সমাজতত্ত্ব

(Sociology)

পরিমল ভূষণ কর

পরিবেশক ঃ
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

স্বত্বাধিকারী ঃ
অভিযান গোষ্ঠীর পক্ষে সচিব,
বিদ্যানন্দ চৌধুরী,
১০১ জি, টি, রোড, বর্ধমান

প্রকাশকাল ঃ
৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ
শ্যামল চক্রবর্তী

মুদ্রণ ঃ
ইন্দ্রনাথ দাশ
কো - অপারেটিভ প্রেস,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

মুদ্রণ সহযোগিতায় ঃ
কম্পু - কালার,
৬এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা

(লেসার কম্পোজ)
ইলেক্ট্রো গ্রাফিক্স
২২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা - ৭৩

(প্রচ্ছদ মুদ্রণ)
টাইপো গ্রাফিকস আর্ট
পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা - ৯

(লেমিনেশন)
চৌধুরী কনসার্ন
৫৭/২ই, কলেজস্ট্রীট কলিকাতা - ৭৩

প্রচ্ছদ ঃ সমর মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

এই পুস্তকটি স্নাতক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনার্স পাঠ্যসূচীর অনুসরণে লিখিত। পুস্তকটিতে ভাষা ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপন যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও সরল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে সমাজতাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকবর্গও সহজে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারেন।

বাঙলা ভাষায় সমাজসম্পর্কিত নানা বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তক আছে। কিন্তু এই বিষয়ে আজও কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক লিখিত হয় নাই। এই ক্ষেত্রে আলোচ্য পুস্তকটি প্রথম পদক্ষেপ। সেইজন্য আমাকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

ইংরাজীতে লিখিত অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন অনুসারে বিষয়বস্তু সমূহ বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়। ইহার ফলে আমাদের পক্ষে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের পারম্পর্য অনুসরণ করা কঠিন হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আমি পরিচ্ছেদগুলি এমনভাবে সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে প্রথম প্রবেশেচ্ছু পাঠকের পক্ষে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে একটি অখণ্ড সামগ্রিক রূপ গড়িয়া তোলা সম্ভব হয়। পুস্তকটি চার খণ্ডে মোট চব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে তত্ত্বগত আলোচনা। যেমন, বিষয়বস্তুর পরিচিতি, অপরাপর সমাজবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক, সমাজকে বিশ্লিষ্ট করিয়া প্রতিটি অংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ। বিভিন্ন সামাজিক আচার-ব্যবস্থা দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত। যেসব আচার-ব্যবস্থা সমাজকে সুসংহত এবং সমাজ-জীবনকে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে সেইসব আচার-ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণ এই খণ্ডে আছে। তৃতীয় খণ্ডে কালপ্রবাহে সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তন ও তাহার প্রকৃতি এবং কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে সামাজিক সমস্যার স্বরূপ এবং কয়েকটি সামাজিক সমস্যা আলোচনা করা হইয়াছে।

বর্তমানে সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তা, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। অতএব কোন একটি পাঠ্যপুস্তকের সীমানার মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা নিঃশেষিত হইতে পারে না। এই কারণে প্রথম প্রবেশেচ্ছু পাঠকদের দিগদর্শন করাইবার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। জটিলতা এড়াইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই বিস্তারিত আলোচনা করি নাই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পুস্তকটির কলেবর বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় বিস্তারিত আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পরিপূরক গ্রন্থ

পাঠ করিয়া অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্ট হইবে বলিয়া আশা করি। সমাজতত্ত্বের কয়েকটি বিতর্কমূলক বিষয় লইয়া সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আমি এইসব বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাধারা যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত করিয়াছি। ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইয়া যাহাতে নিজেরাই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের মূল্যায়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তথ্যাদি পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পাশ্চাত্য জগতে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সঙ্গে পাঠকবর্গকে পরিচিত করাইবার সময় ভারতবর্ষীয় উদাহরণ এবং ভারতীয় মনীষীদের সমাজবিষয়ক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাভাবনা পরিবেশন করিয়া আলোচনাকে যথাসম্ভব অর্থবহ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকসমূহে সমাজতাত্ত্বিক মূল বাচ্যগুলি (basic concepts) য়ুরোপীয় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা-প্রসূত উদাহরণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জাতীয় উদাহরণ আমাদের নিকট পরিপূর্ণভাবে অর্থবহ হয় না। ইহার ফলে সমাজতাত্ত্বিক মূল বাচ্যগুলি সম্পর্কেও আমাদের ধারণা অনেক সময় অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক বাচ্যগুলির যোগ-সাধন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, সৃজনমূলক চিন্তা-শক্তি বিকাশের পথে ইহা অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এই ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতাত্ত্বিক মূল বাচ্যগুলি যথাসাধ্য আমাদের পরিচিত উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়েরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। যখন আমরা পাশ্চাত্য মনীষীদের রচিত সমাজতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক পাঠ করি, তখন অনুরূপ বিষয়ে ভারতীয় মনীষীদের চিন্তা পাশাপাশি বিচার না করিলে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট ঔৎসুক্য জন্মায় না। ভারতীয় জীবনাদর্শ পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ হইতে ভিন্ন। সুতরাং ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা না থাকিলে ভারতীয় সমাজবিষয়ক আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না। আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়ে বিস্তারিত এবং গভীর আলোচনা করার সুযোগ খুবই সীমিত থাকায় আমি স্থানে স্থানে ইঙ্গিত মাত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকবর্গ অনুসন্ধিৎসু হইয়া এইদিকে দৃষ্টি দিলে আমার আরব্ধ প্রয়াস সার্থক হইবে। অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইবে বলিয়া আশা রাখি।

আলোচ্য পুস্তকে ইংরাজী রচনা হইতে বহু উদ্ধৃতি পাদটিকার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া মূল আলোচনার অংশ হিসাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি এবং তৎসঙ্গে ভাবানুবাদ দিয়াছি। কারণ, আমার দীর্ঘকালের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হইল যে ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ পাদটিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ পাঠোপযোগী বলিয়া মনে করে না। অথচ মাতৃভাষায় কোন বিষয় পাঠ করিবার সময় প্রাসঙ্গিক বিদেশী রচনার সঙ্গে পরিচিত না হইলে জ্ঞানার্জনে ত্রুটি থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিছু কিছু ইংরাজী উদ্ধৃতির সঙ্গে পরিচিত হইলে কোন কোন বিষয়ে ইংরাজী

রচনা পাঠ করিবার ঔৎসুক্য জন্মাইবে এই আশায় বহু ইংরাজী উদ্ধৃতি মূল আলোচনায় স্থান পাইয়াছে এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শেষে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বাঙলা ভাষায় সমাজবিষয়ক বহু প্রবন্ধ লেখা হইয়া থাকে। পুস্তকও প্রচুর আছে। কিন্তু সমাজতত্ত্বের মূল বাচ্যগুলির সর্বজনস্বীকৃত কোন পরিভাষা আজও গড়িয়া উঠে নাই। একাধিক প্রবন্ধ বা পুস্তক পাঠ করিলে দেখা যায়, একই ধারণাকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। সর্বজনস্বীকৃত পরিভাষার অভাব ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক। বাচ্য (concept) হইল বিষয়-বিশ্লেষণের উপায়স্বরূপ। সুতরাং পারিভাষিক শব্দ সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হইলে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা সহজসাধ্য হয়। আদর্শ হিসাবে পরিভাষা এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত, যাহাতে প্রত্যেকটি শব্দ বিশেষ একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশ করে। একই শব্দ যদি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ভাববিনিময় কষ্টকর হইয়া উঠে। সেইজন্য এই পুস্তকে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দাবলীর একটি তালিকা পৃথকভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সব ক্ষেত্রে যে পারিভাষিক শব্দ যথোপযুক্ত হইয়াছে তাহা নহে। তবে অন্য বিকল্প শব্দ মনে না আসায় নিজের পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি শব্দ বাধ্য হইয়া ব্যবহার করিয়াছি। ভবিষ্যতে কেহ যদি আরও উন্নততর পরিভাষা প্রয়োগ করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। ভারত সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরিভাষাবলী যথাসম্ভব ব্যবহার করিয়াছি। যেসব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর দিক হইতে পারিভাষিক শব্দ অর্থদ্যোতক বলিয়া মনে হয় নাই, সেইসব ক্ষেত্রে নূতন শব্দ চয়ন করিয়াছি। সব ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও অর্থবহ শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছি। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইংরাজী শব্দের বহুল প্রচলিত এবং পরিচিত প্রতিশব্দও বর্জন করিয়াছি এবং তাহার স্থলে নূতন শব্দ চয়ন করিয়াছি। যেমন, culture শব্দটির বাঙলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যখন কোন লোককে cultured বলিয়া বিশেষিত করা হয়, তখন 'সংস্কৃতিবান' শব্দের প্রয়োগ উপযুক্ত, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাহিত্যে, দর্শনে এবং কলাশাস্ত্রে culture বা সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ পরিশীলিত, মার্জিত ও সুচারুসম্পন্ন ভাব বহন করে। কিন্তু সমাজতত্ত্বে এবং নৃতত্ত্বে culture শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই দুইটি বিদ্যায় কোন বিশেষ জনসমষ্টির culture বলিতে তাহাদের আহারবিহার, বিলাসব্যসন, আচারআচরণ প্রভৃতি সব কিছু বুঝায়। নানা কারণে 'সংস্কৃতি' শব্দটি এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা অনুচিত বলিয়া মনে হয়। 'সংস্কৃতি' শব্দ অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি, রীতিনীতি, আচারব্যবহার ইত্যাদির উৎকর্ষ নির্দেশ করে। সুতরাং সমাজতত্ত্বে ও নৃতত্ত্বে ব্যবহৃত culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে। এইরূপ প্রয়োগে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা। এই কারণে আমি culture-এর প্রতিশব্দ

হিসাবে 'জীবন-ধারা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। 'জীবন-ধারা' বলিতে way of life ছাড়া অন্য কোন অর্থ বহন করে না। অপর কোন উন্নততর শব্দ থাকিতে পারে। তাহা আমার জানা নাই। যদি কাহারও এই বিষয়ে কোন প্রস্তাব থাকে, দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। মূল কথা হইল, একটি বিশেষ শব্দ যাহাতে কেবলমাত্র একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। এই বিষয়ে আমাদের প্রয়াস সার্থক হইলে বাঙলায় সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা সহজ ও সরল হইবে এবং দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আবার অনেক ইংরাজী শব্দ আমাদের কথাবার্তায় বহুল প্রচলিত। এইসব ক্ষেত্রে বাঙলা পরিভাষা ব্যবহার না করিয়া প্রচলিত ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করাই বোধহয় সঙ্গত। বহু আরবী ও ফার্সী শব্দ যেমন বাঙলা ভাষায় মিশিয়া যাওয়ায় বাঙলা শব্দতালিকা ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইয়াছে, অনুরূপভাবে যেসব ইংরাজী শব্দ সহজভাবে আমাদের কথোপকথনে স্থান পাইয়াছে, সেইসব শব্দ লেখায় গৃহীত হইলে বিষয়-বস্তুর আলোচনা অনেক বেশি সাবলীল হয় বলিয়া আমার ধারণা। যেমন, ইংরাজী fashion, pattern প্রভৃতি শব্দ বাঙলা কথাবার্তায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্ব স্তরে প্রচলিত এবং সমপরিমাণে অর্থবহ। সেইজন্য এইসব ক্ষেত্রে অর্থদ্যোতক প্রতিশব্দ বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া বাঙলায় ফ্যাশান, প্যাটার্ন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়ন করিবার সময় আমি অনেকের নিকট হইতে নানাপ্রকার সাহায্য পাইয়াছি। সর্বাগ্রে আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে আমার সহকর্মী পরম স্নেহভাজন শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। বিভিন্ন পুস্তক সংগ্রহ ও সরবরাহ করিয়া তিনি আমার অনেক শ্রম লাঘব করিয়াছেন। সর্বোপরি, অসীম ধৈর্য এবং যত্ন সহকারে তিনি আমার পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনেক ত্রুটি সংশোধন করিতে সাহায্য করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি যে আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্তমান কালে দুর্লভ। পরিভাষা রচনা করার কাজে এবং অন্যান্য ভাবে আমার শিক্ষক অধ্যাপক শ্রী নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ ডক্টর তারাপদ ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি, শ্রী নির্মাল্য আচার্য, শ্রী দীপক চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রী অমর কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃত সাহায্য করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের তরফ হইতে পাণ্ডুলিপিটি পুনরীক্ষণের (review) দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নির্মল চন্দ্র বসু রায় চৌধুরী। তিনি গ্রন্থটির মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে যেসব মন্তব্য ও প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা সবিশেষ মূল্যবান। আমি ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট গভীরভাবে ঋণী। আমি অতীতে বাঙলা ভাষায় গ্রন্থ ত' দূরের কথা কোন প্রবন্ধও লিখি নাই। কাজেই আমার রচনা-শৈলীতে ও শব্দ-প্রয়োগে যথেষ্ট দুর্বলতা রহিয়াছে। এই বিষয়ে আমার সহধর্মিণী আগাগোড়া পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করিয়া ভাষার সরলীকরণে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। তাহার সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এই দুরূহ দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হইত।

এই গ্রন্থের প্রকাশন ত্বরান্বিত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক শ্রী অবনী মিত্র বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। মেসার্স এস্, এ্যাণ্ট্ল এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডেব অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ গ্রন্থটির মুদ্রনকার্য অতি অল্প সময়ে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য নিরলস প্রয়াস করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

৭এ, অমৃত ব্যানার্জি বোড
কলিকাতা ২৬

পরিমল ভূষণ কর

বিশ্লেষিত সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড : সামাজিক আচার-ব্যবস্থা

তৃতীয় খণ্ড : সমাজ প্রবাহ

চতুর্থ খণ্ড : সামাজিক সমস্যাবলী

সমাজতত্ত্ব

প্রথম খণ্ড

তত্ত্বগত আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়বস্তুর পরিচিতি

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মানুষ সামাজিক জীব বলিয়া পরিচিত। সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র স্বভাবের তাড়নায় নহে, প্রয়োজনের তাগিদেও তাহাকে সমাজ গড়িয়া তুলিতে হয় এবং সামাজিক পরিবেশে বসবাস করিতে হয়। যে কোন সমাজের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, সমাজে বসবাসকারী লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে। কে কাহার সঙ্গে কি অবস্থায় কি রকমের আচরণ করিবে ইহা মোটামুটি নির্ধারিত থাকে। ইহার যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে। তবুও যথেচ্ছ আচরণ করা সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ। কারণ, যথেচ্ছ আচরণ স্বীকৃত হইলে সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সুতরাং সমাজবদ্ধ মানুষ বলিতে সমাজের নানারকম অনুশাসনের অধীন মানুষকে বুঝায়।

বহু প্রাচীন কাল হইতে দার্শনিকগণ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক লইয়া নানাদিক হইতে আলোচনা করিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, প্লেটো এবং এরিস্টটলের রাজনীতিক চিন্তায় ইহার আভাষ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে এই বিষয়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রবন্ধে, সাহিত্যে ও উপন্যাসে সমাজের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন সমাজবিদ্যার (social science) উদ্ভব হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ কালস্রোতে সমাজের বিবর্তন, গতি ও প্রকৃতি নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের উদ্ভব, রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক এবং অন্যান্য বহু রাজনীতিক সমস্যা-সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। অর্থনীতিবিদ সমাজস্থ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য সমাবেশ করিয়া সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করার বিষয় অলোচনা করিয়াছেন। এইভাবে সমাজের অন্যান্য দিক আলোচনার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি স্বতন্ত্র সমাজবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। সমাজতত্ত্ব ইহাদের অন্যতম ও কনিষ্ঠতম। সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু কি এবং ইহার স্বাতন্ত্র্য কোথায় এই প্রশ্ন লইয়া অনেক বিতর্ক অতীতে হইয়াছে এবং বর্তমান কালেও চলিতেছে। এই বিষয়টি আলোচনা করিবার পূর্বে সমাজতত্ত্ব কিভাবে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যায়।

সমাজতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইল সমাজ এবং নানা ধরনের সামাজিক সম্পর্ক। মনুষ্যসমাজকে কেন্দ্র করিয়া সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধরনের চিন্তা ও আলোচনার সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে। ফরাসী দার্শনিক অগস্ট কঁৎ (August Comte, 1798-1857) সর্বপ্রথম 'সোসিওলজি' শব্দটি প্রবর্তন করিয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজবিদ্যা হিসাবে সমাজতত্ত্বের

সূচনা করেন। বিগত এক শতাব্দীতে নানাদিক হইতে এই বিষয়ের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অনেক শাখা প্রশাখা বিস্তারলাভ করিয়াছে। কিন্তু গত এক শতাব্দীর ইতিহাস সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে আমাদের আরও আগের এক শতাব্দীর (১৭৫০-১৮৫০) বিভিন্ন সমাজচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিম য়ুরোপে সমাজব্যবস্থায় এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে কয়েকটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলির ঢেউ মানুষের চিন্তাজগতেও আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মানুষকে অনেক বেশি সমাজ-সচেতন করিয়া তুলে। সর্বাগ্রে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের উল্লেখ করিতে হয়। শিল্প-বিপ্লব কেবলমাত্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনে নাই, সমাজেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল। যেমন, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং বাসস্থানের সমস্যা, গ্রাম-ভিত্তিক সমাজের অবক্ষয় এবং নগর-ভিত্তিক সমাজের সম্প্রসারণ প্রভৃতি নানারকমের সামাজিক পরিবর্তন শিল্প-বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিতে থাকে। তাহা ছাড়া, শিল্প-বিপ্লবের প্রথম জোয়ারের মুখেই নানারকম রাজনীতিক মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। এইসব মতবাদের পরিণতি দেখিতে পাই ফরাসী বিপ্লবে। ফরাসী বিপ্লব স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ ঘোষণা করে। ইহাকে চিন্তার জগতে একটি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিল্প-বিপ্লবে যে-সব সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়, ফরাসী-বিপ্লবে উচ্চারিত আদর্শের অনুপ্রেরণায় সেইসব সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজিবার চেষ্টা করা হয়। দারিদ্র্য এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা দেয়। পূর্বে দারিদ্র্যকে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের কপালের ফের বলিয়া গণ্য করা হইত এবং অসহায়ভাবে মানিয়া লওয়া হইত। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে যখন একদিকে প্রাচুর্য এবং অপরদিকে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন দারিদ্র্যকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে স্বীকার করা হয়। কি উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায় ইহা লইয়া চিন্তা এবং নানা-প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। সমাজের নানা ক্ষেত্রে সামাজিক সমীক্ষা (social survey) চালানোর চেষ্টা করা হয়। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করিবার পথে ইহাই প্রথম উল্লেখযোগ্য ধাপ।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে পশ্চিম য়ুরোপীয় নাবিকগণ দলে দলে দেশ দেশান্তরে যাইতে আরম্ভ করে। বিদেশ হইতে তাহারা বাণিজ্য সম্ভার ছাড়াও নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া নিয়া আসিত। এইভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত সমাজের স্বতন্ত্র আচার আচরণ ও অনুশাসনের সঙ্গে য়ুরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ও জনসাধারণের পরিচয় হইতে থাকে। বিভিন্ন দেশের জীবন-ধারার (culture) পার্থক্য তাহাদের সমাজ-সচেতনতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। ইহার ফলে ইতিহাস-চর্চা নূতন রূপ নেয়। কতিপয় অসভ্য বর্বর জাতির সংস্পর্শে আসায় তাহাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কিভাবে অসভ্য অবস্থা হইতে তাহাদের সমাজ সুসভ্য সংগঠিত সমাজে পরিণত হইয়াছে।

সমাজের অভিব্যক্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া যেখানে ধারাবাহিকতা নির্দেশ করিতে অসুবিধা হইয়াছে, সেখানেই ঐতিহাসিকগণ অনুমানের (Theoretical or Conjectural History) উপর নির্ভর করিয়া ধারাবাহিকতা টানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই অনুমানের ভিত্তি ছিল মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক আচরণবিধি। কোন বিশেষ অবস্থায় মানুষের স্বভাবসুলভ আচরণ বা প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে ইহা অনুমান করিয়া ইতিহাসের অজ্ঞাত অংশসমূহের উপর আলোকসম্পাত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই ধরনের ইতিহাস চর্চা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা ধারা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রথমতঃ, সমাজের বিবর্তন ও প্রগতির ধারণা পরবর্তীকালের সমাজচিন্তাকে সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। এই বিষয়টি পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিকগণের (Philosophical Historians) নূতন ধারায় ইতিহাস চর্চার ফলে গোটা সমাজের উপর আলোকসম্পাত করা হয় এবং সমাজ বলিতে যে কেবলমাত্র রাষ্ট্র বা রাজনীতিক সংগঠনই বুঝায় না এই ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সমাজ যে রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র এবং আরও ব্যাপক এই ধারণা পরবর্তীকালে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা গড়িয়া উঠার পথ সুগম করিয়াছিল।

১৭৫০ হইতে ১৮৫০ এই এক শতাব্দীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় কি ভাবে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে আস্তে আস্তে সমাজ-চিন্তা শুরু হইয়াছিল। এই চিন্তার পরিণতি হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের গোড়ার দিকে স্বতন্ত্র সমাজবিদ্যা হিসাবে সমাজতত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী চার পাঁচ দশকে ইহা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। এই সময়কার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় সুস্পষ্ট দুইটি ধারা পাশাপাশি চলিতে দেখা যায়।

কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ তথ্য-ভিত্তিক আলোচনার উপর গুরুত্ব দেন। পূর্বেই সামাজিক সমীক্ষার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে সমীক্ষার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যা ও তথ্যের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করার উপর বেশি জোর দেন। আবার কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ গোটা সমাজকে চোখের সামনে রাখিয়া সমাজের গতি, প্রকৃতি ও বিবর্তন সম্পর্কিত কল্পনা বা অনুমান-ভিত্তিক (speculative) আলোচনার উপর জোর দেন। যেমন, ডারউইনের বিবর্তনবাদের অনুসরণে জৈব বিবর্তনের মূল নীতিগুলির সাহায্যে কেহ কেহ সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ পদার্থবিদ্যার অনুসরণে সমাজকে একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো (structure) কল্পনা করিয়া সমাজের ক্রিয়াকলাপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমানকালেও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় তথ্যভিত্তিক ও অনুমান-ভিত্তিক ধারা দুইটি পাশাপাশি চলিতে দেখা যায়।

এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু ও অনুশীলন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

সংজ্ঞা

প্রথমাবস্থায় সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপকভাবে (encyclopaedic) নির্ণীত হইত। সমাজস্থ মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম এবং সবরকমের সামাজিক সম্পর্ক সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য করা হইত। মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের ইতিহাসও এই আলোচনা হইতে বাদ যাইত না। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দেখা যায় যে, এইরূপ ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসর সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। এই কারণে আপত্তি উঠে যে, সমাজতত্ত্ব স্বতন্ত্র সমাজবিদ্যা হিসাবে গণ্য হইতে পারে না।

এই ধরনের অভিযোগের ফলে দুই দিক হইতে সমাজতত্ত্বের পরিধি নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদের মতে সমাজ-জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক লইয়া বিশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু (conception of Sociology as a clearly defined specialism)। দ্বিতীয়তঃ, কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদের মতে, বিভিন্ন সমাজবিদ্যা (যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ দর্শন ইত্যাদি) যাহা আলোচনা করে তাহার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সংশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত (the view of Sociology as a synthesis of all Social Sciences)।

প্রথমোক্ত মতবাদের (School of Formal Sociology) সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি ও ব্যাখ্যা উত্থাপন করা হইয়াছে। এই মতবাদ অনুসারে, সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা এবং সমাজ জীবনে বিভিন্ন রকম সম্পর্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই মতবাদের আলোচনা করিয়াছেন।

ফার্ডিনেণ্ড টনিজ (Tonnies) সমাজস্থ লোকের পারস্পরিক সম্বন্ধের ঘনিষ্টতার তারতম্য অনুসারে সমাজকে সম্প্রদায় (Gemeinschaft or community) এবং সমিতি (Gesellschaft or association) এই জাতিরূপে বিভক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

আরেকজন জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ জর্জ সিমেলের (Simmel) মতে সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (interactions) বিশ্লেষণ করিয়া পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে বিভিন্ন জাতিরূপে (forms or types) ভাগ করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার বক্তব্য একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা আমাদের মনের নানা ভাব ভাষায় প্রকাশ করি। কিন্তু ভাষায় প্রকাশিত বিষয়বস্তু ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নহে। বিষয়বস্তু বিচার না করিয়া বৈয়াকরণ ভাষার গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া, শব্দ-গঠন, শব্দ-প্রয়োগ সম্পর্কিত নিয়মাবলী আলোচনা করেন। অনুরূপভাবে, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক এবং বিশেষ বিশেষ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। যেমন, প্রভুত্ব ও অধীনতা, প্রতিযোগিতা, শ্রমবিভাগ ইত্যাদি নানারকম পারস্পারিক সম্পর্কের প্যাটার্ন বা ফর্ম রাজনীতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, পরিবারে এবং সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই। অতএব বৈয়াকরণের ন্যায় সমাজতত্ত্ববিদেরও কাজ হইল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করিয়া নানাপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক বা পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন ফর্মে বা জাতিরূপে ভাগ করা।

আরও দুইজন জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ আলফ্রেড ফিয়ারকান্ড (**Alfred Vierkandt**) এবং লিওপোল্ড ফন্ হ্বীজ (**Leopold Von Wiese**) সামাজিক সম্পর্কের আরও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা এবং আরও জটিল শ্রেনীবিভাগ করিয়াছেন।

ফিয়ারকান্ড-এর মতে, আমাদের সামাজিক জীবন যে-সব মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভরশীল, সেই বৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ করাই হইল সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার মতে, সমাজতত্ত্বে ভারতীয় সমাজ বা ফরাসী সমাজের একমাত্র তাৎপর্য হইল সমাজের পারস্পারিক সম্পর্কের স্বতন্ত্র উদাহরণ হিসাবে। এই দুইটি সমাজের সমাজ-বন্ধনের পশ্চাতে কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি কাজ করে অথবা এই দুইটি সমাজের স্থিতি এবং গতি কি প্রকার মানসিকতার উপর নির্ভর করে এই জাতীয় বিষয়গুলিই সমাজতত্ত্বের উপজীব্য।

ফন হ্বীজ-এর বক্তব্য হইল, সমাজস্থ লোকের পারস্পারিক সম্পর্ক দুইটি মৌল মানসিক প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটি সংযোগকারী (**associative**) এবং অপরটি বিয়োগকারী (**dissociative**) প্রবণতা। সংযোগকারী প্রবণতার উদাহরণ খাপ খাওয়ানো, সমতা আনয়ন করা ইত্যাদি। বিয়োগকারী প্রবণতার উদাহরণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া, বিরুদ্ধাচরণ করা বা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া। তাঁহার মতে, সমাজস্থ লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে হয় সংযোগকারী সম্বন্ধে নতুবা বিয়োগকারী সম্বন্ধে আবদ্ধ। সব রকম সামাজিক সম্পর্ককে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া তিনি মনে করেন 1।

যাঁহারা উপরোক্ত উপায়ে সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ দিক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলিয়া মত পোষণ করেন, তাঁহাদের মতবাদকে নানাদিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। অনেকের মতে, গোটা সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিলে আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থহীন হইবে। যেমন, অর্থনৈতিক জীবন বাদ দিয়া প্রতিযোগিতার আলোচনা করা নিরর্থক। আবার একই ধরনের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। যেমন, পরিবারে অধীনতা বলিতে যাহা বুঝায় রাজনীতিক ক্ষেত্রে বা ধর্মীয় সম্পর্কে অধীনতা সম্পূর্ণ অন্য অর্থ বহন করে। সুতরাং

---

1. "All relations may be divided into one or the other, and if they cannot it is because they belong to a third category sharing both associative and dissociative characteristics." A Hundred Years of Sociology by Mitchell. Page 112

সমালোচকদের মতে, আলোচনা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক না করিলে আলোচনা অর্থবহ বা ফলপ্রসূ না হওয়ারই কথা।

এইজন্য অনেক সমাজতত্ত্ববিদ সংশ্লেষাত্মক (synthetic) আলোচনা করার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে, সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং কার্যকলাপ পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত ও নির্ভরশীল। সমাজ জিনিষটি জৈব না হইলেও যান্ত্রিক নহে। নানা রকম মানসিক বন্ধনের দ্বারা ইহা সংশ্লিষ্ট। অতএব অন্যান্য সমাজবিদ্যা সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশ পৃথক ভাবে আলোচনা করিলেও এই ধরনের আংশিক আলোচনা-গুলিকে এক সূত্রে গাঁথিয়া সমাজকে সামগ্রিকভাবে দেখার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিক তাঁহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজের বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজ অভিন্ন এবং সমাজের এক অংশে যাহা ঘটে তাহা অপরাপর অংশকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে। সমাজের এই সামগ্রিক রূপটি তুলিয়া ধরা ও বিশ্লেষণ করাই সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু। এই মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে এমিল ডুর্কহেইম (Emile Durkheim) ও হবহাউসের (Hobhouse) নাম উল্লেখ করা যায়।

ডুর্কহেইম সমাজতত্ত্বকে প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগের নাম দিয়াছেন social morphology বা সমাজের গঠন-সম্পর্কিত বিদ্যা। ভৌগোলিক অবস্থান, লোকসংখ্যার আয়তন ও ঘনত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজ-গঠনে কি ধরনের এবং কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে এই জাতীয় আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় ভাগের নাম দিয়াছেন Social Physiology বা সমাজের শারীরবৃত্ত। সমাজে নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা (institutions) কিভাবে উদ্ভূত হয় এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এই ভাগের আলোচ্য বিষয়। যেমন, ধর্ম, নীতি, আইন বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামাজিক পটভূমিকা নির্দেশ করাই এই ভাগের বিষয়-বস্তু। তৃতীয় ভাগের নাম দিয়াছেন General Sociology বা সাধারণ সমাজতত্ত্ব। দ্বিতীয় ভাগে সমাজের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে যাহা পৃথকভাবে আলোচিত হইবে তাহার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা এবং থাকিলে সেই যোগসূত্র নির্ধারণ করা সাধারণ সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয়। ডুর্কহেইম এই প্রকার সংশ্লেষাত্মক আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সমাজে যাহা ঘটে তাহার একটি বা একাধিক সামাজিক কারণ (social facts) থাকে। যেমন, তিনি আত্মহত্যা (suicide) সম্পর্কে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়া-ছেন যে আত্মহত্যা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও তাহার অনেকগুলি সামাজিক কারণ থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ, ডুর্কহেইম পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, অর্থনৈতিক মন্দা ব্যক্তিগত জীবনে সাংঘাতিক আর্থিক বিপর্যয় টানিয়া আনে এবং আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি করে।

হবহাউসের মতে, সমাজের বিভিন্ন অংশের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের একত্রীকরণ সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তবে ইহা কোন কৃত্রিম একত্রীকরণ (mechanical juxtaposition) নহে। গোটা সমাজের মধ্যে এক বা একাধিক মৌল ভাবধারা

(central conceptions) পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই ভাবধারা সমাজের বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করে। অতএব সমাজতত্ত্ববিদের কাজ হইল এই সমন্বয়ী ভাবধারা স্মরণ রাখিয়া সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ করা। হবহাউস ও ডুর্কহেইমের চিন্তাধারায় এইদিক হইতে যথেষ্ট মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

একটু গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সমাজের অংশ বিশেষের বিশ্লেষাত্মক আলোচনা এবং গোটা সমাজের সংশ্লেষাত্মক আলোচনার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কোন অংশকে গোটা সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নহে। এইজন্য অংশবিশেষের আলোচনা করিবার সময় অন্যান্য অংশকে উপেক্ষা করিলে সেই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অপর পক্ষে, বিভিন্ন অংশের সম্যক আলোচনা না করিলে গোটা সমাজের আলোচনাও সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক হইতে পারে না। সুতরাং সমাজের অংশবিশেষের বিশ্লেষণ এবং গোটা সমাজের সংশ্লেষাত্মক আলোচনা যুগপৎ চলিতে পারে এবং চলা উচিত। সমাজতত্ত্বে দুইয়েরই স্থান আছে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যে-সব প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা, সমিতি বা সামাজিক সঙ্ঘের (social group) ভিতর দিয়া বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের বিশ্লেষণ করা এবং জাতিরূপে ভাগ করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র নির্ধারণ করিয়া পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয়। যেমন, একদিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং অপরদিকে নৈতিক মান ও আইনব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করা এই প্রকার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়তঃ, সমাজের স্থিতি এবং গতি বিশ্লেষণ করিয়া সমাজের স্থিরত্ব (stability) ও গতিশীলতার অনুকূল এবং প্রতিকূল উপাদানগুলি নির্ণয় করা। চতুর্থতঃ, গবেষণামূলক কাজে যে-সব তথ্য সংগৃহীত হয় তাহার সাহায্যে সমাজে কোন্‌দিকে এবং কি ধরনের পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে তাহা নির্দেশ করাও সমাজতত্ত্ববিদদের আলোচনার অন্তর্গত। যেমন, পরিবর্তিত অবস্থার ফলে কাঠামো ও কার্যাবলীর দিক হইতে পরিবারের নানা প্রকার পরিবর্তন আলোচনা করা ছাড়াও ভবিষ্যতে পারিবারিক কাঠামো কি রূপ পরিগ্রহ করিবে ইহার ইঙ্গিতও তাঁহারা দিয়া থাকেন।

আরেকটা বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সমাজ সম্বন্ধে কেবলমাত্র তত্ত্বগত বিশ্লেষণ করা ছাড়াও বর্তমান কালে সমাজতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন রকমের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ও তাহাদের সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কেও গবেষণা করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সামাজিক সমস্যা লইয়া যে-কাজ শুরু হইয়াছিল তাহাই বর্তমানে আরও ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। শিল্প-ভিত্তিক জটিল সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন, অর্থনৈতিক বা শিক্ষা ক্ষেত্রে) গৃহীত সরকারী নীতির সম্ভাব্য বা বাস্তব ফলাফল আলোচনা করা বর্তমানে সমাজতত্ত্ববিদগণের গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জাতীয় আলোচনাকে ফলিত সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলা যায়।

সমাজতত্ত্ব কি মূল্যমান-নিরপেক্ষ ?

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। যখন সমাজতত্ত্ববিদগণ সামাজিক পরিবর্তনের গতি আলোচনা করিবেন তখন কি তাঁহারা ভাল-মন্দের বিচার করিবেন ? যেমন, যৌথ পারিবারিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া যাওয়া সম্পর্কে কি তাঁহারা নীতিগত কোন মতামত ব্যক্ত করিবেন ? এক কথায়, সমাজতত্ত্ব কি মূল্যমান-নিরপেক্ষ হইবে না মূল্যমান নির্দেশক হইবে ?

আমরা সমাজতত্ত্বের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম হইতেই সমাজতত্ত্বকে মূল্যমান-নিরপেক্ষ শাস্ত্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে কঁৎ-এর দৃষ্টবাদ (Positivism), জীব-বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ (Evolutionism) এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অনুশীলন-পদ্ধতি দ্বারা সমাজতত্ত্ববিদগণ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া সমাজের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা সঙ্গত বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। তাঁহাদের মতে, ভাল-মন্দ বা বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের বিচার নীতিশাস্ত্রের বিষয়, সমাজতত্ত্বের নহে। তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল, এই ধরনের বিচারে লিপ্ত হইলে সমাজতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইবে এবং পৃথক সমাজবিদ্যা হিসাবে ইহার টিকিয়া থাকিবার কোন অধিকার থাকিবে না। তাঁহাদের অভিমত ছিল এই যে, সামাজিক পরিবর্তনের গতি বা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবার সময় যথাসম্ভব ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের প্রশ্ন এড়াইয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার ও বিশ্লেষণের উপর জোর দিতে হইবে। এখনও সমাজতত্ত্ববিদগণ মোটামুটি এই মত পোষণ করেন।

আদর্শের দিক হইতে ইহা মানিয়া লইলেও তাঁহারা এই আদর্শ রূপায়ণ করিতে গিয়া কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হন। সর্বাগ্রে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমাজতত্ত্ববিদগণ সমাজের আরও অন্যান্য লোকের মত বিধি-শাসিত সমাজে (normative society) বাস করেন। তাঁহাদের কোন কিছু করা বা না-করা অনেকাংশে সমাজে প্রচলিত বিধি-নিষেধের উপর নির্ভর করে। এই বিধি-নিষেধগুলি আবার কয়েকটি মৌল মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজে বাস করিয়া কাহারও পক্ষে এই মৌল মূল্যবোধগুলিকে উপেক্ষা করিয়া চলা প্রায় অসম্ভব। সমাজের তিরস্কার এবং অবস্থাবিশেষে শাস্তি এত বেশি কঠোর হয় যে, অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই চাপ সহ্য করা কষ্টকর। এই অবস্থায় সমাজতত্ত্ববিদের বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন বিচার যদি সমাজের মৌল মূল্যবোধের বিরোধী হয়, তাহা হইলে আত্মরক্ষার খাতিরে তাঁহার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অগ্রসর দেশেও এক সময় প্রাক্ বিবাহ যৌনসম্পর্ক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার অভিযোগে কয়েকজন সমাজতত্ত্ববিদকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা দিকও বিবেচনা করিতে হইবে। শৈশবাবস্থা হইতে নানা-ভাবে সামাজিকীকরণের ফলে আমাদের জীবনে এমনভাবে সমাজের বিধিনিষেধের

স্বাঙ্গীকরণ (assimilation) ঘটে যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের দ্বারা আমাদের কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনা প্রভাবিত হয়। এই অবস্থায় শত চেষ্টা করিয়াও সমাজতত্ত্ববিদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে মূল্যমান-নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব। একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। অনেক সময় অনেক সমাজতত্ত্ববিদ নানারকম সামাজিক সমস্যাবলী লইয়া অনুসন্ধান-কার্য চালান। একটু গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক মূল্যবোধের বিরোধী কাজকর্মকে তাঁহারা সমস্যা বলিয়া ধরিয়া লন এবং অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে সঙ্গতি রাখিয়া সমস্যার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করেন। ইহা খুবই স্বাভাবিক। পদার্থবিজ্ঞানী বা রাসায়নিকের মত মূল্যমান-নিরপেক্ষ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

অতএব সমাজতত্ত্ববিদ নীতিগতভাবে মূল্যমান নিরপেক্ষ থাকিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত করা অসম্ভব। তাঁহাকে উপরোক্ত দুইটি অন্তরায় মানিয়া লইতে হইবে। তবে ইহাও অনস্বীকার্য যে, তাঁহাকে যথাসম্ভব ভাল মন্দের বিচার পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। এই দিকে দৃষ্টি দিলে তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইবে না।

অন্যান্য সমাজবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন সমাজবিদ্যা যাহা আলোচনা করে তাহার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিবার জন্য সংশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু। কাজেই অন্যান্য সমাজবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি আরও সুস্পষ্ট হইবে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি সমাজবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক নিম্নে বিবৃত করা হইল।

অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব

মানুষের কাজকর্মের যে অংশ ধনের সহিত সম্পর্কিত, প্রধানতঃ তাহাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। সেইজন্য অর্থনীতির আরেক নাম ধনবিজ্ঞান। সাধারণ অর্থে ধন বলিতে আমরা টাকা পয়সা ও অন্যান্য বিষয় সামগ্রী বুঝি। কিন্তু অর্থনীতিতে ধন বলিতে সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ বুঝায়। যে-সব দ্রব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের চাহিদা পূরণ করে এবং যাহাদের যোগান সীমাবদ্ধ সেইসব দ্রব্য ধন বলিয়া পরিচিত। মানুষের ধন আহরণ ও ধন-সৃজন প্রচেষ্টা, ধন-বণ্টন ও ধনের ব্যবহার, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ এবং উপায়গুলি কার্যে প্রয়োগ করার বিভিন্ন পদ্ধতি লইয়া গবেষণা করা অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

অনেকদিন পর্যন্ত অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে অন্যান্য সমাজবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমাজের অন্য সব ঘটনা বা সামাজিক পরিস্থিতি উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীবন, কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনা অর্থনীতিবিদদের বিবেচ্য বিষয় ছিল। কোন অর্থনৈতিক নিয়ম

(economic laws) প্রতিষ্ঠা করিবার সময় তাঁহাদের বলিতে হইত যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে (other things remaining the same) 'ক'-এর বিশেষ কোন পরিবর্তনে 'খ'-এর অমুক ধরনের পরিবর্তন হইবে। যেমন, চাহিদার নিয়ম অনুসারে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে মূল্য বৃদ্ধি হইলে চাহিদা হ্রাস পাইবে। অর্থনৈতিক আলোচনা ও গবেষণা বহুদিন পর্যন্ত এই ধারায় চলিয়াছিল।

কিন্তু সমাজের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকে না বলিয়া অর্থনৈতিক নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম মানিয়া লইতে হইত। সেই কারণে অর্থনৈতিক আলোচনা ও গবেষণাকে আরও বাস্তবমুখী করিবার জন্য অর্থনীতির আলোচনার পরিধিও সম্প্রসারিত করা হয়। ইহার ফলে সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল। প্রথমতঃ, মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ (economic behaviour) তাহার জীবনের অন্যান্য দিক হইতে পৃথক নহে। বরং তাহার অর্থনৈতিক আচরণ, চিন্তা-ভাবনা ও উদ্যম তাহার পরিবেশ, মূল্যবোধ ও অন্যান্য মানসিক প্রবণতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এইজন্য সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক আচরণকে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ সাহায্য করে। বর্তমান কালের বিকাশমুখী অর্থনীতি-সম্পর্কিত (Growth Economics) নানাবিধ সমস্যা আলোচনা করিবার সময় এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যে-সব কারণ সমস্যার সৃষ্টি করে তাহার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল সেইসব দেশের লোকেদের মানসিক গঠন, জীবনাদর্শ ও ঐতিহ্য। সুতরাং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্যের সাহায্যে অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কিত সমস্যাবলীর আলোচনা করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে হ্যাগেনের (E. E. Hagen) নাম করা যায়। তিনি স্বাধীনোত্তর ব্রহ্মদেশের অর্থনৈতিক বিকাশসম্পর্কিত সমস্যাগুলি আলোচনা করিতে গিয়া নূতন কিছু করার মনোভাব (innovative personality) কি করিয়া গড়িয়া উঠে সেই সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[1] বহু পূর্বে ম্যাক্স হেবার (Max Weber) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করিতে গিয়া অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনার উপর ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। কাজেই দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বিকাশ আলোচনা করিতে গেলে অর্থনীতি-বহির্ভূত বিষয়গুলি (non-economic factors) বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ যে economic man-এর কল্পনা করিয়াছিলেন, বাস্তবে তাহার অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিক সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদগণ বহু মূল্যবান আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন। যেমন, সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত সমস্যা, শ্রম বিভাগ, শিল্প সংগঠন ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাকে তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিশ্লেষণ করিয়া এই বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই

---

1 E. E. Hagen : On the Theory of Social Change : How economic growth begins. Vakils, Feffer and Simons Pvt. Ltd. Bombay. 1962.

জাতীয় আলোচনা এত বেশি ব্যাপক হইয়াছে যে, বর্তমানে সমাজতত্ত্বে দুইটি স্বতন্ত্র ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি ধারাকে Industrial Sociology ও Economic Sociology বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসম্পর্কিত নানাপ্রকার বিষয় ও সমস্যা। যেমন, সরকারের গঠন ও কার্যাবলী, নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক, রাষ্ট্র বা সরকারের লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। এই বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হইল অনেক রকম তত্ত্বগত আলোচনা। যেমন, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন রাজনীতিক আদর্শ ইত্যাদি। সরকার ও সরকারকে কেন্দ্র করিয়া নানারকম ব্যবহারিক সমস্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপরোক্ত বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যাইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের কেবলমাত্র রাজনীতিক সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করে। অপর পক্ষে, সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু অনেক বেশি ব্যাপক। কারণ, সমাজ-জীবনের সব দিকই ইহার আলোচনার অন্তর্গত। ইহা ছাড়া, সরকারের গঠন ও সরকারের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা ও তাহার প্রতিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপজীব্য। পক্ষান্তরে, সমাজতত্ত্বে সমাজে প্রচলিত অনেক রকমের আচার-ব্যবস্থার (institutions) মধ্যে সরকারকে অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হয়।

বিষয়বস্তুর বিস্তৃতির দিক হইতে উপরোক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। ইদানীং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনীতিক কাঠামোর বাহ্যিক আকারগত (formal political system) বিশ্লেষণ ছাড়াও প্রকৃতিগত বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘ (pressure group) ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানাপ্রকার সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করা হইতেছে। তাহা ছাড়া, রাজনীতিক আচরণ, বিশেষ করিয়া নির্বাচনের সময় ভোটদাতাদের আচরণ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদগণ গবেষণা করিতেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে Political Sociology নামে একটি নূতন শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শাখার বিষয়বস্তু ও গবেষণা-পদ্ধতির সঙ্গে সমাজতত্ত্বের বিশেষ পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। এইভাবে সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

তবে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব কোন বিষয়ই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইবে না। রাজনীতিক কাঠামোর বাহ্যিক আকারগত বিশ্লেষণ ছাড়াও রাজনীতিক ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগ সম্পর্কিত নানারকমের সমস্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একান্ত আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। অনুরূপভাবে, সমাজতত্ত্বও তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবে।

ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব

অতীতের ঘটনাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া অতীতকে অর্থবহ করিয়া তোলা ইতিহাসের উদ্দেশ্য। যে-সব জায়গায় তথ্যের অভাব থাকায় ঘটনাগুলিকে ক্রমানুযায়ী সাজাইয়া পরিবেশন করিতে অসুবিধা হয়, সেইসব স্থলে ইতিহাস-রচয়িতা গবেষণাকার্য চালাইয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং তাঁহার দৃষ্টি অতীতের দিকে। পক্ষান্তরে, সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টি মূলতঃ বর্তমানের দিকে আবদ্ধ। তবুও এই দুইটি বিদ্যার মধ্যে নানা দিক হইতে যোগাযোগ রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব বা **Historical Sociology** বলিয়া সমাজতত্ত্ব-চর্চার একটি ধারা আছে। যাঁহারা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিশ্লেষণ করেন। ম্যাক্স হেবার ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা **Historical Sociology**র পর্যায়ভুক্ত। ঐতিহাসিকগণ যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন তাহার ভিত্তিতেই সমাজতত্ত্ব-চর্চার এই বিশেষ ধারাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিকগণও কয়েকটি ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের মৌল ধারণা (concept) ও পদ্ধতির সাহায্যে ইতিহাস-চর্চা করেন। যেসব ঐতিহাসিক সামাজিক ইতিহাস (Social History) লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়বস্তুর যথেষ্ট মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক ইতিহাস রচনা করিবার সময় তাঁহারা সমাজতত্ত্ববিদের ন্যায় সামাজিক সম্পর্ক, সমাজের গঠন, শ্রেণীবিন্যাস, নানাপ্রকার আচার-ব্যবস্থা, প্রথাগত অনুশাসন প্রভৃতি বিষয় লইয়া চর্চা করেন। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ইতিহাস-চর্চা ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণ এই যে, উভয় বিষয়ই সমাজস্থ মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী লইয়া আলোচনা করে—অনেক সময় একই দৃষ্টিকোণ হইতে, আবার অনেক সময় ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে। যেহেতু উভয় বিদ্যার একই আলোচ্য বিষয়, ইহা খুব স্বাভাবিক যে একটি বিদ্যা অপর বিদ্যার নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইয়া থাকে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এক বিদ্যার গবেষণা অপর বিদ্যার গবেষণার পরিপূরক। অতএব এই দুই বিদ্যার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র যত বেশি প্রসারিত হইবে, ততই উভয় বিদ্যার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইবে।

দর্শন ও সমাজতত্ত্ব

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, কি ভাবে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইতিহাস চর্চার (**Philosophy of History**) প্রচেষ্টা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। ইহার ফলে বহুদিন পর্যন্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সমাজতত্ত্বের বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। যেমন, সামাজিক পরিবর্তনের গতি আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা নানারকম দার্শনিক প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সামাজিক

পরিবর্তন কি প্রগতির সূচক ? গোটা সমাজকে কি কোন মৌল নীতি বা আদর্শ বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে ? কালক্রমে সমাজতত্ত্ববিদগণ দর্শনের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাদের বিদ্যাকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পূর্বে আরও দেখিয়াছি, কি ভাবে তাঁহারা সমাজতত্ত্বকে সব রকম মূল্যবোধের প্রশ্ন হইতে মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। অনেকের ধারণা, বর্তমানে সমাজতত্ত্বের সঙ্গে দর্শনের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন অথবা অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ধারণা ভুল। উভয় বিদ্যার মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই যোগসূত্র রহিয়াছে। নিম্নোক্ত দিক হইতে এই যোগসূত্র আলোচনা করা হইল।

প্রথমতঃ, সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করা সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয়। এই আচার-আচরণ আবার মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। অতএব মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার আলোচনা করিতে গিয়া সমাজতত্ত্ববিদকে সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধসমূহের বিশ্লেষণ করিতে হয়। তবে তিনি দার্শনিকের ন্যায় মূল্যবোধ সম্পর্কে কোন তত্ত্বগত আলোচনা করেন না। সমাজতত্ত্বে মূল্যবোধকে তথ্য (fact) হিসাবে গ্রহণ করিয়া সামাজিক আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপের উপর ইহার প্রভাব বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

তবুও নীতিশাস্ত্রে এবং দর্শনে মূল্যবোধ এবং মূল্যমান-নির্ণয় সম্পর্কে যাহা আলোচনা করা হয় তাহার সঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদকে পরিচিত থাকিতে হয়। এই পরিচয় না থাকিলে সামাজিক পরিবেশে মানুষের কাজকর্ম, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সার্থকতা ও ব্যর্থতা সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। যেমন, ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় না থাকিলে ভারতীয়দের মূল্যবোধ এবং এই মূল্যবোধের সামাজিক প্রতিক্রিয়া কত সুদূরপ্রসারী হইতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা এবং বিশ্লেষণ করা কোন সমাজতত্ত্ববিদের পক্ষেই সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের ফলে দার্শনিক তত্ত্বগত আলোচনার সূত্রপাত হয়। যেমন, ডুর্কহেইম তাঁহার ধর্মসম্পর্কিত আলোচনায় নানা প্রকার চিন্তাধারার উপর সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত জ্ঞানতত্ত্বীয় (epistemological) আলোচনার অবতারণা করেন।

একটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। সমাজের স্থায়িত্বের স্বার্থে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলা প্রত্যেকের কর্তব্য। কিন্তু স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে, সমাজে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করার যদি কাহারও বুদ্ধিগ্রাহ্য সঙ্গত কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে ? সক্রেটিসের সময় সমাজে যে-নীতিবোধের প্রয়োজন ছিল, সেই নীতিবোধ সক্রেটিসের কণ্ঠেই উচ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহার বিচারকদের কণ্ঠে নহে। অথচ তাঁহার সমসাময়িকরা সক্রেটিসকে বুঝিতে পারেন নাই এবং সমাজের স্থায়িত্বের স্বার্থে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাহা হইলে কি মানিয়া লইতে হইবে যে যাহা প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাহাই শিরোধার্য ? এই জাতীয় প্রশ্ন

অতীতে বহুবার উচ্চারিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হইবে। এই ধরনের অনেক সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা আলোচনা করিতে গিয়া দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সূত্রপাত হয়।

মনোবিদ্যা ও সমাজতত্ত্ব

মনোবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুইটি বিপরীত মত ব্যক্ত করা হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে, মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের পশ্চাতে তাহার মন কাজ করে। কাজেই তাহার বাহ্যিক আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ক বুঝিতে হইলে তাহার মানসিক বৃত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অপর পক্ষে, ডুর্কহেইমের মতে মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের একটি বা একাধিক সামাজিক হেতু (social facts) থাকে। সুতরাং সামাজিক হেতুগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহার বাহ্যিক আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ক বুঝিতে হইবে। তাঁহার মতে, এই বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণের কোন স্থান নাই।

বর্তমান কালেও সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে মিল ও ডুর্কহেইমের মতের সমর্থক রহিয়াছেন। আবার অনেকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মতে কিছু কিছু আচার আচরণ ব্যাখ্যা করিতে গেলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন এবং কোন কোন বিষয় কেবলমাত্র সামাজিক বিধি (sociological laws) দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আবার কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদের মতে, সমাজতাত্ত্বিক পন্থায় কোন কোন সামাজিক আচার-আচরণের ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও এই ব্যাখ্যার যাথার্থ্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাহায্যে যাচাই করা সঙ্গত। যাঁহারা এই ধরনের মত পোষণ করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস সমাজতত্ত্ব ও মনোবিদ্যা একে অন্যের পরিপূরক।

এই প্রসঙ্গে সমাজ-মনোবিদ্যার (Social Psychology) উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকের মতে, সমাজতত্ত্ব ও সমাজ-মনোবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সমাজ-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু সমাজতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার দিক হইতে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তির যাথার্থ্য আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। মনোবিদ্যার দিক হইতে বিচার করিলে সমাজ-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, সমাজস্থ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ কিভাবে সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় ইহা বিশ্লেষণ করা। আবার সমাজতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে সমাজ-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, সমাজস্থ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিসমূহ কিভাবে সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে তাহা নির্ণয় করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজ-মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। গবেষণার ক্ষেত্রে এই উক্তির আরও সমর্থন পাওয়া যায়। জনমত, উচ্ছৃঙ্খল জনতার আচরণ, রাজনীতিক ক্ষেত্রে গণ-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদ ও মনোবিদগণ যে-সব গবেষণা করেন, তাহার মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

আবার অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে এই দুই বিদ্যার গবেষণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় পরিচালিত হয়। বিরোধ বা যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সমাজতত্ত্ববিদ এবং

মনোবিদ সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অনুরূপভাবে, সামাজিক স্তর-বিন্যাস ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মনোবিদ বিষয়ীগত (subjective) কারণসমূহের উপর জোর দেন। অপর পক্ষে, সমাজতত্ত্ববিদ বিষয়গত (objective) কারণগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

উপরোক্ত পার্থক্যগুলি থাকা অস্বাভাবিক নহে। বিষয়বস্তু ও আলোচনা-পদ্ধতির দিক হইতে দুইটি বিদ্যা স্বতন্ত্র। তবুও ইহা অনস্বীকার্য যে এই দুইটি বিদ্যার গবেষণা পরস্পরের পরিপূরক এবং একটির গবেষণালব্ধ ফলাফল অপরটিকে সমৃদ্ধ করে।

নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের ন্যায় নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়গুলি অত্যন্ত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology), ভাষাতত্ত্ব (Linguistics), লোকের শারীরিক গঠন ও আকৃতি সম্পর্কিত চর্চা (Physical Anthropology), জীবন প্রণালী সম্বন্ধীয় আলোচনা (Cultural or Social Anthropology) ইত্যাদি কোন বিষয়ই নৃতত্ত্বের বিবেচনার বহির্ভূত নয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের বিষয়বস্তু প্রায় সমগোত্রীয়। বিশেষ করিয়া নৃতত্ত্বের যে শাখা জীবন-প্রণালী লইয়া আলোচনা করে, তাহার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু ও আলোচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এত বেশি যে, দুইটি বিদ্যার মধ্যে ভেদ রেখা টানা খুব শক্ত।

তবুও এই দুইটি বিদ্যার মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত দিক হইতে আলোচনা করা যায়। প্রথমতঃ, অক্ষরপরিচয়হীন আদিম (primitive) মনুষ্য-সমাজের মধ্যেই নৃতত্ত্ববিদগণ তাঁহাদের আলোচনা ও গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। অপর পক্ষে, শিক্ষিত ও সুসভ্য সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করা সমাজতত্ত্ববিদের দায়িত্ব। এই মৌল পার্থক্য হইতে দুইটি বিদ্যার বিষয়বস্তু ও অনুশীলন পদ্ধতির মধ্যে অন্যান্য পার্থক্যের উদ্ভব হয়। সাধারণতঃ নৃতত্ত্ববিদগণ গোটা সমাজকেই বিভিন্ন দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদগণ সমাজের বিভিন্ন অংশ বা দিক লইয়া আলোচনা করেন। যেমন, কোন সমাজতত্ত্ববিদ হয়ত পরিবার সম্পর্কিত বিষয় সমূহের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন, আবার কেহ হয়ত সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) বা সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে গবেষণা করেন। কারণ, আধুনিক সমাজ-জীবন এত জটিল ও ব্যাপক সম্বন্ধজালে জড়িত যে, সমাজ-তত্ত্ববিদদের পক্ষে গোটা সমাজ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নহে।

দ্বিতীয়তঃ, অনুশীলন পদ্ধতিতেও দুই বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যে-সমাজ নৃতত্ত্ববিদের আলোচ্য বিষয়, তিনি সেই সমাজে বাস করেন এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গবেষণা কার্য চালান। সুতরাং তাঁহার গবেষণা পদ্ধতিকে clinical বা সাক্ষাৎ পরিচয়-ভিত্তিক বলিয়া বর্ণনা করা যায়। অপর পক্ষে, সমাজতত্ত্ববিদ পরিসংখ্যান ও প্রশ্নমালার উপর বেশি নির্ভর করেন। ইহার ফলে তাঁহার গবেষণা অনেক বেশি নিয়মমাফিক পদ্ধতিতে (formal method) পরিচালিত হয়।

তৃতীয়তঃ, গবেষণা-পদ্ধতির পার্থক্যের জন্য আরেকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ নৃতত্ত্ববিদগণকে ছোট সম্প্রদায়ের (small community) মধ্যেই তাঁহাদের গবেষণাকার্য নিবদ্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদদের পক্ষে বৃহদায়তন নৈর্ব্যক্তিক (informal) সামাজিক ব্যবস্থা বা সংগঠন আলোচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং এই বিষয়গুলি সমাজতত্ত্বের একান্ত আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকাইলে একটা বিষয় অনুমান করা যায়। অদূর ভবিষ্যতে যখন নিরক্ষর আদিম অধিবাসীরা সুসভ্য সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য হারাইবে, তখন নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে বর্তমানের ভেদ রেখা বিলীন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এখনও অনেক বিষয়ে এই দুইটি বিদ্যায় প্রায় একই রকম গবেষণাকার্য চালানো হয়। ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদ প্রায় একই প্রকার গবেষণা অতীতে করিয়াছেন এবং বর্তমান কালেও করিতেছেন।

সমাজতত্ত্ব অনুশীলনের পদ্ধতি

সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু ও পরিধি সম্বন্ধে যেমন সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, ঠিক তেমনি এই বিদ্যা অনুশীলন করার পদ্ধতি সম্বন্ধেও অনুরূপ মতভেদ দেখা যায়। এই মতভেদের প্রধান হেতু হইল সমাজতত্ত্ববিদদের বিভিন্ন রকমের সমাজ চিন্তা। যাঁহারা সমাজের প্রকৃতি ও গতি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর (natural laws) অধীন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ বিবর্তনবাদের অনুসরণে ঐতিহাসিক পর্যালোচনার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে সামাজিক ঘটনা-বলীর কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে প্রয়াসী হন। অনেকে আবার জীব বিজ্ঞানের অনুসরণে সমাজকে জীবদেহের ন্যায় একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো (structure) কল্পনা করিয়া সমাজদেহের প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ আলোচনা করেন। এই ধরনের চিন্তাকে Structural—Functionalism বা সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইদানীং বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (বিশেষ করিয়া পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে) অভূতপূর্ব সাফল্য ও অগ্রগতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অনেক সমাজতত্ত্ববিদ' পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজতত্ত্ব অনুশীলন করার পক্ষপাতী। আমরা উপরোক্ত চারিটি পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া ইহাদের মূল্যায়ন করিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহারা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সমাজের বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। কঁৎ, স্পেনসার, হবহাউস প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদগণ প্রথম ধারাটি অনুসরণ করিয়াছেন। এই ধারার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। সমাজ বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কোথাও ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় নাই। একটি পর্যায়ের পরিসমাপ্তি এবং পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়া থাকে।

এই পর্যায়গুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়। এই প্রসংগে কঁৎ-এর বিখ্যাত তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে, প্রত্যেক সমাজ তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথমটি সামরিক মেজাজবিশিষ্ট (militaristic), দ্বিতীয়টি আইনসম্মত (legalistic) এবং তৃতীয়টি আধুনিক শিল্পপণ্যোৎপাদী (modern industrialism) পর্যায়। কঁৎ-এর মতে সমাজের পর্যায়ক্রমিক অভিব্যক্তির ন্যায় মানুষের চিন্তাধারাও তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করে। ঈশ্বরতত্ত্বসম্পর্কিত (theological) চিন্তা কালক্রমে সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত (metaphysical) চিন্তায় পরিণতি লাভ করিয়া শেষ পর্যন্ত দৃষ্টবাদমূলক (positivist) চিন্তায় সমাপ্তি লাভ করে। অন্যান্য অভিব্যক্তিবাদীরা কঁৎ-এর অনুগামী না হইলেও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, নির্দিষ্ট পর্যায়ের ভিতর দিয়া সমাজের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। কাজেই সমাজের স্বরূপ বা প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা দ্বারা সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে সেই বিশেষ সমাজ কোন্ পর্যায়ভুক্ত।

মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর মতবাদও আংশিকভাবে এই চিন্তাধারার সমগোত্রীয়। তাঁহাদের মতে, সমাজের অভিব্যক্তির প্রত্যেকটি পর্যায় পরবর্তী পর্যায়ের অভ্যুদয়ের পথ সুগম করে। আদিম কম্যুনিজম দাসত্বপ্রথার ভিতর দিয়া সামন্তপ্রথায় পর্যবসিত হয়। সামন্তপ্রথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় এবং ধনতন্ত্রের মধ্যেই ইহার ধ্বংসের বীজ উপ্ত থাকায় শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্র লোপ পাইয়া মানবসমাজ পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হইবে। অপরাপর অভিব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে তাঁহাদের মতপার্থক্য রহিয়াছে। মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর মতে এক পর্যায় হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে অন্য পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়।

ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সমাজ বিশ্লেষণের দ্বিতীয় ধারাটি আমরা ম্যাক্স হেবেবার প্রমুখ সমাজতত্ত্বিবদদের আলোচনায় পাই। ম্যাক্স হেবেবারের মতে, ঐতিহাসিক প্রবাহকে মাত্র একটি সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা নিরর্থক ও অবাস্তব। বরং উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা বা পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করিয়া কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা অনেক বেশি মূল্যবান ও সার্থক প্রয়াস। তিনি ধনতন্ত্রের সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ, আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি এবং ধর্মের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করিয়া ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ম্যাক্স হেবেবারের অনুসৃত পদ্ধতি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিল্পায়নের পথে যে-সব অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে, সেই অন্তরায়গুলিকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে।

যাঁহারা সমাজতত্ত্বে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের বক্তব্য ডুর্কহেইম সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। প্রকৃতি বিজ্ঞানে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার (experiments) সাহায্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা সহজ। কিন্তু সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ করার সময় এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন

করার অবকাশ নাই। সেই কারণে পরোক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় লইতে হয়। এই পরোক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার একমাত্র পথ হইল বিভিন্ন সমাজের মধ্যে অথবা বিভিন্ন সমাজের প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার (institutions) মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা। এই পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করা না গেলেও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। একই সমাজের মধ্যেও এই তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদাহরণ হিসাবে ডুর্কহেইম-এর আত্মহত্যা সম্পর্কিত গবেষণার উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে আত্মহত্যার আনুপাতিক হারের তারতম্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আত্মহত্যার সামাজিক কারণগুলি নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ সমাজকে পরস্পরনির্ভরশীল অংশের সমবায়ে গঠিত সুসংবদ্ধ কাঠামো বলিয়া মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন অংশকে বিশ্লেষণ করেন। যাঁহারা এই জাতীয় মত পোষণ করেন, তাঁহাদের বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই মতবাদে সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচাব-ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়। তাঁহাদের আলোচনায় ব্যক্তি বা সঙ্ঘ বা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা (institution), যেমন পরিবার, স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রাধান্য পায না। সমাজের অংশ হিসাবেই ইহাদের গুরুত্ব এবং সার্থকতা। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ একটি মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রত্যেক পুরুষে (generation) জন্ম এবং মৃত্যুর ফলে সমাজের লোকসংখ্যার আমূল পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কিসের জোরে সমাজ টিকিয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, সমাজ একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো এবং এই কাঠামোর মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের প্রয়োজন মেটানো হয়। ইহাই সমাজের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট না হওয়ার একমাত্র কারণ। যদি এই প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা সমাজে না থাকিত, তাহা হইলে সমাজের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজকে বিশ্লেষণ করার প্রথম ধাপ হইল সমাজস্থ মানুষের প্রয়োজন এবং চাহিদা নির্ণয় করা এবং সমাজে এই প্রয়োজন মিটাইবার কি ব্যবস্থা আছে সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সমাজের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পরিবার এবং পরিবার সম্পর্কিত অনেক রকম আচার-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। অতএব পরিবার সমাজের প্রয়োজন সম্যকভাবে মিটাইতে সমর্থ কিনা ইহা বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা এবং কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা সমাজতত্ত্ববিদের কাজ। এইভাবে, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাকে সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণ করা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

সমাজতত্ত্ব অনুশীলন করার উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে অনেকে গণিতশাস্ত্র ও রাশি বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন। তাঁহাদের মতে সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হইল একটি প্রকল্প

(hypothesis) গ্রহণ করা এবং তারপর এই প্রকল্প হইতে এক বা একাধিক সিদ্ধান্তে (inferences) উপনীত হওয়া। ইহার পরবর্তী ধাপ পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রকল্পের যাথার্থ্য (empirical test) যাচাই করিয়া দেখা। কোন সামাজিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রকল্প বা মর্ম অন্তর্দৃষ্টির (insight) সাহায্যে উপলব্ধি করিতে হয়। দুইটি উপায়ে এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়। প্রথম উপায়, সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করা। ইহার ফলে বিভিন্ন আচার-আচরণের মধ্যে পুনরাবৃত্তিশীল প্যাটার্ন দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ধারণার (concept) উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে সমাজতত্ত্ব-বিদগণ সমাজে প্রচলিত প্রথা বা প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করেন। কোন সামাজিক বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায়, সামাজিক ব্যাপার সম্পর্কিত গাণিতিক প্রতীকগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা। কোন সামাজিক ঘটনা বা বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাশিবিজ্ঞানীগণ পরিসংখ্যানের সাহায্যে নানারকম তথ্য পরিবেশন করেন। ইহার ভিত্তিতে গাণিতিক নক্শা বা তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই গাণিতিক প্রতীকগুলি পর্যালোচনা করিলে সমাজ-বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সব রকম সামাজিক বিষয় প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করা সম্ভব নহে। যেমন, ভারতবর্ষে বেকার সমস্যার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি বুঝিতে হইলে পরিসংখ্যানের সাহায্য না লইয়া গত্যন্তর নাই। এই ক্ষেত্রে সমস্যার ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের পথে প্রধান অন্তরায়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যে-কোন পদ্ধতিতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, সংবেদনশীল মন না থাকিলে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব নহে। ইহার ফলে নির্ভরযোগ্য প্রকল্প গ্রহণ করাও অসম্ভব। বহু সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এই কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

সমাজতত্ত্ব অনুশীলন করার জন্য যে-সব পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুসৃত হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। কোন কোন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদের নিকট কোন বিশেষ পদ্ধতি একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, কোন পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় এবং বর্জনীয় বলিয়া মনে করার কোন সংগত হেতু নাই। অতীতে প্রত্যেকটি পদ্ধতিই সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে নানাভাবে আলোক সম্পাত করিয়াছে এবং গবেষণার নূতন নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে। বর্তমান কালেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। কোন কোন সামাজিক সমস্যা আলোচনার সময় একাধিক পদ্ধতির সাহায্য লওয়া প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, ভারতীয় সমাজব্যবস্থার উপর আধুনিকীকরণের প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে গেলে ম্যাক্স হেবার কর্তৃক অনুসৃত ঐতিহাসিক পদ্ধতি, ডুর্কহেইম্-এর তুলনামূলক পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যান সম্পর্কিত গাণিতিক পদ্ধতির একই সঙ্গে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইতে পারে। এই

প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা করা হয়। এই কারণে কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। অপর পক্ষে, সমাজচর্চায় মানুষের বাহ্যিক আচরণ, মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি নানারকমের অনির্দিষ্ট এবং অবিন্যস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহা ছাড়া, অনেক সময় অতীতের ভাবনা-চিন্তা আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্তমানের আচার-আচরণকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, বর্তমানকে সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে অতীতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। কাজেই সমাজ-চর্চায় প্রয়োজনানুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

সমাজতত্ত্ব কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ?

সমাজতত্ত্বের অনুশীলন-পদ্ধতি আলোচনা করিবার সময় অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে কিনা অথবা সমাজতত্ত্ব 'বিজ্ঞান' বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা।

আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে দেখিয়াছি, রসায়ন-শাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যায় সুনির্দিষ্ট তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণাকার্য চালানো হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজচর্চায় বিবেচ্য তথ্য হইল অনির্দিষ্ট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। এই অবস্থায়, বস্তু-বিজ্ঞান যে-অর্থে বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য হয়, সেই অর্থে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান পদবাচ্য হইতে পারে না।

কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা এবং অনুসন্ধান-কার্য বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই উক্তির সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করা যায়। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক পন্থার অনুসরণে সমাজতত্ত্ববিদ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ তথ্য সমাবেশ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি যথাসম্ভব মূল্যবোধ বা মূল্যায়ন সম্পর্কিত আলোচনা পরিহার করিতে চেষ্টা করেন। যেমন, জাতিভেদপ্রথা বা বিবাহ-বিচ্ছেদ বা যে-কোন সামাজিক আচার-ব্যবস্থা অথবা সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণ করিবার সময় সমাজতত্ত্ববিদ যথাসম্ভব নিজের অভিরুচি বা ন্যায়-অন্যায় বোধ যাহাতে তাঁহার আলোচনাকে প্রভাবিত না করিতে পারে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁহার কর্তব্য সামাজিক গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করা, বিচার বা মূল্যায়ন করা নহে। সব সময় তিনি যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে পারেন, তাহা নহে। তবে যে-পরিমাণে তিনি নিরপেক্ষ থাকিতে সক্ষম হইবেন, সেই অনুপাতে তাঁহার গবেষণার সার্থকতা নিরূপিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন উক্তি সমাজতত্ত্বে স্বীকৃত হয় না। যেমন, কেহ যদি বলেন যে শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে সমাজতত্ত্ববিদ নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া এই প্রকার উক্তির যাথার্থ্য বিচার করেন। তৃতীয়তঃ, সমাজতত্ত্বে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন অংশের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে বিবৃত করা হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাইবে। চতুর্থতঃ, উপরোক্ত

বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ ছাড়াও সমাজতত্ত্ববিদ বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা বা বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। যেমন, তথ্যের দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে তিনি আরও ব্যাপক অনুসন্ধানকার্য চালাইয়া সমস্ত ঘটনার উপর যথাসম্ভব আলোক-সম্পাত করিতে চেষ্টা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, সমাজতত্ত্ববিদের অনুসন্ধিৎসা, অনুশীলন-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত। এইদিক হইতে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের সমগোত্রীয়, কিন্তু বিজ্ঞান পদবাচ্য নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবন-ধারা

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

যে কোন সমাজের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক সমাজে বসবাসকারী লোকেদের আহার-বিহার, আচার-অনুষ্ঠান এবং চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। আবার এক সমাজের আচার-ব্যবহার বা চিন্তাধারার সঙ্গে অন্য সমাজের আচার-ব্যবহার বা চিন্তাধারায় যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, ভারতীয় সমাজে অভিবাদন জানাইবার রীতি করজোড়ে নমস্কার করা। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য সমাজে অভিবাদন জানাইবার রীতি করমর্দন করা। এইভাবে পোষাকপরিচ্ছদ ও আহার্য সম্পর্কেও নানারকমের পার্থক্য দেখা যায়। আরও গভীরভাবে দেখিতে চেষ্টা করিলে চিন্তাধারা, মূল্যবোধ এবং জীবনদর্শনেও পার্থক্য ধরা পড়ে। কাজেই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, প্রত্যেক সমাজে বসবাসকারী লোকেদের জীবন-যাপন করিবার প্রণালীতে একটা স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। এইরূপ স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করিবার প্রণালীকে সমাজতত্ত্ববিদগণ সেই সমাজের culture বা জীবন-ধারা নামে অভিহিত করিয়াছেন।1

বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে বসবাস করার ফলে আমরা যেমন আমাদের জীবনে বায়ুর অস্তিত্ব ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না, ঠিক তেমনি সমাজের স্বতন্ত্র জীবন-ধারার সঙ্গে আমাদের জীবন শৈশবাবস্থা হইতে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকে যে, আমরা ইহার অস্তিত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ সময়েই সচেতন থাকি না। ভিন্ন সমাজের ভিন্ন জীবন-ধারার সংস্পর্শে আসিলে আমাদের জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠি।

প্রত্যেক সমাজে একটি স্বতন্ত্র জীবন-ধারা কেন এবং কিভাবে গড়িয়া উঠিল ইহা বুঝিতে হইলে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। প্রাণী মাত্রেরই তিনটি মৌল জৈবিক প্রয়োজন রহিয়াছে। এই প্রয়োজন মিটাইতে না পারিলে সেই প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এই তিনটি মৌল প্রয়োজন হইল খাদ্য, সংজনন (reproduction) ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা। মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবের নিকট এই তিনটি প্রয়োজন সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রয়োজন মিটাইবার পদ্ধতি মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীবের এক নহে। মনুষ্যেতর জীব বংশপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বিশেষ কয়েকটি শারীরিক গুণ এবং সহজ প্রবৃত্তির সাহায্যে তাহার প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করে। যে কোন মনুষ্যেতর জীবের দিকে তাকাইলে এই উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। হস্তীর কায়িক শক্তি এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রখরতা তাহার খাদ্য সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার প্রধান

---

1. "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society" Sir Edward Tylor.

অবলম্বন। হরিণের গতিবেগ বা কুকুরের ঘ্রাণশক্তি তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে সাহায্য করে। শীতের প্রারম্ভে পক্ষীরা হিমালয় হইতে উড়িয়া সমতলভূমিতে চলিয়া আসে। বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা স্থান পরিবর্তন করে না। একমাত্র সহজ প্রবৃত্তির তাগিদে তাহারা পরিচালিত হয়। জীববিজ্ঞানীগণ ইহার কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপন করিতে পারেন নাই। সহজ প্রবৃত্তির সাহায্যে জৈবিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ইহারা যে-সময় নির্ধারণ করে তাহাকে জীববিজ্ঞানীগণ biological clock বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইভাবে অসংখ্য উদাহরণের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা যায় যে, মনুষ্যেতর জীবের জৈবিক মৌল প্রয়োজন মিটাইবার প্রধান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন হইল বংশপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বিশেষ কয়েকটি শারীরিক গুণ এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তি। এই কারণে মনুষ্যেতর জীবের জীবন প্রণালীতেও সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু এই সাদৃশ্যের মূলে রহিয়াছে তাহাদের বংশগতি; বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা নাই।

অপর পক্ষে, মানুষ মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় বংশপরম্পরাক্রমে কোন বিশেষ গুণ জন্মসূত্রে লাভ করে না এবং মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় তাহার সহজ প্রবৃত্তিও এত বেশি প্রখর নহে। মানুষের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রবণ বা ঘ্রাণশক্তি এবং শারীরিক বল বিবেচনা করিলেই এই বিষয়টি বুঝিতে পারা যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানুষ কি ভাবে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করে? কোন্ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া সে তাহার মৌল জৈবিক প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাওয়া যায়। মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে মানুষের অন্যতম প্রধান পার্থক্য হইল, মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে। ইহার ফলে, কোন অভিজ্ঞতাই বিনষ্ট হয় না। হাজার বৎসর পূর্বে মানুষ যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তী হাজার বৎসরে পরিবর্ধিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহাকেই আমরা মানুষের সামাজিক উত্তরাধিকার বলিয়া থাকি। খাদ্য আহরণ, উৎপাদন ও প্রস্তুত করা বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতালব্ধ ফল। এই অভিজ্ঞতার প্রবাহে যদি কোন ছেদ পড়িত, তাহা হইলে আমাদের সমাজ এবং জীবনযাত্রার চেহারা অন্য রকমের হইত। সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ মৌল প্রয়োজনগুলি মিটাইবার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। খাদ্যের জন্য তাহাকে আর বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। সে খাদ্য উৎপাদন করার জ্ঞান অর্জন করিয়াছে। সংজনন এবং বংশরক্ষার জন্য সে পরিবার গঠন করিতে শিখিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য বিবিধ উপায় তাহার করায়ত্ত হইয়াছে। শীতের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে পশমের জামা পরিধান করে। গ্রীষ্মের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হাত পাখা, বৈদ্যুতিক পাখা বা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গৃহের ব্যবস্থা করা তাহার আয়ত্তাধীন।

কাজেই মনুষ্যেতর জীবের জীবনপ্রণালী হইতে মানবসমাজের জীবনপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনুষ্যেতর জীব মানুষের মত ভাবের আদানপ্রদান করিতে পারে না। তাহার একমাত্র অবলম্বন হইল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নানা প্রকার শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং সহজ প্রবৃত্তি। অতএব মনুষ্যেতর জীবের পক্ষে স্বতন্ত্র জীবন-ধারা গড়িয়া তোলা সম্ভবপর

নহে। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে হস্তী বা ব্যাঘ্রের আচার-আচরণ বা জীবন-প্রণালীর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এইদিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় জীবন-ধারা মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই মানব-সমাজকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে এক সমাজের জীবন-ধারার সঙ্গে অন্য সমাজের জীবন-ধারার পার্থক্যের কারণও সহজেই বুঝা যায়। বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ তাহার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে; অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী উদ্ভাবিত উপায়সমূহেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। য়ুরোপীয় সমাজে এই কারণেই একটি স্বতন্ত্র জীবন-ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত-বর্ষীয়দের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা পৃথক হওয়ায় আমাদের জীবন-ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিলে সমাজতত্ত্বে জীবন-ধারা সম্পর্কে ধারণা করিতে অসুবিধা হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সামাজিক স্থায়িত্বের জন্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানাপ্রকার বিধি-অনুশাসন, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি সমাজের জীবন-ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। সমাজের স্থিরত্বপক্ষে এইগুলি অনুকূল হওয়ায়, শিশু জন্মাইবার পর হইতেই নানা উপায়ে তাহাকে তাহার সমাজের জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিত করাইবার চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে সমাজে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, ভাল-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সম্পর্কে অধিকাংশ লোকের মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য থাকে না। এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হইয়াছে যে, সমাজে বসবাসকারী লোকেদের জীবন-ধারায় সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ইহার জন্য শৈশবাবস্থা হইতে নানারকম সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টা দায়ী।[1]

জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান

জীবন-ধারার তাৎপর্য ও অর্থ আরও পরিষ্কার করিবার জন্য ইহার বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ পরবর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিবৃত করা হইল।

(১) আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, ভাবের আদান-প্রদান করিবার শক্তি থাকায় মানুষের পক্ষে স্বকীয় জীবন-ধারা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। ভাব বিনিময়ের প্রধান বাহন হইল ভাষা। ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে বলিয়াই মানুষ তাহার অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাধারা কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। আমাদের সামাজিক উত্তরাধিকার গড়িয়া তুলিতে ভাষা প্রভূতভাবে সাহায্য করিয়াছে। প্রত্যেক সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভৃতি নানা অভিজ্ঞতা সাহিত্যে, নাটকে, সঙ্গীতে এবং দার্শনিক তত্ত্বে গ্রথিত থাকে এবং পুরুষানুক্রমে সমাজের লোকেদের প্রভাবিত করে। জীবন-ধারার এই জাতীয় উপাদানগুলিকে প্রতীকমূলক উপাদান (symbolic elements) বলা যাইতে পারে। আমাদের জীবনে প্রতীকমূলক উপাদানের বিশেষ

---

1 সামাজিকীকরণ সম্পর্কে দশম ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রত্যেক সমাজের জীবন-ধারার স্বাতন্ত্র্য মুখ্যত প্রতীকমূলক উপাদানের পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল।

আরেকটি লক্ষ্য করার বিষয় হইল, বাস্তব বা শরীরী উপাদানের ভিতর দিয়া অনেক সময় প্রতীকমূলক উপাদানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দুর মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ বা খ্রিষ্টানের গির্জার উল্লেখ করা যায়। মন্দির, মসজিদ বা গির্জা কেবলমাত্র ইঁট, পাথর ও সুড়কির সমাবেশ নহে। হিন্দুর নিকট মন্দির বিশেষ আদর্শ এবং স্বপ্নের প্রতীক। মন্দির দেখিলে তাহার মনে যে-ভাব সঞ্চারিত হয়, অন্য কোন অট্টালিকা দেখিলে সেই ভাব উদিত হয় না। মুসলমানের নিকট মসজিদ এবং খ্রিষ্টানের নিকট গির্জার অনুরূপ তাৎপর্য। দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিলে দেখা যাইবে, উপাসনাগৃহ ছাড়াও বিভিন্ন সমাজের বাসগৃহ এবং হাট-বাজারের গঠন-প্রণালীতেও প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে।

অতএব জীবন-ধারার উপাদানকে দুইটি ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ করা যায়। একটি প্রতীকমূলক উপাদান এবং অপরটি বাস্তব বা শরীরী উপাদান। এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে এই পার্থক্যের তাৎপর্য লইয়া আলোচনা করা হইবে।

জীবন-ধারার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্য এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। সব বস্তুই কি জীবন-ধারার উপাদান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? রাস্তার ধারে অথবা পাহাড়ে যেসকল নুড়ি পাওয়া যায়, সেইসব নুড়ি কি জীবন-ধারার উপাদান বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর জীবন-ধারার সংজ্ঞার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ তাহার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিবিধ উপায় বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। এই উপায় বা ব্যবস্থাগুলি জীবন-ধারার উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহা মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা জীবন-ধারার উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যদি দেখা যায় যে, পাহাড় হইতে নুড়িগুলি সংগ্রহ করিয়া রাস্তায় ব্যবহারের জন্য আনা হইয়াছে বা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা হইলে এই নুড়িগুলিকে জীবন-ধারার উপাদান বলিয়া গণ্য করা হইবে। অথবা যদি পাহাড়ে অবস্থিত কোন প্রস্তরখণ্ডে এমন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা হইতে বুঝা যায় যে অতীতে এই খণ্ডটি মারণাস্ত্র হিসাবে মানুষ ব্যবহার করিত, তাহা হইলে এই প্রস্তরখণ্ডটি জীবন-ধারার উপাদান হিসাবে গণ্য হইবে। অতএব মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হইলে কোন বস্তুই জীবন-ধারার উপাদান হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না।

(২) পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমাদের আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, ঘরবাড়ী এবং বাসনপত্র সব কিছুই জীবন-ধারার অন্তর্গত। যদিও বিভিন্ন উপাদান লইয়া জীবন-ধারা গড়িয়া উঠে এবং আমরা এই উপাদান-গুলিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করি, তবুও এই উপাদানগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। আমরা যাহা ভাবি, যাহা করি এবং যাহা তৈরী করি—সব কিছুর মধ্যেই যোগসূত্র রহিয়াছে। এই যোগসূত্র আছে বলিয়াই আমাদের জীবন-প্রণালী একই ধারায় প্রবাহিত হয় এবং স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে।

জীবন-ধারার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র এবং সঙ্গতি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ক) ভাষার মাধ্যমে জীবন-ধারা ব্যাপ্তি এবং পরিচিতি লাভ করে। অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অধুনালব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গতি সাধিত হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষা না থাকিলে আমাদের পক্ষে অভিজ্ঞতা এবং ভাব বিনিময় সম্ভব হইত না। ইহার ফলে আচারব্যবহারে এবং কাজকর্মে অসঙ্গতি দেখা দিত। উপরন্তু, কিছুদিন প্রচলিত থাকার পর কোন বিশেষ শব্দ কেবলমাত্র বিশেষ অর্থ বহন করে না। অনেক ক্ষেত্রে মনের নানারকম আবেগ ও আকুতি বিশেষ বিশেষ শব্দের সঙ্গে জড়িত হইয়া যায় এবং সেই শব্দগুলি আমাদের নিকট অর্থ ছাড়া অন্য আরও কিছু অতিরিক্ত ভাব বহন করিয়া আনে। যেমন, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ বা ইনক্লাব জিন্দাবাদ কেবলমাত্র বিশেষ অর্থ বহন করে না, আমাদের মনের আবেগ ও আকুতি জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করে। এইভাবে ভাষা জীবন-ধারার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অসঙ্গতি ঘুচাইয়া যোগসূত্র স্থাপন করে।

(খ) শৈশবাবস্থা হইতেই শিশুকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, সে বিনা দ্বিধায় সমাজে প্রচলিত আদর্শ এবং বিধি-নিষেধ মানিয়া লয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সমাজে প্রচলিত জীবন-ধারা তাহার নিকট স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কাজেই জীবন-ধারার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সঙ্গতি সামাজিকীকরণের মাধ্যমেও সাধিত হয়।

(গ) আমাদের নানাপ্রকার প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে নানারকমের জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণের (cultural traits) উদ্ভব হইয়াছে। যতদিন এই প্রয়োজনগুলি থাকিবে, ততদিন জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণগুলিও টিকিয়া থাকিবে। যেমন, খাদ্যের প্রয়োজন যতদিন থাকিবে, ততদিন রান্নাবান্না সংক্রান্ত প্রলক্ষণগুলিও প্রচলিত থাকিবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে আংশিক পরিবর্তন সাধিত হইলেও রান্নাবান্নার চর্চা যথারীতি প্রচলিত থাকিবে। জীবন-ধারার এই দিকটি বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গতি ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করে।

(ঘ) জীবন-ধারাকে জৈব পদার্থের সঙ্গে তুলনা করা চলে। জীবদেহে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা অবিরাম চলিতে থাকে। যখনই এই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, তখনই জীবদেহে ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। জৈবিক ক্ষেত্রে যেমন, জীবন-ধারার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা নানা প্রকার সামাজিক নিয়ামকরূপে অভিব্যক্ত। যে-কোন সমাজের প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেকটি আচার-ব্যবস্থা অপরাপর আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। যখনই কোন বিশেষ আচার-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে, তখন সেই পরিবর্তনের প্রভাব অপরাপর আচার-ব্যবস্থার উপর আসিয়া পড়ে। ভারতবর্ষের মত কৃষি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো যখন শিল্পায়নের দিকে পরিবর্তিত হইতে থাকে, তখন অন্যান্য আচার-ব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠে। এই প্রকার সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য আসিতে কিছুটা বিলম্ব হইতে পারে। কিন্তু সামঞ্জস্য আসার দিকে ঝোঁক সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়।

(৩) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন প্রলক্ষণের সমাবেশে জীবন-ধারার বিশেষ বিশেষ উপাদান গঠিত হয়। যেমন, আগুন জ্বালাইবার জ্ঞান, শস্য ও মসলা উৎপন্ন করার জ্ঞান, তৈজসপত্র তৈরী করিবার কৌশল, এবং সর্বকিছুর সমন্বয়ে রান্না করার রীতি যখন আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইল, তখনই রান্নাবান্না জীবন-ধারার অন্তর্গত অন্যতম উপাদান হিসাবে স্থান পাইল। এইভাবে জীবন-ধারার যে-কোন উপাদান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অনেকগুলি প্রলক্ষণের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে ইহার উদ্ভব সম্ভব হয়। জীবন-ধারায় সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকার ইহা অন্যতম কারণ।

(৪) জীবন-ধারায় প্রতীকমূলক উপাদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্রত্যেক সমাজেই ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শোভন-অশোভন প্রভৃতি নানারকমের মূল্যবোধ প্রচলিত থাকে। এই ধরনের মূল্যবোধের দ্বারাই জীবনপ্রণালী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ভারতীয় সনাতন আদর্শ ও মূল্যবোধ য়ুরোপীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ হইতে পৃথক হওয়ায়, এই পার্থক্য দুই সমাজের আহার-বিহার, আচার-অনুষ্ঠানেও প্রতিফলিত হয়। যে আদর্শ বা মূল্যবোধ সমাজে স্বীকৃতি পায়, সেই আদর্শ বা মূল্যবোধই বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থাকে একটি যৌগিক কাঠামোতে (**structure**) পরিণত করে এবং ইহাই সেই সমাজের জীবন-ধারা বলিয়া গণ্য হয়।

বিভিন্ন জীবন-ধারায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত জীবন-ধারায় যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা খুবই সুস্পষ্ট। কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়া কেবলমাত্র কয়েকটি প্রধান প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক সমাজেই অনুরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই আচার-ব্যবস্থাগুলির আকার-প্রকার পৃথক, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ নাই যেখানে অনুরূপ কয়েকটি আচার-ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই প্রকার কয়েকটি আচার-ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়। যেমন, (১) পারিবারিক প্রথা, (২) ভাব এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বাহন হিসাবে ভাষার প্রচলন, (৩) আহার, বস্ত্র ও আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য অর্থ-নৈতিক আচার-ব্যবস্থা, (৪) আইন ও শৃঙ্খলা বলবৎ করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আচার-ব্যবস্থা, (৫) সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা, (৬) উপাসনা করার কোন-না-কোন পদ্ধতি ইত্যাদি। এইরূপ আরও অনেক সর্বজনীন উপাদানের উল্লেখ করা যায়। এই অর্থে সব সমাজের জীবন-ধারার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে।

সমাজতত্ত্ববিদগণ এই সাদৃশ্যের কারণ হিসাবে মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের উল্লেখ করেন। যেমন, সব সমাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বভাবে অনুরূপ পার্থক্য রহিয়াছে। মানবশিশুর স্বয়ম্ভর হইতে বিলম্ব ঘটে এবং ইহার ফলে দীর্ঘকাল তাহাকে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যৌন-প্রবৃত্তির দ্বারা মানুষ সর্বত্র অনুরূপভাবে চালিত হয়। কোন সমাজের মানুষই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু এড়াইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রত্যেক সমাজে অনুরূপ আচার-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজনের দ্বারা জীবন-ধারার উদ্ভব এবং বিকাশ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবন-ধারার কয়েকটি দিক আছে যাহার সঙ্গে জৈবিক প্রয়োজনের কোন যোগ নাই। উদাহরণস্বরূপ, সাজসজ্জার উল্লেখ করিতে হয়। পোষাকপরিচ্ছদ পরিধান করা জৈবিক প্রয়োজন। কিন্তু রকমারী পোষাক বা অলঙ্কারের দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করার সঙ্গে জৈবিক প্রয়োজনের কোন যোগ নাই। অনুরূপভাবে, খাদ্য আমাদের জৈবিক প্রয়োজন। কিন্তু মুখরোচক রান্না বা খাদ্য-অখাদ্যের বিচারের সঙ্গে জৈবিক প্রয়োজনের যোগ নাই। হিন্দুদের নিকট গো-মাংস অখাদ্য। অথচ অধিকাংশ অ-হিন্দুর নিকট গো-মাংস পরম উপাদেয় খাদ্য। এই ধরনের অনেক পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আমাদের নজরে পড়ে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বিভিন্ন সমাজের জীবন-ধারায় যে-পার্থক্য রহিয়াছে তাহাই বেশি করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই পার্থক্যকে অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকে বলেন যে, জাতিগত (racial) পার্থক্য হইতে জীবন-ধারাগত পার্থক্যের উদ্ভব হয়। এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। ইহার বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা যায়। প্রথমতঃ, কোন জাতিই অবিমিশ্র বলিয়া দাবি করিতে পারে না। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই অপরাপর জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জীবন-ধারার উপর বংশগতির যে কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই, ইহা নানা গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে মার্কিন পিতামাতার একটি পুত্রসন্তান শৈশবাবস্থা হইতে চীনদেশে সেখানকার একটি পরিবারে অন্যান্য চীনা শিশুদের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। এই শিশুটি যখন যুবক তখন সে মার্কিন দেশে যায়। তাহার হালচাল, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা বলার ঢঙ সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে চৈনিক যুবকের অনুরূপ দেখা যায়। কেবলমাত্র আকৃতি, চুলের রঙ ইত্যাদি শারীরিক বৈশিষ্ট্য তাহার বংশপরিচয় বহন করে। তৃতীয়তঃ, সমজাতীয় লোকেদের মধ্যে ভিন্ন জীবন-ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। চীনা, জাপানী এবং ভিয়েৎনামী মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জীবন-ধারায় যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার ভিন্নজাতীয় লোকেদের মধ্যে একই প্রকার জীবন-ধারা প্রচলিত থাকিতেও দেখা যায়। বর্তমান যুগে য়ুরোপীয় বেশভূষা ও আহার্য প্রায় সব সমাজেই অল্পবিস্তর পরিব্যাপ্ত। কাজেই জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে জীবন-ধারাগত পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনেক সমাজতত্ত্ববিদ জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পার্থক্যের ভিত্তিতে জীবন-ধারাগত পার্থক্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। একই রকমের জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বেশভূষা ও আহারের পার্থক্য ধরা পড়ে। ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ডে জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পরিবেশে বিশেষ পার্থক্য নাই। অথচ দুই দেশের নরনারীর বেশভূষা এবং আচার-আচরণে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পোষাক পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণে পার্থক্য সুবিদিত। অতএব এই জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে।

যদিও জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্য দ্বারা জীবন-ধারাগত পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু আমাদের সমাজ-জীবনে ইহাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। যেমন, কোন অঞ্চলে যদি বৃষ্টিপাত বেশি এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সেই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেদের জীবন-প্রণালী অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে প্রচলিত জীবন-প্রণালী হইতে পৃথক হইবে। অনুরূপভাবে, শীতপ্রধান অঞ্চলে প্রচলিত জীবন-প্রণালী গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের জীবন-প্রণালী হইতে পৃথক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আছে বলিয়াই জীবনধারা প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নির্ণীত হয় বলিলে ভুল করা হইবে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং প্রাকৃতিক সমস্যার মোকাবিলা করা মানুষের ধর্ম। একই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে দুইটি সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিতে পারে। কোন্ সমাজ কোন্ উপায় অবলম্বন করিবে ইহা সেই সমাজের ঐতিহ্য, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে।

উপজীবন-ধারা

আমরা যে অর্থে জীবন-ধারার ব্যাখ্যা করিয়াছি, সেই অর্থে ভারতবর্ষে একটি স্বতন্ত্র জীবন-ধারা প্রচলিত রহিয়াছে। অন্য যে-কোন সমাজের জীবন-ধারার সঙ্গে তুলনা করিলে ভারতীয় জীবন-ধারার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়িবে।

কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর ভাষা, আহার, আচার-ব্যবহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে তাকাইলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাহারা বৃহৎ ভারতীয় সমাজের অংশ হইয়াও নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে। সমাজতত্ত্ববিদগণ এইরূপ অবস্থাকে sub-culture বা উপজীবন-ধারা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সব সমাজেই এই প্রকার উপজীবন-ধারা গড়িয়া উঠে। যে সমাজে সামাজিক স্তর-বিন্যাস এমনভাবে বিকাশ লাভ করে যে, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবধান খুব বেশি থাকে, সেই সমাজে প্রত্যেক স্তরের অন্তর্ভুক্ত লোকেদের জীবনযাপনে অল্পবিস্তর স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। যেমন, উচ্চ শ্রেণীর জীবন-ধারা অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর জীবন-ধারা হইতে স্বতন্ত্র। অনেক ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগ এবং উচ্চারণেও এই পার্থক্য দেখা যায়। এই জাতীয় স্বতন্ত্রতাকে উপজীবন-ধারা আখ্যা দেওয়া হয়।

ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা লাভ করিলে উপজীবন-ধারা জাতীয় সংহতির প্রতিকূল হইয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য Yinger নামক একজন সমাজতত্ত্ববিদ উপজীবন-ধারাকে contra-culture বা বিরোধী জীবন-ধারা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 1

আবার ইহাও লক্ষণীয় যে, বৃহত্তর জীবন-ধারার স্থিরত্ব ও পরিপুষ্টির জন্য উপজীবন-ধারার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে! ইহা অনস্বীকার্য যে, বাঙালী, তামিল বা মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য, আহার্য ও পরিচ্ছদ বৃহত্তর ভারতীয় জীবন-ধারাকে বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য প্রদান করিয়াছে।

---

1 Yinger: "Contra-culture and Sub-culture", American Sociological Review, 25 (October, 1960): Pages 625-635. Referred to by Anderson and Parker in their book "Society: Its Organisation and Operation." Page 51.

বিধি-শাসিত সমাজ

মানুষ বিধি-শাসিত সমাজে বাস করে। সুতরাং তাহার পক্ষে যথেচ্ছ আচরণ করা সমাজের রীতি এবং নীতি বিরুদ্ধ। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, কি তাহার প্রয়োজনের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য বা বর্জনীয়, কি তাহার কাম্য এবং শ্রেয়। এইভাবে ধীরে ধীরে নানারকম বিধি-নিষেধ এবং অনুশাসন জীবন-ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু সমাজ-জীবনে সব বিধি-নিষেধের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সামাজিক প্রয়োজনসাধনে কয়েকটি বিধি-নিষেধের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং এইগুলি লঙ্ঘন করিলে সমাজ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবার কিছু সংখ্যক বিধি-নিষেধ আছে যাহাদের ক্ষেত্রে সমাজ বিশেষ গুরুত্ব দেয় না এবং এইগুলি পালন করার ব্যাপারেও বাধ্যবাধকতা থাকে না। সমাজতত্ত্ববিদগণ সমাজকে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যে জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের বিধি-সংক্রান্ত উপাদানগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পরবর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে পৃথকভাবে সামাজিক বিধিগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্য আলোচনা করিব।

লোকাচার

প্রত্যেক সমাজেই অনুরূপভাবে কথা বলার, চিন্তা ও আচরণ করার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। সমাজস্থ সকলেই একই রীতি অনুসরণ করিবে ইহাও আশা করা হয়। কিন্তু কয়েকটি রীতি এমন আছে যেগুলি কেহ যদি অনুসরণ বা পালন করিতে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তাহার উপর কোন প্রকার জোরজবরদস্তি খাটান হয় না। এই জাতীয় বিধিসমূহকে সুমনার (William Graham Sumner) folkways বা লোকাচার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নানাপ্রকার লোকাচার সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন, মহিলারা যে-ধরনের বেশভূষা করিয়া বিবাহবাসরে উপস্থিত হন, ঠিক সেই ধরনের সাজসজ্জা করিয়া শ্রাদ্ধবাসরে যান না। ইহাই সাধারণ রীতি বা লোকাচার। কেহ যদি এই রীতি লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে কেহ কিছু বলিবে না বা অনুযোগও করিবে না। অথচ তাহার এই আচরণকে খামখেয়ালীপ্রসূত বা স্বাভাবিক বিধি-বহির্ভূত আচরণ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

লোকাচার নানাপ্রকারের হইতে পারে। বেশভূষাসংক্রান্ত লোকাচার ছাড়াও কথাবার্তা এবং আচরণ সম্পর্কিত লোকাচারও প্রচুর রহিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা যখন এক পংক্তিতে খাইতে বসি, তখন সাধারণ রীতি হইল সকলেই একসঙ্গে খাওয়া শুরু করিবেন এবং একই সঙ্গে পংক্তি ত্যাগ করিবেন। কেহ এই রীতি লঙ্ঘন করিলে সকলে তাহার দিকে আড় চোখে তাকাইবেন, মুখে কিছু বলিবেন না। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ এই জাতীয় লোকাচারকে convention বা চলিত রীতি আখ্যা দিয়া থাকেন। এই প্রকার চলিত রীতি সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন যাপন করার জন্য যে প্রয়োজন, এই বোধ প্রায় সকলেরই থাকে বলিয়া এইরকম লোকাচারকে convention বা চলিত রীতি বলা হইয়া থাকে।

সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবনে চলিত রীতির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। দুই ব্যক্তির পারস্পরিক বিরোধ যতই তীব্র হউক, চলিত রীতি হইল কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলিত হইলে তাহারা তাহাদের বিরোধ সম্পর্কিত কথাবার্তার জের টানিয়া অনুষ্ঠানের আবহাওয়াকে মলিন করিবেন না। এই ধরনের চলিত রীতি লঙ্ঘিত হইলে সমাজের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়।

আবার কিছু লোকাচার আছে যাহা শিষ্টাচার সম্পর্কিত। যেমন, প্রথম পরিচয়ে কাহাকেও তাহার উপার্জন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। কেহ যদি এইপ্রকার প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে তিনি etiquette বা শিষ্টাচার জানেন না বলিয়া অভিযোগ করা হইবে। সমাজ-জীবনে আমাদের অনেকরকম শিষ্টাচার মানিয়া চলিতে হয়। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গৃহস্বামী নিমন্ত্রিতদের নিকট আসিয়া করজোড়ে প্রশ্ন করেন রান্নাবান্না এবং আদর আপ্যায়ন আশানুরূপ হইয়াছে কিনা। ইহা তাঁহার শিষ্টাচারের অন্তর্গত। আবার নিমন্ত্রিতদেরও শিষ্টাচারসম্মত আচরণ হইল তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য প্রশস্তিসূচক বাক্য প্রয়োগ করা। রান্নাবান্না এবং আদর আপ্যায়নে ত্রুটি থাকিলেও এই ক্ষেত্রে সত্যবাদী হওয়া নিন্দনীয়। সাধারণতঃ শিষ্টাচার দ্বারা কোন ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা এবং পদমর্যাদা সূচিত হয়।

সমাজে লোকাচার কিভাবে গড়িয়া উঠে ইহার সবসময় যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া শক্ত। এমন অনেক লোকাচার আছে যাহা মোটেই বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। সমাজে একত্র বসবাস করিবার সময় বিভিন্ন অবস্থায় ইহারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। কাজেই বলা যায় যে, লোকাচারের সমর্থন লোকাচারের মধ্যেই নিহিত থাকে। কেহ সমাজে প্রচলিত কোন লোকাচার লঙ্ঘন করিলে, তাহার পাড়াপ্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব কানাঘুষা করিয়াই ক্ষান্ত হন। তাহাদের মৃদু অনুযোগের গুঞ্জন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইলেও কোন কিছু করিবার থাকে না।

কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, সমাজে সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবন যাপন করিবার জন্য লোকাচার বিশেষভাবে সাহায্য করে। লোকাচার প্রচলিত থাকায় সমাজে বিভিন্ন লোক কি অবস্থায় কিভাবে আচরণ করিবে ইহা মোটামুটি আমাদের জানা থাকে। ইহার ফলে বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়াও সহজভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। উপরন্তু, সমাজে সকলেই যখন অনুরূপ আচরণ করে এবং একইভাবে কথাবার্তা বলে, তখন আমাদের নিরাপত্তাবোধ সুদৃঢ় হয়। সমাজ-জীবনে এই প্রকার নিরাপত্তাবোধের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

অবশ্য পালনীয় আচার

সমাজে কিছুসংখ্যক বিধি আছে যাহার উপর লোকাচারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কেহ এই বিধিগুলি লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলে তাহার উপর যথাসম্ভব চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বিধিবহির্ভূত কাজ হইতে বিরত রাখা হয়। যদি কেহ চাপের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া বিধি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে সমাজ বিভিন্ন উপায়ে তাহাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করে। এই জাতীয়

বিধিগুলিকে সমাজতত্ত্ববিদ্গণ mores বা অবশ্য পালনীয় আচার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এই জাতীয় আচারগুলিকে অবশ্য পালনীয় বলিয়া ধার্য করার কারণ হইল, এই আচারগুলি মানা বা না-মানার সঙ্গে সমাজের ভালমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন জড়িত করা হয়। লোকাচারের সঙ্গে এই জাতীয় প্রশ্ন জড়িত থাকে না বলিয়াই লোকাচার লঙ্ঘন করিলে কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে অনেকটা অজ্ঞাতসারে নানারকমের আচার অবশ্য পালনীয় বলিয়া গ্রহণ করি। যেমন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য অথবা পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কি হইবে, ইহা সব সমাজেই সাধারণভাবে নির্দিষ্ট করা থাকে। কর্তব্যচ্যুতি ঘটিলে নানারকম সামাজিক ভর্ৎসনা বা নিন্দার সম্মুখীন হইতে হয়। গ্রাম-সমাজে বা যে সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত, এই প্রকার ভর্ৎসনা বিশেষ কার্যকর হয়। আরেকটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ করা যায়। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে প্রত্যেক সমাজে সুনির্দিষ্ট বিধি আছে। যেমন, স্বামী বা স্ত্রী কেহই অন্য কোন মহিলা বা পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিবেন না—ইহাই সর্বজনস্বীকৃত রীতি। কেহ ইহা লঙ্ঘন করিলে, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার ভয় দেখাইয়া বা নানাভাবে ভর্ৎসনা ও নিন্দা করিয়া বিধিবহির্ভূত আচরণ হইতে তাহাকে বিরত থাকিতে বাধ্য করা হয়। এই প্রকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়াও নানারকমের সামাজিক কাজকর্ম এই পর্যায়ভুক্ত। সমাজে ইহা স্বীকৃত যে, ব্যবসায়ী ব্যবসা করিয়া মুনাফা অর্জন করিবে। কিন্তু সমাজ-নির্দিষ্ট কয়েকটি রীতি-নীতি তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। তিনি যদি অন্যায়ভাবে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার কাজকর্ম সমাজে নিন্দিত হয়। সমাজ যদি সক্রিয় এবং শক্তিমান হয়, তাহা হইলে সামাজিক নিন্দা বা ভর্ৎসনার নিকট তাহাকে নতি স্বীকার করিতে হয়।

লোকাচার এবং অবশ্য পালনীয় আচার সম্বন্ধে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এই দুইটি আচারের মধ্যে যে-ভেদরেখা টানা হয়, ইহা পরিবর্তনশীল এবং নমনীয়। আজ যাহা অবশ্য পালনীয় আচার বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই অদূর ভবিষ্যতে লোকাচারে পরিণত হইতে পারে। এক সময় হিন্দু পরিবারে সদ্য-বিবাহিতা বধূকে শ্বশুরালয়ের পূজনীয় ব্যক্তিদের সম্মুখে ঘোমটা টানিয়া মুখমণ্ডল আড়াল করা অবশ্য পালনীয় আচার বলিয়া গণ্য করা হইত এবং এখনও অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল পরিবারে বধূমাতাকে তাহা করিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ শহুরে পরিবারে ইহা লোকাচারে পরিণত হইয়াছে। কেহ যদি ঘোমটা না টানে, তাহা হইলে তাহাকে কঠোর ভর্ৎসনার সম্মুখীন হইতে হয় না। সমাজের স্তর বিশেষেও তারতম্য হয়। সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে এমন অনেক আচার আছে, যাহা অবশ্য পালনীয়। অথচ অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীতে সেইগুলি লোকাচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বিশেষ অনুষ্ঠানে লৌকিকতা এবং পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ইহা বেশি প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ, যাহাকে অবশ্য পালনীয় আচার বলা হয়, তাহা কতটুকু বা কি

পরিমাণে কার্যকর হইবে ইহা নির্ভর করে সমাজের সক্রিয়তা ও শক্তিমত্তার উপর। বর্তমান যুগে জনসাধারণের ভৌগোলিক সচলতা সহজ হওয়ায় কেহ সমাজের উপর পূর্বের মত নির্ভরশীল নহে। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তির উপর সমাজের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় অনেক অবশ্য পালনীয় আচার লোকাচারে পর্যবসিত হইতেছে।

সমাজ-জীবনে অবশ্য পালনীয় আচারের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রথমতঃ, সমাজস্থ লোকেদের আচার-আচরণ এবং কাজকর্ম ইহা দ্বারা প্রভাবিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ণীত হইয়া থাকে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আমরা লোকনিন্দার ভয়ে অনেক কাজ করি অথবা অনেক কাজ হইতে বিরত থাকি। দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত উপায়ে সমাজের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাবোধ জন্মে। অভিন্ন আচরণের মাধ্যমে এই আত্মীয়তাবোধ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের স্থিরত্বপক্ষে ইহা বিশেষ অনুকূল।

সামাজিক প্রথা

লোকাচার এবং অবশ্য পালনীয় আচার সামাজিক প্রথার অন্তর্গত। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করা যেমন ব্যক্তিবিশেষের অভ্যাসে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি সমাজ-জীবনেও লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় আচার পালন করা অভ্যাসগত ক্রিয়ায় পরিণত হয়। ইহাকেই সামাজিক প্রথা বলা হইয়া থাকে।

যখন সমাজ সহজ সরল এবং জটিলতামুক্ত ছিল, তখন সামাজিক প্রথা দ্বারাই সমাজ শাসিত হইত। দীর্ঘকালের ঐতিহ্যমণ্ডিত হওয়ায় জনসাধারণের নিকট সামাজিক প্রথার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কোন্ অনুষ্ঠানে কি করা হইবে বা না হইবে ইহা সামাজিক প্রথা দ্বারাই নির্ণীত হইত। সমাজ সরল ও জটিলতামুক্ত থাকায় প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই সমস্যা-সমাধানের চাবিকাঠি সামাজিক প্রথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইত।

কিন্তু ক্রমশঃ সমাজ জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন সমস্যা সমাজ-জীবনে দেখা দেয়। সামাজিক প্রথায় এই সমস্যাসমূহের সমাধান পাওয়া শক্ত হইয়া পড়ায় অন্য বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তাহা ছাড়া, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া সমাজের আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক প্রথার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হ্রাস পায়। সমাজের আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য পরিবর্তনও দেখা দেয়। বিভিন্ন ভাষাভাষী বা ধর্মাবলম্বী লোকের সমাগম হইতে থাকায় একই প্রকার প্রথার সর্বজনীন আবেদন বিনষ্ট হয়।

আইন

এই পরিবর্তিত অবস্থায় প্রথাগত শাসনের স্থলে সুনির্দিষ্ট সর্বজনস্বীকৃত আইনের শাসন প্রবর্তন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্রথমাবস্থায় সামাজিক প্রথার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই আইনের শাসন প্রবর্তিত হয়, প্রথাগত অনুশাসনকে বর্জন করিয়া নহে।

পরবর্তীকালে প্রথা প্রগতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইলে আইনের দ্বারা প্রথাকে অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আইনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ বিভিন্নভাবে আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। খুব সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয়ে কয়েকজন সমাজতত্ত্ববিদের মতবাদ বিবৃত করা হইল।

প্রাচীনকালে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে আইন এবং ধর্মীয় অনুশাসন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। ধর্মশাসিত সমাজে আইনের সমর্থন ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রভুত্ব করিতেন, তাঁহারাই সামাজিক অনুশাসন প্রবর্তন করিতেন এবং ধর্মসম্পর্কিত যুক্তি দ্বারা এই অনুশাসনগুলিকে সমর্থন করিতেন। আস্তে আস্তে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ হওয়ার ফলে আইন ধর্মের বেড়াজাল হইতে মুক্তি পায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও আইনকে ধর্মীয় অনুশাসনের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়।

ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়ার পর আইন যে-ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, সেই সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদগণ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে পৃথক পৃথক মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত লেখকগণ আইনকে বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, আপাতদৃষ্টিতে আইনকে শ্রেণী-নিরপেক্ষ বলিয়া মনে হইলেও আসলে ইহা বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূল। তাঁহারা আরও বলেন যে, আইনের শ্রেণী-নিরপেক্ষ বাহ্যিক আবরণ দ্বারা সমাজের শ্রেণীবিভাগ এবং শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব ঢাকা পড়িয়া যায়। তাঁহাদের মতবাদের সমর্থনে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে স্বত্ব ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনের পরিবর্তন হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন।

পক্ষান্তরে, এমিল ডুর্কহেইম এবং হেনরী মেইন (Maine) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সমাজ স্থাবর অবস্থা হইতে আস্তে আস্তে স্থিতিশীলতা কাটাইয়া চলিষ্ণু হইয়াছে। ইহার সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে যে যে-ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করিত, তাহার সঙ্গে তাহার পদ-মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত থাকিত। কিন্তু অগ্রসর এবং চলিষ্ণু সমাজে বৃত্তির সঙ্গে পদ-মর্যাদার কোন যোগ থাকে না। বৃত্তি হইয়া দাঁড়ায় মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে চুক্তির বিষয়। চিন্তা-ধারায় এবং বাস্তব অবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটে, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আইনেরও পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠে। আইনের চোখে ব্যক্তির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্ত্বা স্বীকৃত হয়। হবহাউসও প্রায় একই ধারায় ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন কিভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ন্যায়-সঙ্গত বিচার সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার মতে, পূর্বে ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি বা অপমান-অভিযোগের নিষ্পত্তি হইত রক্তক্ষয়ী বিরোধের মাধ্যমে। কিন্তু আইনের শাসনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করা সম্ভব হয়। শাস্তি প্রদান করার পদ্ধতিতেও যে ক্রমশঃ পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও হব-হাউস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স হেবারের মতে আইনের প্রধান কাজ সমাজে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মূল্যবোধের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য জগতে সমাজ যেমন আস্তে আস্তে যুক্তিসম্মতভাবে পুনর্গঠিত হইতে থাকে, আইনও ক্রমশঃ যুক্তিসম্মতভাবে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন, কি ভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আইনেরও পরিবর্তন হয়।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আইনগত যেসব পরিবর্তন দেখা যাইতেছে সেই সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল। হেনরী মেইনের উক্তির উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছিল যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক মালিকের সঙ্গে বৃত্তিসম্বন্ধীয় চুক্তি করার অবাধ স্বাধীনতা পাইয়াছিল। বর্তমান যুগে সুসংবদ্ধ এবং শক্তিশালী শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠায় এই চুক্তি করার স্বাধীনতা শ্রমিকের নিকট হইতে শ্রমিক-সঙ্ঘের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। শ্রমিকের পক্ষে শ্রমিক-সঙ্ঘই মালিকের সঙ্গে দর কষাকষি করিয়া ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা আদায় করিতে চেষ্টা করে। আইন এই পরিবর্তিত অবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আইনে যৌথ দর-কষাকষি প্ররোচনা বা অভিসন্ধিমূলক বলিয়া নিন্দিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, দর-কষাকষিতে মালিকপক্ষকে আইন অনেক নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। চাকুরির নিরাপত্তা এবং নানারকমের সুযোগসুবিধা আইনতঃ শ্রমিকদের প্রাপ্য। অর্জিত মুনাফার একাংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক। তৃতীয়তঃ, স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত আইনকানুনও ক্রমশঃ কঠোর হইতেছে। ইহার ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে ধনদৌলত কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা সব দেশেই ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হইল যে, আইনের ক্ষেত্রে যেসব যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার মূলে আছে জনসাধারণের মানসিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কাজেই ডুর্কহেইম, মেইন, হবহাউস বা হেবার যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সমর্থন বিংশ শতাব্দীর আইনগত পরিবর্তনে পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্ক্স বলিয়াছিলেন, আইনে বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিফলন হয়। বিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হওয়ার ফলে আইনে যে-ধরনের পরিবর্তন সূচিত হইতেছে তাহাতে এই উক্তির যাথার্থ্য আংশিকভাবে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা

আমরা এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বিধি-শাসিত সমাজের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে যেসব বিধির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্গতিপূর্ণ অখণ্ড রূপ (consistent integration) প্রকাশ পায় নাই। স্বভাবতই কেবলমাত্র এইরূপ বিধি দ্বারা সমাজকে বাঁধিয়া রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নহে। কাজেই লোকাচার, অবশ্য পালনীয় আচার এবং আইনের সমাবেশে কিছুসংখ্যক

আচার-ব্যবস্থা প্রত্যেক সমাজে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজতত্ত্ববিদগণ এইসব প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাকে institution আখ্যা দিয়াছেন। সমাজের স্থিরত্ব এবং সক্রিয়তা এইরূপ প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল।

প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। যে-সব আচার-আচরণ বা কাজকর্ম সমাজে বাঞ্ছনীয় এবং অনুকরণীয় বলিয়া গণ্য করা হয়, সেইসব আচার-আচরণ সমাজের নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়া পরিপুষ্টি ও শক্তি অর্জন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন ছাড়া আইনের সমর্থনও জড়িত থাকে। কেহ প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে সমাজ সর্বশক্তি দ্বারা সমাজের নীতিবিরুদ্ধ আচার-আচরণকে সংযত করে এবং প্রয়োজন হইলে আইনতঃ দোষী সাব্যস্ত করিয়া এই প্রকার আচরণকে দমন করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমাজে অনেক আচার-আচরণ বাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য করা হইলেও অনুকরণীয় বলিয়া গণ্য হয় না। এই প্রকার আচার-আচরণ প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার অন্তর্গত নহে। যেমন, প্রত্যেক সমাজেই ত্যাগের আদর্শকে মহৎ আদর্শ বলিয়া তুলিয়া ধরা হয়। কিন্তু আপামর জনসাধারণের পক্ষে ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব নহে এবং সমাজও এই আদর্শ অনুসরণ করিতে বাধ্য করে না। প্রত্যেক সমাজেই প্রাচীন লোক-সাহিত্যে বা লোক-সঙ্গীতে শৌর্যবীর্য এবং তিতিক্ষার অনেক উচ্চ আদর্শের উল্লেখ আছে। জনসাধারণের মধ্যে এই আদর্শসমূহ উচ্চ-প্রশংসিত হয় এবং শৈশবাবস্থা হইতে প্রায় প্রত্যেক শিশুকে এইসব আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করাইবার প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। কিন্তু এই জাতীয় আদর্শ কেহ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিবে না ইহাও মোটামুটি ধরিয়া লওয়া হয়। কাজেই কল্পনাপ্রসূত (utopian) উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নহে।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে: কোন্ কোন্ আচার-আচরণ কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া উঠে? সমাজের বিভিন্ন কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন (organisation) স্থাপিত হয়। যেমন, উপাসনা সম্পর্কিত কাজকর্ম করিবার জন্য ধর্মীয় সংগঠন, শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া স্বাবলম্বী করার জন্য পরিবার, অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে নানা জাতীয় ব্যবসায়িক সংগঠন এবং বণিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। এই রকম প্রত্যেকটি সংগঠনের উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য আবার কিছু কিছু আচার-আচরণ সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদানের অনুকূল ব্যবস্থা হিসাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষা লওয়ার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। যাহারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিবার জন্য যোগ দিবে, তাহাদের পরীক্ষায় বসিতেই হইবে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবে না। ইহা বাধ্যতামূলক। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হইল যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা। পরিবারের উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত

হইয়াছে। নরনারীর যৌন আকাঙ্ক্ষা যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিতৃপ্ত হইতে পারে সেইজন্য বিবাহের প্রচলন। আবার বিবাহিতদম্পতির সন্তানসন্ততি প্রতিপালন করার দায়িত্বও তাহাদের উপর ন্যস্ত হয়। যে-কোন বিবাহ-অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে লোকাচার, অবশ্য পালনীয় আচার এবং আইনের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। কেবলমাত্র লোকাচার বা অবশ্য পালনীয় আচার হিসাবে যদি বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে পারিবারিক সংগঠন দুর্বল হইয়া পড়িত এবং সেই সঙ্গে সমাজের বুনিয়াদও হীনবল হইত। কোন পুরুষ এবং নারী সমাজে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক বিবাহরীতি অগ্রাহ্য করিয়া যদি স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করিতে চায়, তাহা হইলে সমাজ এইরূপ রীতিবিরুদ্ধ আচরণ বরদাস্ত করিবে না এবং নানারকম দমননীতি প্রয়োগ করিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পরিবারের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে বিবাহপ্রথার প্রচলন হইয়াছে।

এইভাবে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা সমাজের গঠন-প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কয়েকটি অপরিহার্য আচরণ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত (institutionalised) না হইলে সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস দুর্বল এবং এলোমেলো হয়। ইহার ফলে সমাজে চলাফেরা এবং কাজকর্ম করা কঠিন হইয়া পড়ে। সমাজে কখন কে কি অবস্থায় কি প্রকার আচরণ করিবে মোটামুটি জানা থাকায় সমাজ-জীবন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে। অপর পক্ষে, সব আচরণই যদি অপ্রত্যাশিত হইত, তাহা হইলে সমাজ-জীবন স্বচ্ছন্দ গতি হারাইত এবং সমাজে নানারকমের জটিলতা দেখা দিত। যে-সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার দৃঢ়তা হ্রাস পায়, সেই সমাজের অবক্ষয় অনিবার্য।

সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব নিম্নলিখিত তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা যায়। প্রথমতঃ, কালপ্রবাহে সমাজবদ্ধ মানুষের কাজকর্ম এবং পারস্পরিক সম্বন্ধে পৃথকীকরণ (differentiation) এবং বৈচিত্র্য ঘটে। ইহার মধ্যে কিছু কিছু কাজকর্ম ও সম্বন্ধ সমাজে সমর্থিত এবং গ্রহণযোগ্য। আবার কিছু কিছু কাজকর্ম ও সম্বন্ধ নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়। কাজেই কোন্ ধরনের কাজকর্ম ও সম্বন্ধ গ্রহণযোগ্য এবং কোন্ ধরনের কাজকর্ম ও সম্বন্ধ বর্জনীয় ইহা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকা দরকার। সমাজে নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় কাজকর্ম ও সম্বন্ধ পরিহার করিবার জন্য উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা না থাকিলে অসামাজিক কার্যকলাপকে দমন করা যায় না। সেইজন্য সুসংগঠিত সমাজে প্রত্যেকের সামাজিক ভূমিকা নির্দিষ্ট করা থাকে। যেমন, পিতা বা পুত্র হিসাবে পরস্পরের প্রতি কি করণীয়, প্রতিবেশীর প্রতি কি কর্তব্য, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য ইত্যাদি সব কিছুই সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচার হিসাবে গড়িয়া উঠে। এইসব বিষয় সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকিলে সমাজের স্থিরত্ব বিঘ্নিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব কাহার নিকট থাকিবে ইহা সুনির্দিষ্ট থাকা দরকার। যেখানে কর্তৃত্ব থাকে না, সেখানে শৃঙ্খলার অভাবে কাজকর্ম ব্যাহত হয়। কর্তৃত্ব থাকার অর্থই হইল অন্য সকলে সেই কর্তৃত্ব মানিয়া চলিবে। সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্তৃত্ব মানিয়া চলিবার অভ্যাস না থাকিলে সমাজের কাজকর্ম

প্রতি পদে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। কাজেই সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া উঠা বিশেষ প্রয়োজন। যেমন, পরিবারে কর্তৃত্ব কাহার উপর থাকিবে ইহা মোটামুটি স্থির থাকা দরকার। পদে পদে কর্তৃত্বের অবমাননা করিলে পারিবারিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কোন পরিবারে পিতার উপর আবার কোন পরিবারে মাতার উপর এই কর্তৃত্ব বর্তায়। এই জাতীয় আচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে কাজকর্ম অনেক সহজভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আদেশ জারী করিয়া যে-ভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করেন, ঠিক সেইভাবে সমাজের কাজকর্ম চলিতে পারে না। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের সহজ স্বীকৃতি প্রয়োজন। কর্তৃত্ব সম্পর্কিত আচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমাজে প্রত্যেকের মনঃপ্রকৃতি অনুরূপভাবে গঠিত হয়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক সমাজেই সুনির্দিষ্ট মূল্যমান স্বীকৃত হয় এবং এই মূল্যমানের দ্বারা সমাজভুক্ত লোকেদের কাজকর্মের মূল্যায়ন করা হয়। যেমন, কোন সমাজে পাণ্ডিত্যকে যদি বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই সমাজে পণ্ডিত ব্যক্তি সম্মানের অধিকারী হন। কিন্তু মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া না উঠিলে এই সম্মান অর্থবহ হয় না। এক সময় ভারতবর্ষে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সম্মানার্হ ছিলেন। কারণ, তখন পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পাইত। কিন্তু বর্তমানে কাঞ্চন-কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তদনুরূপ সম্মান পান না। সরকার বা বিভিন্ন বিদ্যোৎসভা কর্তৃক সম্মানিত হইলেও সমাজে তাঁহাদের সম্মানপ্রাপ্তিতে ভাটা পড়িয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য। কজেই মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া না উঠিলে বিভিন্ন কাজকর্ম ও ব্যক্তির মূল্যায়ন সমাজের স্বীকৃত আদর্শ অনুযায়ী হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন ও স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ লোক যদি কোন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে সেই আচার-ব্যবস্থা অর্থহীন হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজে শৈশবাবস্থা হইতে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার অনুকূল মানসিকতা গড়িবার চেষ্টা করা হয়। তাহাদের ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ যাহাতে সমাজের প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া গড়িয়া উঠে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা জন-জীবনে স্বীকৃতি ও পরিপুষ্টি লাভ করে।[1]

ফ্যাশান

প্রত্যেক সমাজেই প্রচলিত আচার-ব্যবহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদে অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য আনিবার জন্য সাময়িকভাবে প্রচলিত ধারার পরিবর্তন করা হয়। ইহাই ফ্যাশান নামে পরিচিত। ইহার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজে অবশ্য পালনীয় আচার হিসাবে যাহা প্রচলিত থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া পরিবর্তন প্রবর্তিত

1 বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নবম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

হয়। যেমন, পুরুষ এবং মহিলার পোষাকে প্রথাগত একটা পার্থক্য রহিয়াছে। কাজেই ফ্যাশান হিসাবে পুরুষের প্রচলিত পোষাকে অভিনবত্ব আনিবার জন্য প্রয়োজনানুগ পরিবর্তন করা হয়; সম্পূর্ণ মেয়েলী পোষাক পুরুষের ফ্যাশানসূচক পরিচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত হয় না। ফ্যাশানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই বিষয়ে সামাজিক প্রথার সঙ্গে ফ্যাশানের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথা অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। কাজেই প্রথা দীর্ঘস্থায়ী, ফ্যাশান ক্ষণস্থায়ী। যাহারা ফ্যাশান প্রবর্তন করে এবং গ্রহণ করে তাহারা ভালভাবেই জানে যে, অল্প দিনের মধ্যেই প্রচলিত ফ্যাশান পরিবর্তিত হইবে। ফ্যাশানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, ইহার সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক নাই। ফ্যাশানের মাধ্যমে যে পরিবর্তন প্রবর্তিত হয় তাহাতে সমাজ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। সেইজন্য ইহার প্রবর্তন ও বর্জন সহজসাধ্য।

যদিও ফ্যাশান মানুষের উপরিগত (superficial) বাহ্যিক বিষয়সমূহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তবুও তাহার কয়েকটি আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ সমাজে প্রচলিত জীবন-প্রণালীর সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে যেমন ব্যগ্র, ঠিক তেমনি অভিনবত্ব প্রবর্তন করিয়া স্বাতন্ত্র্য অর্জন করার দিকেও তাহার সমান আগ্রহ। এইরূপ আপাতবিরোধী অভিপ্রায় বা আকাঙ্ক্ষা ফ্যাশানের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়। কোন ছেলে সম্পূর্ণ মেয়েলী পোষাক পরিয়া অভিনবত্ব প্রবর্তন করিতে সাহসী হইবে না। সে প্রচলিত ধারা মানিয়া লইয়া পরিবর্তন গ্রহণ করিতে রাজী। কাজেই পুরুষের প্রচলিত পোষাকের মধ্যেই কিছু কিছু মহিলাদের প্রচলিত পোষাকের বৈশিষ্ট্য প্রবর্তিত হইতে পারে। তাহাতে অভিনবত্ব আসে, অথচ প্রচলিত ধারার সঙ্গে কোন বিরোধ ঘটেনা। এই ধরনের গৌণ পরিবর্তনের সাহায্যে মানুষ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতে চেষ্টা করে।

বর্তমান যুগের শিল্প-প্রধান সমাজে ফ্যাশানের বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। পূর্বে সামাজিক সচলতা খুব সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় যে যে-স্তরে জন্মগ্রহণ করিত তাহাকে প্রায় আজীবন সেই স্তরেই কাটাইতে হইত। যেমন, গ্রামে প্রত্যেকের পদমর্যাদা তাহার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক স্তর অনুযায়ী নির্ণীত হইত। কিন্তু শিল্প-প্রধান সমাজে সামাজিক সচলতা অপেক্ষাকৃত বেশি। পূর্বের মত জন্ম দ্বারা সামাজিক স্তর নির্ণীত হয় না। ধনদৌলত, পেশা, শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা পদমর্যাদা বিবেচিত হয়। সাধারণতঃ এই গুণসমূহের বাহ্যিক প্রকাশ হয় আদবকায়দায় এবং পোষাক-পরিচ্ছদে। কাজেই সমাজে যাঁহারা মর্যাদাসম্পন্ন তাঁহাদের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ অনেক সময় ফ্যাশানে পরিণত হয়। তাঁহাদের বাহ্যিক আদবকায়দা বা পোষাক-পরিচ্ছদ অনুকরণ করিয়া পদমর্যাদায় উন্নীত হইবার চেষ্টা শিল্প-প্রধান সমাজে খুব বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ ফ্যাশান মর্যাদার প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান যুগে ফ্যাশানের ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যখনই কোন নূতন ফ্যাশান প্রবর্তিত হয় তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই দূরদূরান্তরে প্রসারিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যে কোন বিশেষ ফ্যাশান সারা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত হইতেও দেখা যায়। তাহা ছাড়া, পূর্বে ফ্যাশান উচ্চ স্তরের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকিত। কিন্তু বর্তমানে সর্বস্তরের লোকের মধ্যেই ফ্যাশান বিস্তৃতি লাভ করে। ইহার ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তার কারণ নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমতঃ, সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ায় ফ্যাশান মর্যাদার প্রতীক চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। বাহ্যিক আবরণ দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ থাকায় ফ্যাশান জনপ্রিয় হইয়া উঠে। সুতরাং ইহার সম্প্রসারণ ঘটা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে অল্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই অবসর এবং আর্থিক সচ্ছলতা জুটিত। কাজেই ফ্যাশান কেবলমাত্র তাহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে সাধারণ লোকের অবসর ও আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে ফ্যাশানও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, যাতায়াত এবং অন্যান্য সূত্রে যোগাযোগ রক্ষা করিবার উপায়সমূহ সহজসাধ্য হওয়ায় ফ্যাশানের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভৌগোলিক দিক হইতে প্যারিস, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক অথবা কলিকাতার মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান বেশি থাকা সত্ত্বেও যোগাযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রে এই ব্যবধান প্রায় অবলুপ্ত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। এই অবস্থায় শিল্প-জাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার জন্য শিল্প-সংস্থাগুলি নানারকম বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞাপনদাতাগণ দ্রব্যের আসল গুণ বা কার্যকারিতা বর্ণনা না করিয়া মর্যাদা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রতীক চিহ্ন রূপে দ্রব্যটির গুরুত্বের উপর বেশি জোর দেন। যেমন, কোন প্রসাধন সামগ্রীর গুণাগুণ বর্ণনা না করিয়া দ্রব্যটি কোন জনপ্রিয় চিত্র-তারকার প্রিয় সামগ্রী বলিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। বর্তমান যুগের অধিকাংশ বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, দ্রব্যের সঙ্গে বিশেষ কোন social image বা মর্যাদা-সূচক কোন প্রতীক জড়িত করা হয়। ইহার ফলে পোষাকপরিচ্ছদ, প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতি শৌখিন দ্রব্য কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্যাশান হিসাবে ক্রয় করা হয়। এই ধরনের বিজ্ঞাপন-প্রচার ফ্যাশানের বিস্তৃতির জন্য বহুলাংশে দায়ী।

জীবন-ধারা ও সভ্যতা

জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করার সময় প্রতীকমূলক উপাদান এবং বাস্তব উপাদানের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছিল। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ এই পার্থক্যের ভিত্তিতে জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁহাদের মতে প্রতীকমূলক উপাদান লইয়া জীবন-ধারা গড়িয়া উঠে এবং বাস্তব উপাদানে সভ্যতার সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটিয়া থাকে। ম্যাক আইভার (Mac Iver) খুব সংক্ষিপ্ত একটি উক্তিতে এই পার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আমরা যে-ভাবে জীবন-যাপন করি তাহাই আমাদের জীবন-ধারা এবং আমরা যাহা ব্যবহার করি তাহাই সভ্যতা।[1]

যে-সব বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়, তাহা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হইল।

---

1 "Our culture is what we are, our civilisation is what we use." R. M. Mac Iver: The Modern State. Page 325

(১) জীবন-ধারার উপাদান হইল প্রতীকমূলক। কাজেই এই উপাদানগুলিকে সর্বজনস্বীকৃত কোন মানদণ্ড দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচি এবং বিচার-শক্তি দ্বারা ইহার মান নির্ণীত হয়। সাহিত্য, নাটক, কবিতা, চিত্রাঙ্কন বা সঙ্গীত সম্পর্কে মূল্যায়ন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হওয়াও বিচিত্র নহে। পক্ষান্তরে, সভ্যতার বাস্তব উপাদান কার্যকারিতা এবং কর্মকুশলতার ভিত্তিতে সর্বজনস্বীকৃত মানদণ্ড দ্বারা বিচারযোগ্য। যদি বলা হয় যে, মোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী হইতে বেশি কার্যকর, তাহা হইলে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকে না। উভয় যানের কার্যকারিতা সর্বজনস্বীকৃত মানদণ্ড দ্বারা পরিমাপ করিয়া এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করা যায়।

(২) সভ্যতার উপাদান যত সহজে আয়ত্ত করা যায়, জীবন-ধারার উপাদান তত সহজে আয়ত্ত করা যায় না। কোন কিছু না জানিয়াও সভ্যতার উপাদানগুলিকে ব্যবহার করা যায়। যেমন, রেডিও, ইলেকট্রিসিটি বা মোটর গাড়ীর যান্ত্রিক গঠন-প্রণালী জানা না থাকিলেও এই ব্যবস্থাগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায়। কিন্তু জীবন-ধারার উপাদানগুলি প্রতীকমূলক হওয়ায় আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নহে। যাহার সুর এবং তালজ্ঞান নাই তাহার পক্ষে সঙ্গীত আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। উপরোক্ত কারণে সভ্যতার উপাদান যত সহজে এবং দ্রুতগতিতে বিস্তৃতিলাভ করে, জীবন-ধারার উপাদান তত সহজে এবং দ্রুত গতিতে প্রসারলাভ করে না।

(৩) সভ্যতার উপাদানসমূহ সঞ্চিত থাকে এবং এই সঞ্চয়ের ভিত্তিতে পরবর্তী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয়। ঘোড়ার গাড়ী প্রবর্তিত হওয়ায় গরুর গাড়ী বাতিল হয় নাই। মোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ীকেও বাতিল করে নাই। আবার মোটর গাড়ীতেও নানারকমের উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রবর্তিত হইতেছে। এইভাবে সভ্যতার যে-কোন উপাদান বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতিমূলক পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জীবন-ধারার ক্ষেত্রে নিশ্চয় করিয়া এই কথা বলা যায় না যে, কাল-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ উপাদানের উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন প্রগতিমূলক পরিবর্তন হইবে। পূর্বে কোন উপাদানের প্রগতিমূলক পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়াই এই উন্নতি ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকিবে অথবা আরও উন্নতির সূচনা করিবে এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। নাটক, সাহিত্য বা সঙ্গীতে ক্রমান্বয়িক উত্থান-পতনের ইতিহাসে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

(৪) বিস্তৃতির দিক হইতে জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য পূর্বেই করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। কার্যকারিতার দিক হইতে বিচার করিয়া আমরা সভ্যতার উপাদান ইচ্ছামত গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারি। কিন্তু জীবন-ধারা আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাহা ছাড়া, জীবন-ধারার বিভিন্ন উপাদান যৌগিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। সুতরাং কোন সমাজে প্রচলিত জীবন-ধারার বিশেষ কোন উপাদান অন্য কোন সমাজে প্রবর্তন করা সহজসাধ্য নহে। সেইজন্য দেখা যায় যে, সারা পৃথিবীতে (বিশেষ করিয়া নগর-সমাজে) অনুরূপ সভ্যতা বিরাজ করিলেও জীবন-ধারাগত পার্থক্য বিলুপ্ত হয় নাই। য়ুরোপের দেশগুলির দিকে তাকাইলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। এই দেশগুলিতে অভিন্ন

সভ্যতা বিরাজ করিলেও জীবন-ধারাগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। ফরাসীদের খাওয়া-দাওয়া ও চিন্তাধারার সঙ্গে ইংরাজ জাতির খাওয়া-দাওয়া ও চিন্তাধারায় পার্থক্য সুবিদিত।

উপরোক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। চারাগাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যেমন উপযুক্ত মাটি ও জলবায়ুর প্রয়োজন, ঠিক তেমনি জীবন-ধারার বিকাশের জন্যও অনুকূল পরিবেশ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে এই পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

আবার সভ্যতাও জীবন-ধারার প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। সভ্যতার উপাদান কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে ইহা জীবন-ধারা দ্বারা নির্ণীত হয়। একটি মেশিন দ্বাবা ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করা যায় এবং রণ-সম্ভারও উৎপাদন করা যায়। কোন্ বস্তুটি উৎপাদন করা হইবে ইহা সম্পূর্ণরূপে জীবন-ধারাগত বিবেচনা দ্বারা স্থির হয়। যে-সমাজে জন-কল্যাণমূলক কাজকর্ম অনুসরণ করা জীবন-ধাবার বৈশিষ্ট্য, সেই সমাজে ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়। আবার যে-সমাজে জঙ্গী মনোভাব জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য, সেই সমাজে রণ-সম্ভার উৎপাদন প্রাধান্য পায়।

আরেকভাবেও জীবন-ধারা সভ্যতাকে প্রভাবিত করে। জীবন-ধারা মূলতঃ মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে জীবন-ধারার পরিবর্তন হয় এবং সভ্যতাও সেইভাবে পরিবর্তিত হয়। মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওযার ফলে দাসত্বপ্রথা লোপ পায এবং ক্রমশঃ কায়িক পরিশ্রম লাঘব করার উদ্দেশ্যে নানারকম উপায় উদ্ভাবিত হইতে থাকে। অনুরূপভাবে, জীবনযাপনের মান সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হওযায জীবনযাত্রা সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সামগ্রী সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে সংযোজিত হইতেছে।

জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে যে পার্থক্য আলোচনা করা হইল তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ-প্রবাহে প্রতীকমূলক উপাদান এবং বাস্তব উপাদান অধিকাংশ সময় একই গতিতে অগ্রসর হয় না। ইহার ফলে, নানারকম সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। এশিয়ার অনেক দেশেই পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণে শিল্পায়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু জাপান ছাড়া অন্য কোন দেশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা যায় না। কারণ, শিল্পায়নের অনুকূল জীবন-ধারাগত কয়েকটি প্রলক্ষণ গড়িয়া না উঠিলে শিল্পায়নের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় না। ম্যাক্স হ্বেবার দেখাইয়াছেন, কিভাবে ইংল্যাণ্ডে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মূল্যবোধ ধনতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে এই সত্যটি বিশেষ-ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রগতিমূলক পরিবর্তন প্রবর্তন করার উৎসাহে আমরা অনেক সময় অগ্রসর ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপাদান নির্বিচারে গ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের জীবন-ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। [1]

---

1 বিংশ পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

নিবিড় পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া যখন মানুষ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে তখন তাহাকে আমরা সমাজ বলিয়া থাকি। কিন্তু সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সমাজতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। আজ পর্যন্ত কোন সংজ্ঞাই সর্বজনীন স্বীকৃতি পায় নাই। কিন্তু সমাজ বলিতে তাঁহারা কোন ভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখ করেন নাই। বরং ইহা বলা যায় যে, একই ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করার পার্থক্য হইতেই তাঁহাদের মতপার্থক্য দেখা দেয়। সঙ্গপ্রিয় মানুষ নানা প্রকার পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং এই সম্বন্ধের বহিঃপ্রকাশে অনেক রকমের বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্য সমাজতত্ত্ববিদগণের সংজ্ঞায়ও প্রতিফলিত হয়। সমাজ সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণাকে প্রধানতঃ দুইটি ধারায় ভাগ করিয়া আলোচনা করিলে সমাজের স্বরূপ বুঝিতে সুবিধা হইবে।

প্রথমতঃ, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ কেবলমাত্র একত্র বসবাস করে না; তাহাদের মধ্যে অবিরাম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনেক রকমের হইতে পারে। যেমন, একজন আরেকজনের আচার-ব্যবহার বা কথাবার্তার ধরন অনুকরণ করতে পারে। ছাত্রের পক্ষে শিক্ষকের এবং শিশুর পক্ষে পিতামাতার আচরণ অনুকরণ করা প্রায় বিশ্বজনীন ব্যাপার। তাহা ছাড়া, যাঁহারা মর্যাদা বা প্রতিপত্তি ভোগ করেন তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করিতেও দেখা যায়। অনেক সময় একজন অন্যের সম্ভাব্য আচরণ অনুমান করিয়া নিজের আচরণ নির্ণয় করেন। যেমন, কোন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করা হইতে পারে অনুমান করিয়া সেই সামগ্রীটি অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রয় করার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। একজনের প্রতিক্রিয়া জানিবার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনাও অনেক সময় দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন, সরকারের নিকট হইতে কোন ঘটনার সঠিক তথ্য জানিবার উদ্দেশ্যে সাংবাদিক সেই ঘটনা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বিবরণী সংবাদপত্রে ছাপাইতে পারেন। এই অবস্থায় সরকারকে বাধ্য হইয়া উক্ত বিবরণীর সত্যতা অস্বীকার করিয়া প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করিতে হয়। এইভাবে নানারকমের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমাদের নজরে পড়ে। সমাজস্থ মানুষের জীবন প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে অবিরাম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই সমাজের অন্যতম প্রধান- বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করেন। ম্যাক আইভার সমাজকে **web of social relationships** বা পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধজাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, দুইটি শর্ত পূরণ হইলে সামাজিক

সম্বন্ধ কার্যকর এবং অর্থবহ হইতে পারে। প্রথমতঃ, একজন আরেকজনের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হইলেই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সম্ভব। সেইজন্য আমরা যখন কোন বস্তু ব্যবহার করি তখন সেই বস্তুর সঙ্গে কোন প্রকার পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। এই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অস্তিত্ব সম্পর্কে পারস্পরিক সচেতনতার অভাব রহিয়াছে। কিন্তু দুই ব্যক্তি যখন একত্র বাস করেন বা কোন কাজে নিযুক্ত থাকেন, তখন তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সচেতনতা বিরাজ করে। দ্বিতীয়তঃ, ঐক্যবোধ না থাকিলে সামাজিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের সৈন্যদল পরস্পরের অস্তিত্ব এবং উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইলেও তাহারা সমাজ গঠন করে না। কারণ, তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ শত্রুতাপূর্ণ এবং সহযোগিতার বিরোধী। সহযোগিতার মনোভাব এবং আদর্শগত মিল সমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, সমাজে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকে না। সহযোগিতা এবং বিরোধের সহাবস্থান সব সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সমাজবদ্ধ মানুষের বিরোধ ক্ষণস্থায়ী। সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। যেখানে বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, সেখানে সমাজবন্ধন শিথিল হয়, এবং সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। 1

সমাজ সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাসমূহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার সমাবেশে যে সুসংবদ্ধ কাঠামো গড়িয়া উঠে তাহাই সমাজ বলিয়া পরিচিত। যাহারা এই ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদের মতে অর্থনৈতিক, রাজনীতিক, ধর্মীয়, শিক্ষাসম্পর্কিত এবং অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলেই সমাজের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবে। সমাজের আচার-ব্যবস্থাগুলি এমন গভীরভাবে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত যে, কোন ব্যক্তির পক্ষেই খুশিমত যথেচ্ছ আচরণ করা সম্ভব নহে। এই সম্পর্কে টালকট পারসন্‌স্-এর (Talcott Parsons) উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "Social systems in which a considerable number of individuals are in a complex and delicate state of mutual interdependence tend greatly to limit the scope for 'personal' emotional feelings, or at least its direct expression in action".2 অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যথেচ্ছ আচরণ করিতে চেষ্টা করিলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সমাজ সম্পর্কে আলোচ্য ধারণার সঙ্গে জীবন-ধারার স্বভাবতই ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। ফস্টার (Foster) এই সংযোগ খুব সংক্ষিপ্ত একটি উক্তিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "Society means people and culture means

---

1 ষোড়শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

2 The Social Structure of Family by Talcott Parsons. Reprinted in Readings in Sociology. Edited by A. M. Lee. Page 101.

the behaviour of people."1। অথবা জন-সমষ্টি লইয়া সমাজ গঠিত হয় এবং উক্ত জন-সমষ্টির আচার-আচরণ তাহাদের জীবন-ধারা। জীবন-ধারার কি কি উপাদানের সাহায্যে সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হয় এবং সমাজস্থ মানুষের প্রয়োজন সাধিত হয়, সমাজসম্পর্কিত আলোচ্য ধারণায় তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে সমাজ সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদদের ধারণা পৃথক দুইটি ধারায় ভাগ করিয়া আলোচনা করা হইল। প্রথমটিতে সমাজকে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত একটি প্রবহমান ধারা (social process) হিসাবে দেখা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে সমাজকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা (social system) হিসাবে দেখা হইয়াছে। এই মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা টালকট পারসন্স্-এর বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইল। "A social system consists in a plurality of individual actors interacting with each other in a situation which at least has a physical or environmental aspect, actors who are motivated in terms of a tendency to the 'optimisation of gratification' and whose relation to their situations, including each other, is defined and mediated in terms of a system of culturally structured and shared symbols.2" এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে সুসংবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, বিভিন্ন ব্যক্তি বা জন-সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। তৃতীয়তঃ, পারস্পরিক সম্বন্ধ জীবন-ধারাগত আদর্শ বা মূল্যবোধ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হইবে।

সমাজ সম্পর্কে আলোচ্য দুইটি ধারণা বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না। বরং একটি অপরটির পরিপূরক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। সমাজবদ্ধ লোকের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা না করিলে পারস্পরিক সম্বন্ধ অর্থবহ হয় না। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির একাধিক সামাজিক পরিচিত (social status) আছে এবং সামাজিক পরিচিতি অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকাও (social role) পৃথক হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি কাহারও পুত্র, কাহারও স্বামী, কাহারও প্রতিবেশী, কাহারও ভ্রাতা বা কাহারও পিতা। আবার পেশা হিসাবেও পার্থক্য হয়। তিনি চিকিৎসক, উকিল, বিচারক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী অথবা অন্য যে-কোন বৃত্তিধারী হইতে পারেন। অতএব ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা তাহার সামাজিক পরিচিতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। তিনি মাতাপিতার সঙ্গে এক ধরনের আচরণ করিবেন, অনুজ ভ্রাতা-ভগিনীর সঙ্গে অন্য ধরনের আচরণ করিবেন। আবার চিকিৎসক

---

1 George M. Foster : Traditional Cultures : And the Impact of Technological change. Page II. Harper & Brothers, N.Y.

2 Talcott Parsons. The Social System. Glencoe, III. The Free Press. 1951. Pages 5-6.

হিসাবে তাহার ভূমিকা ব্যবসায়ীর ভূমিকা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন্ সামাজিক পরিচিতি অনুযায়ী কাহার কি ভূমিকা হইবে ইহা সম্পূর্ণরূপে জীবন-ধারাগত মূল্যবোধ বা আদর্শ দ্বারা নির্ণীত হয়। ভারতবর্ষে পিতা যেভাবে পুত্রের সঙ্গে আচরণ করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক সেইভাবে আচরণ করেন না। জীবন-ধারাগত পার্থক্যের মধ্যে ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, একজন বিচারপতি বিচারকের আসনে বসিয়া কোন দোষী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলে তাঁহার কাজ সমাজ-বিরোধী বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু তিনি বাড়ীতে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া যদি তাঁহার কর্মচারীকে প্রহার করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হন, তাহা হইলে তিনি সমাজ-বিরোধী কাজ করার জন্য আইনতঃ দণ্ডণীয় হন। আমাদের জীবন-ধারায় বিচারকের যে-ভূমিকা নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই ভূমিকা অনুযায়ী তিনি মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। ইহা সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের যে ভূমিকা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই ভূমিকা অনুযায়ী কাহারও প্রাণনাশ করিলে তিনি সমাজ-বিরোধী কাজ করার জন্য দণ্ডণীয়। সমাজে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সেইজন্য প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা বিবেচনা না করিলে পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অর্থবহ হয় না। পক্ষান্তরে, পারস্পরিক সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া কেবল প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাসমূহ বিশ্লেষণ করিলে সমাজের অখণ্ড রূপ ধরা পড়ে না। সমাজের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় বিভিন্ন সম্বন্ধাদিতে। এই সম্বন্ধগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা দ্বারা। কেবলমাত্র এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে সমাজের সামগ্রিক রূপটি হারাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অতএব সমাজকে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত প্রবহমান ধারা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা হিসাবে দেখার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। একই সামাজিক সম্বন্ধকে দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইয়াছে। কারণ, সমাজ যুগপৎ গতিশীল এবং স্থিতিশীল। ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু যে-কোন মুহূর্ত বিবেচনা করিলে সমাজকে স্থিতিশীল বলিয়া গণ্য করা যায়। সময়ের ব্যাপ্তি বিবেচনা করিলে সমাজের গতিশীলতা ধরা পড়ে। সমাজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে সমাজের গতিশীলতা এবং স্থিতিশীলতা উভয়ই বিবেচনা করা প্রয়োজন।[1]

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এবং অর্জিত সামাজিক পরিচিতি

সমাজের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার সময় সামাজিক পরিচিতি ও ভূমিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, সমাজস্থ লোকের একাধিক পরিচয় থাকে। মানুষ দুইভাবে সমাজে পরিচিত হয়। প্রথমতঃ, সে জন্মসূত্রে নানাভাবে সামাজিক পরিচিতি লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় চেষ্টায় সে সমাজে পরিচিতি অর্জন করে।

শিশুর জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই সামাজিকীকরণের কাজ শুরু হয়। সমাজের

1 এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য নবম ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

আদর্শ, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং শিশুর নানাবিধ কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য। জন্মসূত্রে শিশু যেভাবে পরিচিত হয় তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা অগ্রসর হয়। যেমন, ছেলে হইয়া জন্মাইলে শিশুকে এক ধরনের এবং মেয়ে হইয়া জন্মাইলে অন্য ধরনের কর্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয়। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পরিচিতি কিভাবে পৃথক হয় তাহা একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জন্ম হইতেই শিশুর লিঙ্গভেদে তাহার সামাজিক পরিচিতি পৃথক হয় এবং এই পার্থক্য আজীবন তাহার কাজকর্ম ও আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর সব সমাজেই সমাজস্থ লোকদের পুরুষ এবং স্ত্রী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং তাহাদের সামাজিক ভূমিকাও সেইভাবে পৃথক করিয়া নির্দিষ্ট করা হয়। কেবলমাত্র শিক্ষা-দীক্ষা নহে, মানমর্যাদা, প্রতিপত্তি এবং সুযোগসুবিধাতেও অনেক পার্থক্য থাকে। সব সমাজেই অধিকারপ্রাপ্তির দিক হইতে পুরুষ অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ পাইয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদে শ্রমবিভাগের পার্থক্য সর্বজনবিদিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা য়ুরোপের অগ্রসর সমাজগুলিতেও এই পার্থক্য বিরাজ করে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহার বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বয়সভেদেও সামাজিক পরিচিতির পার্থক্য হয়। সব সমাজেই শিশু, কিশোর, যুবক এবং বৃদ্ধের সামাজিক ভূমিকা পৃথক হয়। কাজেই একই ব্যক্তির বয়সভেদে সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তন হয়। শৈশবাবস্থায় তাহার আচার-ব্যবহার এক ধরনের এবং পরিণত যৌবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হয়। যৌবনাবস্থায় কেহ যদি শিশুসুলভ আচরণ করে, তাহা হইলে সে উপহাসের পাত্র হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রী-পুরুষভেদজনিত পার্থক্যের মত বয়সভেদজনিত পার্থক্য আজীবন স্থায়ী হয় না। উত্তরোত্তর বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিচিতি এবং সেই অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকারও পরিবর্তন হইতে থাকে। কিন্তু বয়সভেদ-জনিত পার্থক্য বিশেষ অর্থে আজীবন স্থায়ী হয়। যতই বয়স হউক পুত্র পিতামাতার সঙ্গে আজীবন পুত্রবৎ আচরণ করে। অগ্রজ-অনুজের সম্পর্ক বয়সের উপর নির্ভর করে না। সমাজে স্বীকৃত রীতি দ্বারা তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হয়। তৃতীয়তঃ, শিশু যে পরিবারে বা বংশে অথবা জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই পরিবার, বংশ বা জাতির পদমর্যাদা অনুযায়ী সামাজিক পরিচিতি লাভ করে। ঐতিহ্যপূর্ণ বংশজাত সন্তান স্বভাবতই সেই বংশমর্যাদার অধিকারী হয়। যেখানে জাতিভেদ প্রথা এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে ব্রাহ্মণ পরিবারজাত সন্তান সমাজে মর্যাদার স্থান অধিকার করে এবং শূদ্রপরিবারজাত সন্তান অপেক্ষাকৃত অমর্যাদাসূচক পংক্তিতে স্থান লাভ করে। অনুরূপভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় নিগ্রোপরিবারজাত সন্তানকে জন্মাবধি বহুবিধ অসম্মানজনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়।

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পরিচিতি সম্পূর্ণরূপে মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। চেষ্টা করিয়া ইহাকে অর্জন অথবা বর্জন করা যায় না। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে কর্ণের

উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্"। অর্থাৎ জন্ম আমাদের আয়ত্তাতীত কিন্তু পৌরুষ আমাদের আয়ত্তাধীন।

আমরা নিজের চেষ্টায় যে সামাজিক পরিচিতি লাভ করি, তাহাকে অর্জিত সামাজিক পরিচিতি আখ্যা দেওয়া হয়। আমরা কেবল আকৃতিতে পৃথক হইয়া জন্মাই না, আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং সম্ভাবনাসূচক অন্তর্নিহিত শক্তিতেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। ইহার ফলে নানারকম পার্থক্য আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ দেখা দেয়। পাণ্ডিত্যে, প্রযুক্তিবিদ্যায় এবং কর্মকুশলতায় পার্থক্য থাকায় সমাজে আমরা বিভিন্ন রকম স্থান অধিকার করি। কেহ ডাক্তার, কেহ ইন্‌জিনিয়ার, কেহ শিল্পী, কেহ শিক্ষক, কেহ বা সামান্য দিনমজুরের পেশা গ্রহণ করে। যে যে-ভাবে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকশিত করে সেইভাবে সে সামাজিক পরিচিতি অর্জন করে। কিন্তু কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা প্রচেষ্টার পার্থক্যের জন্য সামাজিক পরিচিতিতে পার্থক্য দেখা দেয় না। ক্ষমতা এবং প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি না থাকিলেও নানারকম সামাজিক প্রতিবন্ধক সাফল্যের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যে সমাজে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং অধ্যবসায়ের স্বাভাবিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত থাকে, সেই সমাজ গুণবান ব্যক্তির অবদানে লাভবান হয়। এক কথায় বলা যায়, যে-পরিমাণে সমাজ গুণের আদর এবং সম্মান দিতে সক্ষম হইবে, সেই অনুপাতে সমাজ শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করিবে। ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদপ্রথা থাকার দরুণ অনেক ক্ষেত্রে মনীষার স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ ছিল। ইহার ফলে ভারতীয় সমাজ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

অতএব জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পরিচিতি এবং অর্জিত সামাজিক পরিচিতির মধ্যে বিভেদ থাকিলেও দুইটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া ভাবা সমীচীন হইবে না। একটি অপরটির পরিপূরক। মানুষের পুরুষকার তখনই সফল হয় যখন জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পরিচিতি দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে না। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পরিচিতি অনুকূল হইলে স্বীয় চেষ্টায় সামাজিক পদমর্যাদা অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। শৈশবাবস্থায় জন্মসূত্রে আমরা যদি কোন সামাজিক পরিচিতি লাভ না করিতাম, তাহা হইলে জীবনের শুরুতেই আমাদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইত। এই অবস্থায় অনেকের পক্ষেই জীবন অসহ্য হইত। জন্মসূত্রে সামাজিক পরিচিতি নির্ণীত হওয়ার ব্যবস্থা থাকায় শৈশবাবস্থা হইতেই আমরা আমাদের অধিকার, কর্তব্য এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীকৃত কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকি। এই জ্ঞান আমাদের নিরাপত্তা-বোধ সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। এই নিরাপত্তাবোধ না থাকিলে অনেকের পক্ষেই পরবর্তী জীবনে সামাজিক পরিচিতি অর্জন করার চেষ্টা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িত। সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করিবার জন্য জন্মসূত্রে সামাজিক পরিচিতি লাভ করা যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি স্বীয় চেষ্টায় সামাজিক পরিচিতি অর্জন করার সহজ সুযোগসুবিধা থাকাও একান্ত দরকার। এই সুযোগসুবিধা যত সহজলভ্য হয় এবং বিস্তৃত লাভ করে, মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকশিত করার উৎসাহ তত বৃদ্ধি পায়। সমাজও তদনুযায়ী শ্রীমণ্ডিত হয়।

সমাজের বিভিন্ন জাতিরূপ

ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে শিল্পোন্নত সমাজের আকৃতি-প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হইতে থাকে। শিল্পায়নের সঙ্গে সামাজিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক সমাজের সরলতা হারাইয়া ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়ে। পুরাতন সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া নূতন নূতন সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি হইতে থাকে। সমাজের সঙ্গে সমাজস্থ লোকের সম্বন্ধও পরিবর্তিত হয়। পূর্বে সমাজ যেভাবে সমাজস্থ লোকের কাজকর্ম এবং চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করিত, পরিবর্তিত অবস্থায় সমাজের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অনেকাংশে দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সামাজিক পরিবর্তনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে সমাজতত্ত্ববিদগণ অনেক তত্ত্ব এবং তথ্যের অবতারণা করিযাছেন। এই প্রসঙ্গে তিনজন সমাজতত্ত্ববিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা হইলেন ডুর্কহেইম, টনিজ (Tonnies) এবং রেডফিল্ড (Redfield)।

১৮৯৩ সালে ডুর্কহেইম তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক The Division of Labour in Society প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি যে মত ব্যক্ত কবিযাছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। প্রাকৃশিল্প-যুগীয় সমাজে জনসাধারণের মধ্যে কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্য থাকার ফলে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রকার সংহতিকে mechanical solidarity বা যান্ত্রিক সংহতি বলা যায়। এইরূপ সংহতি কেবলমাত্র অভ্যাসবলে বজায় থাকে। ইহাতে স্বাধীন ইচ্ছার কোন ভূমিকা নাই। সর্বজনস্বীকৃত একটি আচরণ-বিধি সমাজস্থ প্রত্যেকে মানিযা চলে বলিয়াই সামাজিক সংহতি বজায় থাকে। পক্ষান্তরে, শিল্প-ভিত্তিক সমাজে কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-আচরণ চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধে সাদৃশ্যের চাইতে বৈসাদৃশ্য বেশি নজরে পড়ে। এই অবস্থায় সমাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় নাই। কারণ, শিল্পপ্রধান সমাজে শ্রম-বিভাগের মাধ্যমে সহযোগিতার বন্ধন গড়িয়া উঠে। শ্রম-বিভাগে মানুষের পরস্পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরনির্ভরশীলতাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, পার্থক্যের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। এই জাতীয় সংহতিকে organic solidarity বা সাংগঠনিক সংহতি বলা যায়।

উপরোক্ত ধারায় প্রাকৃশিল্প-যুগীয় এবং শিল্প-ভিত্তিক সমাজের সংহতির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ডুর্কহেইম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শিল্পায়নের ফলে সমাজ ক্রমশঃ যান্ত্রিক সংহতির স্থলে সাংগঠনিক সংহতির দিকে অগ্রসর হইবে। তাঁহার মতে, এই গতি অপ্রতিরোধ্য।

টনিজ (Tonnies) ১৮৭৭ সালে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Gemeinschaft UND Gesellschaft প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে য়ুরোপীয় সমাজ ক্রমশঃ Gemeinschaft হইতে Gesellschaft-এর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, শিল্পায়নের ফলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইয়া সমাজ শিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্যের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইতে থাকে। অর্থনৈতিক

কাঠামোর আকৃতি এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে গ্রাম ক্রমশঃ সংকুচিত হয় এবং নগরের কলেবর বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধ প্রভৃতি বহুবিধ আচার-ব্যবস্থায় পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। তিনি এই পরিবর্তনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে Gemeinschaft (community) বা সম্প্রদায় এবং Gesellschaft (association) বা সমিতি এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যখন কোন জন-সমষ্টি কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত না হইয়া সমাজবদ্ধ জীবনের সার্বিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে একত্র বসবাস করে, তখন সেই সমাজকে সম্প্রদায় আখ্যা দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে সম্প্রদায়ের স্বরূপ বুঝিতে সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ, সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ হিসাবে টনিজ পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী বা গ্রাম-সমাজে প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সার্বিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা গোটা মানুষ হিসাবেই মিলিত হয়। পক্ষান্তরে, যখন আমরা কোন বিশেষ একটি সমস্যা আলোচনা করার উদ্দেশ্যে কোন কমিটি বা সমিতিতে মিলিত হই, সেখানে অন্য সভ্যদের আমরা সদস্য হিসাবেই চিনি। কমিটির কাজ শেষ হইয়া গেলে আমাদের আংশিক পরিচয়ের যোগসূত্রও ছিন্ন হইয়া যায়। উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের পারস্পরিক পরিচয় এবং সম্পর্ক আরও গভীর, বিস্তৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী করিয়া তোলে। তৃতীয়তঃ, সম্প্রদায় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। এক স্থানে অবিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করার ফলে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মধ্যে নানারকম পারস্পরিক বন্ধনের সৃষ্টি হয় এবং সংহতি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র স্বার্থবোধ এই বন্ধনকে শক্তি যোগায় না। নানারকম আবেগ, অনুভূতি এবং স্মৃতিকথা পারস্পরিক বন্ধনকে পরিপুষ্ট করে। সেইজন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা তাহাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ড এবং তাহাদের জীবন-প্রণালী সম্পর্কিত বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থা লইয়া গর্ববোধ করে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, সম্প্রদায়ের গণ্ডী নির্ধারণ করা সহজ নহে। গ্রাম-সমাজ হইতে শুরু করিয়া নেশন-এর মত বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীকে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে সমাজতত্ত্ববিদগণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মানব-গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্প্রদায়ের গণ্ডী আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী।

আরেকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান যুগে কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের সার্বিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নহে। ইহার কয়েকটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, শিল্প-প্রধান সমাজে আমাদের চাহিদায় উত্তরোত্তর এত বৈচিত্র্য ঘটে যে কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহা চরিতার্থ করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের উন্নতি হওয়ার ফলে বিভিন্ন

অঞ্চল উৎপাদন এবং সরবরাহের সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যের জন্য স্বভাবতই পরস্পর-নির্ভরশীল হইয়া গড়িয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে নগরের উৎপত্তি হওয়ায় নগরের সঙ্গে সংলগ্ন সম্প্রদায়সমূহের নানারকম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় ক্ষুদ্র স্বাবলম্বী সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করা যায় না। আদিম পার্বত্য জাতির অভাব এবং চাহিদা সীমাবদ্ধ থাকায় এবং তাহাদের অধ্যুষিত অঞ্চলে যানবাহন এবং রাস্তাঘাট প্রসারলাভ না করায়, একমাত্র তাহাদের মধ্যে স্বয়ম্ভর সম্প্রদায় থাকা সম্ভব।

সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা বিস্তারলাভ করার সঙ্গে সম্প্রদায়ের গণ্ডীও বিস্তৃতিলাভ করে। ইহার ফলে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক পরোক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। পরস্পর নির্ভরশীলতাও হ্রাস পায় এবং সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে, সম্প্রদায়ের গণ্ডী বিস্তৃতি লাভ করায় নানারকম সংগঠনের মাধ্যমে বিশেষীকরণের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সহজ হয়। ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে এই জাতীয় সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যেমন, ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করাইবার জন্য হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। সম্প্রদায় বিস্তৃতিলাভ করিলে এই ধরনের সুযোগ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। এই প্রসঙ্গে ম্যাক আইভারের উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, পরিপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য আমাদের উভয় প্রকার সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে। বৃহদায়তন সম্প্রদায় আমাদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে এবং নানারকম বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়া জীবনকে অধিকতর ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে। পক্ষান্তরে, ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় কোলাহল-বর্জিত ধীর শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে মানবিক সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য উভয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে।

টনিজ এবং তাঁহার পরবর্তী বহু সমাজতত্ত্ববিদ সম্প্রদায়ের সহিত সমিতির তুলনামূলক বৈষম্যের (contrast) উল্লেখ করেন। যখন কোন জন-সমষ্টি কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত হয় তখন সেই জন-সমষ্টিকে যৌথভাবে সমিতি আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, শরীর-চর্চার জন্য যদি ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয় তাহা হইলে ইহাকে সমিতি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সমিতির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। প্রথমতঃ, সার্বিক প্রয়োজনের বদলে নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ করা ইহার লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ, সমিতিভুক্ত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরোক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক। তৃতীয়তঃ, সমিতির সদস্যগণ সীমিত উদ্দেশ্যে মিলিত হন। সুতরাং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের ন্যায় তাহাদের মধ্যে আবেগ বা অনুভূতি বিজড়িত কোন দীর্ঘস্থায়ী মানবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে না। চতুর্থতঃ, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া সমিতি না-ও গড়িয়া উঠিতে পারে।

ইহার ফলে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কে সমিতির সদস্যবৃন্দ কোনপ্রকার গর্ব অনুভব করেন না।

টনিজের মতে শিল্প-সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্প্রদায়-ভিত্তিক সমাজ ক্রমশঃ সমিতি-ভিত্তিক সমাজে পরিণত হইতে থাকে। নগর-ভিত্তিক সমাজের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। তাঁহার পুস্তকে তিনি এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তাহার আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। **"Gemeinschaft (community) is old; Gesellschaft (society) is new as a name as well as a phenomenon.......Wherever urban culture blossoms and bears fruits, Gesellschaft appears as its indispensable organ. The rural people know little of it."1**

রেডফিল্ডের ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায়ের ধারণা

রেডফিল্ড তাঁহার পুস্তকে (The Little Community) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্তব্য করেন যে, সমাজ যেসব বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে, তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় অন্যতম। তিনি little community বা ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় বিশ্লেষণ করিতে গিয়া চারিটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ, এই সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য (distinctiveness) রহিয়াছে। সম্প্রদায়ের কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ ইহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, অপরিসর গণ্ডী (smallness) ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহার ফলে সম্প্রদায়কে সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যে-কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তৃতীয়তঃ, এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের চিন্তাধারা এবং কাজকর্ম সমপ্রকৃতির (homogeneous) হয়। পুরুষানুক্রমে সমজাতীয় বৃত্তির পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে। চতুর্থতঃ, স্বয়ম্ভরতা (self-sufficiency) এই সম্প্রদায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। ইহার গণ্ডীর মধ্যেই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন চরিতার্থ হয়।

ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায়ের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করিয়া রেডফিল্ড সর্বব্যাপী (inclusive) বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আলোচনা করেন। এই প্রকার আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির সমাবেশে বৃহত্তর সমাজ গড়িয়া উঠে; সুতরাং ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বিশ্লেষণ করিলে বৃহত্তর সমাজের স্বরূপ বুঝিতে সুবিধা হইবে।

ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রেডফিল্ডের মতকে নানাদিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, আজ পর্যন্ত যত ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় সম্পর্কে গবেষণা করা হইয়াছে কোন সম্প্রদায়েরই সুস্পষ্ট গণ্ডী নির্দেশ করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে বৃত্তি, সামাজিক শ্রেণী বা ধর্মের দিক হইতে নানা পার্থক্য দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক

1. Ferdinand Tonnies: Fundamental Concepts of Sociology (Gemeinschaft and Gesellschaft), translated and supplemented by Charles P. Loomis American Book Co. N. Y. 1940. Pages 37-39.

ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দূরের বাজারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এই অবস্থায় কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা সম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, রেডফিল্ডের আলোচনা হইতে ধারণা জন্মে যে, বৃহত্তর নগর-সম্প্রদায়ের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন গ্রাম-সম্প্রদায়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত, বিরোধ-বর্জিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধারণা বাস্তবসম্মত না হওয়ারই কথা। পারস্পরিক সম্পর্কের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ এবং সেই কারণে যোগাযোগ সহজ হওয়ায় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিরোধের সম্ভাবনা বরং বেশি।

রেডফিল্ডের আলোচনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাঁহার মতে একমাত্র লোকাচার-শাসিত সমাজকেই (folk socicty) সম্প্রদায় পদবাচ্য বলিয়া গণ্য করা যায়। নগর-সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং নগর-সমাজকে নগর-সম্প্রদায় বলিয়া বর্ণনা করা অসঙ্গত। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে গ্রাম এবং নগরের জীবন-ধারাগত পার্থক্য আলোচনা করাব সময় রেডফিল্ডের এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার করিব।

গ্রাম-জীবন এবং নগর-জীবন

পৃথিবীর সকল দেশেই মানুষ গ্রামে এবং নগরে বাস করে। কত সংখ্যক লোক গ্রামে এবং কত সংখ্যক লোক নগরে বাস কবে, ইহাব অনুপাত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমেব। এই পার্থক্যের কারণও নানারকম হইতে পারে। গ্রাম এবং নগর বলিতে কি বুঝায় এই সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের মোটামুটি একটা ধারণা আছে। কথাবার্তায় প্রায়ই এই দুইটি শব্দ ব্যবহারও করিয়া থাকি। কিন্তু কেহ যদি আমাদের গ্রাম এবং নগরের সংজ্ঞা দিতে বলেন এবং এই দুইটি জনপদের পার্থক্য নির্দেশ করিতে বলেন, তখনই দেখা যাইবে আমরা যত সহজে এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করি ঠিক তত সহজে সংজ্ঞা বা পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি না। কারণ, লোকসংখ্যা, আয়তন, আকৃতি-প্রকৃতি এবং জীবন-প্রণালীর দিক হইতে এক নগরের সঙ্গে অন্য নগরের এবং এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কলিকাতার সঙ্গে তমলুক, সিংউড়ি মালদহ বা জলপাইগুড়ির মিলের চাইতে পার্থক্যই হয়ত বেশি। অথচ এই সব কয়টি জনপদই নগর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আবার কলিকাতার সংলগ্ন কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামের সঙ্গে দূরবর্তী সহজ যাতায়াতের সুযোগসুবিধাবর্জিত গ্রামের মিলের চাইতে পার্থক্য বেশি। অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশগুলির গ্রামের সঙ্গে আমাদের গ্রামের পার্থক্য এত বেশি যে দুইটি একই পদবাচ্য কিনা এই সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। পাশ্চাত্য দেশগুলির ছোট নগরের সঙ্গে আমাদের ছোট নগরের পার্থক্যও তদনুরূপ। সেইজন্য গ্রাম এবং নগর বলিতে কি বুঝায় তাহার বিস্তারিত আলোচনা প্রজয়োন।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই লোকসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রাম এবং নগরের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যেমন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড এবং জাপানে যথাক্রমে

2000, 2500, 20,000, এবং 30,000 লোকসংখ্যার বসতিকে নগরাঞ্চল বলিয়া অভিহিত করা হয়। আইসল্যাণ্ড 300 লোকসংখ্যার বসতিকেই নগরাঞ্চল বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে পার্থক্য করা হয়। কিন্তু এক অঞ্চলের কোথায় শেষ এবং অন্য অঞ্চলের কোথায় শুরু ইহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা কঠিন। আমাদের পরিচিত যে-কোন নগরের দিকে তাকাইলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

জাতিপুঞ্জের একটি সংস্থা 1 52টি দেশের আদম সুমারীর নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিয়া যে রিপোর্ট তৈরী করিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, প্রত্যেকটি দেশেই নগরাঞ্চলের সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার পর অবশিষ্ট অঞ্চলকে গ্রামাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। উপরোক্ত জাতিপুঞ্জের সমীক্ষায় দেখা যায়, সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নগরাঞ্চল নিরূপণ করা হয়। (1) যে স্থানে প্রশাসনিক সদর কার্যালয় থাকে সেই স্থান সাধারণতঃ নগর বলিয়া পরিচিতি লাভ করে। যেমন, জেলা সদর, মহকুমা সদর ইত্যাদি। (2) কোন অঞ্চলে ন্যূনতম নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক বাস করিলে সেই অঞ্চল নগর বলিয়া গণ্য হয়। (3) যেসব অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা থাকে (যেমন, পৌর প্রশাসনিক সংস্থা) সেই সব অঞ্চল নগর বলিয়া পরিগণিত হয়। (4) যেসব অঞ্চলে পৌর বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান, সেই সব অঞ্চল নগর আখ্যা পাইয়া থাকে। পৌর বৈশিষ্ট্য বলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বুঝায়ঃ সুবিন্যস্ত রাস্তাঘাট, মল নিষ্কাশন, রাস্তায় আলো এবং নলের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, হাসপাতাল, বাজার, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সেবামূলক সংগঠন। (5) কোন অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার ন্যূনতম অনুপাতের অধিক সংখ্যক লোকের কৃষি ব্যতীত অন্য জীবিকা থাকিলে (যেমন, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বা যানবাহন সম্পর্কিত জীবিকা) সেই অঞ্চল নগর বলিয়া পরিচিত হয়।

1961 সালের ভারতীয় আদম সুমারীতে পৌর অঞ্চলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কোন মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির অধীন অঞ্চল, নগর কমিটি বা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অঞ্চল কমিটি (notified area committee) দ্বারা শাসিত অঞ্চল এবং ক্যান্টনম্যাণ্ট পৌর অঞ্চল বলিয়া পরিচিত হইবে। ইহা ছাড়া, যেসব অঞ্চল নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করিবে সেই অঞ্চলগুলিও পৌর অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইবে। এই শর্তগুলি হইলঃ (1) প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব যেন 1000 এর কম না হয়। (2) ন্যূনতম লোকসংখ্যা 5000 হওয়া প্রয়োজন। (3) মোট কর্মনিযুক্ত লোকের অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ লোক অ-কৃষিজীবি হইবে। (4) রাজ্য আদম সুমারী তত্ত্বাবধায়কের মতে সুস্পষ্ট পৌর বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান থাকা প্রয়োজন।

---

1. Handbook of Population Census Methods, Vol. 3, Demographic and Social Characteristies of the Population, Studies in Census Methods, Ser F No. 5, United Nations N. Y. 1959. Pages 60-61.

উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে গ্রাম এবং নগরের যেসব বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া এই দুই প্রকার জনপদের মধ্যে ভেদ-রেখা টানা হইল, সমাজতত্ত্বে সেইসব বৈশিষ্ট্যের বিশেষ তাৎপর্য নাই বলিলেই চলে। সমাজতত্ত্বে গ্রাম এবং নগরের মধ্যে পার্থক্য মূলতঃ জীবন-ধারাগত, কেবলমাত্র বাহ্যিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কিত নহে। জীবন-ধারাগত পার্থক্য বুঝিতে হইলে গ্রাম এবং নগরের সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে পরিচিত থাকা প্রয়োজন। এইজন্য গ্রামীন এবং পৌর সমাজ-জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইল।

(ক) আচার-ব্যবহারে, বেশভূষায়, এবং আহার-বিহারে নানারকম পার্থক্য নগর-জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিসর স্থানে অধিক সংখ্যক লোক কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে এই পার্থক্য দেখা দেয়। লোকসংখ্যার ঘনত্ব অধিক থাকায় সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে বৃত্তিগ্রহণে পার্থক্য ঘটে। উপরন্তু, কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন নির্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় কিছুসংখ্যক লোক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অ-কৃষিমূলক বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং বাহিরের সঙ্গে নানারকম সংযোগ স্থাপিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাহিরের লোক আসিয়া নগরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই অবস্থায় নগর-জীবনে বৈচিত্র্য ঘটিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, গ্রামে এই ধরনের বৈচিত্র্য অনুপ্রবেশ করার বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া গ্রাম-জীবনে সমরূপ আচার-ব্যবহার, বেশভূষা এবং আহার-বিহার পরিলক্ষিত হয়।

(খ) পরোক্ষ সম্বন্ধ-ভিত্তিক সমিতি নগর-জীবনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। লোক-সংখ্যা অধিক হওয়ায় প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না। নানারকম প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে অপরিচিত এবং অল্পপরিচিত লোকদের নানারকম পরোক্ষ সম্বন্ধ-ভিত্তিক সমিতি গঠন করিতে হয়। এক কথায় বলা যায়, নগর-জীবন মুখ্যতঃ সমিতি-ভিত্তিক। পক্ষান্তরে, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যোগসূত্রে গ্রামবাসীগণ আবদ্ধ থাকায় তাহাদের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতা নগরবাসীদের তুলনায় বেশি।

(গ) ভৌগোলিক নৈকট্য এবং সামাজিক দূরত্ব নগর-জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে মৌখিক পরিচয়ের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে না। এই অবস্থায় গ্রাম-জীবনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নগর-জীবনে অনুপস্থিত। সুতরাং পুলিশ বাহিনী, আদালত প্রভৃতি পরোক্ষ নিয়ামকগুলি নগর-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) অধিকাংশ নগরবাসী অ-কৃষিমূলক বৃত্তি গ্রহণ করার ফলে বৃত্তিতে নানা-রকম বিশেষীকরণ ঘটিয়া থাকে। বৃত্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও বিশেষীকরণ সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পরিচিতির তুলনায় অর্জিত সামাজিক পরিচিতি প্রাধান্য পায়। গ্রামাঞ্চলে বৃত্তিতে বৈচিত্র্য ও বিশেষীকরণ খুবই সংকীর্ণ হওয়ায় সামাজিক গতিশীলতার সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ। সুতরাং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পরিচিতি স্বভাবতই প্রাধান্য পায়।

(ঙ) নগর-জীবনে প্রতিযোগিতা, বৃত্তিতে বৈচিত্র্য ও বিশেষীকরণ, দুর্বল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সমিতির বাহুল্য থাকার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। যে-কোন নগরবাসীর পক্ষে নগর-জীবনে বিভিন্ন ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব। গ্রাম-জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিবার অনুকূল পরিবেশ প্রায় অনুপস্থিত। ব্যক্তির কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার এবং চিন্তাধারা পরিবার এবং সমাজ দ্বারা প্রভাবিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(চ) উপরোক্ত বাহ্যিক সাংগঠনিক ব্যবধান ছাড়াও গ্রামবাসী এবং নগরবাসীর মানসিকতা ভিন্নভাবে গড়িয়া উঠে। কৃষি কেবলমাত্র জীবিকা বা বৃত্তি নহে। ইহা সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে। কৃষিকার্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সীমিত থাকায় কৃষিজীবীগণ স্বভাবতই ভাগ্যের উপর আস্থাশীল হইয়া উঠে। সনাতন ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস এবং নানারকম কুসংস্কার তাহাদের চিন্তাধারাকে সংকুচিত করিয়া রাখে। পল্লী-জীবনের উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে এই মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। অপর পক্ষে, নগর-জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের যোগাযোগ খুবই সীমিত এবং যাহা আছে তাহাও পরোক্ষ। নগরবাসীর নিকট সমাজ পরিবর্তনশীল। তাহাকে নিজের চেষ্টায় উপায় উদ্ভাবন করিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে হয়। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাহার চেষ্টাকে অপেক্ষাকৃত কম ব্যাহত করে বলিয়া নগরবাসী কোন কিছুকেই আয়ত্তাতীত বলিয়া মনে করে না। কুসংস্কার বা সনাতন ধ্যান-ধারণা তাহার মনন-ক্রিয়াকে স্বভাবতই কম প্রভাবিত করে। সুতরাং গ্রামীন উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে যে শান্ত সুশৃঙ্খল পরিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, নগরের উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে তাহা পাওয়া দুষ্কর। নগর-জীবনে যে চাঞ্চল্য, গতিশীলতা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়, তাহাই উৎসব অনুষ্ঠানে প্রতিফলিত হয়।

উপরে গ্রাম-জীবন এবং নগর-জীবনের মধ্যে যে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হইল, তাহা অতি দ্রুত গতিতে অতীতের বিষয়ে পরিণত হইতেছে। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের লোকের পক্ষে নগরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। এই যোগাযোগের ফলে বেশভূষায়, আহার-বিহারে এবং আচার-আচরণে পল্লীবাসীর সঙ্গে নগরবাসীর পার্থক্য ক্রমশঃ মুছিয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, রেডিও এবং দৈনিক সংবাদপত্রের বহুল প্রচলনের ফলে নগর-জীবনের প্রভাব পল্লী-জীবনে সহজে এবং অত্যন্ত কার্যকরভাবে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি হওয়ায় পূর্বের ন্যায় কৃষি প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নহে। কৃষি ক্রমশঃ শিল্পের ন্যায় অন্যতম একটি স্বতন্ত্র বৃত্তিতে পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ সমগ্র জীবনের উপর কৃষির প্রভাব উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। এই পরিবর্তনকে অনেক সমাজতত্ত্ববিদ বিংশ

শতাব্দীর গ্রামীন বিপ্লব বলিয়া বর্ণনা করেন। অধ্যাপক হেলপার্ণ (Joel M. Halpern) The Changing Village Community নামক গ্রন্থে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য করেনঃ "The rural revolution can be defined as that complex of changes encompassing the progressive elimination of characteristics that make rural and urban modes of life culturally, socially, and geographically separable. It is hypothesizcd that these changes are as important for the future of man as were the..... agricultural revolution ;...the urban revolution ; and......the scientific and industrial (power) revolution" 1 অর্থাৎ নবপ্রস্তরযুগে বনজ উদ্ভিদকে প্রয়োজনানুযায়ী চাষ করিয়া উৎপাদন করার জ্ঞান লাভ করিয়া এবং বন্য পশুকে পোষ মানাইয়া চাষের কাজে ব্যবহার করিয়া যে কৃষি-বিপ্লবের সূচনা হয় তাহার মত বিংশ শতাব্দীর গ্রামীন বিপ্লবও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যা আবিষ্কারের ফলে যেমন নগর-সভ্যতার সূচনা হয় অথবা যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগের ফলে যেমন শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়, ঠিক তদনুরূপ যুগান্তকারী এই গ্রামীন বিপ্লব।

ভারতবর্ষে এই গ্রামীন বিপ্লবের ঢেউ এখনও আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে সজোরে আঘাত করে নাই। কিন্তু এই বিপ্লবের সূত্রপাত বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হইয়াছে। যানবাহনের উন্নতি, রেডিও ও সংবাদপত্রের প্রচলন এবং রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারাভিযান নগরের ভাবধারা এবং আচার-আচরণ গ্রামাঞ্চলে দ্রুত জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছে। সবুজ বিপ্লব এখনও কয়েকটি সংকীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ শক্তির সম্প্রসারণ, অধিকতর সার উৎপাদন, ভূমিসম্পর্কিত আইনের পরিবর্তন এবং সর্বোপরি কৃষি-গবেষণায় আরও সাফল্য অর্জন করিলে কৃষিতে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং সবুজ বিপ্লবের সম্প্রসারণের ফলে গ্রামীন বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হইবে।

সারা পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে সমাজ-ব্যবস্থা সম্ভবতঃ নগর-কেন্দ্রিক হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল তাহাই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নানাভাবে পরিপুষ্ট হইয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। অতীতের দিকে তাকাইয়া লাভ নাই। ইতিহাসের গতি অমোঘ। অনেকের কাছে নানাকারণে এই গতি অনভিপ্রেত হইলেও ইহাকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে রেডফিল্ডের উক্তির যাথার্থ্য আলোচনা করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, নগরকে সম্প্রদায় আখ্যা দেওয়া সমীচীন নহে। তাঁহার মতে,

সম্প্রদায়ের অনুকূল মানসিকতা একমাত্র little communty বা ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায়েই গড়িয়া উঠিতে পারে। তাঁহার উক্তির সত্যতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, নগর-জীবনে অভিরুচি, অনুরাগ এবং স্বার্থের ভিত্তিতে আরেক ধরনের সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা এবং সুযোগ আছে। এই বিষয়ে ডেভিসের উক্তি উল্লেখ করা হইল। তিনি বলেন: "No matter what a person's hobby or vocation, national background or religion, age or color, he can always find others with a similar basis of interest." 1 এই প্রসঙ্গে এণ্ডারসন এবং পার্কারের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "Most people in the world live in relatively small places, although the trend of population movement in industrialised countries especially is toward the urban center. This is so even for the United States, where it is often described in terms of crowded cities.......The Census for 1960 gives 19,790 as the number of incorporated and unincorporated places in the country. Of these, 72 per cent have less than 2500 inhabitants. A large proportion of the 72 per cent are the centers of functional communities." 2 অন্যত্র এণ্ডারসন এবং পার্কার functional community বলিতে কি বুঝায় আলোচনা করিতে গিয়া বলেন: "It is the self-sufficing area of operation for a large part of any population. Just as we belong to one family at a given time, so we belong to just one community with which we identify ourselves." 3 এণ্ডারসন এবং পার্কারের উক্তি বিশ্লেষণ করিলে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হইবে। প্রথমতঃ, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক লোকের নগরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, অতিকায় নগরগুলির তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন নগরগুলিতে বসবাস করার প্রবণতা বেশি। তৃতীয়তঃ, এই ক্ষুদ্রায়তন নগরগুলিতে ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লোকেরা পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে প্রয়াসী। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নগরের আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সম্প্রদায়সুলভ ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং পরস্পরনির্ভরশীলতার আবেদন এখনও রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আবার ম্যাক আইভারের উক্তির পুনরুল্লেখ করিতে হয়। আমাদের পরিপূর্ণতার জন্য ক্ষুদ্রায়তন এবং বৃহদায়তন সম্প্রদায়ের সমান প্রয়োজন রহিয়াছে।

1. **Kingsley Davis : Human Society. Page 333.**
2. **Anderson and Parker : Society—Its Organisation and Operation. Page 102.**
3. **তদেব পৃষ্ঠা ১০২**

ভারতবর্ষে নগরায়নের প্রকৃতি

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী গ্রাম-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নগর-সমাজে বসতি স্থাপন করার যে প্রবণতা দেখা যায় ভারতবর্ষ তাহার ব্যতিক্রম নহে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ শতকে ইহার সূচনা হইয়াছিল। স্বাধীনোত্তর কালে এই গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরাতন, ছোট, মাঝারি এবং বড় নগরগুলির আযতন এবং লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। শিল্পায়নের ফলে কলকারখানাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন নূতন নগর গড়িয়া উঠিতেছে।

গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে বসতি স্থাপন করার প্রবণতাকে সমাজতত্ত্ববিদগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণগুলিকে মোটামুটি দুইভাবে ভাগ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের পরিবেশ কিছুসংখ্যক লোককে গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে। সমাজতত্ত্ববিদগণ ইহাকে push factor বলিয়া অভিহিত করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে নগরের সুযোগসুবিধা (ইহা বাস্তব না হইয়া কাল্পনিকও হইতে পারে) কিছুসংখ্যক গ্রামবাসীকে 'নগরে আকর্ষণ করিয়া আনে। ইহাকে সমাজতত্ত্ববিদগণ pull factor বলিয়া থাকেন। গ্রামের লোককে বাহির করিয়া আনিতে কোন্ কারণ বেশি কার্যকর ইহা লইয়া অতীতে অনেক বিতর্ক হইয়াছে এবং বর্তমানেও চলিতেছে। তবে অধিকাংশ সমাজতত্ত্ববিদ স্বীকার করেন যে, গ্রাম পরিত্যাগ করার প্রবণতা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করার জন্য উভয় কাবণই দায়ী।

ভারতবর্ষে যেসব কারণে কিছুসংখ্যক লোক গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সেই কারণসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। প্রথমতঃ, পল্লী অঞ্চলে লোক-সংখ্যার অনুপাতে চাষের জমির অভাব হওয়ায় কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধা এবং খাদ্যের অভাব ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, যে-হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সেই হারে পল্লী অঞ্চলে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি হইতেছে। তৃতীয়তঃ, পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে কিছুসংখ্যক নব্য শিক্ষিত যুবক পিতৃপুরুষের বৃত্তি অনুসরণ করিতে উৎসাহ বোধ করে না। শিক্ষা তাহাদের কেবলমাত্র অক্ষর-পরিচয় করায় না; ইহা তাহাদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলে। তাহাদের পরিবর্তিত মূল্যবোধ অনুযায়ী চাষ অথবা অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমের কাজ করা মর্যাদা-হানির নামান্তর মাত্র। এই অবস্থায় পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া ভাগ্যান্বেষণে নগরে যাওয়া ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। চতুর্থতঃ, চাষের কাজে ঋতু অনুযায়ী কর্মসংস্থান হয়। সারা বৎসরের কাজকর্ম থাকে না। এই কারণে অনেকে কয়েক মাসের জন্য নগরাঞ্চলে বিভিন্ন কাজকর্ম গ্রহণ করিয়া সেখানে অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।

আবার বিভিন্নভাবে গ্রামবাসী নগরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করে। প্রথমতঃ, নগরাঞ্চলের প্রাচুর্য এবং কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃত বেশি বলিয়া অনেকে নগরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, নগরের আমোদ-

প্রমোদ এবং বিলাস-ব্যসনের সুযোগ-সুবিধাও অনেক পল্লীবাসীকে আকর্ষণ করে। তৃতীয়তঃ, ভারত-বিভাগের ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আগত অধিকাংশ পল্লীবাসী নগরাঞ্চলে অথবা নগরের সংলগ্ন স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের জমি এবং অর্থ না থাকায় জীবিকার সন্ধানে নগর এবং নগরের সন্নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। চতুর্থতঃ, ভারতবর্ষে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হওয়ায় কোন পল্লীবাসী নগরে আসিয়া কোনভাবে একটু প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার আত্মীয়স্বজনকে আনিয়া নগরে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে বগ (Bogue) এবং জ্যাকেরিয়ার মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। "It (the upswing in urbanward migration) has now progressed to a point where the residents of almost every village have relatives or fellow villagers living in at least one (and possibly several) of the major cities. Family and village ties are sufficiently strong to create an obligation upon the successful migrant to help sponsor new entrants to the city." 1

পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে নগরায়নের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষের নগরায়নের গতি এবং প্রকৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলির অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও চাকুরি এবং আয়-বৃদ্ধির প্রত্যাশায় লোকেরা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে আসিয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের আশা এবং স্বপ্ন সার্থক হয়। তাহা ছাড়া, চাকুরি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও তাহারা অর্জন করে। ইহার ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাহারা নগর-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যায়। তাহারা আর বাহিরের লোক থাকে না; সম্পূর্ণরূপে নগরবাসী হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রত্যাশায় লোকেরা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা ব্যর্থ হয়। চাকুরি সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা লইয়া তাহারা আসে না। পরবর্তীকালে যোগ্যতা অর্জন করিবার সুযোগও তাহারা পায় না। এই অবস্থায় বস্তি অথবা নগরের উপকণ্ঠে বাধ্য হইয়া তাহাদের আশ্রয় খুঁজিতে হয়। নগরে বসবাস করিলেও নগর-জীবনের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ এবং সামর্থ্য তাহাদের থাকে না; বিভিন্ন উপায়ে যাহা উপার্জন করে তাহাতে কোনপ্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারে মাত্র। এই অবস্থাকে কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ Subsistence urbanisation বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ নগরে আসিয়া অধিকাংশ আগন্তুক যাহা রোজগার করে তাহাতে কোনরকমে বাঁচিয়া থাকিবার মত সংস্থান হয়।

1. Donald G. Bogue and K. C. Zachariah, "Urbanisation and Migration in India," in Roy Turner, ed., India's Urban Future (Berkeley & Los Angeles, California: University of California Press, 1962) P 45. Quoted by Breese in his book entitled "Urbanisation in Developing Countries." Pages 81-82.

তাহাদের খাওয়া দাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ এবং বাসস্থানের অবস্থা দেখিলে এই বিষয়টি বুঝা যায়।

পাশ্চাত্য দেশে গ্রামাঞ্চল হইতে নবাগতরা যত সহজে এবং পরিপূর্ণভাবে নগরবাসী হইতে পারিয়াছে, আমাদের দেশে আগন্তুকদের পক্ষে তত স্বচ্ছন্দে নগরবাসী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ইহার ফলে নগর-সমাজ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। প্রথমতঃ, নগরের সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করিতে না পারায় নগরের প্রতি তাহাদের মমত্ব এবং আনুগত্য গড়িয়া উঠে না। আবার নগরে প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় গ্রামের সঙ্গে যোগসূত্রও বজায় রাখে। নগরে অস্থায়ীভাবে বাস করার মনোভাব গড়িয়া উঠার ফলে নগরের উন্নতিবিধানে তাহারা উদাসীন থাকে। অনেক ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্যের দিক হইতে ক্ষতিকর কাজকর্ম করিতেও তাহাদেব বাধে না। দ্বিতীয়তঃ, নগরের সামাজিক জীবনের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান হওয়ায় কিছু সংখ্যক আগন্তুকের মনে সমাজ-বিরোধী ভাব গড়িয়া উঠে। তাহারা নানারকম দুষ্ক্রিয়তায় লিপ্ত হয়। আবার কিছুসংখ্যক আগন্তুক নিজেদের অবহেলিত এবং প্রত্যাখ্যাত বলিয়া মনে করে এবং বৃহৎ জনসমুদ্রে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় অসহায় বোধ করে। এই ধরনের মানসিক পীড়া হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহাদের বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। সুস্থ নগর-জীবনের পক্ষে এই প্রকার মনোভাব বিশেষ ক্ষতিকর।

অধ্যাপক ব্রীজ (Breese) অনগ্রসর দেশগুলির ভবিষ্যৎ নগরায়নের সম্ভাব্য রূপ আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। "The prospects for the ordinary inhabitant of an urban area in a newly developing country is that things will be worse before they are better. A high degree of physical urbanisation—in terms of where people live—is quite likely to be characterised by a low degree of social urbanisation, in the sense of providing appropriate amenities for urban life." 1 অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার আরও অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। নগরাঞ্চলে লোকবসতি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ইহার অনুপাতে নগর-সুলভ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ নাই বলিলেই চলে। গ্রামাঞ্চল হইতে যাহারা নগরে আকৃষ্ট হইবে, তাহারা নগরে বাস করিলেও নগরের সামাজিক জীবনে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিবে। যাঁহারা নগর-পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুপরিকল্পনার সাহায্যে আমাদের এই ভয়াবহ সঙ্কট হইতে আংশিক পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। 2

---

1. Gerald Breese : Urbanisation in Newly Developing Countries. Page 100.

2. আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে নগরায়নের প্রকৃতি ও সমস্যা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক সঙ্ঘ

সামাজিক সঙ্ঘ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা

বিগত শতাব্দীতে শিল্পায়নের ফলে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পবিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টনিজ, ডুর্কহেইম প্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববিদগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রচলিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সামাজিক পরিবর্তনসমূহকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিবার চেষ্টা করেন এবং কয়েকটি সাধারণ তত্ত্বের অবতারণা করেন।[1] কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সমাজকে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির দিক হইতে বিচাব করিবার ধারা পরিত্যক্ত হয়। ইহার পরিবর্তে সমাজকে আরও গভীরভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিবাব জন্য সামাজিক সম্বন্ধকে আরও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান শতাব্দীতে বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন সামাজিক সঙ্ঘ সম্পর্কে নানাদিক হইতে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুবু হয়। সমাজের সংগঠন এবং প্রকৃতি বুঝিতে হইলে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সঙ্ঘের, বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্রায়তন সঙ্ঘের, আকৃতি প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র সামাজিক সঙ্ঘসমূহকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা নানা দিক হইতে নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ, সামাজিক সঙ্ঘ সমাজ ও ব্যক্তির উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সঙ্ঘে যাহা ঘটে, যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং যেভাবে সঙ্ঘের কাজকর্ম পরিচালিত হয় তাহা সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যে-কোন বিপ্লবী সঙ্ঘের পর্যালোচনা করিলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। প্রত্যেক সমাজেই গণ-অভ্যুত্থান এবং বিপ্লবের পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘের অবদান অনস্বীকার্য। হিটলার এবং মুসোলিনীর ক্ষমতা করায়ত্ত করার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা ক্ষুদ্র সঙ্ঘের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করার প্রথম সোপান অতিক্রম করেন। আবার সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিগণ সঙ্ঘের কাজকর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। শৈশবে এবং কৈশোরে মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার ক্ষেত্রে পরিবার, শিক্ষায়তন, খেলাধূলার সাথী এবং ক্লাব জাতীয় সমিতির অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে। যৌবনে এবং বার্ধক্যে সঙ্ঘের গুরুত্ব হ্রাস পাইলেও একেবারে নিঃশেষিত হয় না। সুতরাং সমাজের গতি এবং প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ক্ষুদ্রায়তন সঙ্ঘের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, সমাজে অনবরত নানা শক্তির আলোড়ন ঘটিয়া থাকে এবং এই আলোড়নের ঢেউ সর্বাগ্রে সামাজিক সঙ্ঘসমূহকে স্পর্শ করে। অতএব সামাজিক সঙ্ঘের পরি-প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শক্তির আলোড়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা

---

1 এই বিষয় সম্পর্কে তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হইযাছে।

অপেক্ষাকৃত সহজ। এইভাবে সঙ্ঘ সম্পর্কিত আলোচনার ভিত্তিতে বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তির কি প্রতিক্রিয়া হয় বা ব্যক্তি কি ভাবে আচরণ করে তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং এই সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের অবতারণা করা যায়। তৃতীয়তঃ, শারীরবৃত্তে যেমন দেহের অসংখ্য ক্ষণস্থায়ী জীবাণুর গতিবিধি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি সমাজতত্ত্বেও নানারকম দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী সঙ্ঘের গঠন ও কাজকর্ম পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। চতুর্থতঃ, সঙ্ঘ-সমূহকে কেবল গোটা সমাজের অংশ হিসাবে গণ্য না করিয়া সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ (microcosm) হিসাবেও গণা করা যায়। সমাজের ন্যায় সঙ্ঘগুলিতে ক্ষুদ্রাকারে শ্রমবিভাগ, মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীবিভাগ, আদর্শবাদ, পরিচালকবৃন্দ ইত্যাদি দেখা যায়। সুতরাং সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সমাজের গঠন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়।

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

সব সমাজেই মানুষ নানারকম সঙ্ঘ গঠন করে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক জীবন যাপন করে। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সঙ্ঘের মাধ্যমেই গড়িয়া উঠে। সমগ্র জীবন ধরিয়া সে নূতন নূতন সঙ্ঘে প্রবেশ করে এবং কিছুসংখ্যক পুরাতন সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে। জীবনের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন-না-কোন সামাজিক সঙ্ঘের সম্পর্ক রহিয়াছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা হইল। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ করিয়া একজন ছাত্র স্কুল (একটি সামাজিক সঙ্ঘ) পরিত্যাগ করিয়া কলেজে (নূতন সামাজিক সঙ্ঘ) প্রবেশ করে। আবার কলেজের পড়া শেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (আরেকটি সামাজিক সঙ্ঘ) অথবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার অর্থই হইল নানারকম সামাজিক সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হওয়া। সে যদি কোন ফ্যাক্টরীতে যোগ দেয়, তাহা হইলে তাহার বিভাগীয় (ডিপার্টমেণ্টের) লোকদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধাদিতে আবদ্ধ হয়। শ্রমিক সঙ্ঘে যোগ দিলে অন্য রকম সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। আমোদ প্রমোদ বা খেলাধূলার জন্য রিক্রিয়েশন ক্লাবে যোগ দিলে আবার অন্য রকমের সম্বন্ধাদি স্থাপিত হয়। এইভাবে জীবনের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিলে সামাজিক সঙ্ঘের গুরুত্ব এবং প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরে বর্ণিত উদাহরণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্বে সামাজিক সঙ্ঘ বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করা যায়। দুইটি শর্ত পূরণ হইলে যে-কোন জন-সমষ্টি সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, জনসমষ্টির অন্তর্গত লোকদের মধ্যে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার, কর্তব্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে যেন অবহিত থাকে। দ্বিতীয় শর্তটি হইল, সঙ্ঘের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে প্রত্যেকের সচেতন থাকা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে শ্রমিক সঙ্ঘকে সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ, শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্যদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং দায়দায়িত্ব

সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে এবং সঙ্ঘের লক্ষ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও সদস্যগণ সম্পূর্ণ সচেতন। সুতরাং শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্যদেব অনুরূপ আচরণ করিতে দেখা যায়। দুই বা ততোধিক লোককে লইয়া সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত হইতে পারে। যেমন, যখন একজন পুরুষ এবং একজন নারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিবার গঠন করে, তখন সামাজিক সঙ্ঘেব সৃষ্টি হয়। দুই বা ততোধিক বন্ধু সাহিত্যচর্চার জন্য যদি নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে সামাজিক সঙ্ঘ বলা যায়। ভৌগোলিক নৈকট্য ছাড়াও সামাজিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে। নিয়মিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াও কিছুসংখ্যক লোক সামাজিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসাধনে সচেতনভাবে পাবস্পরিক প্রতিক্রিয়া জানা এবং প্রকাশ করার ব্যবস্থা থাকিলেই সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত হইল বলা যায়। পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া জানিবার বা প্রকাশ কবিবার ব্যবস্থা না থাকিলে সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কোন প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইতে পারি। প্রবন্ধের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আমাদের অনেক কিছু বলাব থাকিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবিত না থাকায় আমাদের সমালোচনার উত্তরে তাঁহার প্রতিক্রিয়া জানিবার উপায নাই। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন সামাজিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অপর পক্ষে, কোন জীবিত লেখকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিলে সামাজিক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলা সম্ভব-পর। উপরের উদাহরণগুলি হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, সামাজিক সঙ্ঘ সুবিন্যস্তভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে (যেমন, পরিবার) অথবা অবিন্যস্তভাবে সংগঠিত হইতে পারে (যেমন, বৃদ্ধদের মজলিস বা সাহিত্যানুরাগী বন্ধুদের রবিবাসরীয় আসর)।

সম্ভাব্য সঙ্ঘের (Quasi or potential group) সঙ্গে তুলনা করিলে সামাজিক সঙ্ঘেব প্রকৃতি আরও পরিষ্কার হইবে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিরুচি, অনুরাগ এবং স্বার্থের মিল রহিয়াছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সচেতনভাবে তাঁহাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াকে সংগঠিত রূপ দেওয়া না হয় ততদিন তাঁহাদের যৌথভাবে সম্ভাব্য সঙ্ঘ বলা যাইতে পারে। সম্ভাব্য বলার অর্থ হইল, তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক সঙ্ঘ গঠন করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অথচ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় নাই। কিন্তু যখনই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের শিক্ষকগণ সমিতিবদ্ধ হইলেন, তখনই সামাজিক সঙ্ঘের সৃষ্টি হইল। সমাজে নানারকম সম্ভাব্য সঙ্ঘ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পাড়ার বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী অথবা যুবক-যুবতীগণকে পৃথক পৃথক সম্ভাব্য সঙ্ঘ বলা যায়। তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন সংগঠনের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিলেই সামাজিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যেমন, বালক সঙ্ঘ কিশোর সঙ্ঘ, বা যুবক সঙ্ঘ। অনুরূপভাবে, কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর লোকেরা সম্ভাব্য সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ সম্ভাব্য সঙ্ঘের গুরুত্ব আলোচনা করিতে গিয়া

বলেন যে, অনেক সামাজিক সঙ্ঘের মধ্যেই একাধিক সম্ভাব্য সঙ্ঘ থাকিতে পারে এবং সামাজিক সঙ্ঘের স্থিরত্ব এবং নমনীয়তা অনেকাংশে সম্ভাব্য সঙ্ঘের কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে জনসনের বক্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হইল ঃ "Potential groups are a great source of flexibility and stability. They exert influence at all times because actual groups fear them. It is especially important that they can be activated in support of the rules of fair play...........We shall not appreciate the full importance of potential group unless we realise that their influence is felt within every actual group. Then we must realise that they cut across many actual groups, thus being great latent sources of power.........In short, 'potential groups' are a form of social control latent in every group and in the society as a whole. They remind us of the great importance of the press and other channels by which publicity is given to people's actions."1 অর্থাৎ যদি কোন সামাজিক সঙ্ঘের কর্মকর্তারা সঙ্ঘের নীতি বা আদর্শ উপেক্ষা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বা কাজ করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সেই সামাজিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত সম্ভাব্য সঙ্ঘ সম্মিলিত হইয়া কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে বা কাজ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করিতে পারে। সামাজিক সঙ্ঘকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সম্ভাব্য সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। যে কোন রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালী এবং কাজকর্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সম্ভাব্য সঙ্ঘ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সব ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সঙ্ঘ উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য না-ও হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

সামাজিক সঙ্ঘের শ্রেণী বিভাগ

সামাজিক সঙ্ঘের গঠন এবং লক্ষ্যসম্পর্কিত বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) সামাজিক সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্রবেশ করিবার জন্য তিনটি পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে। একটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে-সব সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত হয়, সেই সঙ্ঘগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কোন ক্রীড়া সঙ্ঘে যোগদান করা ইচ্ছামূলক। উদ্দেশ্য পূরণ হইয়া গেলে অথবা প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা না পাইলে সেই সঙ্ঘ পরিত্যাগ করাও ইচ্ছামূলক। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি শর্তাধীন। বিশেষ শর্ত পূরণ না করিলে সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতে

1. Harry M. Johnson : Sociology. Pages 387-388

যদি কোন সঙ্ঘ গঠিত হয় এবং বিশেষ একটি জাতির মধ্যে সদস্যভুক্তি সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে অন্য জাতির লোকের পক্ষে উক্ত সঙ্ঘে প্রবেশ করা অসম্ভব। তৃতীয় পদ্ধতিটি নির্বাচন-সাপেক্ষ। অনেক সামাজিক সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে হইলে আবেদন করিতে হয। আবেদনকারীর অন্তর্ভুক্তি সঙ্ঘের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হইবে মনে করিলে তাহাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়।

(২) সঙ্ঘের সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতেও শ্রেণী বিভাগ করা হয়। এই শ্রেণীতে তিন রকম সঙ্ঘের কথা ভাবা যায়। প্রথমটি হইল যুগল সংঘ (Dyad)। যুগল সঙ্ঘ নানারকমের হইতে পারে। যেমন, বিবাহিত দম্পতি, মা ও সন্তান, বন্ধুদ্বয়, ব্যবসায়ে জড়িত অংশীদারদ্বয় প্রভৃতি। যুগল সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা পারস্পরিক স্নেহ, ভালবাসা, অভিরুচি বা স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। সুতরাং একজন বন্ধন ছিন্ন করিলে যুগল সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যায়। কোন কোন যুগল সঙ্ঘ সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। যেমন, দম্পতির ক্ষেত্রে বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত পারস্পরিক সম্পর্ক নানাভাবে সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টি হইল ত্রয়ী বা ব্যক্তিত্রয়ের মিলিত সঙ্ঘ (Triad)। এই প্রকার সঙ্ঘের তাৎপর্য আলোচনা করিতে গিয়া সিমেল (Simmel) বলেন : "in groups of three, the third person may act as a mediator, as a holder of the balance of power, or as a divider who creates conflicts that destroy any sense of unity between any two of the persons". অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা অনেক রকম হইতে পারে। দুইজনের মধ্যে কোন বিরোধ বাধিলে মধ্যস্থতা করা, ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্ব হইলে ভারসাম্য বজায় রাখা, অথবা দুইজনের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্রয়ের মিলিত সঙ্ঘ বিশেষ কার্যকর হয়। যেখানে কোন সমস্যার সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুইজন ব্যক্তি পরস্পরবিরোধী দুইটি মত প্রকাশ করিলে তৃতীয় ব্যক্তি বিবদমান বিষয়ের তীব্রতা হ্রাস করিয়া ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। তৃতীয়টি হইল তিনের অধিক ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত সঙ্ঘ। সদস্য-সংখ্যার পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ সংঘকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন সঙ্ঘ। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘ আলোচনা করিবার সময় ক্ষুদ্রায়তন এবং বৃহদায়তন সঙ্ঘ বিবেচিত হইবে।

(৩) কোন বিশেষ সামাজিক সঙ্ঘের সদস্যভুক্ত হওয়া বা না-হওয়ার ভিত্তিতে সামাজিক সঙ্ঘকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটিকে অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ (In-group) এবং অপরটিকে বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘ (Out-group) বলা হয়। আমরা যে-সঙ্ঘের সদস্যভুক্ত এবং যে-সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে আমরা পারস্পরিক প্রীতি, সহানুভূতি ও আনুগত্যের বন্ধনে গভীরভাবে আবদ্ধ, সেই সঙ্ঘ আমাদের অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ হইতে গেলে সদস্যভুক্তিই একমাত্র শর্ত নহে, সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি

ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকাও প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ পরিবার হইল তাহার অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ। শিক্ষায়তনের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হইলে শিক্ষায়তনও তাহাদের অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

পক্ষান্তরে, যে-সঙ্ঘের আমরা সদস্যভুক্ত নহি এবং যে-সঙ্ঘ সম্পর্কে আমরা উদাসীন অথবা বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করি, সেই সঙ্ঘকে আমাদের বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলা যায়। এই ক্ষেত্রেও সদস্য না-হওয়া একমাত্র শর্ত নহে। সঙ্ঘ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোন সঙ্ঘ সম্পর্কে উদাসীনতা বা বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পাইবে, তখন সেই সঙ্ঘ বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হইবে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘের উদাহরণ প্রায়ই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রীড়া সঙ্ঘের প্রতি উদাসীন এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকি।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা যে-সঙ্ঘের সদস্যভুক্ত সেই সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্বন্ধ না-ও থাকিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়াও বিচিত্র নহে। এই ক্ষেত্রে আলোচ্য সঙ্ঘ আমাদের অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হয় না। ইহাকে বলা হয় **membership reference group** অথবা নামে মাত্র সসস্য নির্দেশক সঙ্ঘ। আবার যে-সঙ্ঘের আমরা সদস্যভুক্ত নহি, সেই সঙ্ঘের সদস্যদের সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ না-ও করিতে পারি। এই প্রকার সঙ্ঘ আমাদের বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হয় না। ইহাকে বলা হয় **non-membership reference group** অথবা অ-সদস্য নির্দেশক সঙ্ঘ।[1]

(৪) সঙ্ঘের সদস্যদের পদমর্যাদায় উচ্চতর এবং নিম্নতর শ্রেণীতে ভাগ করা বা না-করার ভিত্তিতেও সামাজিক সঙ্ঘকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে-সঙ্ঘে ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের (**hierarchical**) নীতিতে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে, সেই সঙ্ঘকে **patterned group** বা বিধিবৎ সুবিন্যস্ত সঙ্ঘ বলা হয়। যখন কোন ফুটবল বা ক্রিকেট টিম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে, তখন টিমের ম্যানেজার, পেশাদার শিক্ষক, ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের ভূমিকা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা থাকে। ইহাকে বিধিবৎ সুবিন্যস্ত সঙ্ঘ বলা হয়। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই জাতীয় সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসিতে হয়। যখনই সঙ্ঘকে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হয়, তখন এইভাবে সংগঠন না করিলে সঙ্ঘের পক্ষে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব।

যে-সঙ্ঘে সদস্যদের মধ্যে সমতা স্বীকৃত হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক যথানিয়মের ধারাবর্জিত (**informal**), সেই সঙ্ঘকে **non-patterned group** বা বিধিবর্জিত অবিন্যস্ত সঙ্ঘ বলা হয়। যেখানে নূতন কিছু সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করা সঙ্ঘের লক্ষ্য, সেখানে এই জাতীয় সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। সদস্যগণ যদি নির্ভয়ে এবং

নিঃসংকোচে মতামত ব্যক্ত করিতে না পারেন, তাহা হইলে সঙ্ঘের পক্ষে সৃজনমূলক কাজ করা সম্ভব হয় না। কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে হুকুম জারী করিলে সৃজনী প্রতিভার উন্মেষ ঘটে না। ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজে নিযুক্ত কর্মীদের যথাসম্ভব বিধিবর্জিত ধারা অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়।

(৫) সঙ্ঘের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি অনুযায়ী সামাজিক সঙ্ঘকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় primary group বা প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ এবং অপরটিকে বলা হয় secondary group বা পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সংঘ। এই দুই প্রকার সামাজিক সঙ্ঘ সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ কুলি (C. H. Cooley) তাঁহার Social Organisation (1909) নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁহার আলোচনার সূত্র ধরিয়া পরবর্তী কালে অন্যান্য সমাজতত্ত্ববিদ নানা দিক হইতে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। কুলি এবং তাঁহার পরবর্তী সমাজতত্ত্ববিদদের আলোচনার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানগুলির উল্লেখ করা যায়। (১) প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে এই সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিবর্গ পরস্পর পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন এবং এই পরিচয়ের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। (২) প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পক্ষে অনুকূল শর্ত হইল সঙ্ঘের গণ্ডী সীমিত রাখা। সেইজন্য স্বল্পসংখ্যক সদস্য থাকা এই জাতীয় সঙ্ঘের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (৩) ব্যক্তিগত সান্নিধ্য এবং সাহচর্য লাভ করা এই সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। ব্যক্তিই মুখ্য। ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত সাহচর্য যদি গৌণ বলিয়া গণ্য হয় এবং অন্য কোন উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায়, তাহা হইলে এই প্রকার সঙ্ঘকে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ বলা অনুচিত। কোন বিক্রয়কাবী বাজার বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির সান্নিধ্য এবং সাহচর্য কামনা করিতে পারে এবং ব্যক্তিগত পরিচয় স্থাপন করিতেও পারে। কিন্তু এই ধরনের সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সংঘ বলা সঙ্গত হইবে না। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত পরিচয় উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নহে। (৪) এই প্রকার সঙ্ঘ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে; আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চুক্তি বা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে নহে। যেখানে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত সাহচর্য মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে ব্যক্তিগত আকর্ষণই সঙ্ঘের উদ্ভবের প্রধান কারণ। কোন কারণে ব্যক্তিগত আকর্ষণ দুর্বল হইলে সঙ্ঘের পরিসমাপ্তি ঘটে। (৫) এই প্রকার সঙ্ঘের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সম্বন্ধ নানারকম আবেগ এবং স্মৃতি-বিজড়িত হওয়ার ফলে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হওয়া স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকার সম্বন্ধ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিলেও

কালক্রমে উদ্দেশ্যাসিদ্ধি গৌণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাও এই জাতীয় সঙ্ঘকে অধিকতর স্থায়িত্ব প্রদান করে। (৬) সাধারণতঃ এই প্রকার সঙ্ঘে কোন রকমের আনুষ্ঠানিক সংগঠন থাকে না। কারণ, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য এই প্রকার সঙ্ঘ স্থাপিত হয় না।

উপরে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের যে-সব বৈশিষ্ট্য বিবৃত করা হইল, তাহাদের সব কয়টির অস্তিত্ব বাস্তবক্ষেত্রে না-ও পাওয়া যাইতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাস্তবের সংস্পর্শমুক্ত আদর্শস্বরূপ বলিয়া গণ্য করা যায়। সমাজ-জীবনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি অংশতঃ পরিবর্তিত হইতে পারে এবং হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বৈশিষ্ট্যগুলি যে-ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্বভাবতই ধারণা জন্মে যে, প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সম্বন্ধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠিবার পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক থাকে না। কিন্তু বাস্তবে ইহা সত্য না-ও হইতে পারে। প্রত্যেক সমাজেই জীবন-ধারাগত আদর্শ এবং মূল্যবোধ দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে কি অবস্থায় কি শর্তে এবং কতটুকু অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে ইহা সম্পূর্ণরূপে জীবন-ধারাগত আদর্শ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই ক্ষেত্রে সমাজের বিধি অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী আচরণ করা সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে, সমাজ-নির্দিষ্ট বিধির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আমাদের সব রকম পারস্পরিক সম্বন্ধাদি স্থাপন করিতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া অনেকে এই প্রকার সঙ্ঘকে organised primary group বা সুবিন্যস্ত প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া অভিহিত করেন।

এই প্রকার সামাজিক সঙ্ঘের উদাহরণ দিতে গিয়া কুলি বলিয়াছিলেন ঃ "The most important spheres of this intimate association and co-operation are the family, the play-group of children, and the neighborhood or community group of elders." অর্থাৎ পরিবারে, শিশুদের ক্রীড়া সঙ্ঘে, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে অথবা বয়স্কদের মজলিসে প্রত্যক্ষ পরিচয় গড়িয়া উঠিবার প্রশস্ত সুযোগ থাকে। কিন্তু কেবল মাত্র এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ভাবা সঙ্গত হইবে না। কলেজ হোস্টেলে, কারখানায়, আপিসে, সৈন্য-বাহিনীতে, এমন কি জেলখানায় কয়েদীদের মধ্যে, এই প্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। এইসব বৃহৎ জনবহুল সংস্থাগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনকানুন প্রবর্তন করিয়া পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করা হইলেও প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে অনেক রকম সঙ্ঘ অবিন্যস্তভাবে গড়িয়া উঠে। এই সঙ্ঘগুলিতে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। হোস্টেলে শতাধিক আবাসিকের মধ্যে পাঁচ সাতজন করিয়া পৃথক পৃথক অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। ভোজন-কক্ষে, খেলার মাঠে, সিনেমায় এবং আলোচনা-

চক্রে তাহাদের এক সঙ্গে চলাফেরা করিতে দেখা যায়। অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনাও নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোস্টেল পরিত্যাগ করার অনেক পরেও তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয় না। যাঁহারা সৈন্যবাহিনী, জেলখানা, আপিস বা কারখানা সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ সঙ্ঘের অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছেন।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই প্রকারের সঙ্ঘ মূলতঃ মানুষের স্বভাবজাত। প্রীতি এবং ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, অন্তরঙ্গ পরিবেশে মনকে মুক্তি দেওয়া, অন্তরের গোপন দুঃখ ও আনন্দে অন্যকে শরিক করা মানুষের সহজাত বৃত্তি। সেইজন্য প্রায় প্রত্যেকের জীবনে শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে এবং বার্ধক্যে এই প্রকার অন্তরঙ্গ সঙ্ঘের অস্তিত্ব দেখা যায়।

সমাজ-জীবনে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রথমতঃ, জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই শিশুরা পরিবার এবং খেলার সঙ্গী সাথীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সমাজ-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। সমাজের আদর্শ, মূল্যবোধ, সমাজে কি করণীয়, কি গ্রহণযোগ্য এবং কি বর্জনীয় প্রভৃতি সব কিছু সামাজিক আচার-ব্যবস্থা আমাদের অন্তরঙ্গ সঙ্ঘ হইতে আমরা শিখিয়া থাকি। এই প্রকার সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রীতি ও ভালবাসার সম্বন্ধ থাকায় আমরা খুব স্বচ্ছন্দে (অনেক সময় সম্পূর্ণ অজানিতভাবে) সামাজিক আচার-ব্যবস্থাসমূহ আয়ত্ত করিতে পারি। খুব সহজে এবং স্বচ্ছন্দে শিখি বলিয়াই এই প্রকার শিক্ষা আমাদের মজ্জাগত হইয়া যায়। এক কথায় বলা যায়, প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘ দ্বারা আমাদের সামাজিক সত্তা গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাপ্ত বয়স্কদের জীবনেও এই প্রকার সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এই দিকটি ঘটনাচক্রে আবিষ্কৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাসপাতালগুলিতে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীর তুলনায় মানসিক রোগের চিকিৎসকের সংখ্যা অল্প ছিল। এই অবস্থায় রোগীদের পৃথকভাবে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক ডাক্তারকে সমষ্টিগতভাবে কিছুসংখ্যক রোগীর তত্ত্বাবধান করিতে হইত। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর কয়েক মাসের মধ্যেই রোগীদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পাওয়ায় তাহাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে মানসিক হাসপাতাল ছাড়াও সাধারণ হাসপাতালে **primary group therapy** বা রোগীদের সমষ্টিগতভাবে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রে রোগীদের আরোগ্য ত্বরান্বিত হইয়াছে। হাসপাতালে ইহার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে জেলখানায় কয়েদীদের পুনর্বাসনের জন্যও এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ-তরুণীদের দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধ এবং সংশোধন করার জন্য এই

পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে। সমাজসেবার ক্ষেত্রে Social Group Work নামক নূতন একটি ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের গুরুত্ব অপরিসীম। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রকার সঙ্ঘের সাহায্যে কর্মীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, দক্ষতা, মনোবল এবং উৎসাহ অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়। সমাজতত্ত্ববিদগণ বহু গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জনবহুল কোন সংস্থায় শান্তি, শৃঙ্খলা বা উৎসাহ বজায় রাখিতে গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের মাধ্যমে অগ্রসর হইলে এইরূপ প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত সহজে এবং কার্যকরভাবে সফল হইবে। এইসব গবেষণা Industrial Sociology নামক সমাজতত্ত্বের একটি নূতন শাখা গড়িয়া তুলিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, একদিকে যেমন আমরা প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অন্যদিকে তেমনই এই প্রকার সংঘ গড়িয়া উঠিবার উপযুক্ত পরিবেশ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভাব আদান-প্রদানের সুযোগ-সুবিধা এবং যানবাহনের উন্নতি হওয়ায় আমাদের ভৌগোলিক সচলতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় পাড়া-প্রতিবেশী বা নিকট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পূর্বের মত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহা ছাড়া, বর্তমান যুগের জীবনযাত্রা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া পড়ায় আমাদের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য বৃহদায়তন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই বলিলেই চলে।

পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সংক্ষেপে এই প্রকার সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করা হইল। (১) সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিগণ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন না। এক-মাত্র পরোক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে এই প্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। (২) প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের তুলনায় এই জাতীয় সঙ্ঘে সদস্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। (৩) এই প্রকার সঙ্ঘ বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্যই মুখ্য, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গৌণ। সঙ্ঘের সদস্যগণ যখন মিলিত হন, আনুষ্ঠানিকভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে; ব্যক্তিগত পরিচয় বা সাহচর্য গৌণ স্থান অধিকার করে। (৪) আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলীর ভিত্তিতে এই প্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। যখন কোন বিশেষ স্বার্থে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয়, তখন বিধিবৎ সুবিন্যস্ত সংস্থা স্থাপন করা হয়। (৫) পরোক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে এই প্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে বলিয়া ইহার স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম হওয়া স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত পরিচয়ে যে-প্রকার মানসিক বন্ধনের সৃষ্টি হয়, পরোক্ষ পরিচয়ে তাহার সম্ভাবনা থাকে না। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন চরিতার্থ করা এই জাতীয় সঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পর পরিচয়ের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করা যায়। বৃহদায়তন কলেজগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা এত বেশি যে ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে একজন অপর জনকে বিশেষ শ্রেণীর নম্বরধারী ছাত্র হিসাবেই জানে। নামধাম জানিবার অবকাশ হয় না। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কেও একই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কেবল শিক্ষকের নামের আদ্য অক্ষর জানে এবং তাহাদের নিকট শিক্ষকের পরিচয় এই আদ্য অক্ষরেই সীমাবদ্ধ থাকে। শিক্ষকগণও ছাত্রদের নামধাম জানেন না। জানা সম্ভবও নহে। শ্রেণীর ক্রমিক সংখ্যার সাহায্যে ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তি হিসাবে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই পরস্পরের নিকট অপরিচিত। কয়েক বৎসর এক শিক্ষায়তনে অতিবাহিত করার পরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়িয়া উঠে না। পঠন-পাঠন একমাত্র লক্ষ্য। ব্যক্তিগত সান্নিধ্য বা সাহচর্য গৌণ স্থান অধিকার করে। ইহার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠ শেষ হইয়া গেলে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষায়তনের বা শিক্ষকের কোন সংস্রব থাকে না। আমরা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কাজকর্ম করার জন্য পরোক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে যোগাযোগ স্থাপন করি। কর্মক্ষেত্রেও শিক্ষায়তনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কাজকর্মের স্বার্থে যাহাদের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু পরিচয় স্থাপিত হয় এবং তাহাও অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে। কাজকর্মের পরিসমাপ্তির সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষীণ যোগসূত্রও বিচ্ছিন্ন হয়। যখন কোন নাটক দেখিতে যাই, সেখানে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে আমাদের পরোক্ষ পরিচয় ঘটে। তাহার অভিনয়ের চাতুর্য বা বৈশিষ্ট্য, তাহার বাচন ভঙ্গি এবং দর্শকদের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। অভিনেতাও দর্শকদের দর্শক হিসাবেই জানেন, ব্যক্তি হিসাবে নহে। আমাদের বিভিন্ন পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সম্পর্কই পরোক্ষ পরিচয়ভিত্তিক। জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় ইহা অনিবার্য।

সামাজিক সঙ্ঘের সংহতি

সমাজস্থ লোক ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেমন, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, অথবা রাজনীতিক কারণে তাহারা বিশেষ কোন সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকিতে পারে। যেমন, প্রীতি এবং ভালবাসার বন্ধন, নিরাপত্তার প্রয়োজন, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে আমরা পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থাকি।

এই বিষয়টি অন্যভাবে প্রকাশ করা যায়। আমাদের প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করে বলিয়াই সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়। যতদিন আমাদের প্রয়োজন পূরণ করিতে

পারিবে ততদিন সংঘ টিকিয়া থাকিবে। সুতরাং আমাদের অভাব পূরণ করার উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু অস্তিত্ব বজায় রাখা এক কথা এবং সঙ্ঘের সদস্যদের ঐক্য সূত্রে বিধৃত করিয়া রাখা আরেক কথা। সদস্যদের ঐক্য-সূত্র দৃঢ় না হইলে সঙ্ঘের কার্যকারিতা অনেক কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন চরিতার্থ হয় বলিয়া পরিবার টিকিয়া থাকে। কিন্তু পরিবারভুক্ত লোকদের মধ্যে যদি সদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে পরিবারের বুনিয়াদ দুর্বল হয় এবং পরিবারের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। সেইজন্য সঙ্ঘের সংহতি অথবা সংঘভুক্ত লোকদের মধ্যে ঐক্যসূত্র কিভাবে সুদৃঢ় করা যায় ইহা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

অনুকূল পরিবেশে সংহতি গড়িয়া উঠে এবং কয়েকটি উপাদানের (components) সাহায্যে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এখানে আমরা তিনটি উপাদানের উল্লেখ করিতে পারি।

প্রথম উপাদান হিসাবে ডুর্কহেইম-এর আলোচনার অনুসরণে যান্ত্রিক সংহতি এবং সাংগঠনিক সংহতির উল্লেখ করিতে হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাজের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করিবার সময় এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, চিন্তাধারা, কাজকর্ম, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকার জন্য যান্ত্রিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরস্পরনির্ভরশীল শ্রমবিভাগের ফলে সাংগঠনিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংহতির উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে উভয় প্রকার ব্যবস্থারই গুরুত্ব রহিয়াছে। যে-সমাজে সংহতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেই সমাজে সঙ্ঘের সংহতিও অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় উপাদান হিসাবে মৌল বিষয়ে (যেমন, মূল্যবোধ) ঐকমত্যের উল্লেখ করা যায়। সমাজে মৌল বিষয়ে যত বেশি মতৈক্য পরিলক্ষিত হইবে, সেই অনুপাতে সংহতির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। ইহার ফলে সামাজিক সংঘ গুলিতেও বন্ধন সুদৃঢ় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তৃতীয় উপাদান হিসাবে মনোবল বা আত্মবিশ্বাসের (morale) উল্লেখ করিতে হয়। ইহা এক প্রকার মানসিক অবস্থা। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সন্তোষ, অসন্তোষ, এবং নানা রকম ভাবপ্রবণতা এই প্রকার মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। সমাজস্থ লোকের মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস সংহতি দৃঢ়তর করিতে সক্ষম।

উপরোক্ত তিনটি উপাদান সংহতির অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। কিন্তু কোন বিশেষ সঙ্ঘের সংহতির কয়েকটি উপকরণ থাকা বা না-থাকার উপর সঙ্ঘের সংহতির তারতম্য হয়।

উপকরণগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে সঙ্ঘের আয়তনের উল্লেখ করিতে হয়। সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে, সঙ্ঘের আয়তন যত সীমিত হইবে সংহতি তত দৃঢ় হইবে, এবং আয়তন যত বিস্তৃত হইবে সংহতি তত দুর্বল হইবে। সঙ্ঘের আয়তন

অনুযায়ী সংহতির তারতম্য হওয়ার অনেক কারণ আছে। অল্পসংখ্যক সদস্য-বিশিষ্ট সঙ্ঘকে কোন কাজের জন্য যত সহজে সক্রিয় করা যায়, অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক সদস্য থাকিলে তত সহজে পারা যায় না। তাহা ছাড়া, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পরিধিও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পায়। দুইজন ব্যক্তি রাম এবং শ্যামের মধ্যে মাত্র একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক (রাম + শ্যাম) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু যখনই তৃতীয় ব্যক্তি যদু প্রবেশ করিল তখনই ব্যক্তিগত সম্পর্কেব সংখ্যা তিনে দাঁড়াইল (রাম + শ্যাম, রাম + যদু, শ্যাম + যদু)। চতুর্থ ব্যক্তি প্রবেশ করিলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংখ্যা ছয় দাঁড়াইবে। এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, সদস্যদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা তত হ্রাস পায়।

দ্বিতীয় উপকরণ হইল সঙ্ঘের সদস্যদের ভৌগোলিক সচলতা। যখন কোন ব্যক্তি বা পরিবার বাসস্থান পরিবর্তন করে, তখন পুরাতন বাসস্থানেব সন্নিকটবর্তী সঙ্ঘসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক বিছিন্ন হইয়া যায়। আবার নূতন বাসস্থানের সন্নিকট-বর্তী সঙ্ঘসমূহের সঙ্গে নূতনভাবে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হয এবং স্বভাবতই ইহা সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য ভৌগোলিক সচলতা যত বৃদ্ধি পায, সঙ্ঘের সংহতি তদনুযায়ী ব্যাহত হয়।

সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দিক হইতে মিল বা সঙ্গতি থাকা বা না-থাকার উপর সঙ্ঘের সংহতি নির্ভব করে। ধর্ম, ভাষা, আচাব-আচরণ এবং আহার-বিহাবে যত বেশি মিল থাকে, সঙ্ঘের সংহতি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার বিভিন্ন দিক হইতে যত পার্থক্য থাকে, সংহতি দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ইহাকে সংহতির তৃতীয উপকরণ বলা যায়।

উপরে আমরা সামাজিক সঙ্ঘের জন্য অনুকূল উপাদান এবং উপকরণের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছি। ইহার তাৎপর্য একটি উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মৃত্তিকা হইল ঘটের উপাদান। আনুষ্ঠানিক পূজায় বিগ্রহ-স্বরূপ যে ঘট ব্যবহৃত হয়, তাহার উপাদান হিসাবে মৃত্তিকা অপরিহার্য। কিন্তু আনুষ্ঠানিক পূজায় অন্যান্য উপকরণ না থাকিলে পূজা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। অথচ বিগ্রহস্বরূপ ঘট না থাকিলে উপকরণের কোন প্রয়োজন থাকে না। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশে যদি সংহতির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র উপকরণসমূহ সংহতি আনিতে বা রক্ষা করিতে পারে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমষ্টিগত আচরণ

সমষ্টিগত আচরণের প্রকৃতি

সমাজবদ্ধ হইয়া থাকা এবং অন্যের সাহচর্য কামনা করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। এই স্বভাবের জন্যই সে নানাভাবে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপন করে। সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, মানুষের সামাজিক আচরণ-বিধি প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবহার হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিধি-বহির্ভূত আচরণ সামাজিক স্বীকৃতি পায় না ; বরং সমাজ কঠোরভাবে প্রচলিত আচরণ-বিধি কার্যকর করে।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমষ্টিগতভাবে মানুষ এমনভাবে আচরণ করে যাহা বিধিসম্মত নহে। এই প্রকার আচরণ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া সামাজিক কাঠামো বিপর্যস্ত বা দুর্বল হয় না। সমাজে নানাপ্রকার সমষ্টিগত আচরণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, জনতা (crowd), উচ্ছৃঙ্খল জনতা (mob), শ্রোতৃমণ্ডলী (audience), জনমণ্ডল (public) ইত্যাদি। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বিভিন্ন প্রকার সমষ্টিগত আচরণ আলোচনা করিবার পূর্বে সাধারণ ভাবে সমষ্টিগত আচরণের প্রকৃতি এবং উদ্ভবের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিব।

সমষ্টিগত আচরণ সাধারণতঃ কোন ক্ষণস্থায়ী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। রাস্তায় যদি কোন মোটর দুর্ঘটনা হয়, তাহা হইলে কিছুসংখ্যক লোক তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আকৃষ্ট হয়। তাহাদের আচরণ বিভিন্ন রকম হইতে পারে। কেহ হয়ত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিগণকে শাস্তি প্রদান করিতে উদ্যত হয়, কেহ হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, আবার কেহ হয়ত নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গ্রামে বা সহরে কোন যাত্রাদল আসিলে দর্শকগণ যাত্রাস্থলে যথাসময়ে উপস্থিত হয় এবং অনেক সময় সারা রাত্রি অতিবাহিত করে। এই দুইটি উদাহরণে দেখা যায় যে, মানুষ সচরাচর যে-ভাবে সমাজে আচরণ করে, উভয় ক্ষেত্রেই ভিন্ন রকম আচরণ করিল। সারা রাত্রি কেহ বাড়ীর বাহিরে জাগ্রত অবস্থায় কাটায় না। কিন্তু যাত্রার আকর্ষণে চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম হইল। ঠিক তেমনি কেহ রাস্তায় উত্তেজিত হইয়া কাহাকেও প্রহার করিতে যায় না। কিন্তু দুর্ঘটনাস্থলে কিছুসংখ্যক লোককে প্রহার করিতে উদ্যত হইতে দেখা যায়। উভয় প্রকার আচরণই সমাজের বিধিসম্মত আচরণের ব্যতিক্রম এবং বিশেষ কোন ঘটনা এই ব্যতিক্রমের কারণ।

সমষ্টিগত আচরণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া লোকেরা এলোমেলোভাবে আসিয়া সমবেত হয়। কেহ তাহাদের নির্বাচন করে না। তাহারাও পরামর্শ করিয়া সমবেত হয় না। ঘটনা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহারা মিলিত হয়। অতএব তাহাদের নাম-ধাম বা পরিচয় অজ্ঞাত থাকার জন্য তাহারা বেপরোয়াভাবে দায়িত্বহীন কাজ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

সমষ্টিগত আচণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যায় যে, ইহার পশ্চাতে কোন পূর্ব-পরিকল্পিত সংগঠন থাকে না। যে ঘটনা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লোকেরা মিলিত হয়, সেই ঘটনা কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনা অকস্মাৎ ঘটে এবং কোন কিছু ভাবিয়া লোকেরা মিলিত হয় না। ঠিক তেমনি সিনেমার দর্শকগণ একত্র মিলিত হইয়া পরিকল্পনা করিয়া সিনেমা দেখিতে আসে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় পর্যন্ত থাকে না।

সমষ্টিগত আচরণের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা ক্ষণস্থায়ী। কারণ, যে ঘটনাটি লোকদের আকর্ষণ করিয়া আনে, সেই ঘটনাটিই ক্ষণস্থায়ী। যাত্রা বা সিনেমা শেষ হইয়া গেলে দর্শকবৃন্দও বিছিন্ন হইয়া পড়ে। দুর্ঘটনায় আকৃষ্ট হইয়া যাহারা সমবেত হয়, তাহারাও কিছুক্ষণ পর সেই স্থান পরিত্যাগ করে। তাহাদের প্রয়োজনের বেশি সময় সেখানে থাকার কোন সার্থকতা থাকে না।

সমষ্টিগত আচরণের বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা ইহার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য। ভিন্ন সময়ে বা ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত একই প্রকার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টিগত আচরণ ভিন্ন হইতে পারে অথবা এক প্রকার হইতে পারে। ফুটবল খেলায় গোল হইবার মুহূর্তে দর্শকগণ সাধারণতঃ উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে এবং অবিরাম চীৎকার করিতে থাকে। ইহা মোটামুটি প্রত্যাশিত আচরণ। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম হওয়াও বিচিত্র নহে। সমষ্টিগত আচরণের প্রকাশ কি ধরনের হইবে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন, মোটর দুর্ঘটনায় সমবেত জনমণ্ডলী শান্ত থাকিয়া আহতদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে পারে। আবার অন্য এক দুর্ঘটনায় জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া অসংযত আচরণ করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জীবন-ধারা সমষ্টিগত আচরণের প্রকৃতি প্রভাবিত করে। ইংল্যাণ্ডে উত্তেজিত জনতা সাধারণতঃ প্রহারাদি কার্যে বেশি লিপ্ত হয় এবং বিষয়সম্পত্তি বিশেষ নষ্ট করে না। কিন্তু ফ্রান্সে জনতা উত্তেজিত হইয়া বিষয়সম্পত্তি বেশি নষ্ট করে এবং খুন জখম প্রভৃতি দুষ্কার্যে অপেক্ষাকৃত কম লিপ্ত হয়। দুই দেশের জীবন-ধারাগত বৈসাদৃশ্যের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ খুঁজিতে হইবে। সরকারী বিষয়সম্পত্তি নষ্ট না করার ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইংল্যাণ্ডে গড়িয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, ফ্রান্সে ক্যাথলিক ধর্মের অনুশাসন এবং ফরাসী বিপ্লবের

পর হইতে দেহে আঘাত করার বিরুদ্ধে আইনে কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্তন জনতাকে প্রহারাদি কার্য হইতে বিরত রাখে।

কোন্ কোন্ অবস্থায় সমষ্টিগত আচরণের উদ্ভব হয়?

সমষ্টিগত আচরণ সমাজের বিধি-সম্মত আচরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং কোন্ কোন্ অবস্থায় লোকেরা সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় অথবা বাধ্য হয় তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

চিরাভ্যস্ত জীবন-যাত্রা কোন কারণে হঠাৎ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলে লোকেরা দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য হইয়া আতঙ্কে বা ক্রোধে এমন আচরণ করে যাহা সমাজের বিধি-বহির্ভূত। হঠাৎ যদি কোন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তাহা হইলে আক্রান্ত অঞ্চলের লোকেরা স্বাভাবিকভাবে আচরণ করিতে পারে না। ক্রোধ, আতঙ্ক এবং প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে অস্বাভাবিক আচরণের পথে ঠেলিয়া দেয়। হঠাৎ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের (যেমন, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি) মুখেও লোকদের অস্বাভাবিক আচরণ করিতে দেখা যায়।

অনেক সময় দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাইবার জন্য সুপরিকল্পিত-ভাবে সমাজে নানারকম অনুষ্ঠান ও উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব উৎসবে সামাজিক বিধি শিথিল করা হয় এবং জনসাধারণকে বিধি-বহির্ভূত আচরণ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। দোলের সময় সাময়িকভাবে সামাজিক রীতিনীতি উপেক্ষা করিয়া হৈ হুল্লোড় করা সমাজে স্বীকৃত। বিবাহাদি উৎসবে বাসর-জাগা প্রভৃতি নানা লোকাচারের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে চরিতার্থ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থায় এই জাতীয় safety valve বা নিরাপদভাবে উত্তেজনা নিরসনের উপায় থাকে। ইহার ফলে সমাজের স্থিরত্ব (stability) এবং শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয় না।

কোন কারণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যদি শিথিল হয়, তাহা হইলেও সমষ্টিগত আচরণের উদ্ভব হয়। কোন অঞ্চলের লোকের মনে যদি ধারণা জন্মায় যে, চোর অথবা এই জাতীয় সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের ধরিয়া থানায় লইয়া গেলে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় না বরং উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই অঞ্চলের লোকেরা অন্যায়ের প্রতিবিধানের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে। সমাজের শাসন শিথিল হওয়ার ফলে সমষ্টিগত আচরণের উদ্ভব হওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকের আছে। এই অবস্থায় সমষ্টিগত আচরণ প্রায়ই সমাজবিরোধী কার্যকলাপের রূপ নেয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যদি অন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সমষ্টিগত আচরণ বিক্ষোভ এবং আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। সমাজের বিধি-সম্মত উপায়ে অন্যায়ের প্রতিকার না হইলে মানুষ বাধ্য হইয়া বিধি-বহির্ভূত উপায়ে প্রতিকারের চেষ্টা করে। প্রথম দিকে তাহাদের হতাশা এবং

অসন্তুষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পায়। আশু প্রতিকারের সম্ভাবনা না থাকিলে বিক্ষিপ্ত এবং অবিন্যস্ত সমষ্টিগত আচরণ আস্তে আস্তে সুসংগঠিত হইয়া আন্দোলনের রূপ নিতেও দেখা যায়। সমাজমনোবিদগণের মতে, লোকের হতাশা বৃত্তাকার প্রতিক্রিয়ার (circular response) সৃষ্টি করে এবং ক্রমশঃ সুসংগঠিত আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

জনতা

সমষ্টিগত আচরণ সাধারণতঃ জনতার মধ্যেই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। যখন কোন জনসমষ্টি বিশেষ কোন ঘটনা বা উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া কোন নির্দিষ্ট স্থানে অসংগঠিতভাবে স্বল্পকালের জন্য মিলিত হয় তাহাকে জনতা বলা হয়।

অন্য প্রকার সমষ্টিগত আচরণের সঙ্গে জনতার প্রথম পার্থক্য এই যে, জনতার আচরণে মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কোন কিছুর আকর্ষণে জনতা মিলিত হইলে লোকেরা উত্তেজিত হইয়া এত তাড়াতাড়ি এবং চীৎকার করিয়া কথা বলে যে, একজনের উত্তেজনা অপর জনের মধ্যে দ্রুত সঞ্চারিত হইতে থাকে। উত্তরোত্তর আবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাহারা কিছু সময়ের জন্য বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে। যাহা কিছু তাহাদের নিকট উত্থাপন করা হয় তাহা-ই তাহারা নির্বিচারে গ্রহণ করে। উত্তেজনার বশে এমন আচরণ করে যাহা স্বাভাবিক অবস্থায় করার কথা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না।

জনতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অধিক সংখ্যক লোক সমবেত না হইলে জনতা বলিয়া গণ্য হয় না। অনেক দিন পর রাস্তায় হঠাৎ কয়েকজন বন্ধুর দেখা হইলে তাহারা উত্তেজিত হইয়া ভাবাবেগের আতিশয্যে চীৎকার করিয়া কথাবার্তা বলিতে পারে। কিন্তু এই জনসমষ্টিকে জনতা বলা যাইবে না। কারণ, তাহারা এত অল্পসংখ্যক এবং এত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের নিকট পরিচিত যে, জনতাসুলভ আচরণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেই-জন্য অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক লোক না হইলে কোন জনসমষ্টি জনতা বলিয়া পরিগণিত হয় না।

তৃতীয়তঃ, কোন কিছুর আকর্ষণে বিভিন্ন দিক হইতে এলোমেলোভাবে লোক মিলিত হইয়া জনতা গঠন করে। কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে অথবা কোথাও আগুণ লাগিলে বিভিন্ন স্থান হইতে লোক আসিয়া জড় হয়। তাহাদের মিলিত হইবার পশ্চাতে কোন পূর্ব পরিকল্পনা বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না।

চতুর্থতঃ, সমাজ-জীবনে সামাজিক পরিচিতি যাহাই হউক না কেন, জনতার অন্তর্ভুক্ত হইলে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক পরিচিতিজনিত কোন পার্থক্য থাকে না। জনতা কোন সংগঠিত জনসমষ্টি নহে। সুতরাং সামাজিক পরিচিতির বিভিন্নতা জনতার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

বিবিধ কারণে জনতাব মধ্যে অত্যধিক উত্তেজনার ভাব সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ, কোন জননেতা সমবেত জনমণ্ডলীর উত্তেজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হইতে পারেন। তিনি যদি জনসাধারণের আস্থাভাজন প্রিয় নেতা হন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার বক্তব্য নির্বিচারে গ্রহণ করে। বাকচাতুর্যে এবং ঘটনাবলী পরিবেশন করার কৌশলে তিনি জনমণ্ডলীকে বুঝাইতে সক্ষম হন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত পথই একমাত্র নির্ভুল পথ। বিকল্প কোন প্রস্তাব বা পথের কথা বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে বলিযা তাহারা মনে করে না। রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের অনেক নেতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, অধিকসংখ্যক লোক সমবেত হইযা একপ্রকার আচরণ করায় তাহারা অজ্ঞাত থাকিবার সুযোগ পায এবং তাহাদের পক্ষে দায়িত্বহীন কাজ বা আচরণ করার পথে কোন বাধা থাকে না। সাময়িকভাবে জনতার সমর্থন লাভ করায় বিধি-বহির্ভূত আচবণ করাব স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকগুলি অন্তর্হিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে লোকনিন্দার ভয়ে কোন ব্যক্তি যেসব কাজ হইতে বিরত থাকে, সেই লোকই জনতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া সেইসব কাজ বিনা দ্বিধায় করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, সমান তালে জিগির তোলা, হর্ষধ্বনি করা বা নিন্দাসূচক ধ্বনি দেওয়ার মাধ্যমে সমবেত জনমণ্ডলীব মধ্যে ব্যক্তিগত ভেদ মুছিয়া যায এবং তাহাদের মধ্যে সাময়িকভাবে সংহতির বন্ধন গড়িয়া উঠে এবং সমরূপ মানসিকতার সৃষ্টি হয়। এইভাবে একজন অপরজনকে উত্তেজিত করিতে সাহায্য করে। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদগণকে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে জনতাসুলভ মানসিক অবস্থা (crowd rhythm) গড়িয়া তুলিতে দেখা যায়।

জনতাকে বিভিন্ন জাতিরূপে ভাগ করা হয়। ভাগ করার প্রণালী সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে এই বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। কেহ জনতা কিভাবে সৃষ্টি হয় তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কেহ জনতা কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তাহার উপর জোর দেন, আবার কেহ জনতার আচরণ-বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণী বিভাগ করেন। তাঁহাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জনতাকে চার জাতিরূপে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হইল।

(১) **Casual crowd** বা আকস্মিক জনতা: এই প্রকার জনতার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যে-কোন আকস্মিক ঘটনা বা উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এই ধরনের জনতা সমাজে বেশি দেখা যায়। প্রধানতঃ দুইটি কারণে আকস্মিক জনতার সমাবেশ হয়। অনেক সময় আতঙ্কিত হইয়া লোকেরা জনতাসুলভ আচরণ করে। যদি রাস্তায় বিষধর সর্প দেখা যায় অথবা পাড়ায় কোন বাড়ীতে আগুণ লাগে অথবা নদী-সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বানের সংকেত দেওয়া হয়, তাহা হইলে লোকেরা আতঙ্কিত হইয়া ছোটাছুটি করে। ইহাকে **panic crowd** বা ভয়জনিত আকস্মিক জনতা বলা হয়। আবার

অনেক সময় কৌতূহলবশতঃ কোন ঘটনা দেখিবার জন্য জনতার সমাবেশ হয়। যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না সেখানে বান দেখিবার জন্য জনতার সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। বান আসিবার পূর্বে একটা চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পায়। বান আসিলে জনতা মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি করিতে থাকে এবং বান চলিয়া যাইবার অনেক পরেও এই আনন্দোচ্ছ্বাসের অনুরণন চলিতে থাকে। শ্রী বুদ্ধদেব বসু 'আমার ছেলেবেলা' 1 নামক প্রবন্ধে নোয়াখালিতে আবালবৃদ্ধবনিতার বান দেখিবার উত্তেজনা সম্পর্কে একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। "প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের অমাবস্যায়, মধ্যাহ্নের কোন-এক লগ্নে সমুদ্র থেকে বান আসে নদীতে —স্থানীয় ভাষায় বলে 'শর'। ঘরে-ঘরে সেদিন সকাল থেকে চাঞ্চল্য, একটা উৎসবের ভাব। আমার যতদূর মনে পড়ে, স্কুলগুলোতে ছুটি থাকতো কিছুক্ষণ, কাচারি-আদালতেও কাজকর্ম স্থগিত—সেই সময়টুকুর জন্য সকলেই সেদিন নদীর ধারে, অন্তঃপুরিকা মহিলারাও ভালো কাপড় প'রে দিনের আলোয় বেরিয়ে এসেছেন।......আমরা দাঁড়িয়ে আছি পূর্বদিগন্তে তাকিয়ে—শান্তাসীতার মোহানার দিকে—......যেখান থেকে, একটু পরেই, যে-কোনো মুহূর্তে, সমুদ্রের ঢেউ ছুটে আসবে আমাদের চোখের সামনে। ঐ আসছে, আসছে! দুধের মতো শাদা একটি ফেনিল রেখা প্রথমে, তারপর শোঁ-শোঁ শব্দে সমুদ্র এলো ঝাঁপিয়ে......এক বিপুল উল্লাসের ঢেউ তুলে-তুলে পশ্চিম দিকে ছুটে চলে গেলো। দৃশ্যটির মেয়াদ হয়তো পাঁচ মিনিটের বেশি হবে না। কিন্তু লোকেরা তা নিয়ে বলাবলি করে অনেকক্ষণ—কেমন হলো এবার, আগের বছরের চাইতে ভালো না কি এবারে তেমন জমলো না?" ভয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে অনেক সময় রাস্তায় সাপের খেলা দেখিবার জন্যও জনতার সমাবেশ হয়। এই ধরনের জনতাকে Spectator Crowd বা কৌতুহলজনিত আকস্মিক জনতা বলা হয়। কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ casual crowd বা আকস্মিক জনতাকে like-interest crowd বা অনুরূপ বিষয়ে আগ্রহী জনতা বলিয়া অভিহিত করেন।

(২) Action Crowd বা উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যোগী জনতা। অনেক সময় ব্যষ্টি-স্বার্থ অথবা সমষ্টি-স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জনতার সমাবেশ ঘটে। দুইটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের পাওনা মিটাইবার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া আমানতকারীদের সেই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার হিড়িক পড়িয়া যায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তথ্য বা যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া তাহারা নিজ নিজ স্বার্থে সম্মিলিতভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ক্ষেত্রে ব্যষ্টি-স্বার্থই মুখ্য। কিন্তু ব্যষ্টি-স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমষ্টিগতভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। সমষ্টি-স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জনতার সম্মিলিত প্রচেষ্টার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যায়ভাবে বাজারে মাছের দাম বৃদ্ধি করা

হইয়াছে মনে করিলে ক্রেতাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে মৎস্য-বিক্রেতাদের গালিগালাজ করিতে পারে। তাহাদের উপর শারীরিক বলপ্রয়োগও করিতে পারে। এই ধরনের জনতাকে কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ common-interest crowd বা সমরূপ বিষয়ে আগ্রহী জনতা বলিয়া থাকেন। স্বার্থসিদ্ধি করাই এই জনতার লক্ষ্য।

(৩) Expressive crowd বা ভাবপ্রকাশে উদ্‌গ্রীব জনতা। মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য জনসমষ্টি অবস্থাবিশেষে জনতাসুলভ আচরণ করে। কোন স্কুল বা কলেজের ফুটবল টিম খেলায় জয়ী হইলে টিমের সমর্থকগণ রাস্তা দিয়া হৈ হুল্লোড় করিতে করিতে অগ্রসর হয়। নাচ, গান এবং নানারকম ধ্বনির মাধ্যমে তাহাদের বিজয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। অনেক সময় বিশ্রীভাবেও বিজয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করা হয়। বিজয়ীদলের সমর্থকগণ রাস্তা দিয়া যাইবার সময় পথচারীদের অকারণে উত্যক্ত করে, উপহাস করে। এমন কি, রাস্তার দুই ধারের দোকানপাটও লুঠ করে। নির্বাচনের পর বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থকদের রাস্তায় আনন্দের আতিশয্যে নানারকম ধ্বনি তুলিয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচগান করিতে দেখা যায়।

(৪) Conventionalised crowd বা প্রথাসম্মত জনতা। সমষ্টিগত আচরণ আলোচনা করিবার সময় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাইবার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে নানারকম অনুষ্ঠান ও উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক অনুষ্ঠানাদিতে সামাজিক বিধি শিথিল করা হয় এবং নির্দিষ্ট নিয়মকানুন সাপেক্ষে লোকদের বিধি-বহির্ভূত আচরণ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। দোলের সময় জনতাসুলভ আচরণ করা সমাজে স্বীকৃত। সুতরাং ইহাকে প্রথাসম্মত জনতা বলা যাইতে পারে। এইভাবে অনেক আচার-আচরণকে স্বীকৃতি দিয়া সমাজ নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মানুষের ভাবাবেগ প্রকাশ এবং অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিবার সুযোগ করিয়া দেয়।

উপরে যেভাবে জনতাকে বিভিন্ন জাতিরূপে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হইল তাহা সম্পূর্ণ নহে। অন্যভাবেও জনতাকে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ করা যায়। তাহা ছাড়া, একই জনতার মধ্যে দুই বা ততোধিক জাতিরূপের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাই হয়। কিন্তু বিভিন্ন জাতিরূপে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ করিলে জনতার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

উচ্ছৃঙ্খল জনতা

জনতার আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিলে সেই জনতাকে mob বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা বলে। ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, অত্যধিক উত্তেজিত হইলেই জনতা উচ্ছৃঙ্খল হয়। নানা কারণে জনতা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। জনতার আস্থাভাজন নেতা সুকৌশলে তাহাদের উত্তেজিত করিয়া

উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন। তাহা ছাড়া, এমন অনেক জিগির আছে যাহা জনতাকে উদ্দীপিত করে। সুতরাং এইরূপ ধ্বনি দেওয়ার ফলেও জনতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে পারে। অনেক সময় পুলিশ বা অন্য কোন রাজকর্মচারীর সহানুভূতিহীন ব্যবহার জনতাকে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিতে প্ররোচিত করে, বিশেষ করিয়া যখন তাহাদের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিযোগ উপেক্ষিত হয়।

ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, কেবলমাত্র জনতাই উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত হয়। অনেক সময় সুসংগঠিত ও মোটামুটি সুস্থিত (stable) জনসমষ্টিও (যেমন, সৈন্যদল, কারখানায় কর্মরত শ্রমিকগণ অথবা আইন সভার সদস্যবৃন্দ) অকস্মাৎ উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পরিণত হয়।

আচরণেব পরিপ্রেক্ষিতে জনতাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটিকে সক্রিয় এবং অভীষ্টসাধনে রত (purposive and active) উচ্ছৃঙ্খল জনতা বলা হয়। সাধারণতঃ কোন জনপ্রিয় নেতার প্রভাবে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল জনতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অপরটিকে অসম্বদ্ধ এবং বিভ্রান্ত (confused and random) উচ্ছৃঙ্খল জনতা বলা হয়। সাধারণতঃ ব্যর্থতাবোধ অথবা ভয় হইতে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল জনতার সৃষ্টি হয়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে উভয় প্রকার উচ্ছৃঙ্খল জনতার আচরণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কোন বিপ্লবী নেতা জোরপূর্বক আইনকক্ষ দখল করিলে নিম্নোক্ত দুইটির যে-কোন একটি ফল ফলিবার সম্ভাবনা থাকে। যদি আইন-কক্ষের অধিকসংখ্যক সদস্যদের বিপ্লবী নেতার প্রতি অথবা তাঁহার আদর্শের প্রতি সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে সক্রিয় এবং অভীষ্টসাধনে রত আইন-ভঙ্গকারী জনতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, বিপ্লবী নেতার নির্দেশে এবং প্ররোচনায় তাঁহারা বিপ্লবাত্মক কার্যে লিপ্ত হইতে পারেন। অপর পক্ষে, বিপ্লবী নেতার প্রতি অথবা তাঁহার নীতির প্রতি অধিকসংখ্যক সদস্যের সহানুভূতি না থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে বিভ্রান্ত হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে আচরণ করাই স্বাভাবিক।

যে পরিবেশে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ, আদর্শ বা নিয়ামক একই সঙ্গে বিরাজ করে, সেই পরিবেশে উচ্ছৃঙ্খল জনতা অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে গড়িয়া উঠে। যেমন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রথা, ঐতিহ্য এবং জীবনযাপনের রীতি রহিয়াছে এমন দুই বা ততোধিক জাতি যদি পাশাপাশি বাস করে, তাহা হইলে অতি তুচ্ছ কারণেও তাহাদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাহারা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিতে উদ্যত হইতে পারে। অনুরূপভাবে, ধনী এবং দরিদ্র, কারখানার মালিক ও শ্রমিক এবং উগ্রপন্থী দুই বা ততোধিক ধর্মাবলম্বী লোক কাছাকাছি বাস করিলে নগণ্য কারণে তাহাদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই জাতীয় পরিবেশে পারস্পরিক সন্দেহ, বিদ্বেষ ও ভয় তাহাদের সহজভাবে মেলামেশার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ অস্থির পরিবেশ কিছুসংখ্যক লোককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং উত্তেজিত হইবার কোন কারণ ঘটিলে তাহারা শৃঙ্খলাবিহীন জনতাসুলভ আচরণ করে।

উচ্ছৃঙ্খল জনতার পক্ষে কোন স্থায়ী গঠনমূলক কাজ করা সম্ভবপর নহে। কারণ, যে অসুবিধার বা সমস্যাব ফলশ্রুতি হিসাবে উচ্ছৃঙ্খল জনতার সৃষ্টি হয়, সেই সমস্যা বা অসুবিধা দূব করিতে গেলে যে-ধরনের সংগঠন থাকা প্রয়োজন ও যেবূপ সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা অনুসরণ করা আবশ্যক, তাহা উচ্ছৃঙ্খল জনতার মধ্যে স্বভাবতই থাকে না।

শ্রোতৃমণ্ডলী

যখন কোন জনসমষ্টি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, তাহাকে audience বা শ্রোতৃমণ্ডলী বলা হয়। সমাজতত্ত্বে audience শব্দটি প্রচলিত আছে বলিয়া আমরা বাংলায় শ্রোতৃমণ্ডলী শব্দটি সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রোতৃমণ্ডলী বলিতে শ্রোতা এবং দর্শক উভযকেই বুঝায। সভাস্থলে যাহারা বক্তৃতা শুনিতে মিলিত হন, থিয়েটার এবং সিনেমায় যাহারা অভিনয় উপভোগ করিতে যান, অথবা যাহারা খেলার মাঠে খেলা দেখিতে যান তাহারা সবাই শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু বিছিন্নভাবে যাহারা রেডিও শুনেন বা টেলিভিসন দেখেন তাহারা শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাহাদিগকে public বা জনমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই পরিচ্ছেদের শেষ দিকে এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, সমবেত জনসমষ্টির প্রত্যেকের এক রকম প্রত্যাশা থাকে এবং এক রকম প্রত্যাশা লইযা তাহারা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হন। অতএব এক রকম প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী গড়িয়া উঠে।

শ্রোতৃমণ্ডলীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রোতৃমণ্ডলীকে সর্বজনস্বীকৃত আচরণ-বিধি মানিয়া চলিতে হয়। যেমন, বক্তৃতা প্রদানকালে বক্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বক্তৃতায বাধা সৃষ্টি করা রীতিবিরুদ্ধ কাজ বলিয়া স্বীকৃত। ঐকতানবাদন চলার সময় ভাল লাগার নিদর্শন স্বরূপ হাততালি দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু ঐকতানবাদনে একটা সুর শেষ হইলে হাততালি দেওয়া শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া গণ্য করা হয়। আবার দেখা যায় যে, খেলার মাঠে খেলা চলাকালীন উত্তেজনায় হাততালি দেওয়া বা চীৎকার করা রীতিসম্মত। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ-বিধি স্বীকৃত হয়। একটি নীতি দ্বারা এই আচরণ-বিধিগুলি নির্ণীত হইয়া থাকে। যে উদ্দেশ্যে শ্রোতৃমণ্ডলী মিলিত হয়, সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এমন কাজ করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। সেইজন্য ভাষণরত বক্তার বা ঐকতানবাদনরত শিল্পীবৃন্দের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে এইরকম সব আচরণকে-রীতিবহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হয়। এই কারণেই নাটক দেখার সময় দর্শকদের নিজেদের মধ্যে কথা বলা অসঙ্গত আচরণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

শ্রোতৃমণ্ডলীকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে ভাগ করা হয়। কিম্ব্যাল ইয়ং (Kimball Young) সমবেত হইবার উদ্দেশ্য বা প্রেরণার ভিত্তিতে শ্রোতৃমণ্ডলীকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি information-seeking audience বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হন, তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাহারা বক্তৃতা শুনিতে সমবেত হন, তাহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে সংবাদ সংগ্রহ করা। যাহারা শিক্ষামূলক কোন সিনেমা দেখিতে সমবেত হন, তাহাদেরও সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ করা প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং উপরোক্ত উদ্দেশ্যে সমবেত জনসমষ্টিকে অনায়াসে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

যাহারা আমোদ-প্রমোদের জন্য বিনোদনমূলক কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তাহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিম্ব্যাল ইয়ং তাহাদের recreation-seeking audience বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা অবসরকালীন আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলার মাঠে যান বা ঐকতানবাদন শুনিতে যান বা নাটক দেখিতে যান, তাহারা সবাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণীর শ্রোতৃমণ্ডলীকে ইয়ং conversional audience বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। উদাহরণের সাহায্যে ইয়ং-এর বক্তব্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অনেকে অনেক রকম বিশ্বাস পোষণ করিলেও মনে নানারকম দ্বন্দ্ব থাকে। এইজন্য তাহাদের মতবাদের সমর্থন অন্যত্র খুঁজেন। এই উদ্দেশ্যে সভাসমিতি বা আলোচনা-চক্রে যোগদান করেন। যাহারা এইভাবে নিজেদের বিশ্বাসের সমর্থনে একত্র মিলিত হইয়া কোন বক্তৃতা, আলোচনা বা পাঠ শুনেন, তাহাদের conversional audience বলা যাইতে পারে। আবার অন্য প্রকারের conversional audienceও হইতে পারে। ধর্মীয় সংস্থা বা রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে প্রচারের জন্য সভাসমিতির আয়োজন করা হয়। অনেকে এইসব সভায় প্রচারিত আদর্শবাদ সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য সভাসমিতি বা আলোচনা-চক্রে যোগদান করেন। তাহাদেরও conversional audience বলা যায়। উভয় উদাহরণেই শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সমজাতীয়। প্রথম উদাহরণে শ্রোতৃমণ্ডলী নিজ নিজ আদর্শবাদ বা মতবাদ আরও জোরালো করার উদ্দেশ্যে সভাসমিতিতে যোগদান করেন। দ্বিতীয় উদাহরণে শ্রোতৃমণ্ডলী কোন বিশেষ আদর্শবাদ বা মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য সভাসমিতি বা আলোচনা-চক্রে অংশ গ্রহণ করেন।

জনমণ্ডল

যখন কোন অসংগঠিত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিবৃন্দ কোন বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে মাথা ঘামায়, তখন সেই ব্যক্তিবৃন্দকে public বা জনমণ্ডল বলা হয়। সমাজ-জীবনে নানারকম বিতর্কমূলক বিষয়ের উদ্ভব হয়। সেইজন্য নানাপ্রকার জনমণ্ডলের কথা ভাবা যাইতে পারে। যেমন, রাজনীতিক বিষয় সম্পর্কিত জনমণ্ডল, সিনেমা সম্পর্কিত জনমণ্ডল, শিক্ষা সম্পর্কিত জনমণ্ডল ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার জনমণ্ডলের প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করিবার জন্য দৈনিক সংবাদ পত্রে বা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পৃথক বিভাগ থাকে। যেমন, অর্থনৈতিক

সমস্যা, যুব কল্যাণ, থিয়েটার ও সিনেমা, খেলাধূলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকে। তবে মনে রাখিতে হইবে, বিশেষ কোন সমস্যা জনমণ্ডলের চিন্তাভাবনার বিষয় হইলেও সব ক্ষেত্রে তাহারা একমতাবলম্বী না-ও হইতে পারে। আলোচনা এবং বিতর্কের মাধ্যমে জনমত গড়িয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গে জনমত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। যখন কোন বিতর্কমূলক বিষয়ে জনমণ্ডল কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তখন তাহাকে জনমত বলা হয়। তবে, জনমত বলিতে কেবলমাত্র জনমণ্ডলের অধিকাংশের মত বুঝায় না। জনমত-গঠনে সংখ্যালঘুদের মতামতেরও যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত এমন হয় যে সংখ্যালঘুদের মত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইহা জনমত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আবার জনমত বলিতে ইহাও বুঝায় না যে, জনমণ্ডল বিষয়টি সম্পর্কে একমতাবলম্বী হইবে। খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যখন মূল বিষয়ে মোটামুটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই কেবল ইহা জনমত বলিয়া স্বীকৃতি পায়। যখন বলা হয় জনমত কোন বিশেষ ব্যবস্থার বিরোধী, তখন বুঝিতে হইবে মূল বিষয়েই জনমণ্ডলের আপত্তি আছে এবং এই আপত্তি জনমণ্ডলের প্রায় সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত।

দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে জনমতের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কারণ, সর্বদাই নূতন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই জনমণ্ডলের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্কের ফলে জনমত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। সুতরাং জনমত-গঠনে তথ্যের বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকিলে জনমত বিপথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অপর পক্ষে, অচল অনড় সমাজে জনমতের তাৎপর্য বিশেষ থাকে না। কারণ, স্থবির সমাজে সাধারণতঃ বিতর্কের ঝড় উঠিতে পারে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বলিলেই হয়।

জনতার সঙ্গে জনমণ্ডলের পার্থক্য আলোচনা করিলে জনমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা আরও পরিষ্কার হইবে। প্রথমতঃ, একত্র মিলিত না হইলে কোন জনসমষ্টি জনতায় পরিণত হয় না। জনমণ্ডলের ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হইবার প্রশ্ন উঠে না। তাঁহারা সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। নানা পরোক্ষ উপায়ে জনমণ্ডলের মধ্যে খবরাখবর প্রচারিত হয় এবং ক্ষীণ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সংবাদপত্র, রেডিও, মাসিক পত্রপত্রিকা, টেলিভিসন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম জনমণ্ডলের মতামত গঠন এবং ব্যক্ত করিতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের দ্বারা জনতার উদ্ভব হয় বলিয়া জনমণ্ডলের তুলনায় জনতা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক। তৃতীয়তঃ, অধিক সংখ্যা এবং বিস্তৃতির জন্য জনমণ্ডল জনতার মত ভাবাবেগে প্রভাবিত বা চালিত হয় না। ভাবাবেগের আতিশয্যে জনতার মধ্যে যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাও জনমণ্ডলের মধ্যে বিরল। জনতার মধ্যে যেমন একজনের উত্তেজনা অপর-জনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, জনমণ্ডলের ক্ষেত্রে তাহা হয় না। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রবণতা এবং স্বার্থ অনুযায়ী আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে জনমত কি করিয়া গড়িয়া উঠে ? এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জনমণ্ডলের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকিলেও একটি অভিন্ন জীবন-ধারা দ্বারা প্রত্যেকের আচার-ব্যবহার, কার্যকলাপ এবং মূল্যবোধ প্রভাবিত হয়। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই অবস্থায় প্রত্যেকে পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও মৌল বিষয়ে অভিন্নতা থাকিয়া যায়। সেইজন্য ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, জীবন-ধারাগত ঐক্য না থাকিলে জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আরকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। অনেকে জনতার সঙ্গে জনমণ্ডলের ভেদ-রেখা টানিতে গিয়া বলেন যে, জনমণ্ডল বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইহা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব। কারণ, জনমণ্ডলের অন্তর্গত লোকদের বুদ্ধি এবং যুক্তি ঐতিহ্যগত (traditional) চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, জনমত কোন সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠে না। জনমতে মূলত জনমণ্ডলের অভিরুচি প্রতিফলিত হয়। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত (objective) বলিয়া গণ্য করা যায় না।

সুতরাং প্রচারের প্রয়োগ-কৌশলে প্রচারক নিপুণভাবে নিজের ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুযায়ী জনমত গঠন করিতে পারেন। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি-বিদ্যা অভাবনীয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং প্রচারের প্রয়োগ-কৌশলে এই উৎকর্ষ নানাভাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারের প্রয়োগ করা হয়। এই অবস্থায় স্বাধীনভাবে জনমত গড়িয়া উঠিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়।

ব্যাপক এবং সুনিপুণ প্রচারের ফলে আমাদের জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া রাইট মিল্‌স্ (C. Wright Mills) তাঁহার The Power Elite নামক গ্রন্থে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অগ্রসর দেশগুলি ধীরে ধীরে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জনমণ্ডল-সম্বলিত সমাজ (society of publics) হইতে গণসমাজে (mass society) পরিণত হইতেছে। তিনি চারিটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া জনমণ্ডল কিভাবে গণ-সমাজে পরিণত হইতেছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। (১) জনমণ্ডল বিভিন্ন সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া মতামত ব্যক্ত করে। অপর পক্ষে, গণসমাজে মতামত ব্যক্ত করার চাইতে মতামত নির্বিচারে গ্রহণ করাই গুরুত্ব লাভ করে। (২) গণসমাজে প্রচারমাধ্যমসমূহ এমনভাবে সুসংগঠিত যে, ব্যষ্টিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কাহারও পক্ষে কোন সংবাদ বা তথ্য সম্পর্কে কার্যকরভাবে প্রতিবাদ জানান সম্ভব নহে। (৩) জনমত বাস্তবায়িত করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই জনমণ্ডলের মতামত ব্যক্ত করার কোন সার্থকতা থাকে না। (৪) প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হইতে গণসমাজ মুক্ত থাকিতে পারে না। বরং নির্বিচারে প্রচলিত আচার-ব্যবস্থা মানিয়া লওয়ার দিকেই অধিক প্রবণতা দেখা যায়।

কি কি কারণে জনমগুল-সম্বলিত সমাজ ধীরে ধীরে গণসমাজে পরিণত হইতেছে ইহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। বর্তমান যুগে যুগপৎ দুই প্রকার পরিবর্তন ঘটিতেছে। একদিকে দূরদূরান্তরে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নানা প্রকার যোগসূত্র স্থাপিত হইতেছে। রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের উন্নতি যোগাযোগ স্থাপন করিবার পথ প্রশস্ত করিতেছে। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি কবিয়া সংযোগ-স্থাপন অনিবার্য করিয়া তুলিতেছে। উপরোক্ত পরিবর্তনের ফলে সমাজের এক অংশে যাহা ঘটে তাহার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য অংশেও পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, সমাজে যোগা-যোগ রক্ষা করার পথ প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আরেকটি পরিবর্তন একই সঙ্গে ঘটিতেছে। প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে এবং সীমিত গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করার ফলে যে-সব সম্পর্ক অতীতে সহজভাবে গড়িয়া উঠিত তাহা পরিবর্তিত অবস্থায় বিরল হইয়া পড়িতেছে। যেমন, প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বহুলাংশে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, পারিবারিক বন্ধনও পূর্বের তুলনায় ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। অতীতের ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসের প্রতি লোকের আকর্ষণ উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে; অথচ তাহার স্থলে অন্য কোনপ্রকার ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাসের উদ্ভব হইতেছে না। এই সব পরিবর্তনের ঢেউ লোকের আচার-আচরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে অনবরত স্পর্শ করিতেছে ও সমাজ ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। সহজ সরল বিশ্বাস হারাইয়া মানুষ অশান্ত জলরাশির মধ্যে নোঙরবিহীন জলযানের মত দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় সুপরিকল্পিত প্রচারের শিকার হওয়া বিচিত্র নহে। এই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ম্যাক আইভার নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন: "Hence......the need for that social education which guards us against the most expert of 'practitioners of propaganda'.........and which permits us to exercise to the utmost our individual discernment." 1 অর্থাৎ মানুষ যাহাতে নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটাইয়া স্বাধীনভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

1 Mac Iver and Page. Society. Page 436

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সামাজিক স্তর-বিন্যাস

সামাজিক শ্রেণীর সংজ্ঞা

প্রত্যেক সমাজেই সমাজস্থ লোকদের নানাভাবে ভাগ করিতে দেখা যায়। যেমন, লোকসংখ্যাকে বয়সের ভিত্তিতে বৃদ্ধ, যুবা কিশোর, বালক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করার রীতি সর্বত্র প্রচলিত। আবার লিঙ্গভেদে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই ভাগে ভাগ করার রীতিও সর্বজনীন। কিন্তু এই জাতীয় ভাগে কোন ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ সূচিত হয় না। কোন্ ভাগে কত লোক আছে, শুধু এই তথ্যটি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আবার এই প্রকার ভাগের কোন স্থায়িত্ব নাই। কয়েক বৎসর পর পর ইহার পরিবর্তন হয়। দশ বৎসর পূর্বে যে কিশোর ছিল, দশ বৎসর পর সে যুবক বলিয়া পরিচিত হয়।

অনেক সময় বৃত্তি অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত লোকদের ভাগ করা হয়। যেমন, কৃষক, শিল্প-শ্রমিক, ইন্‌জিনিয়ার, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি। এই ধরনের ভাগকে উল্লম্বী ভাগ (vertical division) বলা হয়। এই ভাগেও ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের লক্ষণ পাওয়া যায় না। কারণ, একজনের বৃত্তি উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ অপরাপর বৃত্তির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে উচ্চ-নীচ ভেদ সম্পর্কিত কোন ইঙ্গিত করা হয় না। এই প্রকার ভাগও স্থায়ী হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ইচ্ছা এবং সুবিধা হইলেই বৃত্তি পরিবর্তন করা সম্ভব।

সমাজে আরেক রকম ভাগ দেখা যায়। ইহা ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে অনুভূমিক ভাগ (horizontal division) বলা যাইতে পারে। যেমন, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিটি জাতে বিভক্ত। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ সমাজেই আয়ের ভিত্তিতে সমাজস্থ লোকদের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কোন কোন সমাজে প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে আরও বিভাজন দেখা যায়। এই ধরনের ভাগে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়ঃ (১) প্রত্যেকটি শ্রেণী মর্যাদার দ্যোতক। যেমন, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র বলিতে পদমর্যাদার দিক হইতে সমাজে কাহার কি স্থান ইহারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়। (২) বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কে মর্যাদার দিক হইতে উচ্চতর-নিম্নতর ব্যবধান স্বীকৃত হয়। (৩) কোন্ শ্রেণীর কি মর্যাদা এই সম্পর্কে সমাজস্থ লোক সম্পূর্ণরূপে অবহিত এবং সচেতন। (৪) এই প্রকার বিভাজন সাধারণতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কারণ, সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদ স্বীকৃত হওয়ায় শ্রেণী-স্বার্থ গড়িয়া উঠে এবং শ্রেণীভেদ কায়েমী হওয়ার দিকে প্রবণতা দেখা যায়।

সমাজতত্ত্ববিদগণ এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগকে সামাজিক স্তর-বিন্যাস বলিয়া অভিহিত করেন।

সামাজিক স্তর-বিন্যাসের অর্থ

সমাজতত্ত্বে স্তর-বিন্যাস কথাটি ভূ-বিদ্যা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠ খনন করিলে নানারকম স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব স্তর বিশ্লেষণ করিয়া ভূ-বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর বয়স, অভিব্যক্তির ধারা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোক সম্পাত করিতে চেষ্টা করেন। সমাজস্থ লোকদের শ্রেণী-বিভাগ করিতে গিয়া সমাজতত্ত্ববিদগণ ভূ-বিদ্যার অনুকরণে স্তর-বিন্যাস পদটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভূ-বিদ্যায় স্তর-বিন্যাস বলিতে যাহা বুঝায় সমাজতত্ত্বে এই পদটি ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সামাজিক স্তর-বিন্যাসের অর্থ সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে প্রাকৃতিক স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক স্তর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের স্পর্শজনিত সংযোগ ছাড়া অন্য কোন প্রকার যোগাযোগ নাই। কিন্তু সমাজস্থ বিভিন্ন স্তরভুক্ত লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রত্যেকটি স্তর সুসংগঠিত সামাজিক স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পারস্পরিক সম্পর্কে পদমর্য্যাদার দিক হইতে উচ্চতর-নিম্নতর ব্যবধান স্বীকৃত হয়। 'ক' স্তর 'খ' স্তর হইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, অথবা 'খ' স্তর 'গ' স্তর হইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, এই জাতীয় ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের নীতির উপর সামাজিক স্তর-বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত। খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রাকৃতিক স্তর-বিন্যাসে এই প্রকার ব্যবধানের কোন স্থান নাই। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেকটি স্তর-ভুক্ত লোকেরা সামাজিক স্তর-বিন্যাসের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সচেতন। সুতরাং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে স্বার্থের পার্থক্যজনিত দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বিরাজ করে। চতুর্থতঃ, উপরোক্ত কারণে সামাজিক স্তরসমূহ প্রাকৃতিক স্তরের ন্যায় জড় বা নিষ্ক্রিয় নহে। পদমর্যাদা এবং ক্ষমতার দিক হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরভুক্ত লোকেরা স্বভাবতই উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইতে চেষ্টা করে। অপর পক্ষে, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরভুক্ত লোকেরা নিজেদের পদমর্য্যাদা এবং ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে সামাজিক স্তর-বিন্যাসের প্রকৃতি ও আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন আমাদের অগোচরে অবিরাম চলিতেছে। কোন কোন সময় বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থানের ফলে সামাজিক স্তর-বিন্যাসে হঠাৎ আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

সামাজিক স্তর-বিন্যাসের প্রকার-ভেদ

এই পৃথিবীতে সমাজ-জীবন শুরু করিবার পর হইতেই মানুষ স্তর-বিন্যাস প্রবর্তন করিয়াছে। কাল প্রবাহে ইহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে মাত্র, কিন্তু কোন সময় বিলুপ্ত হয় নাই। সামাজিক স্তর-বিন্যাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা করিতে হইলে বিভিন্ন প্রকার স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে দাসত্ব প্রথা, সামন্ত প্রথা, অর্থনৈতিক শ্রেণী, মর্যাদা অনুসারী শ্রেণী (status group) এবং জাতিভেদপ্রথা সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

দাসত্ব প্রথা

অসম সামাজিক সম্পর্কের চরম নিদর্শন হইল দাসত্ব প্রথা। য়ুরোপে যাহারা দাস শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাদের কোন ভূ-সম্পত্তি বা অন্য কোন প্রকার সম্পত্তি থাকিত না। এমন কি, সব রকম মানবিক অধিকারও তাহাদের আয়ত্তাতীত ছিল। তাহাদিগকে প্রভুব সম্পত্তি বলিযা গণ্য করা হইত। এরিস্টটলের মতে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার জন্য দুই প্রকার সামগ্রীর প্রযোজন। একটি হইল জড়। যেমন, বাসন, আসবাবপত্র ইত্যাদি। অপবটি হইল সজীব। সজীব সামগ্রী বলিতে এরিস্টটল দাসকে নির্দেশ করিযাছেন। পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন সভ্যতা দাসত্ব প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রথার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ, দাসের একমাত্র পরিচয হইল যে, সে তাহার প্রভুর সম্পত্তি। সুতরাং তাহার উপর প্রভুর অবাধ কর্তৃত্ব সমাজে স্বীকৃত ছিল। তিনি খুশিমত তাহাকে ব্যবহাব করিতে পারিতেন। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, প্রহাব প্রভৃতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে প্রভুর উপর সমাজের কোন শাসন ছিল না। দ্বিতীযতঃ, সামাজিক ক্ষেত্রে দাস ঘৃণার পাত্র ছিল। বাজনীতিক ক্ষেত্রে তাহার ছিল দর্শকের ভূমিকা। সক্রিয়ভাবে কোন কিছু কবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। নিষ্ক্রিয়ভাবে সব কিছু মানিযা লওয়া ছিল তাহার একমাত্র কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, দাসকে বাধ্যতামূলকভাবে পরিশ্রম করিতে হইত। এই বিষয়ে তাহাব ইচ্ছা-অনিচ্ছাব কোন মূল্য ছিল না।

উপবোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, দাসত্ব প্রথা মুখ্যত অর্থনৈতিক স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথার ফলে অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয। তাঁহারা কোন প্রকাব কাযিক পরিশ্রম করিতেন না। প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজ দাসকে দিয়া করাইযা লইতেন।

য়ুরোপে দাসত্ব প্রথা লোপ পাওয়াব কারণ হিসাবে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ কবা হয। প্রথমতঃ, উৎপাদনেব দিক হইতে দাসত্ব প্রথা লাভজনক ছিল না। অপেক্ষাকৃত উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে দাসত্ব প্রথার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, দাসত্ব প্রথার যৌক্তিকতা সম্পর্কে নীতিগতভাবে নানারকম আপত্তি উঠে। মানুষকে জড় পদার্থের মত ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধীরে ধীরে সোচ্চার হয়। প্রয়োজনের দিক হইতে দাসত্ব প্রথাকে মানিযা লইলেও আদর্শের দিক হইতে ইহাকে কোন সময়ই সমর্থন করা হয় নাই। এরিস্টটলের লেখায় এই বিরোধ সুস্পষ্ট। ক্রমশঃ দাসত্ব প্রথাব বিবুদ্ধে জনমত গড়িযা উঠে এবং ধীরে ধীরে ইহার অবলুপ্তি ঘটে।

ভারতবর্ষে কোন কালে দাসত্ব প্রথা ছিল কিনা এই প্রশ্ন লইয়া অনেক বিতর্ক অতীতে হইয়াছে। মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথা দেখিতে পান নাই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। ইহার কারণ আছে। পরে ইহার উল্লেখ করা হইবে। তবে ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথা ছিল না ইহা বলা সঙ্গত নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পর আর্যরা অনার্যদের 'দাস' বলিয়া গণ্য করিতেন এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধে যাহাদের

পরাজিত করিতেন তাহাদেরই দাস করিয়া রাখিতেন। ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথার সূত্রপাত এইভাবেই হয়। দাস পিতা-মাতার সন্তান দাস বলিয়া গণ্য হইত। তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় করা যাইত এবং সময় সময় বন্ধক রাখা হইত। অনেক সময় অর্থাভাবে কেহ কেহ সপরিবারে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিতে বাধ্য হইতেন। আবার অনেক সময় ঋণের দায়ে অথবা অসৎ কর্ম করার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যক্তি বিশেষকে দাসে পরিণত করা হইত। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাসত্ব নির্ধারিত করা থাকিত এবং নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হইত। স্মৃতি এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার দাসত্ব প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে-ধরনের দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল তাহার সঙ্গে ভারতীয় দাসত্ব প্রথার তুলনা হয় না। কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রভুর পরিবারের সদস্য হিসাবে দাসকে গণ্য করা হইত। পরিবারভুক্ত পরিজনবর্গের ন্যায় দাসের আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব প্রভুর উপর ন্যস্ত ছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির ন্যায় এখানে বৃদ্ধ বয়সে দাসকে বিতাড়ন করা প্রভুর পক্ষে অ-ধর্মীয় এবং আইন-বিরোধী কাজ বলিয়া গণ্য হইত। আহার্য বস্তু কম হইলে প্রভু সপরিবারে নিজেদের আংশিকভাবে বঞ্চিত করিয়া দাসের প্রয়োজনীয় আহার্যের ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই স্বীকৃত রীতি ছিল। দাসের উপর প্রভু কতটুকু বলপ্রয়োগ করিতে পারেন ইহাও আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা ছিল। অপুত্রক অবস্থায় দাসের মৃত্যু হইলে প্রভুকে তাহার যাবতীয় পারলৌকিক ক্রিয়া করিতে হইত। অর্থশাস্ত্রে দাসের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের জন্য অনেক উদার ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। বেশামের মতে, 1 অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি মৌর্য আমলে প্রচলিত আইনেরই প্রতিফলন বলিয়া গণ্য করা যায়। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রাচীন যুগে ভারতীয় অর্থনীতি দাসত্ব প্রথার উপর নির্ভরশীল ছিল না। চাষ-আবাদ সংক্রান্ত কাজকর্ম স্বাধীন কৃষকরা সম্পাদন করিতেন। সুতরাং মেগাস্থিনিসের পক্ষে ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথা নাই বলা স্বাভাবিক ছিল।

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার বাল্যস্মৃতি লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে উপরোক্ত বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁহার বক্তব্যের আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হইল : " তখনও ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া যায় নাই। সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা সামান্য মূল্য দিয়া দাসদাসী জন্মের মতন কিনিয়া রাখিতেন। এ সকল দাসদাসীর কেবল ভরণপোষণের ভার নহে ইহাদের বিবাহাদির ভারও গৃহস্বামী বহন করিতেন। আপনার পুত্রকন্যাগণের যেরূপ বিবাহ দিতেন, ততটা সমারোহের সহিত না হইলেও এসকল দাসদাসীরও পুত্রকন্যাগণের যথারীতি বিবাহ দিতেন, এবং ইহা নিজেরই দায় বলিয়া মনে করিতেন। রক্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও এসকল দাসদাসী তাহাদের প্রভুপরিবারের সঙ্গে সর্বদাই অতিশয় কোমল স্নেহের

1 A. L. Basham : The Wonder That Was India. Pages 153-154

সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিত ”।1 পাল মহাশয় তাঁহাদের পরিবারভুক্ত “ কাঞ্চনীর মা ” নামে একজন ক্রীতদাসী সম্পর্কে লিখিয়াছেন ঃ “ আমার বার-তের বৎসর বয়স পর্যন্ত কাঞ্চনীর মা আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। মা ইঁহাকে বড় ভগ্নীর মত ভক্তি করিতেন……………। বাবা ইঁহাকে আপনার শ্বাশুড়ীর মত সমীহ করিয়া চলিতেন, বাবা-মার কথাবার্তায় বা আচার-আচরণে ইনি যে দাসী এভাব কোনদিন প্রকাশ পায় নাই। …………ইনি যে দাসী ছিলেন, আজও একথা ভাবিতে সঙ্কোচ হয় ”।2

সামন্তপ্রথা

মধ্যযুগীয় য়ুরোপে সামন্ততন্ত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ, সমাজস্থ লোকেরা তিন শ্রেণীতে (এই শ্রেণীগুলিকে estates বলা হইত) বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে যাজক সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহাদের First Estate বলা হইত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায। তাঁহারা Second Estate বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন সর্বসাধারণ। তাঁহাদিগকে Third Estate বলা হইত। এই তিন শ্রেণীর কাজকর্ম সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করা ছিল। তাঁহাদের জীবন-যাপন করার রীতিতেও (style of life) পার্থক্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি শ্রেণীর পদমর্যাদা আইনের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট করা ছিল। আইনের চক্ষে সবাই সমান, এই নীতি তখন বলবৎ ছিল না। একই প্রকার অপরাধের জন্য অভিজাত সম্প্রদাযের লোককে এবং সাধারণ লোককে ভিন্ন প্রকার শাস্তি দেওয়া হইত। অন্যান্য আইনসম্মত অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রেও পার্থক্য ছিল। তৃতীয়তঃ, সামন্ততন্ত্রে কেবলমাত্র প্রথম দুই শ্রেণীর লোকেরা রাজনৈতিক অধিকাব ভোগ করিতেন। সাধারণ লোকের কোন প্রকার রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হইত না।

ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে। য়ুরোপ ছাড়াও অন্যান্য দেশে সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সর্বত্রই ইহা লোপ পাইয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সামন্তপ্রথা য়ুরোপীয় সামন্ততন্ত্র হইতে পৃথক ছিল। য়ুরোপে সামন্ততন্ত্র চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজার নিকট হইতে জমির ভোগদখল নেওয়ার শর্ত ছিল, যখনই প্রয়োজন হইবে রাজাকে ধনসম্পদ ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এই জাতীয় কোন চুক্তির উপর ভূমির ভোগদখল নির্ভর করিত না। সাধারণতঃ যুদ্ধে পরাজিত হইলে বিজিত রাজা বিজেতা রাজার আনুগত্য স্বীকার করিয়া সিংহাসন রক্ষা করিতেন। ভারতবর্ষে এইভাবেই সামন্ত প্রথার উদ্ভব হয়। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজাকে স্বেচ্ছায় সমীপবর্তী পরাক্রমশালী রাজার আনুগত্য স্বীকার করিতে

1 বিপিন চন্দ্র পাল: সত্তর বৎসর। আত্মজীবনী। যুগযাত্রী-প্রকাশক লিমিটেড, কলিকাতা-৬। ১৯৬২ পৃঃ ৪৫

2 তদেব পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮

উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রাদিতে যে 'ধর্মবিজয়ের' উল্লেখ আছে তাহার অর্থ হইল, বিজেতার পক্ষে পরাজিত রাজার রাজ্য গ্রাস না করিয়া বিজিত রাজাকে অধীন করিয়া রাখা বিধেয়। পরবর্তীকালে সমুদ্র গুপ্ত এবং আরও অনেক রাজা এই অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া বিজিত রাজ্যকে স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্য আরেক প্রকারে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হইতে দেখা যায়। মৌর্যযুগের পরবর্তীকালে নৃপতিগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রিয় কর্মচারীগণকে পুরস্কার হিসাবে নগদ অর্থ না দিয়া কয়েকটি নির্দিষ্ট গ্রামের রাজস্ব আদায় করিবার অধিকার অর্পণ করিতেন। এই অধিকারের সঙ্গে কালক্রমে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদের করায়ত্ত হইত। এই মধ্যস্বত্বভোগীগণই শেষ পর্যন্ত সামন্ত রাজার স্থান অধিকার করিতেন।

সম্রাটের অধীন যে-সব রাজন্যবর্গ ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্ক কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া গড়িয়া উঠিত না। ভিন্ন ভিন্ন সামন্ত রাজার সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্কেও রকমফের হইত। কেহ কেহ সম্রাটকে নিয়মিত খাজনা দিতেন। কেহ কেহ যুদ্ধের সময় সৈন্য ও ধনসম্পদ দিয়া সম্রাটকে সাহায্য করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত থাকা সামন্ত রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। অনেক সময় সামন্ত রাজা সম্রাটের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হইতেন।

কিন্তু বড় বড় রাজন্যবর্গ (যাঁহাদের মহাসামন্ত বলা হইত) সম্রাটের নিরাপত্তার দিক হইতে বিপজ্জনক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলের ইতিহাসে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে চালুক্য বংশের আধিপত্য ছিল। কিন্তু আনুমানিক ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দন্তিদুর্গ রাষ্ট্রকূট নামে একজন সামন্ত নৃপতি চালুক্য সম্রাটকে পরাজিত করিয়া নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং চালুক্য নৃপতিকে সামন্ত রাজার স্তরে নামাইয়া দেন। রাষ্ট্রকূটদের আধিপত্য প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ স্থায়ী ছিল। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূটদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া চালুক্যগণ পুনরায় তাঁহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আবার তাঁহাদের সামন্ত নৃপতিগণ—যাদব, কাকতীয় এবং হয়সালা বংশোদ্ভূত রাজন্যবর্গ—সাম্রাজ্যটি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া নেন। উত্তর ভারতের ইতিহাসেও এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এইসব উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী সামন্ত নৃপতিগণের উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা খুব সীমিত ছিল। অপরপক্ষে, দুর্বল রাজন্যবর্গের প্রভাব এবং ক্ষমতা এত বেশি সঙ্কুচিত ছিল যে, তাঁহাদিগকে সাধারণ জমিদারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যদিও তাঁহারা 'রাজা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগ

শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে সামন্ততন্ত্রের স্থলে ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটে তাহা সমাজ-ব্যবস্থাতেও প্রতিফলিত হয়। সমাজস্থ লোকেরা উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে থাকে। এই কথা বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না যে, সামাজিক স্তর-বিন্যাস বলিতে বর্তমান যুগে মুখ্যত অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ বুঝায়। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে যে-সব সামাজিক স্তর-বিন্যাসের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি হইতে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগ একটু স্বতন্ত্র।

শ্রেণীর কোন সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইজন্য একটু বিস্তারিত আলোচনা করিলে ইহার স্বরূপ বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

সামাজিক শ্রেণীর দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, একই শ্রেণীভুক্ত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিলেও তাহা পারস্পরিক সম্বন্ধ বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কে এই সমতা দেখা যায় না। বরং উচ্চতর-নিম্নতর ব্যবধান এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া রাখে।

এই বিষয়টির আবার দুইটি ভিন্ন দিক আছে। একটি হইল বহিরাবরণ সম্পর্কিত, যাহা বাহির হইতে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অপরটি হইল আভ্যন্তরীণ, যাহাকে শ্রেণী-সচেতনতা বলা যাইতে পারে।

শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভূষা, শিক্ষা এবং সামাজিক সম্বন্ধাদিতে প্রকাশ পায়। শ্রেণীভুক্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সমানভাবে মেলামেশা করে। আচার-আচরণ, কথাবার্তা, বেশভূষা, এবং শিক্ষা-দীক্ষায়ও অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বাহির হইতে দেখিয়া শ্রেণী নির্দেশ করিতে অসুবিধা হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, শ্রেণী যেসব আদর্শকে মূল্যবান বলিয়া মনে করে সেইসব আদর্শেরই প্রতিফলন হয় সেই শ্রেণীর বহিরাবরণে। অতএব সমশ্রেণীস্থ লোকদের শ্রেণীসুলভ আচরণ করিতে হয়। এই বহিরাবরণের সাহায্যে এক শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। যাহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাহারা লোকলৌকিকতায়, শিক্ষায়, এমন কি বৃত্তিতেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মান অনুযায়ী চলিতে চেষ্টা করেন। তাহারা মুখে যত চড়া সুরে সাম্যবাদের জয়গান করেন না কেন, কেহ মেথরের বৃত্তি গ্রহণ করিলে তাহাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অপাংক্তেয় বলিয়াই গণ্য করা হয়।

শ্রেণীর বহিরাবরণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কে কি ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে অথবা কি ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করিতে

সক্ষম হইবে ইহা তাহার অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা মুখ্যত নির্ণীত হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হইলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হয় এবং অধিক উপার্জন করার সম্ভাবনা থাকে। ইহার ফলে শ্রেণীর প্রচলিত মান অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। সুতরাং শ্রেণীর সঙ্গে আয়ের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই দিক হইতে বিচার করিলে ধনী দরিদ্র এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা শ্রেণীর মান অনুযায়ী করা সঙ্গত। যিনি শ্রেণীর প্রচলিত মান অনুযায়ী চলিতে অক্ষম তিনিই দরিদ্র। আবার যিনি শ্রেণীর প্রচলিত মান হইতে অধিকতর উন্নত মান বজায় রাখিতে সক্ষম তিনিই ধনী। কিন্তু আয়কে শ্রেণীর একমাত্র সূচক বলিয়া গণ্য করা অনুচিত। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লক্ষণ প্রাধান্য পাইয়া থাকে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছিল যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেহ যদি মেথরের বৃত্তি গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাকে মধ্যবিত্ত সমাজে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য করা হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৃত্তিও শ্রেণীর অন্যতম প্রধান সূচক। অনুরূপভাবে, শিক্ষার মান, আদব-কায়দা, কোন কোন ক্ষেত্রে বাসস্থানও শ্রেণীর সূচক বলিয়া গণ্য হয়।

কেবলমাত্র বহিরাবরণ বিচার করিলে শ্রেণী সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় না। অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ শ্রেণীর অন্তর্গত লোকদের মধ্যে একাত্মতা (consciousness of kind) সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রেণী-সচেতনতার উদ্ভব হয়। শ্রেণী-সচেতনতার দুইটি দিক আছে। একটি হইল, সমশ্রেণীস্থ লোকদের মধ্যে একাত্মতাবোধ। দ্বিতীয়টি হইল, এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর নানাপ্রকার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা।

শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা নানা কারণে কম-বেশি হইতে পারে। প্রথমতঃ, সামাজিক সচলতা শ্রেণী-সচেতনতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যে-সমাজে এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে চলাচল সহজসাধ্য, সেই সমাজে শ্রেণী-সচেতনতা অপেক্ষাকৃত কম তীব্র হইবে। আবার যে-সমাজে এক শ্রেণী হইতে অপর সমাজে চলাচল করার পথ রুদ্ধ (যেমন, ভারতীয় জাতিভেদ প্রথায়), সেই সমাজে শ্রেণী বিভাগ মানিয়া চলা অনেকটা অভ্যাসগত এবং স্বয়ংক্রিয় আচরণে পরিণত হয়। সুতরাং এই অবস্থায় শ্রেণী-সচেতনতা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ-ইতিহাসে শ্রেণী-সচেতনতা ও শ্রেণী-দ্বন্দ্ব না দেখিতে পাওয়ার ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। অপর পক্ষে, এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে চলাচল করা যদি সম্ভবপর অথচ সহজসাধ্য না হয়, তাহা হইলে শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। একদিকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং অপর দিকে নিম্নতর শ্রেণীতে অধঃপতিত হইবার আশঙ্কা শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ, দুই বা ততোধিক শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধ বেশি হইলে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শত্রু মনে করিয়া আত্মরক্ষার্থে নিজেদের সংহতি সুদৃঢ়তর করিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

এই অবস্থায় সমশ্রেণীস্থ লোকেরা সম্ভাব্য সামাজিক সঙ্ঘে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, সমরূপ অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমশ্রেণীস্থ লোকদের মধ্যে অভিন্ন ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিলে শ্রেণী-সংহতি দৃঢ় হয় এবং শ্রেণী-সচেতনতাও তীব্রতর হয়। যখন কোন শ্রেণী প্রথম আত্মসচেতন হইয়া উঠে তখন শ্রেণী-সংহতি ও শ্রেণী-সচেতনতা গড়িয়া তুলিতে অভিন্ন ঐতিহ্য বিশেষভাবে কার্যকর হয়।

শ্রেণী-ব্যবস্থা প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে। একটি হইল **open class system** বা সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা। সচল শ্রেণী-ব্যবস্থায় স্তর বিন্যাস প্রতিযোগিতা ও যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে কেহ সামাজিক মানদণ্ডে উঠিতে পারে অথবা নামিতে পারে। এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে চলাচল করিবার পথে অন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা রহিযাছে বলিযা দাবি করা হয। এই দিকটি সামাজিক সচলতা আলোচনা করিবার সময় বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হইবে। আবেক প্রকার শ্রেণীকে **closed class system** বা নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থা বলা হয়। নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থায় এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে চলাচল করা সম্ভবপর নয়। এই প্রকার শ্রেণী-ব্যবস্থার উদাহরণ হইল ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা। এই পরিচ্ছেদের শেষ দিকে জাতিভেদপ্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

শ্রেণী সম্পর্কে মার্ক্সীয় চিন্তাধারা

মার্ক্স-এর সমাজ-চিন্তায শ্রেণী উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য পাইয়াছে। তাঁহার মতে, সমাজের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। গোষ্ঠী-জীবনেব আদিম কমিউনিজম শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ভবিষাতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিবে। মার্ক্স-এর এই মূল বক্তব্যটি পরবর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

সমাজের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিতে গেলে দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। একটি হইল উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং অপরটি হইল উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত নানারকম পারস্পরিক সম্পর্ক। কোন বিশেষ উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে-শ্রেণীর হস্তে উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা থাকে, সেই শ্রেণী অতিরিক্ত উপার্জন **(surplus value)** লাভ করে এবং ইহার জোরে অন্যান্য শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইলেই সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয় এবং অন্য এক শ্রেণী উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা অর্জন করে। ইহার ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের সংঘাত আরম্ভ হয়। এই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সমাজের রূপ পরিবর্তিত হয়। মার্ক্স-এর মতে পুরাতন দিনের দাসত্ব প্রথা হইতে শুরু করিয়া ধনতন্ত্র পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস প্রধানতঃ শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় তিনি তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ

করিয়াছেন : (১) ধনতন্ত্রী বুর্জোয়া। মূলধনের মালিকানা ইহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। (২) ভূ-স্বামীগণ। তাঁহারা ভূমি-স্বত্বের অধিকারী। (৩) শ্রমিক শ্রেণী। তাহারা উৎপাদন-কার্যে প্রয়োজনীয় শ্রম সরবরাহ করে। উৎপাদনে ভূমি, মূলধন এবং শ্রমের সমরূপ গুরুত্ব এবং প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ স্বীকার করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে, উপরোক্ত তিন শ্রেণীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে সৃজনী ভূমিকা রহিয়াছে। একটি অপরটির পরিপূরক। কোন একটি উপাদান বাদ দিলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু মার্ক্সের মতে ধনতন্ত্রী বুর্জোয়া এবং ভূস্বামীগণের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক আসলে বিরোধের সম্পর্ক, মিলনের নহে। ইহা শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। মূলধনের মালিক এবং ভূ-স্বামী মুনাফা বা খাজনা হিসাবে যাহা পান তাহার অধিকাংশ শ্রমিককে শোষণ করিয়াই পান। কারণ, উৎপাদনে তাহাদের ভূমিকা নগণ্য। তাঁহার মতে একমাত্র শ্রমিককে আসল উৎপাদক বলা যাইতে পারে। অতীতে শ্রমিক-শোষণের ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান মূলধনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য তিনি মূলধনকে প্রাণহীন শ্রম (dead labour) বা জমাট বাঁধা শ্রম (congealed labour) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শোষণের উপর ভিত্তি করিয়া ধনতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই অবস্থায় শ্রেণী-দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মার্ক্স মনে করেন। তবে শোষিত হইতেছে বলিয়াই শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-সচেতনতা আপনা হইতে গড়িয়া উঠে না। শোষণ এবং বিপ্লবের মধ্যে সব সময় অনিবার্য কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। মজুরিবৃদ্ধি বা অন্যান্য দাবি-দাওয়ার সমর্থনে শিল্প-শ্রমিকগণ যখন আন্দোলন করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের আন্দোলন সংকীর্ণ অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নিজেদের দাবি-দাওয়া আংশিকভাবে পূরণ হইলেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। শ্রমিকের সর্বপ্রকার শোষণ বন্ধ করিয়া সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠন করার উদার দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে না থাকারই কথা। পরবর্তীকালে লেনিন ইহাকে trade union consciousness বা শ্রমিক সঙ্ঘ সম্পর্কিত সচেতনতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই মানসিকতাকে শ্রেণী সচেতনতা বলিয়া ভাবা সঙ্গত হয় না। উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিক হিসাবে একই ভাবে শোষিত হয় বলিয়া মার্ক্স তাহাদের a class in themselves বা একটি বিশেষ শ্রেণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রেণী-সচেতনতা না থাকার জন্য শ্রেণী হিসাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইবার কোন যুক্ত প্রচেষ্টা করা তাহাদের সাধ্যাতীত। সেইজন্য মার্ক্স বলিয়াছিলেন যে, শ্রমিকগণ a class in themselves হইলেই a class for themselves হয় না। অর্থাৎ শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শোষণের অবসান ঘটাইবার জন্য অনুকূল সংগ্রামী মানসিকতা তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠে না।

মার্ক্সের মতে, শ্রেণী-সচেতনতা গড়িয়া না উঠা পর্যন্ত শ্রমিকগণ যথার্থ শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র শ্রেণীসুলভ বহিরাবরণ থাকিলেই চলিবে না। ইহার সঙ্গে শ্রেণী-সচেতনতার বিশেষ প্রয়োজন।. বহিরাবরণের

ভিত্তিতে তাহাদের statistical category বা পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সমবৈশিষ্ট্য-যুক্ত শ্রেণী বলা যাইতে পারে, সামাজিক শ্রেণী নহে।

মার্ক্সের মতে, শিল্পোৎপাদনে মূলধনের প্রয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ধনতন্ত্রী বুর্জোয়াদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। যাহাদের মূলধন বেশি থাকিবে, কেবলমাত্র তাহারাই বুর্জোয়া শ্রেণীতে স্থান বজায় রাখিতে পারিবে। যাহাদের মূলধন অপেক্ষাকৃত কম থাকিবে (যেমন, ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, দোকানদার—যাহাদের মার্ক্স পাতি বুর্জোয়া আখ্যা দিয়াছেন) তাহারা নিম্ন শ্রেণীতে পতিত হইবে। তাহা ছাড়া, অসম ধন-বণ্টনের জন্য নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদের আর্থিক দুর্দশা চরমে উঠিবে। এই অবস্থায় শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে। বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে শোষণের জগদ্দল পাথর সরান সম্ভব হইবে না, এই বোধ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিবে। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রস্তুতি হিসাবে নিম্নবিত্তদের মধ্যে শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মার্ক্স উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক পর্যালোচনার সাহায্যে তিনি দেখাইয়াছেন যে, শোষণ যত তীব্র হউক শোষণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা আপনা হইতে বৃদ্ধি পায় না। সর্বকালে সর্বদেশে শ্রমিক শ্রেণীকে নিষ্ক্রিয় থাকিতে দেখা যায়। সেইজন্য কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে তিনি শ্রেণী সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে কমিউনিস্ট পার্টির নিম্নোক্ত ভূমিকার উল্লেখ করেন: "The Communists fight for the attainment of immediate aims, for the enforcement of the momentary interests of the working class; but in the movement of the present, they also represent and take care of the future of the movement......... But they never cease, for a single instant, to instil into the working class the clearest possible recognition of the hostile antagonism between bourgeoisie and proletariat.........অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণী-সচেতন করিয়া তুলিতে হইলে কমিউনিস্ট পার্টিকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। এইদিক হইতে বিচার করিলে মার্ক্সকে পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণবাদী (determinist) বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

ধনতন্ত্রের বিকাশধারা সম্পর্কে মার্ক্স যে-ধরনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, বাস্তবে তাহা কার্যকর হয় নাই। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক অবস্থা নিদারুণ হওয়ার পরিবর্তে বরং পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন এই উন্নতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। আহার, পোষাকপরিচ্ছদ, বাসগৃহ, শিক্ষা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদিতে এত ব্যাপক উন্নতি হইয়াছে যে, শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ধনতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে কোন বিপ্লবাত্মক অভিযানে সামিল হইবে বলিয়া মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। মার্ক্সের সমালোচকগণ বহু পূর্বেই এই সম্ভাবনার উল্লেখ

করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকগণ যত বেশি দাবি-দাওয়া আদায় করিতে সমর্থ হইবে তাহাদের বিপ্লব করার উৎসাহে সেই অনুপাতে ভাটা পড়িবে। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, সম্প্রসারণশীল অর্থ-নীতিতেই শ্রমিকগণকে সন্তুষ্ট রাখার মত দাবিদাওয়া পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কাঠামো অপেক্ষাকৃত নিশ্চল (stagnant) হওয়ায় শ্রমিকদের যাবতীয় দাবি পূরণ করা সহজসাধ্য নহে। এই সম্ভাবনা সম্পর্কে জোর করিয়া কোন কিছু বলা যায় না। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার এত অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক অবস্থার চেহারা অল্প সময়ের মধ্যে আমূল পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নহে।

মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণী

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কয়েকটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হওয়ায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে পার্থক্য অনেক হ্রাস পাইয়াছে। শিক্ষার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার কথা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সামাজিক সচলতা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাবু কাজের (white collar jobs) সুযোগ সুবিধা উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইতেছে। কলকারখানায় কাজের সময় পূর্বাপেক্ষা অনেক সংকুচিত হইয়াছে। এইসব পরিবর্তনের ফলে শ্রেণী-পার্থক্য এবং শ্রেণী-সচেতনতা স্বভাবতই হ্রাস পাইয়াছে।

শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই কারণে অর্থনৈতিক শ্রেণীর পাশাপাশি মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, লোকের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ তাহার জীবন যাপনের বিশেষ রীতির (style of life) মধ্যে দেখা যায়। অর্থাৎ গৃহে ও কর্মস্থলে তাহার বিশেষ আচার-আচরণে এবং বিশেষ করিয়া তাহার অর্থ ব্যয় করিবার প্রণালীতে। এই প্রসঙ্গে আপত্তি উঠিতে পারে যে, কোন বিশেষ জীবন-যাপনের রীতি (style of life) অনুসরণ করা বা কোন বিশেষ সামগ্রী ক্রয় করা মুখ্যতঃ তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণী এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীকে সমার্থক বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ঠিক নহে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, অর্থনৈতিক শ্রেণী নির্ধারণ করিতে হইলে কে কি ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে ইহা বিবেচনা করিতে হয়। প্লেটো, এরিস্টটলের সময় হইতে শ্রেণী অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণের রীতি চলিয়া আসিতেছে। মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণী নির্ধারণের সময় বৃত্তি প্রাধান্য পায় না। মর্যাদা-ব্যঞ্জক লক্ষণগুলির মধ্যে জীবন-যাপনের রীতি বিশেষ-ভাবে বিবেচ্য। জীবন-যাপনের রীতি পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরে বাইরে আচরণ, কেনাকাটা, গৃহসজ্জা, আসবাবপত্র প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশ পায়। সুতরাং বিভিন্ন বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত লোকদের সমরূপ জীবন-যাপনের রীতি থাকা বিচিত্র নহে। অর্থনৈতিক শ্রেণী ও মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া সর্বপ্রথম আলোচনার অবতারণা করেন

ম্যাক্স হেবার (Max Weber)। তাঁহার আলোচনা অনুসরণ করিয়া সমাজতত্ত্ববিদগণ এই বিষয় সম্পর্কে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বটোমোরের (Bottomore) নিম্নোক্ত উক্তি প্রণিধানযোগ্য।"………in Western societies, the social hierarchy is now constituted less by social classes and more by status groups. The difference, broadly, is between a hierarchy of a small number of organised or partly organised economic groups whose relations to each other are antagonistic, and a hieararchy of numerous groups, more correctly described as aggregates of individuals of equal social prestige, based on similarities which are not exclusively economic, and whose relations to each other are not primarily antagonistic but are partly competitive and partly emulative. Thus in place of classes pursuing their economic interests at the expense of the community, the democratic societies are moving towards a system of groups which are less exclusive, less clearly defined, less widely separated in social level, and not pursuing with the same tenacity their narrow group interests."1 অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে সামাজিক স্তর-বিন্যাস বলিতে মুখ্যতঃ মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীবিভাগ বুঝায়; অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থান অধিকার করে। এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক, কিন্তু মর্যাদা অনুসারী শ্রেণীবিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সমকক্ষ হইতে বা অপর শ্রেণীকে ছাপাইয়া যাইতে সচেষ্ট থাকে। সুতরাং মর্যাদা অনুসারী শ্রেণীব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক শ্রেণীর ন্যায় সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে না। সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও ব্যাপক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না।

ভারতবর্ষে শিল্প এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে নাই। তাহা ছাড়া, এখানে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত আছে। এই দুইটি কারণে এই দেশে এখনও মর্যাদা অনুসারী শ্রেণীর অস্তিত্ব বিরল। তবে নগর-জীবনে মর্যাদা-ব্যঞ্জক লক্ষণসমূহ ধীরে ধীরে প্রাধান্য পাইতেছে। ইহার নিদর্শন সুস্পষ্ট। নগরবাসীদের কেনাকাটা, দেওয়া-থোওয়া, গৃহসজ্জার সাজ-সরঞ্জাম, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যাইবে, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা সাধ্যাতীত খরচপত্র করেন। যুক্তি হিসাবে প্রায়ই বলিতে শুনা যায়: 'অন্য সকলে যখন এইভাবে দেওয়া-থোওয়া করে, আমাকেও

করিতে হয়। না হইলে মান থাকে না'। সুতরাং মান রাখার প্রচেষ্টারূপ ঢেউ অদূর ভবিষ্যতে সারা সমাজে পরিব্যাপ্ত হইবে, ইহা অনুমান করা অমূলক নহে।

বটোমোর যাহাকে competitive বা প্রতিযোগিতামূলক এবং emulative বা অনুকারী পারস্পরিক সম্পর্ক বলিয়াছিলেন তাহারই বহিঃপ্রকাশ এই ধরনের কথাবার্তা এবং আচার-আচরণে দেখিতে পাওয়া যায়। মর্যাদা অনুসারী শ্রেণীব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকায় সুখ ও সমৃদ্ধি আপেক্ষিকভাবে বিবেচিত হয়। প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব বা অন্যান্য জিনিষপত্র থাকিলেই সন্তুষ্টি আসে না। প্রতিবেশীদের বা পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে কাহার কি আছে বা না-আছে তাহার উপর সন্তুষ্টি নির্ভর করে। ভারতবর্ষের সনাতন জীবনাদর্শ হইতে এই মনোভাবের পার্থক্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে কালপ্রবাহে সমাজের যে কি আমূল পরিবর্তন হয় তাহা বুঝা যায়। ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি প্রশ্ন ছিল ঃ "কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে"। এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন ঃ

> "অপ্রবাসে অঋণে যাহার কাল যায়।
> যদ্যপি পরাহ্ণ কালে শাক অন্ন খায়॥
> তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর"।1

অর্থাৎ যে নিজ গৃহে ঋণগ্রস্ত না হইয়া স্ব-অর্জিত শাকান্ন খাইয়া জীবনযাপন করে, সে-ই সংসারে প্রকৃত সুখী। এই জীবনাদর্শ ভারতবর্ষে আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃত পক্ষে, প্রাক্ শিল্পযুগীয় সব সমাজেই অনুরূপ আদর্শ স্বীকৃত ছিল, কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে। শিল্প-প্রধান সমাজে জীবন যে কি জটিল হইয়া পড়িয়াছে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তাহার অন্যতম নিদর্শন।

আমাদের সমাজ-জীবনে যে প্রতিযোগিতামূলক এবং অনুকারী পারস্পরিক সম্পর্ক অতীতকালে বিরল ছিল তাহার একটি সুন্দর ছবি বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের আত্ম-জীবনী হইতে উদ্ধৃত করা হইল। "আমাদের গ্রামের নিকটেই একজন বড় জমিদার ছিলেন, জাতিতে তেলী বা কলু। আমাদের অঞ্চলের তেলীদের মধ্যে সামাজিক পংক্তি ভোজনে এই প্রথা ছিল যে, তাহারা এক একটা মোটা মুলী বাঁশের উপরে দশ পনের জন করিয়া সার দিয়া খাইতে বসিতেন। কলাপাতায় খাদ্যাদি পরিবেশন হইত, আর কাঁসার বা পিতলের ঘটিতে পানীয় জল থাকিত, এক এক ঘটি হইতে চার পাঁচ জন মিলিয়া পান করিতেন। একবার এই জমিদার জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পিঁড়ি পাতিয়া থালা গ্লাস সাজাইয়া করজোড়ে যাইয়া তাহাদিগকে আহার স্থলে ডাকিয়া আনিলেন। ....খাবার ঘরের দরজায় গিয়া ই'হারা দাঁড়াইয়া রহিলেন। বসিতে অনুরোধ করিলেও নড়িলেন না। তখন তাঁহার কি অপরাধ হইয়াছে গৃহস্বামী জানিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে একজন সকলের মুখপাত্র হইয়া বলিলেন, তুমি কি আমাদের অপমান করিবার জন্য এই নিমন্ত্রণ করিয়াছ? তুমি ধনী, তোমার ঘরে বিস্তর থালা গ্লাস আছে; আমরা গরীব, তোমাকে যখন

1 ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারত পৃ ঃ ৫১৭

আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব, তখন ত এইরূপ পিঁড়ি সাজাইয়া খাইতে দিতে পারিব না। এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমাদের সামাজিকতা চলে না, আমরা তোমার বাড়ীতে আর জলগ্রহণ করিতে পারি না। জমিদার মহাশয়ের তখন চৈতন্য হইল। টাকার জোরে তিনি যে স্বজনবর্গের চাইতে উঁচু হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইল। পরে মুলীবাঁশ ও কলাপাতা আনিয়া খাওয়াইবার আয়োজন করিতে হইল"।1 বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রায় একশত বৎসর পূর্বেকার গ্রাম-বাংলার এই ছবিটি আঁকিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বর্তমান কালের মত মান রাখার তাগিদ কেহ অনুভব করিতেন না। ধনবণ্টনে বৈষম্য এবং জাতিভেদপ্রথা থাকা সত্ত্বেও মর্যাদাব্যঞ্জক লক্ষণগুলি আয়ত্ত করিবার সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা বিরল ছিল।

ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথা

বহু প্রাচীন কাল হইতে জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে। কবে কিভাবে ইহার উৎপত্তি হয়, এই বিষয় লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে এবং এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত থাকার ফলে অন্যান্য আচার-ব্যবস্থার ন্যায় জাতিভেদ প্রথারও নানারকম পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথমে যে-ভাবে ইহা শুরু হইয়াছিল এবং বর্তমানে যে-ভাবে ইহা প্রচলিত আছে, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু তাহা অনুমান করা কঠিন। সুতরাং সমাজতত্ত্বের দিক হইতে ইহার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে জাতিভেদ প্রথার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করিয়া বর্তমানে আমাদের মধ্যে এই প্রথা যে-ভাবে প্রচলিত আছে সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা হইলে এই প্রথার যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব হইবে। সেইজন্য প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে জাতি শব্দটির পরিবর্তে বর্ণ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সেই বিরাট পুরুষের "ব্রাহ্মণ মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহুস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার উরু বৈশ্য ছিলেন এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জাত হইয়াছিলেন।" গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি উল্লেখযোগ্য: চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।" (৪।১৩) অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি করিয়াছি। পুরুষ সূক্তের মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নির্মলকুমার বসু মহাশয় নিম্নোক্ত উক্তি করিয়াছেন। "ঋগ্বেদের উল্লিখিত মন্ত্রের সরল অর্থ করিলে মনে হয়, চারিটি বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং বিভিন্ন কর্মবিশিষ্ট বর্ণের সমাবেশের দ্বারা সমগ্র সমাজদেহ গঠিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের বিভিন্ন মাত্রার সংযোগের ফলে চারি বর্ণের মধ্যে গুণের তারতম্য দেখা যায়।.........প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ যখনই বিভিন্ন জাতির সহিত পরিচিত হইয়াছে, তখন গুণ ও কর্ম দেখিয়া

1 বিপিন চন্দ্র পাল: সত্তর বৎসর।। আত্মজীবনী।। যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড। কলিকাতা-৬। ১৯৬২। পৃষ্ঠা ১২৯

কোন না কোন বর্ণের মধ্যে সেই জাতির স্থান নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যদি কোন জাতির অভ্যস্ত কর্ম ঠিক ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কোনটির সঙ্গেই হুবহু মিলিয়া না যায়, তাহাদিগকে মিশ্র গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়, তবে সেই জাতি কোন্ বর্ণে স্থান পাইবে? এই সমস্যা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য,. গৌতম প্রভৃতি বিভিন্ন স্মৃতিকারগণকে যথেষ্ট আলোড়িত করিয়াছিল। তন্মধ্যে মনুসংহিতায় স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ.........'বর্ণবহির্ভূত সবিশেষ অবিদিত, সঙ্করজাতিসম্ভূত আপাততঃ আর্য্যবৎ প্রতীয়মান কিন্তু অনার্য্য—এবম্ভূত ব্যক্তির কর্ম্মদর্শনে জাতিনির্ণয় করিবে'।......মনুসংহিতা পাঠ করিলে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। সেই জাতিগত বৃত্তির বিষয়ে বিবেচনা করিয়া স্মৃতিকারগণ কোন্ জাতির পক্ষে কোন্ বর্ণের মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ করিতেন এবং প্রত্যেকে কিরূপ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হইবে তাহাও স্থির করিয়া দিতেন।" 1 ইহা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনেরা একদিকে যেমন কতকগুলি গুণকে উত্তম এবং কতকগুলি গুণকে অধম বলিয়া গণ্য করিতেন, অপর পক্ষে ঠিক তেমনি কতকগুলি বৃত্তিকে শুদ্ধ এবং কতকগুলি বৃত্তিকে অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এইভাবে গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করেন। ইহা অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না যে, প্রথমাবস্থায় বর্ণ-বিন্যাসের ভিত্তি গুণ ও কর্ম হওয়ায় বিভিন্ন বৃত্তি কৌলিক বা জাতিগত বৃত্তিতে পরিণত হয় নাই। "বৈদিক যুগে ..শিল্পবৃত্তি সম্পর্কে স্বাধীনতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভৃগু ঋষি মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহারা রথনির্মাণে দক্ষ ছিলেন।"2

বর্ণ-বিন্যাসের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার পশ্চাতে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ণ-ব্যবস্থার মূল্যায়ন করিবার সময় আমরা এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে বিভিন্ন কাজকর্ম কিভাবে এবং কোন্ সময়ে একান্তভাবে কুলবিশেষ বা জাতিবিশেষের আয়ত্তাধীনে আসে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। এই বিষয় লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে। উপযুক্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণাদিরও অভাব রহিয়াছে। সুতরাং নিঃসংশয়ে কোন কিছু বলা যায় না। তবে পণ্ডিতগণ অনুমাননির্ভর যেসব তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল।

প্রথম ধারণাটি ছিল এইরূপ। যখন আর্যরা প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তখন তাঁহারা জাতিভেদ বা বর্ণভেদ সম্পর্কে কিছু জানিতেন না। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাহারা পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে যত অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহারা তত স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসেন এবং অধিকাংশ

1 নির্মল কুমার বসু : হিন্দুসমাজের গড়ন। পৃঃ ৬৬-৬৭
2 তদেব পৃষ্ঠা ৯৫

ক্ষেত্রে আর্যরা অনার্যদের তরফ হইতে বাধার সম্মুখীন হন। অনার্যদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহারা 'ঘোর' অথবা কৃষ্ণবর্ণ এবং 'অনাস', অর্থাৎ আর্যদের তুলনায় তাহাদের নাসিকা খর্বকায় ছিল। ইহাদের বাধা প্রতিরোধ করিতে গিয়া আর্যদের মধ্যে শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয় বলিয়া একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। আবার উন্নত মেধাসম্পন্ন কিছুসংখ্যক লোক আর্যদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্তোত্রগুলি স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিতেন এবং যাগযজ্ঞ ও পূজাপার্বণাদি সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। বাকি সব লোক বিশঃ অথবা সাধারণ লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর্যধর্ম গ্রহণ করেন, তাহারা সমাজের নিম্নস্তরে শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইলেন। 1 এই মতবাদ দুইটি কারণে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, এই মতবাদ অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বে আর্যদের মধ্যে বৃত্তিভেদজনিত কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না; এই ধারণা ইতিহাসের দিক হইতে সম্পূর্ণ অমূলক। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বৃত্তিগুলি কিভাবে এবং কেন কৌলিক বৃত্তিতে পরিণত হইল ইহার কোন ব্যাখ্যা এই মতবাদে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় ধারণা অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বেই আর্যদের মধ্যে বৃত্তিভিত্তিক তিন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। এই তিনটি শ্রেণী হইল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বিশ্। তবে বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীগুলি তখন বংশগত ছিল না। এই মতবাদের সমর্থনে বলা যায় যে, সেই যুগে ইরাণীয়দের মধ্যেও অনুরূপ তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। জরোয়াস্ট্রীয়ানদের (Zoroastrian) ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্-অবেস্তাতে (Zend-Avesta) উল্লিখিত অথ্রবন (Athravan) বা যাজক এবং রথেষ্টর (Rathaestar) বা রথচালক বৈদিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতিরূপ বলিয়া মনে হয়। জেন্দ্-অবেস্তাতে উল্লিখিত বাস্ত্র্য (Vastrya) বা কৃষক এবং হুইতে (Huitay) বা মিস্ত্রী বৈদিক বিশের সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ইরাণে থাকাকালীন বা ঋগ্বেদের প্রথম যুগে উপরোক্ত বৃত্তিগুলি কৌলিক বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল। "Both the Rigvedic Aryans and the Iranians of the age of the Gathas were...... distinctly class-conscious, as is inevitable in every society that has left behind the state of primitive savagery. But there is nothing to show that the Gathic Iranians or the Rigvedic Aryans were already divided into castes."2

পরবর্তী যুগে আর্য সমাজের শ্রেণীবিভাগ ভারতবর্ষে এবং ইরাণে দুইটি সম্পূর্ণ

---

1. V. M. APTE: Social and Religious Life in the Grihya Sutras. Popular Book Depot. Bombay 7, 1954. Pages 1-2.

2 Dr. B. K. Ghosh: Hindu Ideal of Life (Manu Extension Lectures) Bharati Mahavidyalaya. Calcutta 6. 1947. Page 49.

ভিন্ন ধারায় গড়িয়া উঠে। ভারতবর্ষের ন্যায় ইরাণে চাতুর্বর্ণ্যের অনুরূপ কোন কাঠামোর উদ্ভব হয় নাই এবং বিভিন্ন বৃত্তিগুলিও কৌলিক বৃত্তিতে পরিণত হয় নাই। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেকে বলেন যে, ইরাণে আর্যগণ কৃষ্ণকায় কোন আদিম অধিবাসীর সংস্পর্শে আসেন নাই। সুতরাং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য কোন দৃঢ় বা অনমনীয় সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপর পক্ষে, ভারতবর্ষে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। এখানে আর্যগণ কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীর সংস্পর্শে আসেন। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় আদিম অধিবাসীদের জীবন-প্রণালী যে কেবল স্বতন্ত্র ছিল তাহা নহে: হয়ত আর্যদের জীবন-প্রণালী হইতে উন্নত ছিল। সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে আর্যদের মধ্যে ঘৃণা এবং ভয়-মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে যে-শ্রেণী-সচেতনতা ছিল তাহা এই অবস্থায় আরও তীব্র হইয়া উঠে। বেশাম (Basham) এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। "In India class stratification grew more rigid when, in the Vedic period, a situation arose rather like that prevailing in South Africa today, with a dominant fair minority striving to maintain its purity and its supremacy over a darker majority."1 আর্যদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীগণকে আর্য শ্রেণী-বিন্যাসের নিম্ন স্তরে স্থান দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে বেশাম বলেন: "The dark-skinned aboriginal found a place only in the basement of the Aryan social structure, as a serf with few rights and many disabilities."2 এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, আধুনিক যুগে শ্বেতবর্ণ-কৃষ্ণবর্ণভেদজনিত সমস্যার সমাধান হিসাবে শ্বেতকায় লোকেরা নিজেদের সমাজ-জীবন হইতে কৃষ্ণকায় লোকদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার পন্থা (segregation) বাছিয়া লইয়াছেন। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষীয় আর্যরা অনার্যদের নিজেদের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া আর্য-সমাজের মধ্যেই আত্তীকরণের (assimilation) উদ্দেশ্যে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন। এই সম্পর্কে নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য: "………ভারতবর্ষীয় সমাজ বহু জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে। অপরাপর দেশেও তাহাই হয়, এবং বিজেতা জাতির প্রভাবে বিজিত জাতি অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে। একে অপরকে শোষণ করিয়া নূতন একটি উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নির্মাণ করে। ………ভারতবর্ষে যে তেমন হয় নাই, তাহা নহে।……… কিন্তু ইহার মধ্যেও ভারতবর্ষের প্রতিভা এক নূতন

1 Bashan : The Wonder That was India. Fontana Books in association with Rupa & Co.

2 তদেব পৃষ্ঠা ১৩৮

দিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ; যাহার ফলে নানা রাজনৈতিক উত্থানপতন ও ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতবর্ষ স্বীয় সংস্কৃতিকে মরণের অপঘাত হইতে বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই কৌশলটি আমরা বর্ণব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদগণের মতে বর্ণব্যবস্থা সকল সমাজেই প্রযোজ্য। যেখানেই বহু জাতি মিলিত হইতেছে, তাহাদিগকে চারি মৌলিক বর্ণে স্থান দিয়া, সংশ্লিষ্ট করিয়া একটি বৃহত্তর সমাজ গঠন করা যায়। সমাজের প্রয়েজনে, স্বীয় গুণ বা প্রতিভা অনুসারে যে যে-কাজ করে, সে যদি সেই কাজেই নিযুক্ত থাকে, এবং সমাজও যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে যে সে-ব্যক্তি বা তাহার পরে অনুরূপ বৃত্তিধারী ব্যক্তি অনাহারে মরিবে না, সকলে পরস্পরের সহযোগিতার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে পরস্পরের বাহুবন্ধনে যে দৃঢ় সমাজ গড়িয়া উঠে, তাহার শক্তি বেশি হয়।"1

যাহারা সমাজের নিম্ন স্তরে স্থান পাইয়াছিল, তাহারা নানা অসুবিধা বা বাধানিষেধের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু তবুও কি কারণে তাহারা এই সমাজ-ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বসু মহাশয় বলেন : "বর্ণগত সমাজের অন্তরে যে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বর্তমান ছিল, এবং স্বধর্ম পালনের যে আশ্বাস বহু জাতি লাভ করিয়াছিল, তাহারই কারণে ভারতীয় সমাজে বিজিতের বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই ; অথবা দেখা দিলেও বেশি দূর পর্যন্ত তাহা অগ্রসর হইতে পারে নাই। অথচ ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে আপত্তি বা বিদ্রোহের কোন কারণ ছিল না, এমন মনে করিবার হেতু নাই। সকল দেশের বিজেতাগণ যাহা করিয়া থাকেন, ভারতীয় সমাজেও তাহার প্রমাণ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বিজেতাগণ স্বীয় শ্রেণীগত স্বার্থ পুষ্টির জন্য পরিশ্রমের ভার উত্তরোত্তর শূদ্রবর্ণের উপরে চাপাইয়া দিতে লাগিলেন ; বিজিত জাতির পুরোহিত-কুলকে ব্রাহ্মণবর্ণে স্থান দিলেও নিম্নপদবীর অধিকারী করিয়া রাখিলেন এবং নিম্ন-বর্ণকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এবং যোগতপের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন।"2

অনেকে চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামো টিকিয়া থাকার কারণ হিসাবে ব্রাহ্মণের 'কূট-কৌশলী' বুদ্ধির উল্লেখ করেন। চাতুর্বর্ণ্য সম্পর্কিত নিয়মকানুন এবং বিধিনিষেধ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্ণীত এবং প্রযুক্ত হইত। সুতরাং অন্যান্য ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর ন্যায় তাঁহারাও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের যোগসাধন করিয়া তাঁহারা চাতুর্বর্ণ্য সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে এমন একটি সংস্কার গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যাহা এই ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল : "In India there was not even a derelict state to enforce the caste-laws. Rather the caste-laws were enforced on the

---

1 নির্মলকুমার বসু : হিন্দু সমাজের গড়ন। পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯

2 তদেব পৃষ্ঠা ১৪৯

state in India by the Brahmanical theocracy. So the Brahmins have always ruled supreme in matters of caste, and they did not abuse their powers the less because they were Brahmins. But even in the process of abusing their powers the Brahmins built up round the prostrate body of decadent Hinduism an effective armour of social sanction which enemies superior in military prowess and political acumen have not been able to completely destory in spite of continuous assault for more than a thousand years."1

ডক্টর ঘোষের উপরোক্ত মন্তব্য আংশিক সত্য, পুরাপুরি সত্য নহে। কেবলমাত্র ধর্মের বেড়াজাল দিয়া হিন্দু সমাজব্যবস্থাকে দুই হাজারেরও অধিক কাল টিকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইত না। হিন্দুসমাজের মধ্যে "আর্থিক ভাগ্যের স্থিরতা ও আচারপালনের স্থির অধিকার" না পাইলে সাধারণ লোক কোন অবস্থাতেই কেবলমাত্র ধর্মের খাতিরে বর্ণব্যবস্থা খুশি মনে মানিয়া চলিত না বলিয়া মনে হয়। এই সম্পর্কে নির্মলকুমার বসু মহাশয় নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন: "ইহার মূলে শুধু ব্রাহ্মণের শঠতা অথবা শূদ্রগণের অন্ধ কুসংস্কার আছে বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। জগতের অন্যত্র যেরূপ সামাজিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা শুধু জাতীয় নির্বীর্যতার কারণে ঘটে নাই বলিলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দায় হইতে খালাস পাওয়া যায় না। মূলে রহিয়াছে, আপামর সাধারণের মনে বর্ণব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য। বর্ণব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্রের স্থৈর্যের বশেই ভারতীয় সংস্কৃতির স্থৈর্য সম্ভব হইয়াছিল। এই মৌলিক সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।"2

বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে আরেকটি ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। "………বর্ণব্যবস্থার মূলে একটি বুদ্ধি ছিল, মানুষ সমাজের দাস। সমাজের জন্য নির্ধারিত সেবা করিয়া কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী স্বীয় জীবনযাপন করিয়া থাকে। সমাজকে তাহারা দেখে এবং সমাজও তাহাদের দেখে। অধিকার এবং দায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"3 ভারতবর্ষে প্রত্যেক বর্ণের সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা ছিল। প্রত্যেককেই জাতিগত স্বধর্ম পালন করার কথা বলা হইয়াছিল। "ধর্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগবিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ করতেই পারত না। শূদ্রও যথেষ্ট

---

1 **Dr. B. K. Ghosh : Hindu Ideal of Life, Pages 67-68**

2 হিন্দুসমাজের গড়ন। পৃ: ১৫১

3 তদেব পৃ: ১৫৩

ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায় নি।" 1 শূদ্রের সমাদর না পাওয়ার মধ্যেই বোধহয় ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার, তথা সারা দেশের, অবনতির অন্যতম কারণ নিহিত। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিও এই কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। এই সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : "স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। ·····এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে। বুদ্ধিসাধ্য জ্ঞানসাধ্য চারিত্রশক্তিসাধ্য যে-কোনো মহাসম্পদলাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রত্বভার ঠেলে তবে করতে হবে—তার পরে সেই সম্পদকে রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আব উপায় নেই। এই কথাই আমাদের ভাববার কথা।"2

• ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার প্রযোজন রহিযাছে। বর্ণাশ্রমধর্ম বলিতে দুইটি বিষয় বুঝায়। প্রথমটি হইল, একটি সাধারণ ধর্ম বা আচরণবিধি বর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়টি হইল, নিজ নিজ অভিরুচি, ক্ষমতা এবং বয়ঃক্রম অনুযায়ী প্রত্যেকের ধর্ম বা আচরণবিধি স্বতন্ত্র। যেমন, স্বত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির এবং তমোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির আচরণবিধি পৃথক। আবার কিশোরের আচরণবিধি বৃদ্ধের আচরণবিধি হইতে স্বতন্ত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম স্বীকাব করিযা প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ সমষ্টিস্বার্থের সঙ্গে ব্যষ্টিস্বার্থের সমন্বয়সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে বেশামের উক্তি উদ্ধৃত কবা হইল : "This thorough-going recognition that men are not the same, and that there is a hierarchy of class, each with its separate duties and distinctive ways of life, is one of the most striking features of ancient Indian sociology."3

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম যে উদার আদর্শ এবং বাস্তববুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই আদর্শ কোনকালেই ষোলআনা পালিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, শূদ্র ছাড়া অন্য কেহ স্বধর্ম পালন করেন নাই। সমাজশাসনের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। শ্রেণীস্বার্থে সমষ্টিস্বার্থকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। শোষণ এবং উৎপীড়ন শূদ্রজাতির ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করিয়াছে প্রতি পদে পদে। আর্য সভ্যতার উদার সংশ্লেষের আদর্শ ভেদনীতি এবং গোঁড়ামির আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা সর্বকালের মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইতে পারিত, তাহা নিম্নজাতির পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়াছে। শূদ্রজাতির সঙ্গে সমস্ত জাতিও শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

1 রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ত্রয়োদশ খণ্ড। পৃঃ ৩২৪
2 রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ত্রয়োদশ খণ্ড। পৃঃ ৩২৫-৩২৬
3 Basham: The Wonder That was India. Page 138

বর্ণাশ্রম প্রথা আলোচনা করিবার সময় আমাদের আরেকটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রাচীন ধর্মসূত্র এবং স্মৃতিগ্রন্থের লেখকেরা চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং ব্যর্থ প্রয়াস বলা যায়। কারণ, বিভিন্ন বর্ণের নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে অনেক বিচিত্র সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়। আবার চতুর্বর্ণের বহির্ভূত নর-নারীর সঙ্গে চাতুর্বর্ণ্যবৃত নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে বিচিত্রতর সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের সবাইকে চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সেইজন্য ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলিয়াছেন: "এই চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা অলীক উপন্যাস, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ, ভারতবর্ষে এই চাতুর্বর্ণ্যের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল; প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর-উপস্তর।"1 সুতরাং চতুর্বর্ণ প্রথার মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে জাতিভেদ প্রথার প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না। সেইজন্য শ্রীনিবাস নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন: "......the influential concept of varna successfully obscured the dynamic features of caste during the traditional or pre-British period."2

জাতিভেদ প্রথা

বর্তমানে যে-ভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) জন্মসূত্রে জাতি নির্ণীত হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মাইলে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ পরিবারে জন্মাইলে কায়স্থ বলিয়া গণ্য হয়। (২) স্ব-অর্জিত গুণের দ্বারা জাতি পরিবর্তন করা সম্ভবপর নহে। নির্দিষ্ট আচার-আচরণ পালন না করিলে কেহ জাতিভ্রষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিম্ন জাতির লোক উচ্চ জাতিতে উন্নীত হইতে পারে না। (৩) বিবাহাদি সম্পর্ক জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। উচ্চ নীচ জাতির মধ্যে বিবাহ রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। (৪) বিবাহ ছাড়া অন্যান্য সামাজিক আচার-আচরণে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্কেও নানারকম বাধা-নিষেধ রহিয়াছে। যেমন, খাওয়া-পরার ক্ষেত্রে নিষেধ-বিধি। নিম্ন জাতির লোকের রান্না করা খাদ্য অথবা নিম্ন জাতির লোক স্পর্শ করিয়াছে এমন খাদ্য উচ্চ বর্ণের লোকদের গ্রহণ করা নিষেধ। গ্রহণ করিলে জাতিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। (৫) বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিসূচক পদবী দ্বারা তুলিয়া ধরা হয়। কাহারও পদবী জানিলে তাহার কুল জানিতে অসুবিধা হয় না। (৬) কয়েক শতক পূর্বে ভারতের প্রায় সর্বত্র কুল অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করা মোটামুটি বাধ্যতামূলক ছিল এবং এখনও কোন কোন গ্রাম-সমাজে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

1. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। বাঙালীর ইতিহাস—আদি পর্ব। পৃ: ৩৩
2. M. N. Srinivas : Social Change in Modern India. Pages 2-3.

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আদর্শ জাতিভেদ প্রথার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ধর্মগ্রন্থ এবং শাস্ত্রাদিতে ইহার স্বীকৃতি আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম স্থানবিশেষে এবং সমাজবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। তবুও জাতিভেদ প্রথা বলিতে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে বুঝায়।

বর্তমানে ভারতবর্ষে কত জাতি রহিযাছে তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া শক্ত। কারণ প্রতিটি জাতি বহু উপজাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথায় আচার-আচরণ এবং বৃত্তিতে শুদ্ধি-অশুদ্ধির মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয় এবং এই মানদণ্ড দ্বারা জাতিতে জাতিতে পার্থক্য করা হয়। সুতরাং নিম্ন জাতির মধ্যে উচ্চ জাতির আচার-আচরণ বা রীতিনীতি অনুকরণ করার প্রবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক। অতএব কে কতটুকু অনুকরণ করিতে সক্ষম হইল তাহার উপর ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে। এইভাবে সমভাবাপন্ন ব্যক্তি এবং পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া উপজাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন, নিরামিষ আহার গ্রহণ করা শুদ্ধির লক্ষণ এবং উচ্চজাতিসুলভ আচরণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং যাহারা নিরামিষ আহার গ্রহণ করিয়া নিজেদের পরিমার্জিত এবং পরিশুদ্ধ বলিয়া মনে করে, তাহারা স্বভাবতই সমগোত্রীয় লোকদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এইরূপ নানাপ্রকার শুদ্ধিঅশুদ্ধিব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অনেক রকম উপজাতির সৃষ্টি হয়।

জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে ধারণা জন্মে যে, ইহাকে নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থার উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায়। অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথায় এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে উন্নীত হওয়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ। তত্ত্বের দিক হইতে ইহা স্বীকৃত হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমেই আমরা শুদ্ধি-অশুদ্ধি সম্পর্কিত মানদণ্ডের উল্লেখ করিতে পারি। প্রত্যেক সমাজেই মূল্যভিত্তিক মানদণ্ড দ্বারা শ্রেণীবিভাগ নির্ণীত হয়। ভারতীয় জাতিভেদ প্রথাতেও কয়েকটি আচার-আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন, কয়েকটি বৃত্তিকে হেয় স্থান করা হয় এবং কয়েকটি বৃত্তিকে সম্মানসূচক স্থান দেওয়া হয়। চামড়া খালানো, পাকানো ও চামড়ার জিনিষ তৈয়ারীর কাজ, তাঁতের কাজ, ক্ষৌরকর্ম প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তি নীচ জাতের কাজ বলিয়া গণ্য হয়। অপর পক্ষে, যজন, যাজন, অধ্যাপন এবং কায়িক পরিশ্রমবর্জিত সবরকম বাবু-কাজ উচ্চ শ্রেণীর উপযুক্ত কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই অবস্থায় প্রথমোক্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত বৃত্তি গ্রহণ করার দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। এইভাবে বৃত্তি পরিবর্তন করিয়া অনেকে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট থাকে। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় নির্মলকুমার বসু কোলদের ঘানির সাহায্যে তেল বাহির করিবার রীতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। পূর্বে মুণ্ডারা দুই খণ্ড বৃহৎ কাঠের

পাটায় চাপ দিয়া প্রয়োজনীয় তেল নিষ্কাশন করিত। কিন্তু রাঁচী হাজারিবাগ এবং পালামৌ অঞ্চলে অন্যান্যদের দেখিয়া তাহারা কিছু কিছু শিল্পের অনুকরণ করিতে লাগিল। "তেলের পাটা ছাড়িয়া কলুর মত ঘানি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু হিন্দু সমাজে কলুর স্থান নীচু বলিয়া গণ্য হওয়ায়, জাত হারাইবার ভয়ে, ঘানিতে বলদ না যুতিয়া মুণ্ডা গৃহিনীগণ স্বয়ং ঘানি ঠেলিয়া তেল পিষিতে লাগিল।"1 বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই ধরনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৃত্তি ছাড়া আহারবিহার বা সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রেও শুদ্ধি-অশুদ্ধির মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়। পূর্বে এই সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'উঁচু' জাতির আচার-আচরণ বা বৃত্তি অনুকরণ করিয়া 'নীচু' জাতির জাত হিসাবে উন্নীত হইবার চেষ্টাকে এম, এন, শ্রীনিবাস sanskritisation বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি sanskritisation-এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন : "Sanskritisation is the process by which a "low" Hindu caste, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology, and way of life in the direction of a high, and frequently, twice-born caste. Generally such changes are followed by a claim to a higher position in the caste hierarchy than that traditionlly conceded to the claimant caste by the local community. The claim is usually made over a period of time, in fact, a generation or two, before the 'arrival' is conceded."2 অর্থাৎ উঁচু জাতে উন্নীত হইবার দাবি প্রথম দিকে স্বীকৃত না হইলেও দুই তিন পুরুষ পর এই দাবি মানিয়া লওয়া হয়। সুতরাং জাতিভেদ প্রথা কোন কালেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল ছিল না। নিশ্চল না থাকার কারণও জাতিভেদ প্রথার মধ্যেই নিহিত। শুদ্ধি-অশুদ্ধির মানদণ্ডে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদরেখা টানা হয়। কাজেই শুদ্ধাচরণ করিয়া জাতে উন্নীত হইবার চেষ্টা করা মানুষের স্বভাব ধর্ম। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে আমরা ইহার প্রমাণ পাই।

দ্বিতীয়তঃ, ভূমির মালিকানা ঊর্ধ্বমুখী সচলতা (upward mobility) কার্যকর করিতে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছে। ইহা সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমির মালিকানা উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই রীতির ব্যতিক্রম আছে। 'নীচু' জাতির মালিকানায়ও কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমি রহিয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে ভূমির মালিকানার জোরে তাহাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, অন্যান্য জাতির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কেও এই প্রভাব এবং প্রতিপত্তির প্রতিফলন দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসের মন্তব্য

1 নির্মলকুমার বসু : হিন্দু সমাজের গড়ন।
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃষ্ঠা ২২

2 M. N. Srinivas : Social Change in Modern India, Page 6

উদ্ধৃত করা হইল: "The power and prestige which landowning castes command affect their relations with all castes, including those ritually higher. This is true of parts of the Punjab where the landowning Jats look upon the Brahmins as their servants, and of Madhopur village in eastern Uttar Pradesh where formerly the dominant Thakurs refused cooked food from all Brahmins except their gurus or religious teachers."1 কেবলমাত্র আর্থিক সচ্ছলতার জোরে অব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণের রান্না খাদ্য প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের মর্যাদাহানি (a fall in secular rank) হইলেও ধর্মগত বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে (ritual rank) তাঁহার মর্যাদা হ্রাস পায় না। এই প্রসঙ্গে বেইডেলমেন-এর (Beidelman) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "At the risk of inconsistency I must emphasise that there are many areas in which ritual rank seems to operate independently of economic determinants. In Senapur and Rampur the Brahmins were not the powerful or economically superior caste, but were subordinate to the Jats and Thakurs. But by consensus the village would probably agree that these same Brahmins are ritually supreme."2

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক জাতিই সাধারণতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নতর জাতির মেয়েদের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতির ছেলেদের সঙ্গে বিবাহ (অনুলোম বিবাহ বা hypergamy) দিয়া জাতে উন্নীত হইবার প্রয়াস দেখা যায়। কুলীনদের মধ্যে প্রচলিত একাধিক বিবাহ করার কথা সুবিদিত। বর্তমান কালেও পশ্চিম বঙ্গে উচ্চতর বংশোদ্ভূত পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কুলমর্যাদায় উন্নীত হইবার প্রচেষ্টা বিরল নহে। এইভাবে নানাপ্রকার উপজাতির উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল: "The giving of girls in marriage to boys from a higher caste or higher section of the same caste added to the prestige of the wife-giving lineage and caste. In some cases it also enabled the lower group to claim, eventually, equality with the higher group" 3 অনুরূপভাবে, সমৃদ্ধশালী শিক্ষিত এবং

1 তদেব পৃঃ ১৩

2 Beidelman : A Comparative Analysis of the Jajmani System, New York, 1959. Pages 18-19. Quoted by Srinivas in his book, Social Change in Modern India. Page 13

3. Srinivas : Social Change in Modern India Page 30.

উচ্চপদস্থ নিম্নতর জাতির ছেলেদের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতির মেয়েদের বিবাহ (প্রতিলোম বিবাহ বা Hypogamy) করিয়া জাতে উন্নীত হওয়ার প্রয়াসও বিরল নহে।

চতুর্থতঃ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী হয়। ইহার ফলে নিম্নোক্ত কারণে সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পায়। অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিবেশে ক্ষমতা দখল করিবার জন্য সামরিক কৌশল ও ঐতিহ্য, জনবল এবং বিস্তীর্ণ কর্ষণযোগ্য ভূমির মালিকানা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এইসব অনুকূল উপকরণের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করার পর সামাজিক মর্যাদা অর্জন করার প্রয়াস অনিবার্য হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয় বংশজাত, এই দাবি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কোন উপজাতি বা তাহার কোন অংশ ক্ষত্রিয়সুলভ রীতিনীতি, আচার-আচরণ এবং আহার-বিহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকরকম অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ করিয়া তাহাদের স্বীকৃতি আদায় করে। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাদের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। আজকাল যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক উপরোক্ত উপায়ে ক্ষত্রিয়ের পদমর্যাদা লাভ করেন।[1]

পঞ্চমতঃ, অনেক সময় কিছুসংখ্যক লোক রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া রাজার আদেশে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ রাজার বিরাগ-ভাজন হইয়া নিম্নতর জাতিতে স্থান পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বল্লাল চরিতের কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য। "সেনরাজ্যে বল্লভানন্দ নামে একজন মস্ত বড় ধনী বণিক ছিলেন। উদন্তপুরীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বল্লালসেন বল্লভানন্দের নিকট হইতে একবার এক কোটি নিষ্ক ধার করেন। বারবার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বল্লাল আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য প্রস্তুত হন, এবং বল্লভানন্দের নিকট হইতে আরও দেড় কোটি সুবর্ণ (মুদ্রা) ধার চাহিয়া পাঠান। বল্লভানন্দ সুবর্ণ পাঠাইতে রাজি হন, কিন্তু তৎপরিবর্তে হরিকেলির রাজস্ব দাবি করেন। বল্লাল ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বণিকের ধনরত্ন কাড়িয়া লন এবং নানাভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করেন। ইহার পর আবার সৎশূদ্রদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে তাঁহাদের আপত্তি আছে বলিয়া বণিকেরা রাজপ্রাসাদে এক আহারের আমন্ত্রণ অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গেই বল্লাল শুনিতে পান যে, বণিকের নেতা বল্লভানন্দ পালরাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তাহার উপর আবার মগধের রাজা ছিলেন বল্লভানন্দের জামাতা। বল্লাল অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণবণিকদের শূদ্রের স্তরে নামাইয়া দিলেন; তাঁহাদের পূজাঅনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিলে, তাঁহাদের কাছ হইতে দান গ্রহণ করিলে কিংবা তাঁহাদের শিক্ষাদান করিলে ব্রাহ্মণেরাও 'পতিত' হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে এই বিধানও দিয়া দিলেন। বণিকেরা

1. তদেব পৃষ্ঠা ৩২

তখন প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্য দিয়া সমস্ত দাসভৃত্যদের হাত করিয়া ফেলিল। উচ্চবর্ণের লোকেরা বিপদে পড়িয়া গেলেন। বল্লাল তখন বাধ্য হইয়া কৈবর্তদিগকে জলচল-সমাজে উন্নীত করিয়া দিলেন; তাঁহাদের নেতা মহেশকে মহামাণ্ডলিক পদে উন্নীত করিলেন। মালাকার, কুম্ভকার এবং কর্মকার, ইহারাও সৎশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত হইল। সুবর্ণবণিকদের পৈতা পরা নিষিদ্ধ হইয়া গেল, অনেক বণিক দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বল্লাল উচ্চতর বর্ণের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে শুদ্ধিযজ্ঞের বিধান দিলেন। ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব একেবারে ঘুচিয়া গেল; তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে 'পতিত' হইলেন।"1 উদ্ধৃত অংশটি পড়িলে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাজানুগ্রহে উচ্চতর জাতে উন্নীত এবং রাজরোষে নিম্নতর জাতে অবনত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। বল্লালচরিতের ঐতিহাসিক সত্যতা আলোচনা করিতে গিয়া নানারকম কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। "কাহিনীটির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য স্বীকার করা কঠিন, কিন্তু ইহাকে একেবারে অলীক কল্পনাগত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আবও কঠিন।··· বৃহদ্ধর্ম পুরাণে তাঁতী, গন্ধবণিক, কর্মকার, তৌলিক, (সুপারি ব্যবসায়ী), কুমার, শাঁখারী, কাঁসারী, বারজীবী (বারুই), মোদক, মালাকার সকলকে উত্তম-সংকর পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে, অথচ স্বর্ণকার-সুবর্ণবণিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ধীবর-রজকের সঙ্গে জল-অচল মধ্যম-সংকর পর্যায়ে। ইহার তো কোনও যুক্তিসংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! বল্লাল-চরিতে এ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে একটা যুক্তি আছে; রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে এইরূপ হওয়া খুব বিচিত্র নয়।"2

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, জাতিভেদ প্রথা কোন কালেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল ছিল না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঊর্ধ্বগতি এবং অধোগতি-ব্যঞ্জক সচলতা ছিল। তবে উপরোক্ত পরিবর্তন-গুলি কেবলমাত্র ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। জাতিভেদ প্রথার কাঠামো মোটামুটি অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল। বুদ্ধদেব বা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তাহা তাঁহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জলাশয়ে বুদ্‌বুদের ন্যায় মিলাইয়া যায়।

কিন্তু ইংরেজ আমলে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া নির্মলকুমার বসু মহাশয় বলেন যে, "হিন্দু-সমাজের মধ্যে কৌলিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল," তাহা মুসলমান আমলে শহরের আশপাশে অদলবদল হইলেও গ্রামে "কায়েমী অবস্থায় টিকিয়া গিয়াছিল।" সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত

1. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়: বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব। পৃঃ ২৬০-২৬১।
2. তদেব পৃঃ ২৬১-২৬২।

ভারতবর্ষ শিল্পসামগ্রী এবং কৃষিজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া প্রচুর ধনসম্ভার সংগ্রহ করিয়া আনিতে সক্ষম হয়। এই অবস্থায় কৌলিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া লোকের খাওয়াপরা স্বচ্ছন্দভাবে চলিয়া যাইত বলিয়া বর্ণব্যবস্থার উপর সঙ্ঘবদ্ধ আঘাত পড়ে নাই বলিলেই চলে। মুসলমান শাসককুলও রাজস্ব আদায় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহারা সনাতনী উৎপাদন ব্যবস্থাকে নষ্ট করেন নাই এবং এই ধরনের অভিলাষও তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় সনাতনী উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সাংঘাতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। তখন একদিকে ইংরেজদের শিল্পোৎপাদিত সামগ্রী বিক্রী করার জন্য বাজারের প্রয়োজন ছিল এবং অপর দিকে শিল্পোৎপাদনের জন্য কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থে ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ শাসককুল সুপরিকল্পিত ভাবে এবং সূক্ষ্ম উপায়ে ভারতীয় শিল্পের বিনাশসাধন করেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষ হইতে সস্তা দরে কাঁচামাল ক্রয় এবং ভারতীয় বাজারে চড়া দরে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করার সুবর্ণ সুযোগ ইংরেজ বণিকগণ লাভ করে এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া যায়। বর্ণব্যবস্থার অন্যতম প্রধান খুঁটি ছিল অর্থনৈতিক স্থিরতা। পরিবর্তিত অবস্থায় এই খুঁটি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। "বর্ণব্যবস্থা অনুসারে যাহার যাহা বৃত্তি ছিল, সে আর তাহা ধরিয়া থাকিতে ভরসা পায় না। ফলে জাতিভেদ অর্থনীতির ক্ষেত্র পরিহার করিয়া শুধু সামাজিক ক্রিয়া-করণে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।"1 বসু মহাশয় আজ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে জাতিভেদ সম্পর্কিত প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন উপরোক্ত উক্তিতে পাওয়া যায় না। বর্তমানে সামাজিক ক্ষেত্রেও জাতিভেদ প্রথা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। নগরাঞ্চলে ত বটেই, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও ইহার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হইল।

সর্বাগ্রে যন্ত্র-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার নাম করিতে হয়। বিভিন্ন জাতের লোক একই কারখানায় পাশাপাশি কাজ করিতে বাধ্য হয়। একই ক্যান্টিনে খাওয়াদাওয়া করে। অবসর সময়ে এক সঙ্গে চলাফেরা এবং গল্পগুজব করে। এই অবস্থায় শুচিতা-অশুচিতার মানদণ্ড অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। শিল্পপ্রধান সমাজে মানুষ জাগ্রত অবস্থার অধিকাংশ সময় কর্মক্ষেত্রে এবং সহকর্মীদের মধ্যে কাটায়। ইহার ফলে কলকারখানায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাহা তাহার পারিবারিক এবং সামাজিক কাজকর্ম ও ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। সুতরাং কর্মক্ষেত্রে জাত-বিচার শিথিল হইলে পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে এবং সামাজিক সম্পর্কেও জাত-বিচার অনুরূপভাবে শিথিল হওয়া অস্বাভাবিক নহে। মর্গেন (Morgan)

1. হিন্দুসমাজের গড়ন। পৃষ্ঠা ১২৩।

এবং ওয়ার্ড (Ward) পরিবার এবং সমাজ-জীবনের উপর কর্মক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সম্পর্কে বলিতে গিয়া নিম্নোক্ত উক্তি করিয়াছেন: "But we should stress that the social experiences that members undergo within organisations feed back into their life outside, into primary groups such as the family, and into their general relationships in the community and elsewhere ......that while we all belong to families, most people in developed societies spend most of their time within the framework of one organisation or another. Unlike the simpler societies, kinship by no mcans constitutes the dominant mechanism in social life."1 অর্থাৎ শিল্পপ্রধান সমাজে রক্তের সম্বন্ধ পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থান অধিকার করে। কর্মক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনদর্শন, মূল্য-বোধ এবং আচার-আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষে নগর-জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে এই উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। নগরাঞ্চলে খাওয়াদাওয়া এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে শুচিতা-অশুচিতার প্রশ্ন প্রায় অবান্তর—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যাধিক্য। নগর-সমাজে অসবর্ণ বিবাহের জন্য কেহ 'অজলচল' হয় না। ইহা অতি সহজে স্বীকৃতি পাইতেছে। মর্গেন ও ওয়ার্ডের বিশ্লেষণ অনুসরণ করিলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, গ্রাম-সমাজেও অনুরূপ পরিবর্তনের ঢেউ অদূর ভবিষ্যতে ছড়াইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ, নগর-সমাজে জীবন-প্রণালীর উল্লেখ করিতে হয়। শ্রীনিবাস যথার্থই বলিয়াছেন: "Urban life sets up its own pressures, and a man's daily routine, his place of residence, the times of his meals, are influenced more by his job than by caste and religion."2 অর্থাৎ শহুরে জীবনযাত্রায় জাতের বালাই থাকে না, থাকা সম্ভবপরও নহে। শাস্ত্রসম্মত আচরণ-বিধি পালন করিতে গেলে জটিল নগর-জীবনের দায়দায়িত্ব পালন করা যায় না। প্রথম দিকে নানারকম হাস্যকর বিপরীতধর্মী আচার-আচরণের যুগপৎ অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাঁহার পুস্তকে একজন দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণের নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন: "When I put on my shirt to go to the office, I take off my caste and when I come home and take off my shirt, I put on my caste."3

---

1. Worsley & others : Introducing Sociology, Penguin Books. Article on Work, Industry & Organisations by D. H. J. Morgan and Robin Ward.

2. M. N Srinivas : Social Change in Modern India. Page 12২.

3. তদেব পৃঃ ১২৩।

এই বক্তব্যটি হাস্যকর মনে হইলেও এই ধরনের অনেক হাস্যকর আচার-আচরণ একটু লক্ষ্য করিলেই চোখে পড়িবে। আসল কথা, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সনাতনী আচার-আচরণের কোন মিল নাই ; প্রতি পদে পদে অসঙ্গতি আমাদের চলার পথে বাধাস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। অথচ বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং বর্তমানের প্রয়োজনীয় দায়দায়িত্ব পালন করা এবং অতীতের অন্ধ কুসংস্কারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, এই দুইয়ের টানা—পড়েনে পড়িয়া অনেকে নানারকম হাস্যকর বিপরীতধর্মী আচরণ করিয়া থাকেন। কালক্রমে অতীতের আকর্ষণ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং জাতিভেদজনিত শুচিতা-অশুচিতার ব্যবধান এবং কে 'জলচল' কে 'অজলচল' এই জাতীয় বিচার অর্থহীন হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ, স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কেহ যদি হোটেলে, রেঁস্তোরায় বা অন্য কোন সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য স্থানে জাতিভেদ অনুসারে 'জলচল' এবং 'অজলচল' এই প্রকার ভেদরেখা টানিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি আইনত দণ্ডণীয় হইবেন। আইনের নিষেধ-বিধির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে শিক্ষিত সমাজের জাতিভেদ-বিরোধী মনোভাব। সাহিত্যে, নাটকে এবং কথোপকথনে এই মনোভাব নানাভাবে প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত তিনটি যুক্তি উত্থাপন করা হয় ঃ ইহা অযৌক্তিক, ইহা সাম্যনীতির বিরোধী এবং জাতিভেদমূলক আচরণ মনুষ্যত্বের পক্ষে অপমানকর। আইন এবং জনমতের তাড়নায় সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদিতে জাতিভেদমূলক আচরণ খুব দ্রুতগতিতে অন্তর্হিত হইতেছে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু ইহা নব কলেবর ধারণ করিয়া রাজনীতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে পার্লামেণ্ট পর্যন্ত সব নির্বাচনে এই প্রথার প্রভাব সুস্পষ্ট। কোন অঞ্চলে বিশেষ কোন জাতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলে সেই জাতের কোন লোককে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করান হয়। নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্বে সেই জাতের বাস্তব বা কল্পিত অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া নানারকম প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল সব দলেরই সমান ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে রাজনীতিক দলগুলির সামঞ্জস্যবিহীন আচরণের উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে সভায় সাম্য ও মৈত্রীর বাণী উচ্চারণ করা হয়, সেই সভাতেই সাম্যের নামে এবং অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ক্ষীয়মাণ ভেদ-রেখাকে আবার নূতন করিয়া সঞ্জীবিত করা হইতেছে। সেলিগ্ হ্যারিসন (Selig Harrison) ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন ঃ "Political competition in a representative system was bound to give càsteism 'a new lease of life', as Vinoba Bhave put it, if only because

the single-member constituency inherently favours......any social group in any country which happens to live in close proximity in a particular locality.......The most perplexing election surprises become crystal-clear when the caste factors in a constituency come to light."1 অর্থাৎ কোন বিশেষ নির্বাচন-এলাকায় কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত জনসমষ্টি বসবাস করিলে নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেকাংশে তাহাদের উপর নির্ভর করে। এই অবস্থায় রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতিভেদপ্রথা নূতন করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। জাতিভেদপ্রথার প্রভাব বিবেচনা না করিলে অনেক নির্বাচনের ফলাফল সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না এবং সম্পূর্ণরূপে অর্থবহ হয় না।

অতএব উপসংহারে বলা যায় যে, জাতিভেদ প্রথা অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে বলিয়া কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইংরেজ আমলে ইহার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সামাজিক ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা ক্রমশঃ গৌণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইহা নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে সবার অগোচরে পুষ্টিলাভ করিতেছে। ইংরেজ আমলে অনুন্নত শ্রেণীর নিম্নবর্ণ হিন্দুগণ 'জাতিভেদজ্ঞানশূন্য সমদর্শী বিপুল শক্তিশালী ব্রিটিশের" কৃপাপ্রার্থী ছিলেন। ইংরেজ শাসককুল নিজেদের স্বার্থে এই ধবনের মনোভাব গড়িয়া তুলিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। স্বাধীন ভারতে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই সম্প্রদায়-প্রীতি অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং রাজনীতিক দলসমূহ গোচরে এবং অগোচরে, সজ্ঞানে এবং অজানিতভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি করিতে উৎসাহ দিতেছে। এই অবস্থায় ইহা অনুমান করা মোটেই অমূলক নহে যে, অদূর ভবিষ্যতে সমাজ-জীবনে, বিশেষ করিয়া রাজনীতিক ক্ষেত্রে, জাতিভেদপ্রথা "কায়েমী অবস্থায়" টিকিয়া থাকিবে।

সামাজিক সচলতা

সমাজ সর্বদা পরিবর্তিত হয়। ইহাই সমাজের ধর্ম। সুতরাং সামাজিক স্তর-বিন্যাসে যে পরিবর্তন হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক।

যখন কোন ব্যক্তি বা জনসমষ্টি এক সামাজিক স্তর হইতে অন্য স্তরে স্থান পরিবর্তন করে তখন এইপ্রকার পরিবর্তনকে সামাজিক সচলতা বলে। সামাজিক সচলতা দুই প্রকারের হয়। একটিকে Horizontal mobility বা অনুভূমিক সচলতা বলা হয়। অপরটি Vertical mobility বা উল্লম্বী সচলতা বলিয়া

1. S. Harrison : The Most Dangerous Decades. Page 109. Quoted by Palmer in his book, The Indian Political System. George Allen & Unwin Ltd. 1961. London. Page 232.

পরিচিত। যখন কোন ব্যক্তি স্থান পরিবর্তন করা সত্ত্বেও তাহার সামাজিক মর্যাদার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তখন এই জাতীয় পরিবর্তনকে অনুভূমিক সচলতা বলা হয়। যেমন, যদি কোন পরিবারের দুই তিন পুরুষের বৃত্তি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ডাক্তারের ছেলে উকীল হইয়াছে এবং উকীলের ছেলে ডাক্তার বা ব্যবসায়ী হইয়াছে, তাহা হইলে এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে বৃত্তির পরিবর্তনে সামাজিক মর্যাদার কোন তফাৎ হয় না। অপর পক্ষে, কোন ব্যক্তি বৃত্তি বা অন্য কোন দিক হইতে স্থান পরিবর্তন করার ফলে যদি সামাজিক মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তখন এই প্রকার পরিবর্তনকে উল্লম্বী সচলতা বলে। যেমন, কারখানার শ্রমিকের ছেলে যদি ডাক্তার হয়, তাহা হইলে বৃত্তির পরিবর্তনের দ্বারা সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধি সূচিত হয়। ইহাকে উর্ধ্বমুখী উল্লম্বী সচলতা (upward vertical mobility) বলা যায়। আবার কোন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার বা উকীলের ছেলে যদি সাধারণ কেরানীর বৃত্তি গ্রহণ করে, তাহা হইলে বৃত্তির পরিবর্তনে সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। ইহাকে অধোমুখী উল্লম্বী সচলতা (downward vertical mobility) বলে। বৃত্তি ছাড়াও অন্য প্রকার পরিবর্তনে মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি সূচিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবন যাপনের রীতি (style of life) ভিন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জীবনযাপনের রীতির পরিবর্তনে সামাজিক মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটা কিছু বিচিত্র নহে। জাতিভেদপ্রথা আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চ বর্ণের লোকদের আচার-আচরণ অনুকরণ করিয়া সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত হইতে চেষ্টা করে। আবার নিম্নবর্ণের লোকদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উচ্চবর্ণের লোকেরা সামাজিক মর্যাদার দিক হইতে অবনত হয়।

উল্লম্বী সামাজিক সচলতা আলোচনা করার বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রথমতঃ, উল্লম্বী সামাজিক সচলতা গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত বলিয়া গণ্য হয়। কারণ, এই প্রকার সচলতা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হইলে সমান সুযোগসুবিধার নীতি বাস্তবায়িত হইবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এইপ্রকার সচলতার পথ রুদ্ধ থাকিলে সমাজের স্থায়িত্ব বা ভারসাম্য বিঘ্নিত হইতে পারে। প্রয়োজনীয় গুণ অর্জন করা সত্ত্বেও যদি সামাজিক মর্যাদা লাভ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তাহা হইলে হতাশা বা আক্রোশ সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের রূপ নিতে পারে।

স্বাভাবিক কারণে সব সমাজ-ব্যবস্থাতেই উল্লম্বী সামাজিক সচলতার কিছু-না-কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকে। জাতিভেদ প্রথাও কোন সময় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল ছিল না। নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে উর্ধ্বমুখী এবং অধোমুখী উল্লম্বী সামাজিক সচলতা জাতিভেদপ্রথাতেও ঘটিয়াছে। কি কারণে সব সমাজ-ব্যবস্থাতেই উল্লম্বী সচলতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল।

(১) যে-সমাজব্যবস্থায় মর্যাদাসূচক উচ্চতর পদগুলির অধিকারীদের নির্দিষ্ট কার্যকাল থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে পদাধিকারীদের

বাছাই করা হয়, সেই সমাজে উল্লম্বী সচলতা থাকা স্বাভাবিক। বর্তমান যুগে রাজনীতিক ক্ষমতা সামাজিক মর্যাদালাভের সোপান বলিয়া গণ্য হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিক ক্ষমতাধিকারীদের বাছাই করার পদ্ধতি স্বীকৃত। সুতরাং উল্লম্বী সচলতা গণতান্ত্রিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

(২) সামাজিক স্তর-বিন্যাস উৎকর্ষসূচক নির্দিষ্ট মূল্যমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই অবস্থায় নিম্নস্তরভুক্ত ব্যক্তিগণ উচ্চস্তরভুক্ত ব্যক্তিদের আচার-আচরণ বা জীবনযাপনের রীতি অনুকরণ করিয়া উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইতে চেষ্টা করে। আবার উচ্চস্তরভুক্ত ব্যক্তিগণ উচ্চস্তরসম্মত আচরণ না করিতে পারিলে মর্যাদায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে অবনত হয়। বর্ণব্যবস্থা আলোচনার সময় এই বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(৩) নৃতত্ত্বে এবং সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্মহারের পার্থক্য তুলনামূলক-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এইসব অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ উচ্চতর শ্রেণীতে জন্মহার অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীর জন্মহারের তুলনায় অনেক কম। ইহার ফলে উচ্চতর শ্রেণীর কাজকর্ম করার জন্য যে-সংখ্যক লোক প্রয়োজন তাহার অভাব দেখা দেয়। সরোকিন (Sorokin) এই অবস্থাকে **social vacuum** বা বিশেষ সামাজিক শ্রেণীতে শূন্য স্থানের সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের উচ্চতর শ্রেণীর শূন্য স্থান পূরণ করিয়া উচ্চশ্রেণীসম্মত কাজকর্ম করার সুযোগ আসে। ইহার ফলে পদমর্যাদায় উন্নীত হয়। যুদ্ধে কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকদের অধিক সংখ্যায় মৃত্যু ঘটিলে অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ যাইবার ফলেও এইপ্রকার শূন্য স্থানের সৃষ্টি হইতে পারে।

(৪) নানা কারণে উচ্চতর শ্রেণীর কিছুসংখ্যক লোক উচ্চশ্রেণীসম্মত কাজকর্ম করিতে অপারগ হইতে পারেন। ইহার ফলে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীতে অবনতি হয়। আবার নিম্নতর শ্রেণীর কিছুসংখ্যক লোক উচ্চশ্রেণী-সম্মত কাজকর্ম করার যোগ্যতা অর্জন করায় পদমর্যাদায় উন্নীত হইতে পারেন। এই জাতীয় উত্থান-পতনের অনেক কারণ থাকিতে পারে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। বুদ্ধি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণগুলি না থাকার জন্য পুত্রের পক্ষে পিতা বা ঠাকুরদাদার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। এই অবস্থায় উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষে, নিম্নস্তরভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণ অর্জন করিয়া উচ্চতর শ্রেণীতে স্থান অধিকার করা বিচিত্র নহে। সচল শ্রেণীব্যবস্থায় এই জাতীয় উত্থান-পতন অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য। তাহা ছাড়া, বর্তমান যুগে যান্ত্রিক পরিবর্তন এত দ্রুত গতিতে ঘটে যে, কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষে পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতি আয়ত্ত করা সহজ হইতে পারে এবং অন্য লোকের পক্ষে খুবই কঠিন, এমন কি অসাধ্যও,

হইতে পারে। এইভাবে খাপ খাওয়াইবার তারতম্যের জন্য সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পায়।

অনেক সময় আকস্মিক কারণেও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পায়। যেমন, হঠাৎ যদি পোষাক-পরিচ্ছদে বা সঙ্গীতে রুচির পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে কিছুসংখ্যক লোক অপ্রত্যাশিতভাবে আর্থিক দিক হইতে লাভবান হইতে পারেন এবং এই কারণে উচ্চস্তরে উন্নীত হন। পক্ষান্তরে, কিছু লোক আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে পারেন। যেমন, হঠাৎ যদি খাদি বস্ত্র পরিধান করা ফ্যাশানে পরিণত হয়, তাহা হইলে খাদি বস্ত্র উৎপাদকগণ স্বভাবতই অপ্রত্যাশিত-ভাবে মুনাফা লুটিবেন এবং অন্য প্রকার বস্ত্র উৎপাদকগণ সেই অনুপাতে বাজার হারাইবেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। এই সম্পর্কে সরোকিন নিম্নোক্ত উদাহরণ দিয়াছেন: "A whimsical change in public taste makes millionnaires out of Sinatras and beggars out of many 'old fashioned' singers." 1 অর্থাৎ বিশেষ ধরনের লোক-সঙ্গীতের প্রতি লোকের আকর্ষণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে সিনাত্রা প্রমুখ গায়কগণ কোটিপতি হইতে পারেন। আবার পুরাতন ধারায় যাঁহারা গান করিতেন তাঁহাদের দারিদ্র্য বরণ করিতে হইতে পারে।

উপরোক্ত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যাপক সরোকিন উপসংহারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন: "Considering that other factors of mobility—such as election or appointment for a limited term, the dissimilarity of parents and children, and the profound changes experienced by persons in the course of their lifetime—are also more or less inherent in the component of members of the groups, the main cause of vertical mobility is seen to be immanent, or inherent, in the sociocultural groups themselves. Even in a constant natural milieu, with an adequate self-perpetuation of the upper strata, vertical mobility would inevitably occur in all organised groups. Factors external to the group may reinforce or hinder it, but they are merely secondary.2" অর্থাৎ সামাজিক সচলতার মুখ্য কারণ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই, বিশেষ করিয়া জীবন-ধারাগত পরিবর্তনের মধ্যে, খুঁজিতে হইবে। উচ্চতর পদাধি-কারী ব্যক্তিগণের নির্দিষ্ট কার্যকালের জন্য মনোনয়ন বা নির্বাচন, পিতামাতা এবং সন্তানদের মধ্যে ক্ষমতা এবং যোগ্যতার পার্থক্য, প্রত্যেকের জীবদ্দশায় উৎপাদন ব্যবস্থায় বা পরিবেশে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ইত্যাদি সচলতার কারণগুলি সমাজ-

1 A. M. Lee (Ed.): Readings in Sociology. 1959. Article entitled General Causes of Vertical Mobility by Sorokin.

2 তদেব পৃ: ২৬৩

ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কিন্তু উপরোক্ত কারণগুলি না থাকিলেও—অর্থাৎ বাহ্যিক পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থাকিলেও—জীবন-ধারাগত পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে উল্লম্বী সামাজিক সচলতা অনিবার্য। সমাজ-জীবনবহির্ভূত কারণগুলির কার্যকারিতা গৌণ। কারণ, এই কারণগুলি সামাজিক সচলতা ত্বরান্বিত বা মন্থর করিতে পারে মাত্র, একেবারে বন্ধ করিতে পারে না। জীবন-ধারাগত পরিবর্তনের জন্য উল্লম্বী সচলতা অবিরাম চলিতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ সরোকিন বলেন যে, রাজতন্ত্রের স্থলে যদি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ পদমর্যাদায় অবনত হইবেন এবং প্রজাতন্ত্রের সমর্থকগণ পদমর্যাদায় উন্নীত হইবেন। অনুরূপভাবে, যদি দেশ যুদ্ধে জড়িত হয় অথবা যদি দেশে জঙ্গী মনোভাব বিরাজ করে তাহা হইলে জঙ্গীভাবাপন্ন রাজনীতিবিদগণ অথবা সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিগণ মর্যাদার আসন লাভ করেন। এইভাবে অনেক উদাহরণের সাহায্যে সরোকিন দেখাইয়াছেন যে, সব সমাজেই অল্প-বিস্তর উল্লম্বী সচলতা চলিতে থাকে। অনুকূল পরিবেশে সচলতা বাড়ে এবং প্রতিকূল পরিবেশে সচলতা কমে, ইহাই একমাত্র রকমফের হয়। কিন্তু সামাজিক সচলতার গতি অব্যাহত থাকে।

কি কি কারণে উল্লম্বী সামাজিক সচলতার গতি ব্যাহত বা মন্দগামী হয়, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। সর্বাগ্রে পরিবারের উল্লেখ করিতে হয়। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য প্রত্যেকে সমান সুযোগ-সুবিধা পায় না। পরিবার সচ্ছল হইতে পারে বা অসচ্ছল হইতে পারে, শিক্ষিত হইতে পারে বা অশিক্ষিত হইতে পারে, জাতে পরিবার উন্নত বা অবনত হইতে পারে, পরিবারের পরিবেশ ভাল বা মন্দ হইতে পারে। এই অবস্থায় শিশুর সামাজিকী-করণের পার্থক্য হয়। এই কারণে এবং পরবর্তী জীবনে সুযোগসুবিধার পার্থক্যের জন্য উল্লম্বী সচলতায় পার্থক্য ঘটে। কেহ হয়ত সামাজিক স্তরের শীর্ষে স্থান লাভ করে আবার কেহ হয়ত সুযোগের অভাবে নিম্নতর স্তরে পড়িয়া থাকে। সুযোগসুবিধার পার্থক্য অনেক রকম হইতে পারে। শিক্ষায় অসম সুযোগ, খাওয়া-পরা এবং চিকিৎসাদির ক্ষেত্রে পার্থক্য, উচ্চস্তরভুক্ত প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে কোন কোন পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে অর্থের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। উচ্চস্তরসম্মত জীবন-যাপনের রীতি অনুসরণ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। অর্থের অভাবে কোন ব্যক্তি বা পরিবারের পক্ষে এই মান বজায় রাখা সম্ভব না-ও হইতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতা অধোমুখী হওয়া স্বাভাবিক। প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা বা না-থাকার উপর সামাজিক সচলতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

সামাজিক স্তর-বিন্যাস উদ্ভবের কারণ

পৃথিবীর সব সমাজ-ব্যবস্থাতেই অল্প-বিস্তর স্তর-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। আদিম অধিবাসীদের সমাজও ব্যতিক্রম নহে। সেখানে দলপতির প্রভুত্বকে কেন্দ্র করিয়া কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বা পরিবার

অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। ইহাকে স্তর-বিন্যাসের সূচনা বলা যাইতে পারে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়ে এবং স্তরভেদও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্তর-বিন্যাস নাই এমন সমাজ-ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিরল।

অতএব প্রশ্ন উঠিতে পারেঃ ইহার কারণ কি? এই বিষয় সম্পর্কে সমাজ-তত্ত্ববিদগণ অনেক রকম ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথমে সমাজের প্রয়োজনীয় কাজকর্মজনিত স্তরভেদের (**functional necessity of stratification**) উল্লেখ করিতে হয়। এই মতবাদের সঙ্গে ডেভিস (**Kingsley Davis**) এবং মুরের (**Wilbert E. Moore**) নাম বিশেষভাবে জড়িত। তাঁহাদের বক্তব্য নিম্নে বিবৃত করা হইল।

মানুষ বহুদিন যাবৎ শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে। ইহা লইয়া কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন, নাট্যকার নাটক লিখিয়াছেন এবং গীতিকার গান বাঁধিয়াছেন। কিন্তু এই কল্পনা আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। ইহার কারণ খুঁজিতে হইবে সমাজের নানারকম প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করার ব্যবস্থার মধ্যে। সমাজের কাজ সমাজস্থ লোকদেরই করিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব যাহাতে উপযুক্ত লোকের উপর অর্পিত হয় এবং যাহাদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হইবে তাহারা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। সমাজের দিক হইতে প্রত্যেকটি কাজের যদি সমান গুরুত্ব থাকিত, কাজ করার দিক হইতে যদি প্রত্যেকটি কাজ সমান আরামদায়ক বা সমান কষ্টসাধ্য হইত এবং প্রত্যেকটি কাজে যদি একই প্রকার যোগ্যতার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইত না। প্রত্যেকে ইচ্ছানুযায়ী কাজ বাছিয়া লইতে পারিত এবং কাজের গুরুত্বভেদে কর্মীদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না।

কিন্তু বাস্তব অবস্থার সঙ্গে উপরোক্ত তিনটি শর্তের কোনটিরই সঙ্গতি নাই। বিভিন্ন কাজের গুরুত্ব বিভিন্ন রকম। কোন কাজ সহজসাধ্য আবার কোন কাজ কষ্টসাধ্য। সব কাজে সমান মেধা বা ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। কোন কোন কাজ আয়ত্ত করিতে হইলে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষানবিশি করিতে হয়; আবার কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের শিক্ষানবিশিই যথেষ্ট।

এই অবস্থায় প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব যাহাতে উপযুক্ত লোকের উপর ন্যস্ত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ইহা না করিলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহা ছাড়া, যাহার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইল, সেই দায়িত্ব যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা আবশ্যক। বিষয়টি অন্যভাবে প্রকাশ করা যায়। প্রথম সমস্যা হইল **placement**এর। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজে যাহাতে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় সমস্যা হইল **motivation**সম্পর্কিত। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে উৎসাহ বোধ করে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য সমাজে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সুখ-সুবিধার (rewards) ব্যবস্থা থাকে। সুখ-সুবিধা সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ, আর্থিক সুখ-সুবিধার কথা উল্লেখ করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সুখ-সুবিধা মর্যাদাসূচক হইতে পারে। অনেক কাজ সমাজে সম্মানার্হ বলিয়া গণ্য হয়। ইহা কিছুসংখ্যক লোককে এই জাতীয় কাজে আকর্ষণ করে এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে উৎসাহ জোগায়। তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত অবসর পাইবার সম্ভাবনা অনেক কাজকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলে।

সমাজ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন রকম কাজের সঙ্গে বিভিন্ন রকম সুখ-সুবিধা যুক্ত করা হয়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সুখ-সুবিধার বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করিয়া সামাজিক স্তব-বিন্যাস গড়িয়া উঠে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পাবে। প্রত্যেক সমাজেই সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ যাহা নির্দেশ করেন সমাজস্থ লোকেরা তাহা সাধারণতঃ শিরোধার্য করে। কারণ, সরকারী কর্মচারীগণের এই সম্মান এবং ক্ষমতা সমাজে স্বীকৃত। এই সম্মান এবং ক্ষমতা না পাইলে সরকারের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইত না। অনেক বৃত্তির সঙ্গে অধিক উপার্জনের ব্যবস্থা জড়িত। ইহাব কারণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সমাজ-জীবনেব পক্ষে বৃত্তিটির বিশেষ গুরুত্ব থাকিতে পারে। অথচ এই বিশেষ বৃত্তিসম্পর্কিত কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে গেলে যে গুণ থাকা প্রযোজন, তাহা বিবল হইতে পাবে। সুতবাং অতিবিক্ত সুখ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি না থাকিলে যোগ্য ব্যক্তিগণ এই বৃত্তিতে আকৃষ্ট না-ও হইতে পারেন। অপর পক্ষে, অনেক বৃত্তিতে অপেক্ষাকৃত কম উপার্জনের ব্যবস্থা থাকে। ইহার একটি কাবণ, আলোচ্য বৃত্তিসম্পর্কিত কাজকর্ম সমাজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি কারণ, এই প্রকার কাজকর্ম অধিকাংশ লোকই করিতে পারে, বিশেষ কোন গুণ বা শিক্ষার প্রযোজন হয় না।

উল্লিখিত যুক্তি এবং উদাহরণের সাহায্যে ডেভিস এবং মুর সামাজিক স্তর-বিন্যাস উদ্ভবের কারণ হিসাবে তাঁহাদের মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই মতবাদে সামাজিক স্তর-বিন্যাস উদ্ভবের যে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা খুবই মূল্যবান। কিন্তু নানা উদাহরণের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সব রকম স্তর-বিন্যাস এই জাতীয় যুক্তিসম্মত কারণকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে না। প্রথমতঃ, বিজেতা এবং বিজিতের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়া যে স্তর-বিন্যাস গড়িয়া উঠে তাহার উল্লেখ করা যায়। সর্বকালে এবং সর্বদেশে বিজেতাগণ যুদ্ধে জয়লাভের সুযোগ লইয়া বিজিতদের সমাজব্যবস্থার নিম্নস্তরে ঠেলিয়া দেয় এবং অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করে। এই প্রকার শ্রেণী-বিন্যাস উদ্ভবের প্রমাণ ইতিহাসে বিরল নহে। দ্বিতীয়তঃ, জাতিগত পার্থক্যের (racial differences) জন্য শ্রেণী-বিন্যাসের উদ্ভব হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য কৃষ্ণকায় ব্যক্তিগণকে সব রকম অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া দাসসুলভ কাজ করিতে বাধ্য

করেন। ইহার ফলে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর উদ্ভব হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় আর্যরা ' কৃষ্ণবর্ণ ' এবং ' অনাস ' অনার্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সমাজ-ব্যবস্থার নিম্নস্তরে স্থান করিয়া দেন। তৃতীয়তঃ, কৃষি-ভিত্তিক সমাজগুলিতে ভূমির মালিকানার উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণী-বিন্যাস গড়িয়া উঠে। য়ুরোপীয় সামন্ত প্রথার অন্যতম ভিত্তি ছিল ভূমির মালিকানা। মধ্য প্রাচ্যে, বিশেষ করিয়া লেবানন, সিরিয়া, এবং মিশরে বহু শতাব্দী যাবৎ শ্রেণী-বিন্যাস ভূমির মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্থতঃ, মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌স্ শ্রেণী-বিন্যাসের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, উৎপাদনের উপাদান যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁহারা সমাজে কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ পান এবং অন্যান্য শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে দাবিয়া রাখেন। যেমন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় একদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং অপর দিকে শ্রমিক শ্রেণী বা প্রলেতারিয়াত-এর উদ্ভব হইয়াছে। উভয় শ্রেণীরই ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে সামাজিক স্তর-বিন্যাসের আরেকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্-এর মতবাদ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ম্যাক্স হেবারও (Max Weber) শ্রেণী-বিন্যাসের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্-এর সঙ্গে তাঁহার মত-পার্থক্য আছে। তাঁহার মতে "………property and lack of property are the basic categories of all class situations. The factor that creates class is unambiguously economic interest, and indeed, only those interests involved in the existence of the market".[1] অর্থাৎ মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্-এর ন্যায় উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া ম্যাক্স হেবার (Max Weber) বণ্টন ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু এঁরা তিনজনই এই বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, অর্থনৈতিক কারণে শ্রেণী-বিন্যাসের উদ্ভব হয়।

শ্রেণী-বিন্যাস উদ্ভবের কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বহু ক্ষেত্রে শ্রেণী-বিন্যাসের সঙ্গে যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রশ্ন জড়িত থাকে সেই সম্পর্কে সন্দেহ নাই। যখন বিজেতাগণ বিজিতদের নিম্ন শ্রেণীতে ঠেলিয়া দেন, তখন তাঁহাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য থাকে অর্থনৈতিক দিক হইতে লাভবান হওয়া। যখন দক্ষিণ আফ্রিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতকায় ব্যক্তিরা কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের সামাজিক স্তর-বিন্যাসের নিম্নতম স্তরে দাবিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখনও তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক দিক হইতে শোষণ করা। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণী-বিন্যাসের অর্থনৈতিক কারণসমূহ উপেক্ষণীয় নহে।

---

1 Gerth and Mills. From Max Weber : Essays in Sociology. Ithaca, N. Y. Cornell University Press. 1946, Pages 182-183. Quoted by Anderson and Parker in their book : Society : Its Organisation and Operation. Page 365

কিন্তু অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ছাড়াও অন্য কারণে সামাজিক স্তর-বিন্যাসের উদ্ভব হইতে পারে। অতীতে সব সমাজেই যাজক শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানেও বহু সমাজে এই প্রাধান্য বজায় আছে। এই প্রাধান্যের মূলে আছে ধর্মীয় কারণ, অর্থনৈতিক কারণ নহে। অনুরূপভাবে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় যে প্রাধান্য ভোগ করিতেন তাহারও কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া সঙ্গত হইবে না। তাঁহাদের ধীশক্তি ও ব্রাহ্মণোচিত আচার-আচরণ ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য বজায় রাখিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, মর্যাদা অনুসাবী শ্রেণী-বিন্যাস বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, অর্থনৈতিক কারণই শ্রেণী-বিন্যাসেব একমাত্র ভিত্তি হইতে পারে না। মর্যাদা-ব্যঞ্জক লক্ষণগুলির ভিত্তিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সংহতির বন্ধন গড়িযা উঠিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে একদিকে ভাল উপার্জনশীল উচ্চস্তবভুক্ত চাকুরিজীবীগণ নিজেদের 'মধ্যবিত্ত' বলিয়া পরিচয় দেন, অপরদিকে অতি সাধারণ চাকুরিজীবীগণও নিজেদের 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা নব্বই ভাগ লোক নিজেদের 'মধ্যবিত্ত' বলিয়া পরিচয় দেন। এইসব উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বে বৃত্তি এবং উপার্জনের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে-ভেদরেখা টানা হইত তাহা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই পরিবর্তনের গতি লক্ষ্য করিয়া ওলন্দাজ সমাজতত্ত্ববিদগণ stratification-এর পরিবর্তে pillarization (verzuiling) শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য, বর্তমান যুগে সমাজ বিভিন্ন অনুভূমিক স্তরে (horizontal strata) বিভক্ত না হইয়া নানারকম উল্লম্বী স্তম্ভে (vertical pillars) বিভক্ত। সব সমাজেই এই লক্ষণ অল্প-বিস্তব সুস্পষ্ট।

ডেভিস ও মুরের মতবাদ এবং মার্ক্সীয় মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া বটোমোর বলেন যে, দুইটি ভিন্ন রাজনীতিক এবং সামাজিক পরি-প্রেক্ষিতে এই দুইটি মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে যে রাজনীতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন মার্ক্সীয় মতবাদে দেখা যায়। সেখানে একদিকে সুসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কিত আদর্শবাদ গড়িয়া উঠে। অপর দিকে, প্রতিপক্ষও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সুসংবদ্ধ হইয়া প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর পক্ষে শ্রেণীভেদের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা স্বাভাবিক ছিল। পক্ষান্তরে, বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুসংবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন অথবা সুদৃঢ় শ্রেণী-বিন্যাস দেখা যায় না। সেখানে অসংবদ্ধ মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুসংবদ্ধ শ্রেণী-বিন্যাস না থাকার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর কোন বিশেষ মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর সদস্যভুক্ত হওয়া বা না-হওয়া নির্ভর করে। এই অবস্থায় ডেভিস এবং মুরের পক্ষে যোগ্যতার মাপকাঠিতে শ্রেণী-বিন্যাস ব্যাখ্যা করা খুবই স্বাভাবিক।

উপরোক্ত দুইটি মতবাদের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। যে-কোন একটি বা দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়া স্তর-বিন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা অসম্ভব। আসল কথা হইল, স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইহার প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে। যেমন, শ্রম-বিভাগ, সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত ব্যবস্থা, ধর্ম, যুদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন-সমূহ স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আবার সমাজের মূল্যবোধ, ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং অন্যান্য জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণগুলিও স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত। অতএব সব দিক বিবেচনা না করিলে স্তর-বিন্যাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা সম্ভব নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব ও সমাজ

বংশগতি ও পরিবেশ

মানুষ যেমন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন করে, ঠিক তেমনি সমাজও মানুষকে সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলে। সুতরাং সমাজ ও ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা বা ভাবা সঙ্গত নহে। যে জীবন-ধারা সমাজকে বাঁধিয়া রাখে তাহা প্রকাশ পায় ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণে। শুধু তাহাই নহে, মানুষ নিজের প্রয়োজনে জীবন-ধারা গড়ে এবং ইহা দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়মিত করে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য দেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। একটি সামাজিক চুক্তি সম্পর্কিত মতবাদ এবং দ্বিতীয়টি জৈব মতবাদ। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী, মানুষ প্রথম দিকে প্রাকৃতিক রাজ্যে বসবাস করিত এবং পরবর্তীকালে নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় চুক্তির মাধ্যমে সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করে। সমাজতত্ত্বের দিক হইতে এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে মানুষের সমাজবদ্ধ হইয়া থাকার স্বাভাবিক প্রবণতার স্বীকৃতি নাই; অর্থাৎ মানুষ যে স্বভাবতই সামাজিক জীব এই দিকটি সামাজিক চুক্তি মতবাদে উপেক্ষিত হইয়াছে। অপর পক্ষে, জৈব মতবাদে রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে এবং ব্যক্তিকে জীবকোষের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। জীবকোষ যেমন জীবদেহের উপর নির্ভরশীল, ঠিক তেমনি ব্যক্তিও রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা বা অর্থবহ জীবন যাপন করা সম্ভব নহে। জৈব মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোন ভেদ-রেখা টানেন নাই। জৈব মতবাদও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, এই মতবাদে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা উপেক্ষিত হইয়াছে।

সমাজতত্ত্বে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নানা দিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। সর্বাগ্রে বংশগতি এবং পরিবেশ সম্পর্কিত বিতর্কের উল্লেখ করা যায়। এই বিষয়ে দুইটি ভিন্ন চিন্তাধারা দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদের মতে ব্যক্তির আচার-আচরণ এবং চিন্তাধারার বিকাশ বংশগতি এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হইলেও বংশগতির প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদের মতে, বংশগতির তুলনায় পরিবেশের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি। উভয় মতবাদের সমর্থনে নানারকম তথ্যানুসন্ধান করা হইয়াছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃত্তি বা শ্রেণীগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ব্যবসায়ী পরিবার, কৃষক পরিবার এবং কুশলী (skilled) শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং অনভিজ্ঞ বা অদক্ষ

(unskilled) শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা অনেক কম। এই ধরনের তথ্যানুসন্ধানের ফলে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিবেশ অপেক্ষা বংশগতির প্রভাব অনেক বেশি।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। যে-সব বৃত্তিতে উপার্জন অপেক্ষাকৃত বেশি, সেইসব বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের সন্তানসন্ততিদের অপেক্ষাকৃত ভাল পরিবেশে 'মানুষ' করিতে পারেন এবং ভাল স্কুল-কলেজে পড়াইবার সুযোগ পান। সুতরাং তাহাদের সন্তানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। আবার যে-সব বৃত্তিতে উপার্জন সাধারণতঃ কম, সেইসব বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততির সুযোগ সুবিধা কম থাকায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনাও স্বাভাবিক কারণে কম থাকে। অতএব বংশগতির প্রভাব এবং পরিবেশের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নহে।

আবার কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ কয়েকটি বিশেষ পরিবার সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইউক্স্ (Jukes) এবং এডওয়ার্ড (Edward) পরিবার সম্পর্কে কয়েক পুরুষের যে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা যায়। ইউক্স্ পরিবারের ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পুরুষে অধিকাংশ ব্যক্তিই হয় মানসিক রোগাক্রান্ত, না-হয় বিভিন্ন সমাজ-বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত। পক্ষান্তরে, এডওয়ার্ড পরিবারের ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পুরুষে অধিকাংশ ব্যক্তিই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুউপার্জনশীল। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে তাঁহাদের ধারণা জন্মে যে, ইউক্স্ পরিবারের বংশগতিতে দোষ থাকায় বংশানুক্রমিকভাবে এই দোষ পরিবারভুক্ত সব লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে এবং এডওয়ার্ড পরিবারের বংশগতি ভাল হওয়ায় বংশানুক্রমিকভাবে এই বংশজাত সন্তানগণ সুশিক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, এই ক্ষেত্রেও পরিবেশের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। ইউক্স্ পরিবারের সন্তানগণ প্রথম হইতেই নৈরাশ্যজনক পরিবেশে 'মানুষ' হওয়ায় তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। অপর পক্ষে, এডওয়ার্ড পরিবারের সন্তানগণ প্রথম হইতেই আশাপ্রদ পরিবেশে 'মানুষ' হওয়ায় সংবৃত্তিগুলি বিকশিত করিবার অধিকতর সুযোগ পাইয়াছে। ভিন্ন পরিবেশজনিত পার্থক্য বিবেচনা না করিয়া কেবলমাত্র বংশগতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে আলোচনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

অনেকে আবার যমজ সন্তানদের এক সঙ্গে অথবা পৃথকভাবে লালন-পালন করিয়া সন্তানদের মধ্যে যে-পার্থক্য দেখা যায় তাহার কারণ হিসাবে হয় বংশগতি না-হয় পরিবেশের প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যমজ সন্তান দুইপ্রকারের হইতে পারে। একটি হইল সমকোষী যমজ। যখন দুইটি শিশু

অভিন্ন মাতৃ-পিতৃ কোষ হইতে জন্মায় তখন তাহাদের সমকোষী যমজ বলা হয়। অপরটি হইল ভিন্নকোষী যমজ। যখন দুইটি শিশু ভিন্ন কোষ হইতে জন্মায় তখন তাহাদের ভিন্নকোষী যমজ বলা হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে, সমকোষী যমজের ক্ষেত্রে বংশগতি অভিন্ন। সুতরাং এই জাতীয় যমজ শিশুকে যদি ভিন্ন পরিবেশে 'মানুষ' করা সত্ত্বেও কোন পার্থক্য দেখা না দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য।

এই জাতীয় দুইটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। একটি হইল এডুইন (Edwin) ও ফ্রেড (Fred) নামে দুইটি সমকোষী যমজ সন্তানের উদাহরণ। অপরটি হইল গ্ল্যাডিস (Gladys) এবং হেলেন (Helen) নামে আরেকটি যমজ সন্তানের উদাহরণ।

এডুইন এবং ফ্রেড্ খুব অল্প বয়সে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং দুইটি ভিন্ন পরিবারে লালিতপালিত হয়। তাহাদের যখন ছাব্বিশ বৎসর বয়স তখন তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে, তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশেষ প্রভেদ নাই। দুইজনই প্রায় সমবয়সে প্রায় সমপ্রকৃতির মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল। দুইজনই একপ্রকার কাজ করিত। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, দুইজনই এক জাতীয় কুকুর পুষিয়াছিল এবং ভিন্ন সহরে বাস করা সত্ত্বেও কুকুরের নামকরণও একপ্রকার করিয়াছিল। এই উদাহরণ হইতে স্বভাবতই ধারণা জন্মে যে, পরিবেশের তুলনায় বংশগতির প্রভাব বেশি। তবে এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল, এডুইন এবং ফ্রেড্ ভিন্ন পরিবারে 'মানুষ' হইলেও আর্থিক এবং অন্যান্য দিক হইতে পারিবারিক পরিবেশ মোটামুটি এক প্রকারের ছিল।

গ্ল্যাডিস এবং হেলেন আঠার মাস বয়সের সময় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং দুইটি পৃথক পরিবারে লালিতপালিত হয়। এই দুই পরিবারের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। হেলেন পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। সে ভাল পরিবারে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীকে বিবাহ করে। ইহার ফলে তাহার বহিরঙ্গে রমণীসুলভ সৌন্দর্য ও কমনীয়তা প্রকাশ পায়। তাহার আচার-ব্যবহারে এবং কথাবার্তায় মার্জিত রুচির ছাপও সুস্পষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে, গ্ল্যাডিস এমন পরিবারে 'মানুষ' হয় যে, অল্প বয়সে সে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং জীবিকার জন্য তাহাকে কারখানায় চাকুরি নিতে হয়। ইহার ফলে, তাহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং বহিরঙ্গে রমণীসুলভ সৌন্দর্য ও কমনীয়তার অভাব ঘটে। শিষ্টাচার সম্পর্কিত আদব-কায়দাও তাহার অজ্ঞাত ছিল। এই ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

উপরোক্ত দুইটি উদাহরণ হইতে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। তাহা ছাড়া, মাত্র দুইটি বা তিনটি উদাহরণের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে কোন কিছুই প্রমাণিত হয় না।

অতএব কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গেলে বংশগতির প্রভাব এবং পরিবেশের প্রভাব পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু কার্যত তাহা করা

সম্ভব নহে। এই কারণে মনোবিদ্ এবং সমাজতত্ত্ববিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানুষের জীবনে উভয়েরই প্রভাব রহিয়াছে। বাঁচিয়া থাকার জন্য জল ও বায়ু উভয়েরই প্রয়োজন আছে। অথচ কোন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না যে, জল অপেক্ষা বায়ু অধিক প্রয়োজনীয় অথবা বায়ু অপেক্ষা জল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোন একটির অভাব হইলেই জীবন বিপন্ন হইবে। অনুরূপভাবে, আমাদেব ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। একটিকে উপেক্ষা করিয়া অপরটি দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তি-সত্তা গড়িয়া উঠে। উভয়ের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া ম্যাক আইভার বলিয়াছেন: **"Heredity......contains all the potentialities of life, but all its actualities are evoked within and under the conditions of environment."1** অর্থাৎ বংশ-গতিকে **limiting factor** এবং পরিবেশকে **unfolding factor** বলিয়া গণ্য করা যায়। আমরা কে কি হইতে পারিব বা করিতে পারিব—এক কথায়, আমাদের জীবনের সম্ভাবনাসমূহের রূপরেখা—বংশগতি দ্বারা চিহ্নিত হইয়া যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাসমূহ কি পরিমাণে বাস্তবায়িত হইবে ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিবেশ দ্বারা নির্ণীত হয়। পরিবেশ অনুকূল হইলে সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে এবং প্রতিকূল হইলে সুযোগ সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু পরিবেশ যতই অনুকূল হউক না কেন, কবি প্রতিভা লইয়া না জন্মাইলে কাহারও পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বংশগতি সমাজতত্ত্বে মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে। জীববিজ্ঞানী এবং মনস্তত্ত্ববিদের নিকট ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজতত্ত্ববিদের নিকট পরিবেশ অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। কি পরিবেশে ব্যক্তিসত্তা স্বচ্ছন্দ বিকাশের সুযোগ পায় ইহাই তাহার গবেষণার বিষয়। মনোবিদগণের মতে কোন অবস্থাতেই কাহারও পক্ষে তাহার সুপ্ত ক্ষমতাসমূহ পুরাপুরি বিকশিত করা সম্ভব নহে। কাহারও কাহারও মতে সাধারণতঃ অন্তর্নিহিত ক্ষমতার শতকরা দশ ভাগ মাত্র প্রস্ফুটিত করা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় কি পরিবেশে ক্ষমতার সর্বাধিক পরিস্ফূরণ সম্ভব তাহা নির্ণয় করা সমাজতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বিষয়। এই সম্পর্কে ডক্টর সেফারের (Shaffer) অভিমত উদ্ধৃত করা হইল: **"Since it is unlikely that anyone ever attains his full capacity, it is important that efforts be directed to a better understanding of the environmental encounters most likely to promote intellectual development."2** সমাজতত্ত্ববিদগণ নানা উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন, যে-ব্যক্তি যত বেশি

1 Mac Iver and Page: Society. Page 95

2 An article entitled Psychology and Society by G. Wilson Shaffer, Ph.D., Professor of Psychology, Director of Psychological Clinic, and Dean of the Faculty, Johns Hopkins University. Baltimore, U.S.A. This article is included in the book: "The Biological Basis of Pediatric Practice" Page 53

সম্ভাবনা লইয়া জন্মায় তাহার নিকট পরিবেশের মূল্য তত বেশি। তাহা ছাড়া, শৈশবাবস্থায় পরিবেশের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এই সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া ডক্টর শেফার বলেন: "There is.........the strong suggestion that since the change in intellectual structures is most rapid during the child's early life, the early environment encounters are the most important."1 সুতরাং আইনস্টাইনের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি যদি আফ্রিকার জঙ্গলে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব হইত না। অনুরূপভাবে, যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে অনুভবনশীল (যেমন, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ,কবি প্রভৃতি) তাঁহারা অনুকূল পরিবেশ না পাইলে স্বকীয় ক্ষমতা ফুটাইয়া তুলিতে অসমর্থ হইবেন। অতএব উপসংহারে ইহা বলা যায় যে, ব্যক্তির জীবনে বংশগতি বা পরিবেশ কোনটাই উপেক্ষণীয় নহে।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও অভিব্যক্তি

উপরে সাধারণভাবে ব্যক্তিত্বের উপর বংশগতি এবং পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও অভিব্যক্তি সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইংরাজীতে একটি কথা প্রচলিত আছে: The blood of the parents flows in the children. এই কথাটির আক্ষরিক অর্থ, পিতামাতার রক্ত সন্তানসন্ততির ধমনীতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু ইহার তাৎপর্য আরও গভীর। পিতামাতার নিকট হইতে সন্তান জন্মসূত্রে কিছু-না-কিছু শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য পাইয়া থাকে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যগুলির একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

প্রথমেই শারীরিক গঠনের উল্লেখ করিতে হয়। শারীরিক গঠন বলিতে সর্বাগ্রে বহিরাকৃতির কথা মনে আসে। ব্যক্তিত্ব গঠনে বহিরাকৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। অনেকের বহিরাকৃতি দেখিয়া লোক আকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের বহিরাকৃতি এমন মর্যাদাব্যঞ্জক ও আকর্ষণীয় ছিল যে, অনেক অপরিচিত লোককেও মাথা নত করিতে দেখা গিয়াছে। বহিরাকৃতি ছাড়া আমরা আরও দুইটি শারীরিক গঠন সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য জন্মসূত্রে লাভ করিয়া থাকি। একটি হইল nervous system বা নার্ভতন্ত্র এবং অপরটি হইল glandular system বা গ্রন্থিতন্ত্র। আমারা কে কতটুকু সংবেদনশীল (responsive) তাহা মুখ্যত নার্ভতন্ত্রের উপর নির্ভর করে। বাহিরের কোন ঘটনা বা বিষয়ের প্রতি অনেকের অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রতিক্রিয়া হয়। তাহাদের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আবার অনেকের এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করা তাহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। সুতরাং নার্ভতন্ত্র আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। গ্রন্থিতন্ত্রেরও অনুরূপ গুরুত্ব রহিয়াছে। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনেক-

1 তদেব পৃঃ ৫৩

গুলি glands বা গ্রন্থি রহিয়াছে। কতকগুলি গ্রন্থি এমন যাহাদের রস নিঃসৃত হইয়া রক্তে মিশিয়া সমগ্র দেহে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপ নিঃসৃত রসকে সাধারণতঃ হরমোন (hormone) বলা হয়। হরমোন দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্য গ্রন্থিতন্ত্রকে ব্যক্তিত্বের অন্যতম উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, জন্মসূত্রে আমরা নানারকমের reflex বা স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র পাইয়া থাকি। যেমন, হঠাৎ ঝলমলে আলো চোখে পড়িলে আপনা হইতেই চোখ বন্ধ হইয়া যায় অথবা লোভনীয় খাবার দেখিতে পাইলে জিভ হইতে লালা ঝরিতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, হৃৎস্পন্দন, হজমক্রিয়া প্রভৃতি নানারকম শারীরিক প্রতিক্রিয়া স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের অধীন। স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সহিত ব্যক্তিত্বের যোগাযোগ আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যেমন, স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পাইলে মানসিক স্থৈর্য কমিয়া যাইতে এবং উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, জন্মসূত্রে আমরা নানারকম মানসিক ধাত (temperament) পাইয়া থাকি। যেমন, কেহ কম বা বেশি আবেগপ্রবণ হইতে পারে, মেজাজ দ্রুত অথবা মন্থর গতিতে পরিবর্তিত হইতে পারে, কাহারও পরিশ্রম করার অনুকূল মানসিকতা থাকিতে পারে আবার কেহ পরিশ্রমবিমুখ হইতে পারে। খুব অল্প বয়সে এই পার্থক্যগুলি প্রকাশ পায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত অবস্থায় সারা জীবন ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। গ্রন্থিতন্ত্র দ্বারা মানসিক ধাত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

চতুর্থতঃ, কার্যদক্ষতা বা শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করার ক্ষমতা বংশগতির উপর নির্ভর করে। ইহা আবার নার্ভতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেকে প্রখর বুদ্ধি লইয়া জন্মায়। তাহারা খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিতে পারে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে শৈশবাবস্থা হইতেই স্থূলবুদ্ধির লক্ষণ সুস্পষ্ট। সব জিনিষ আয়ত্ত করা তাহাদের সাধ্যাতীত, এবং যাহা আয়ত্ত করে তাহাও অত্যন্ত মন্থর গতিতে। বুদ্ধির তারতম্যের জন্য সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতারও পার্থক্য দেখা যায়। এইসব কারণে ব্যক্তিত্বে রকমফের হওয়া স্বাভাবিক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বংশগতি দ্বারা একটি ভিত্তিভূমি তৈরী হয়। প্রত্যেক শিশুই নানারকম গুণ বা বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মায়। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বৈশিষ্ট্য আপনা হইতে বিকশিত হয়, বাহ্যিক কোনপ্রকার প্রভাব নিষ্প্রয়োজন। বাহিরের কাহারও সাহায্য ছাড়া শিশু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ বস্তু দেখিতে পারে, চিনিতে পারে এবং ধরিতে শিখে। নার্ভ কোষের (nerve cells) পরিবর্তনের সঙ্গে শিশুর আচরণও পরিবর্তিত হইতে থাকে। এইভাবে আস্তে আস্তে শিশু পূর্ণতাপ্রাপ্ত (maturation) হয়।

শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে আশপাশের লোকজনের কথাবার্তা এবং আচার-আচরণ তাহাকে প্রভাবিত করিতে আরম্ভ করে। এইসময় হইতেই শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনের সূচনা হয়। একজন সমাজতত্ত্ববিদ এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিযাছেন যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলেই শিশু সমাজের সম্মুখে "a candidate

for personality" হিসাবে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ এই সময় হইতেই শিশু সমাজের তত্ত্বাবধানে আসে। নানা উপায়ে সমাজের জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণগুলির সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করাইবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহাকে সামাজিকীকরণ বলা হয়। এইভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি নানাপ্রকার জৈব-বৈশিষ্ট্য সম্বলিত প্রাণী ধীরে ধীরে সামাজিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সমাজে প্রচলিত রীতি দ্বারা তাহার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক পরিবেশের সংস্পর্শে বিকশিত, পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়। সুতরাং বংশগতি এবং সামাজিকীকরণের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মানুষ নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ নহে। তাহার সক্রিয় ভূমিকা রহিয়াছে। সমাজ হইতে কতটুকু গ্রহণ করিবে বা না-করিবে ইহা সম্পূর্ণরূপে শারীরিক গঠনসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতার উপর নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া, সে-ও পরিবেশের উপর প্রভাব খাটাইতে পারে। একদিকে মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব এবং অপরদিকে পরিবেশের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠে এবং ব্যক্তিত্বকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে। শৈশবাবস্থা হইতে দুইটি শিশুকে একই পরিবেশে 'মানুষ' করিলেও তাহাদের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় গড়িয়া উঠে। ইহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শারীরিক এবং মানসিক ধাত ভিন্ন হওয়ায় পরিবেশের প্রভাবও ভিন্ন হয়। অভিন্ন পবিবেশে একজন গভীরভাবে প্রভাবিত হইতে পারে এবং আরেকজন সম্পূর্ণরূপে প্রভাব-মুক্ত থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ-প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করার সামর্থ্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হয়। একজনের পক্ষে যাহা সহজসাধ্য, আরেকজনের নিকট তাহা কষ্টসাধ্য, এমনকি দুঃসাধ্যও, হইতে পারে।

শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সে সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে, অপরদিকে তাহার মনোজগতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। সামাজিক পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে শিশুর মনে ধীরে ধীরে 'অহং' বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সে কেবলমাত্র স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন, ক্ষুধা পাইলে তাহার পেটের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং সে কান্নাকাটি করে। এইভাবে তাহার সব আচার-আচরণই প্রথম দিকে জৈব প্রয়োজনকে অনুসরণ করিয়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত চলিতে থাকে। ক্রমশঃ সে তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত লোকদের চিনিতে আরম্ভ করে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের উপস্থিতি তাহাকে আনন্দ দেয়, আবার কয়েকজনের উপস্থিতি তাহার বিরক্তি উৎপাদন করে। এইভাবে পরিবেশকে চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে সে আত্ম-সচেতন হইতে থাকে। যদি সে সম্পূর্ণ একা থাকিত তাহা হইলে তাহার অহং জ্ঞান হইত না। অন্য লোকের সংস্রবে আসার ফলেই সে আত্ম-সচেতন হইয়া উঠে। এই বিষয় সম্পর্কে এগুারসন এবং পার্কার নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন : "This development of self-consciousness as we are developing social cons-

ciousness is unique to the human species".1 অর্থাৎ সমাজ সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিবার সঙ্গে আত্ম-সচেতন হইয়া উঠা মানবজাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনুষ্যেতর জীবের 'অহং' বিষয়ে কোন বোধ জন্মায় না। ইহার একটি মাত্র কারণ হইল, মানবজাতির পক্ষে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান করা সম্ভব এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই স্বতন্ত্র জীবন-ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে।

আত্ম-সচেতন হইয়া উঠিবার পর হইতে 'অহং' বোধ শিশুর যাবতীয় কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা, এবং আচার-ব্যবহার প্রভাবিত করে। সে যাহাদের সংস্পর্শে আসে তাহাদের নিকট তাহার নানারকম প্রত্যাশা জন্মায়। সে তাহাদের সুখ্যাতি এবং প্রশংসা পাইতে চায়। সেইজন্য সে তাহাদের পছন্দানুযায়ী কাজ করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের অপছন্দের কাজ হইতে বিরত থাকে। এইভাবে অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভাল লাগা বা না-লাগা তাহার ব্যক্তিত্ব-গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ এই জাতীয় নানারকম কাজের ভিতর দিয়া শিশুর মনে গভীর রেখাপাত করে।

প্রথম দিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিশেষ বিশেষ কাজ করা হয় দেখিয়া শিশুও সময়ানুযায়ী কাজ করিতে অভ্যস্ত হয়। ধীরে ধীরে অভ্যাস গড়িয়া উঠিলে ইহা তাহার স্বভাবে পরিণত হয়। ইংরাজীতে একটা কথা প্রচলিত আছে ঃ Habit is one's second nature. অর্থাৎ মানব শিশু একটা বিশেষ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং অধিকাংশ সময় সে এই স্বভাবেব দ্বারা পরিচালিত হয়, চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশ বা প্রয়োজন থাকে না। অনুরূপভাবে, সে যখন বিশেষ বিশেষ কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখনও চিন্তা-ভাবনার প্রযোজন হয় না। সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ না ধুইয়া খাবার খাইতে নাই—ইহা প্রথম দিকে বারে বারে বলিয়া শিখাইতে হয়। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এই ক্রিয়া অভ্যাসে পরিণত হয় এবং আজীবন অব্যাহত থাকে।

উপরোক্ত পরিবর্তনগুলির সঙ্গে শিশুর মনোজগতে আরেকটি পরিবর্তন যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। যাহারা তাহার পরিচর্যা বা তত্ত্বাবধান করেন, তাহাদের আচার-আচরণ এবং কথাবার্তা সে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। যেমন, মেয়ে শিশু তাহার মায়ের কাজকর্ম অনুসরণ করিয়া পুতুলকে দুধ খাওয়ায়, স্নান করায়, মাঝে মাঝে মৃদু ভর্ৎসনা করে এবং আদর কবে। ছেলে শিশু সাধারণতঃ তাহার বাবা বা বড় ভাইয়ের আচার-আচরণ অনুকরণ করে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য লোকের আচরণ অনুকরণ করিবার সময় সে তাহাদের বিশেষ বিশেষ মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি (attitude) আয়ত্ত করে। এইভাবে সামাজিক পরিচিতির (social status) বিভিন্নতা অনুযায়ী যে সামাজিক ভূমিকা পৃথক হয় এই সম্পর্কে সে সচেতন হয়।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এই জ্ঞান তাহাকে তাহার সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া

---

1 Anderson & Parker: Society: Its Organisation and Operation. Page 76

মানে। সে অন্য লোকের মতামতে গুরুত্ব দিতে শিখে। তাহাদের সঙ্গে যথাসম্ভব খাপ খাওয়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। সে বিচার করিয়া দেখে, সমাজে কোন্ কোন্ কাজ করণীয় এবং কোন্ কোন্ কাজ বর্জনীয়, সমাজে কি কি আচরণ স্বীকৃত এবং কি কি আচরণ তিরস্কৃত। শৈশবাবস্থায় যাহা ছিল বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাহাই রূপান্তরিত হয় আন্তর দ্বন্দ্বে। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়, কোন্‌টা অনুকরণীয় কোন্‌টা বর্জনীয়—এই লইয়া সব সময় মনের মধ্যে আলাড়ন চলিতে থাকে। আলোড়নের তীব্রতা কম বা বেশি হয় নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি কম বা বেশি হওয়ার উপর। একটি জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদ। অপরটি শৈশবাবস্থা হইতে গঠিত মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি। তৃতীয়টি উপস্থিত সমস্যার প্রকৃতি। যেমন, একজনের কোন একটি সামগ্রী সম্পর্কে অভাব-বোধ ছিল এবং ইহা পাইবার জন্য মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল। দোকানে গিয়া সেই সামগ্রীটি দেখিবামাত্র তাহার আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হইয়া উঠে। অথচ সামগ্রীটি ক্রয় করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। এই অবস্থায় সমাজ-স্বীকৃত পন্থায় ঐ সামগ্রীটি পাওয়ার উপায় নাই। কিন্তু শৈশবাবস্থা হইতে যে-শিক্ষা পাইয়াছে সেই শিক্ষা অনুসারে সমাজের অননুমোদিত পন্থা অবলম্বন করা অন্যায় বলিয়া সে জানে। সুতরাং তাহার সমস্যা সমাধানের উপায় হইল, হয় আকাঙ্ক্ষা অবদমন কবা, না হয় সমাজ-অননুমোদিত নৈতিক মান উপেক্ষা করা, অথবা দোকানের সামগ্রীর প্রতি লোভ সংবরণ করা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, সজ্ঞানে যে-কোন পন্থা অবলম্বন করা হউক না কেন, অবচেতন মনে এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন থাকিয়া যায়। যদি সামগ্রীটি পাইবার জন্য সমাজ-অননুমোদিত নৈতিক মান উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে অবচেতন মনে অপরাধ-বোধ থাকে এবং বাহ্যিক কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার তদনুযারী প্রভাবিত হয়। অনুরূপভাবে, আকাঙ্ক্ষা অবদমন করিলে অথবা সামগ্রীটির প্রতি লোভ সংবরণ করিলে অবচেতন মনে আকাঙ্ক্ষা বা লোভ থাকিয়া যায় এবং বাহ্যিক আচার-আচরণে ইহার প্রতিফলন হয়। সুতরাং মানুষের চেতনায় এবং অবচেতন মনে যাহা থাকে তাহা না বুঝিলে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সম্যকভাবে বুঝা যায় না।

ব্যক্তিত্বের সম্পূরণ

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ব্যক্তিত্বের সম্পূরণ (**Personality integration**) সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি।

জৈবিক এবং সামাজিক উপাদানের সংমিশ্রণে ব্যক্তিত্ব গঠিত হইলেও ইহা মূলতঃ মনস্তত্ত্ব-সম্পর্কিত। মানুষ যাহা ভাবে অথবা যেরকম চিন্তা করে, সে ঠিক সেইরকম আচরণ করে। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ইহা সহজ ও সরল কথা। সুতরাং আন্তর দ্বন্দ্ব যত কম হয়, ততই সুসংহত ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

আন্তর দ্বন্দ্ব কম বা বেশি বলিতে কি বুঝায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা

প্রয়োজন। আমরা জীবনের প্রতি পদে নানা প্রকার বাহ্যিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই। তবে সব বাহ্যিক দ্বন্দ্ব আন্তর দ্বন্দ্বের রূপ না-ও নিতে পারে। আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও আন্তর দ্বন্দ্বের তারতম্য হয়। একই প্রকার বাহ্যিক দ্বন্দ্বে একজন বিচলিত হইয়া পড়িতে পারে, আবার অপর একজন খুব শান্তভাবে বাহ্যিক দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করিতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাহ্যিক দ্বন্দ্ব আন্তর দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয় না, অথবা হইলেও আন্তর দ্বন্দ্বের প্রকোপ অত্যন্ত মৃদু এবং সীমিত। সব রকম বাহ্যিক দ্বন্দ্ব কেন আন্তর দ্বন্দ্বে পরিণত হয় না অথবা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কি কারণে বাহ্যিক দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয় এই সম্পর্কে মনোবিদ এবং মানসিক রোগের চিকিৎসকগণ (Psychiatrists) নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন।

বাহ্যিক দ্বন্দ্ব যাহাতে আন্তর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমরা অনেক রকম প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর (defensive mechanism) গড়িয়া তুলি। প্রথমতঃ, অনেক সময় আমরা আমাদের অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা এবং ব্যর্থতাকে ভুলিয়া থাকিতে চাই এবং ইহাদিগকে আমাদের মনের চেতন স্তর হইতে অবচেতন স্তরে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করি। ইহাকে repression বা অবদমন বলা হয়। সব ক্ষেত্রে অবদমন সম্ভব হয় না; বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তারতম্য হয়। যাঁহারা অবচেতন স্তরে অবাঞ্ছিত চিন্তা বা অভিজ্ঞতা ঠেলিয়া দিতে সক্ষম, তাঁহাদের মনোজগতে আন্তর দ্বন্দ্বের আলোড়ন বেশি হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনোবিদগণ মনে করেন। কারণ, অবচেতন স্তর হইতে অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা মাঝে মাঝে চেতন স্তরে আসিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করে। যদিও আমরা জ্ঞাতসারে অবদমন করিয়া থাকি, কিন্তু অবদমনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরবর্তীকালে চেতন স্তরে যে-আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে। আমাদের অস্থির, অযৌক্তিক এবং বিকৃত বাহ্যিক আচার-আচরণে এই আন্তর দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা অবদমনের চেষ্টা না করিয়া অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা বা অভিজ্ঞতাসমূহের উদ্গতির (sublimation) চেষ্টা করেন, তাঁহাদের আন্তর দ্বন্দ্ব স্বভাবতই অনেক কম হয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যর্থতার সম্মুখীন হইলে অনেকের অবদমনের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। কেহ কেহ সাফল্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে অধিকতর সচেষ্ট হন। অনেকে ব্যর্থতার গ্লানি সজ্ঞানে বহন করিয়া বেড়ান। ইহার ফলে নানারকম বিকৃত আচরণ প্রকাশ পায়। যেমন, কর্মক্ষেত্রে বাদবিসম্বাদ বা ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অনেকে বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে বা পরিবারবর্গের সঙ্গে রাগারাগি করেন এবং নানারকম তিক্ততার সৃষ্টি করেন। আবার অনেকে যে-কাজে বা যে-ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন, তাঁহারা সেই কাজ বা ক্ষেত্র চিরতরে পরিত্যাগ করেন এবং অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শেষোক্ত ধরনের প্রতিক্রিয়াকে কোন কোন মনোবিদ পলায়নপরতা বা পরিহারমূলক আচরণ (withdrawal or avoidance reaction) বলিয়া আখ্যা দেন। তৃতীয়তঃ, অনেকে যুক্ত্যাভ্যাসের (rationalisation)

মাধ্যমে ব্যর্থতার গ্লানি বা অবাঞ্ছিত চিন্তা-ভাবনা যাহাতে আন্তর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করেন। নানা প্রকার যুক্তির সাহায্যে আন্তর দ্বন্দ্ব এড়াইবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যাহারা যুক্ত্যাভ্যাসের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা বা চিন্তাভাবনা এড়াইয়া চলিতে সক্ষম হন, তাঁহাদের মানসিক দ্বন্দ্বের পীড়ন অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং যাহারা সক্ষম না হন তাহাদের আন্তর দ্বন্দ্বের পীড়ন বেশি হওয়া স্বাভাবিক। চতুর্থতঃ, বাহ্যিক দ্বন্দ্ব যাহাতে আন্তর দ্বন্দ্বে পরিণত না হয় সেই উদ্দেশ্যে অনেকে অভিক্ষেপের (projection) আশ্রয় নেন। অভিক্ষেপও এক ধরনের যুক্ত্যাভ্যাস। অনেক সময় আমরা আমাদের ব্যর্থতা বা অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা অবস্থাকে দায়ি করিয়া মানসিক দ্বন্দ্ব হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা করি। যেমন, নির্বাচনে পরাজয় বরণ করিয়া সাধারণতঃ রাজনীতিক নেতা তাঁহার অযোগ্যতাকে পরাজয়ের কারণ না ভাবিয়া তাঁহার সমর্থকদের চেষ্টায় শৈথিল্যকে দায়ি করেন।

এই প্রসঙ্গে অসম্পূরিত ব্যক্তিত্ব (disintegrated personality) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ব্যক্তিত্বের সম্পূরণ সম্পর্কে ধারণা আরও পরিষ্কার হইবে। আন্তর দ্বন্দ্বের পার্থক্যের জন্য ব্যক্তিত্বে সংহতির তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় আন্তর দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে অসম্পূরিত ব্যক্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পোষণ করিলে ব্যক্তিত্ব অসংহত হইতে পারে। যেমন, কোন সৈনিক যুদ্ধের বিভীষিকায় ভীত হইয়া নানা অজুহাতে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু সে যদি বীর পুরুষ বলিয়া বন্ধু বা আত্মীয় মহলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার আচরণে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পাওয়া বিচিত্র নহে। অনেক সময় এই জাতীয় পরস্পর-বিরোধী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে গিয়া আন্তর দ্বন্দ্ব এত বেশি তীব্র হয় যে, তাহার ব্যবহারে মানসিক বিকৃতির ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রত্যেক যুদ্ধের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে এই জাতীয় মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকেরই সময় এবং কর্মশক্তি সীমিত। এই অবস্থায় একই সঙ্গে নানারকম উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করা হইলে সব উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিতে পারে। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি মানসিক অসন্তুষ্টি এবং আন্তর দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি। যেমন, একজন চাকুরিজীবী বিবাহিতা মহিলা তাঁহার স্বামী ও সন্তানদের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত থাকিতে পারেন এবং সুখী দাম্পত্যজীবন গড়িয়া তুলিতে আগ্রহান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু তিনি যে বৃত্তিতে নিযুক্ত তাহার প্রতিও তাঁহার সমরূপ আকর্ষণ ও আগ্রহ থাকিতে পারে। সুতরাং দাম্পত্যজীবন সম্পর্কিত কর্তব্য পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে কর্মজীবনের দাবি উপেক্ষা করিতে হইতে পারে। অনুরূপভাবে, কর্মজীবন সম্পর্কিত কর্তব্য

পালন করিতে গিয়া দাম্পত্যজীবনের দাবি উপেক্ষিত হইতে পারে। এই প্রকার টানা-পড়েনের ফলে নানারকম মানসিক উত্তেজনার (tension) সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে ব্যক্তিত্বের সংহতি নানাভাবে বিপর্যস্ত হইতে দেখা যায়। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে যাঁহারা মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা সাধারণতঃ বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সমূহকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাইয়া প্রয়োজনবোধে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য-সমূহ বিসর্জন দেন এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য পূরণ করিতে প্রয়াসী হন।

তৃতীয়তঃ, সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে অসমতাজনিত অসন্তুষ্টি আন্তর দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি করিতে পারে। সাধ্যাতীত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া একজন পদে পদে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করিতে পারে। ইহার ফলে তাহার আত্মবিশ্বাস সাংঘাতিকভাবে বিচলিত হইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্টও হইতে পারে। এই অবস্থায় মানসিক স্থৈর্য বা সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

চতুর্থতঃ, শিল্প-প্রধান সমাজে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া মান বজায় রাখার যে সাধ্যতীত প্রচেষ্টা দেখা যায়, তাহার ফলেও অসম্পূরিত ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। কারণ, শিল্প-প্রধান সমাজে পরিবর্তন এত বেশি দ্রুত ঘটে যে, মান রাখার প্রচেষ্টা একটা বিরামহীন প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। ইহার ফলে শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে চাপা উত্তেজনা নিত্যসঙ্গী হইয়া দাঁড়ায়। সামগ্রী-সমূহ ব্যবহার্য বস্তু না হইযা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এই অস্বাভাবিক দৃষ্টি-ভঙ্গি চিন্তাভাবনা এবং আচার-আচরণকে অস্বাভাবিক করিয়া তোলে।

ভারতীয় চিন্তাধারা

এই প্রসঙ্গে সুসংহত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভারতীয় চিন্তাধারার উল্লেখ করা যায়। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ অনেকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি লক্ষণ কেবলমাত্র সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া বিবেচিত এবং কয়েকটি লক্ষণ গৃহীর আদর্শ বলিয়া আবহমান কাল হইতে স্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছে ও ভারতীয় জীবনাদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। এই লক্ষণগুলি হইল :

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ গীতা ২।৫৬

অর্থাৎ দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন। এই শ্লোকে উল্লিখিত লক্ষণগুলি সুসংহত ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। মনোজগতে বিভিন্ন আদর্শ বা লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানসিক স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, সাফল্য এবং ব্যর্থতা সম্পর্কে দার্শনিকসুলভ মনোভাব গড়িয়া না উঠিলে দুঃখে উদ্বেগহীন,

সুখে নিঃস্পৃহ ও বীতরাগভয়ক্রোধঃ হওয়া অসম্ভব। এই প্রকার দার্শনিকসুলভ মনোভাব গড়িয়া তুলিবার পন্থা হিসাবে গীতার সাংখ্যযোগে কর্ম হইতে কর্মফলকে পৃথক করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম অনুসরণ করার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মনি॥ গীতা ২।৪৭

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, কেবলমাত্র কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নহে। অতএব কর্ম কর।` কিন্তু কর্মফলে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়: কারণ, কর্মফলের তৃষ্ণাই কর্মফলপ্রাপ্তির হেতু। সুতরাং কর্মফলপ্রাপ্তির হেতু হইও না অর্থাৎ সকাম ভাবে কর্ম করিও না। আবার কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হউক।

উপরোক্ত জীবনাদর্শ ভারতীয় সমাজে সর্বস্তরে সর্বকালে সক্রিয় ছিল বা বর্তমানে সক্রিয় আছে বলা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু এই আদর্শ জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ইহা ভাবাও সঙ্গত নহে। আবহমানকাল হইতে এই আদর্শ ভারতীয়দের মূল্যবোধ ও জীবন-প্রণালীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য। নানাপ্রকার অভাব অনটনের মধ্যেও এই আদর্শ তাহাদের মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে। সুদূর নিভৃত পল্লীতে নিরক্ষর চাষীদের জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করিলে এই জীবনাদর্শ কিভাবে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত সারা সমাজ-দেহে পরিব্যাপ্ত ছিল তাহা বুঝা যায়। এই জীবনাদর্শ আমাদের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে কিনা এই লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করিতে হইলে যে, এই ধরনের জীবনাদর্শের বিশেষ গুরুত্ব আছে তাহা বোধহয় অনস্বীকার্য।

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য-সমূহ আলোচনা করিতে পারি। সাধারণ কথাবার্তায় ব্যক্তিত্ব বলিতে ব্যক্তির সেইসব গুণের উল্লেখ করা হয় যাহা লোককে আকৃষ্ট করে বা অভিভূত করে। ব্যক্তিত্বহীন লোক বলিতে এমন লোককে বুঝায় যাহার কথাবার্তা বা আচার-আচরণে আকর্ষণীয় কিছু লক্ষ্য করা যায় না।

কিন্তু মনস্তত্ত্বে এবং সমাজতত্ত্বে প্রত্যেক লোকেরই ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করা হয়। কারণ, ব্যক্তির 'অহং' ভাবকে কেন্দ্র করিয়া যে মানসিকতা ও আচার-আচরণ গড়িয়া উঠে তাহাই ব্যক্তিত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে দুইজন ভিন্নমতাবলম্বী মনস্তত্ত্ববিদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সংজ্ঞা উল্লেখ করা যায়। এলপোর্ট ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলিয়াছেন: "Personality is the dynamic organisation within the individual of those psychological systems which determine his unique adjustments to his

environment."1 ওয়াটসন্ নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন: "Our personality is......the result of what we start with and what we have lived through. It is the 'reaction mass' as a whole."2 উল্লিখিত দুইটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যক্তিত্বের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিত্বের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ব্যক্তির আত্ম-সচেতনতা। যখন চেতনায় 'অহং' ভাব প্রকাশ পায় তখনই একজন লোক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না। কারণ, চিন্তন মনন ও ক্রিয়াকলাপে তাহার অভিন্নতা-বোধ জন্মায় না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই 'অহং' ভাব এবং তৎসম্পর্কিত মানসিকতা ও আচরণ গড়িয়া উঠে। আত্ম-সচেতনতা না থাকার জন্য মনুষ্যেতর জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না।

ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, ইহা কেবলমাত্র সামাজিক পরিবেশে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গড়িয়া উঠে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন শিশু যদি কোন কারণে মনুষ্য সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হয় না। ভারতবর্ষের বনে প্রাপ্ত নেকড়েবাঘ-পালিত মানবশিশুর উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। এই কারণে ফিক্‌টে (Fichte) বলিয়াছেন: "Man becomes man only among men."

তৃতীয়তঃ, সমাজে বসবাস করার জন্য জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও নানারকম সামাজিক প্রয়োজনের উদ্ভব হয়। এই সব জৈবিক ও সামাজিক প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার প্রচেষ্টা আমাদের চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম ও আচারব্যবহারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং কোন ব্যক্তির বিভিন্ন লক্ষ্যের সঙ্গে পরিচিত না থাকিলে তাহার ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় না।

চতুর্থতঃ, জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন সমগ্র দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, ঠিক তেমনি ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান—যেমন, শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক উপাদানসমূহ—'অহং' ভাবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। ব্যক্তিত্ব বলিতে গোটা মানুষকে তাহার ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছু লইয়া বুঝিতে হইবে। আংশিকভাবে বিচার বা বিশ্লেষণ করিলে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বুঝা যায় না। প্রথম দিকে অর্থাৎ শৈশবাবস্থায় মানুষ জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদ এবং ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে বুদ্ধি দ্বারা জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদ এবং ভাবাবেগ নিয়মিত হয়। লোকের আচার-আচরণ এবং চিন্তাধারার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠে। ইহাই প্রত্যেক লোকের ব্যক্তিত্বকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে।

---

1 G. W. Allport: Personality: A Psychological Interpretation. Henry Cott and Co. N. Y. P48.

2 J. B. Watson: Psychology from the Standpoint of a Behaviourist. Lippincott Co., Philadelphia. P420.

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিকীকরণ—এই দুইয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিলেও ইহার মূল উপাদান হইল মনস্তত্ত্বগত। এই পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শারীরিক গঠন—বিশেষ করিয়া নার্ভতন্ত্র ও গ্রন্থিতন্ত্র—কিভাবে মানসিকতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সামাজিকীকরণের মাধ্যমেও মানসিকতা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং ব্যক্তিত্বের আসল স্বরূপ ব্যক্তির মনন, চিন্তন, কম্পন, ইচ্ছন প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। অন্য কোন উপায়ে (যেমন, কেবলমাত্র বংশগতি বা পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে) ব্যক্তির সামগ্রিক আচারআচরণ (totality of behaviour) ব্যাখ্যা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে রুথ বেনেডিক্টের (Ruth Benedict) মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "………no anthropologist with a background of experience of other cultures has ever believed that individuals were automatons, mechanically carrying out the decrees of their civilisation. No culture yet observed has been able to eradicate the differences in the temperaments of the persons who compose it. It is always a give-and-take. The problem of the individual is not clarified by stressing the antagonism between culture and the individual, but by stressing their mutual reinforcement. This rapport is so close that it is not possible to discuss patterns of culture without considering specifically their relation to individual psychology."1 অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজস্থ লোকের আচরণ ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিলে এই ধারণা হয় যে, কোন ব্যক্তিই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত সমাজ-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে না। কে কতটুকু সমাজ-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিবে, ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় চিন্তাধারা ও মানসিক ধাতের উপর নির্ভর করে। কোন সমাজ-ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত ব্যক্তির স্বকীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র মানসিকতা বিবেচনা না করিলে জীবন-ধারা সংক্রান্ত কোন আলোচনাই অর্থবহ হয় না। সেইজন্য এলপোর্ট ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়া মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

1. **Ruth Benedict : Patterns of Culture. Routledge and Kegan Paul Ltd. London, 1961. Pages 182-183.**

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Ely Chinoy: Sociological Perspective. Random House, N. Y. 1954. Chapter VI.

২। Kingsley Davis: Human Society. The Macmillan Co. N. Y. 1961. Chapter VII-X.

৩। Anderson & Parker: Society: Its Organisation and Operation. Affiliated East-West Press Pvt. Ltd. New Delhi. 1966. Chapter V.

৪। Mac Iver and Page: Society Macmillan & Co. Ltd. London 1959. Chapters III and IV.

৫। Ruth Benedict: Patterns of Culture. Routledge and Kegan Paul Ltd, Broadway House, Carter Lane, London E.C.4. 1961. Chapter VIII,

৬। Morris Ginsberg: Sociology. Oxford University Press. London. 1961. Chapter III.

৭। G. W. Allport: Personality: A Psychological Interpretation. Constable & Co. London. 1937. Chapter II.

৮। Robert E. Cooke (ed) M.D.: The Biological Basis of Pediatric Practice. The Blakiston Division. Mc Graw-Hill Book Company, N. Y. Chapter III, Section II. (Entitled Psychology and Sociology).

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমাজ-জীবন যাপনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মনোবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ

মানুষ সামাজিক জীব। অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এই তথ্য সব সমাজবিদ্যাতেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। এই পুস্তকের পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে এই ধারণার ভিত্তিতে সমাজসম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ কি কারণে সমাজে বাস করে এই বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা হইলে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইবে।

সভ্যতা বিকাশের প্রথম হইতে সমাজ-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মানুষের মৌল প্রেরণা (urges) এবং প্রবণতা (propensities) সম্পর্কে নানা-প্রকার চিন্তাভাবনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ চলিয়া আসিতেছে। আজও এই আলোচনা অব্যাহত আছে। এই বিষয়ে আমরা দুইটি ভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করিতে পারি। একটি মতবাদ মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকে (instincts) কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অপর মতবাদের কেন্দ্র হইল মানুষের বিবিধ প্রয়োজন (needs)।

ম্যাকডুগল (Mc Dougall), ফ্রয়েড (Freud) প্রমুখ মনোবিদগণের মতে মানুষ অনেকরকম সহজ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মায়। তাহার যাবতীয় কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা ও আচারব্যবহার সহজ প্রবৃত্তিসমূহ দ্বারা প্রভাবিত অথবা নিয়ন্ত্রিত হয়। ম্যাকডুগল চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তির উল্লেখ করেন। পিতামাতার প্রতি আকর্ষণ, সঙ্গলিপ্সা, যৌনাকাঙ্ক্ষা, ঔৎসুক্য, খাদ্যান্বেষণ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি উপরোক্ত চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তির অন্তর্গত। তাঁহার মতে মানুষ সহজ প্রবৃত্তিগুলি জন্মসূত্রে লাভ করিয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মাত্র কয়েকটি প্রবৃত্তি ছাড়া বাকী প্রবৃত্তিগুলি সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত (maturation) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবৃত্তিগুলি বিকশিত হইতে থাকে। সুতরাং ম্যাকডুগলের মতে মানুষের সমাজ-জীবন যাপন করার কারণ তাহার সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত। ফ্রয়েডের মতেও সহজ প্রবৃত্তির তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। কিন্তু তাঁহার বিশ্লেষণ একটু স্বতন্ত্র। তাঁহার মতে মানুষের সব চিন্তাভাবনা এবং আচার-আচরণ কামশক্তি (libido) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। "Upon the whole, it would seem to be Freud's real intention to urge that all tenderness to others is diffused and aim-inhibited sexuality. This is the root of the family, but also of wider groups; theoretically indeed Eros is capable of

binding into a unity the whole of mankind."1 অর্থাৎ ফ্রয়েডের মতে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, তথা সর্বপ্রকারের সমাজ-ব্যবস্থা, কামশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব সমাজ-বন্ধনের কারণ খুঁজিতে হইবে মানুষের অন্তর্নিহিত যৌন-প্রবৃত্তির মধ্যে।

বিংশ শতাব্দীর বিশ শতকে সর্বপ্রকার সামাজিক আচার-আচরণকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টাকে নানাদিক হইতে সমালোচনা করা হয়। মানুষের কোন সর্বজনীন সহজ প্রবৃত্তি নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহার সমর্থনে নানাপ্রকার নৃতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্যের উল্লেখ করা হয়। এমন অনেক উপজাতি (tribe) আছে যাহাদের মধ্যে সংগ্রাম-প্রবৃত্তি প্রবল। আবার অনেক উপজাতির মধ্যে সংগ্রাম-প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রেই এই ধরনের পার্থক্য নজরে পড়ে। এই কারণে অনেকের মত হইল যে, সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য কোনপ্রকার সহজ প্রবৃত্তি নাই। এই জাতীয় প্রবৃত্তির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব এবং কাল্পনিক। তাহা ছাড়া, রেড ইণ্ডিয়ান এবং মাওরীদের (Maoris) উদাহরণ নির্দেশ করিয়া অনেক সমালোচক বলেন যে, এই দুই উপজাতির সংগ্রামাত্মক কার্যকলাপ মাত্র কয়েক পুরুষেই প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা যদি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে ইহার এত আকস্মিক অবলুপ্তি হইত না। মানুষের চিন্তাভাবনা ও কাজ-কর্মকে সহজ প্রবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গেলে নানারকম ব্যতিক্রমের সম্মুখীন হইতে হয়। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেকটি সহজ প্রবৃত্তিরই ব্যতিক্রম নজরে পড়িবে। এই কারণে সহজ প্রবৃত্তির ভিত্তিতে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে আচার-আচরণকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে।

বর্তমানে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তির পরিবর্তে মানুষের বিবিধ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সামাজিক আচার-আচরণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হয়। বিবিধ প্রয়োজন কি কি এই সম্পর্কে মনোবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে এই সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া মৌল প্রয়োজন-গুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় অঙ্কিত নির্লেখে এই প্রয়োজনগুলি তুলিয়া ধরা হইল ঃ

1 M. Ginsberg: Sociology. Oxford University Press, London. 1961. Page 104.

নিরাপত্তা-বোধ চরিতার্থ হইলেই মানুষের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং আত্মোপলব্ধি করা (অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্ষমতাসমূহ প্রকাশ করা) সহজসাধ্য হয় ঃ

↑

দৈহিক এবং মানসিক প্রয়োজন চরিতার্থ হইলে নিরাপত্তা-বোধ জন্মে ঃ

দৈহিক প্রয়োজন ↑ মানসিক প্রয়োজন

↑ বায়ু ↑ জল ↑ খাদ্য ↑ আশ্রয় ↑ বিশ্রাম

অপরের নিকট হইতে স্নেহ, ভালবাসা, গুণের স্বীকৃতি এবং প্রশংসা লাভ করা	বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করা	কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য পরিবেশকে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করা
অপরকে ভালবাসা, স্নেহ করা, অন্যের গুণের স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্যকে প্রশংসা করা	দুঃসাহসিক কর্ম প্রচেষ্টা এবং নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করা	কাজকর্ম এবং চিন্তা করার স্বাধীনতা

এই নির্লেখটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের প্রধান প্রয়োজন হইল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা। এই বিষয়টি আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ "মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রানির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।"1

কিন্তু মানুষের এমনই প্রকৃতি যে, সে কেবলমাত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিলে সন্তুষ্ট হয় না। বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদ ছাড়াও তাহার অন্য তাগিদ আছে। সে জীবনকে অর্থবহ করিয়া তুলিতে চায়। মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এইখানে যে, সে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয় না, সে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকশিত করিয়া নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে চায়। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ "কিন্তু, মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্য বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়। স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে

1 রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের ভূমিকা

নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব-প্রকৃতিতে ; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।"1

মানুষের মধ্যে এই দ্বৈত ভাব আছে বলিয়াই তাহার দৈহিক প্রয়োজন ছাড়াও মানসিক প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রথমটিতে সে পায় বাঁচিয়া থাকার আশ্বাস। দ্বিতীয়টিতে পায় পরিপূর্ণতা-লাভের প্রতিশ্রুতি।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। উপরোক্ত প্রয়োজনসমূহ কেবলমাত্র সমাজে থাকিলেই চরিতার্থ হইতে পারে, সমাজের বাহিরে নয়। সুতরাং মানুষ কি কারণে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, কি কারণে সে নিজেকে নানাপ্রকার সামাজিক অনুশাসনের অধীন করিয়া রাখে, এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে তাহার প্রকৃতির মধ্যে। সমাজ-বহির্ভূত জীবন যাপন করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কারণ, অপরের সান্নিধ্য, সাহচর্য, প্রীতি ও ভালবাসা না পাইলে তাহার সুপ্ত ক্ষমতা উন্মেষিত হয় না। সে অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

মনোভাব ও লক্ষ্যবস্তু

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমাজে বাস করা এবং নানারকম সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করা মানুষের ধর্ম। কিন্তু সমাজস্থ লোকদের মধ্যে কাহার সঙ্গে কি ধরনের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে ইহা মুখ্যত নির্ভর করে তাহার মনোভাবের (attitude) উপর। শৈশবাবস্থাতেই মনোভাবের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। কাহারও উপস্থিতি শিশুকে আনন্দ দেয়। আবার কাহারও উপস্থিতি তাহার বিরক্তি সৃষ্টি করে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মনোভাবে আরও অনেক রকম বৈচিত্র্য দেখা যায়। কাহাকেও সে শ্রদ্ধা করে ; আবার কাহাকেও সে ঘৃণা করে। কাহারও প্রতি সে সহানুভূতিশীল ; আবার কাহারও প্রতি সে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। মনোবিদ্যায় অপরের প্রতি বা কোন বিষয়ের প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে attitude বা মনোভাব বলা হয় এবং যাহার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহাকে বলা হয় interest বা লক্ষ্যবস্তু। সামাজিক সম্পর্ক সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে উভয় বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। যেমন, যদি বলা হয় অমুক লোক ভয় পাইয়াছে, তাহা হইলে ভয়ের লক্ষ্যবস্তু না জানিলে অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান হয় না। যদি বলা হয় অমুক লোক সহানুভূতি-শীল, তাহা হইলে জানা দরকার কি বিষয়ে বা কাহার প্রতি সহানুভূতিশীল। অর্থাৎ মনোভাব এবং লক্ষ্যবস্তু এই উভয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হইলেই সামাজিক সম্পর্ক অর্থবহ হয়। শৈশবাবস্থা হইতেই শিশু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিতে শিখে।

সামাজিক সম্পর্ক মনোভাবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এই প্রসঙ্গে মনোভাবকে তিনটি জাতিরূপে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, এমন অনেক মনোভাব আছে যাহা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। যেমন, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা, ভদ্রতা প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ, এমন অনেক মনোভাব আছে

1 রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের ভূমিকা।

যাহা সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। আতঙ্ক, হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, ঔদ্ধত্য, সন্দেহ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়তঃ, এমন অনেক মনোভাব আছে যাহা সামাজিক মেলামেশাকে সঙ্কুচিত করে। শ্রদ্ধা, বিনয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সমাজতত্ত্বের দিক হইতে লক্ষ্যবস্তুকেও দুইটি জাতিরূপে ভাগ করা যায়। একটিকে বলা হয় Common interest বা অভিন্ন লক্ষ্যবস্তু। অপরটিকে বলা হয় like interest বা অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু। উদাহরণের সাহায্যে দুই প্রকার লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন অন্তঃসামাজিক সঙ্ঘের সদস্যদের নিজেদের সঙ্ঘের প্রতি একই প্রকার আসক্তি বা আনুগত্য থাকায় বলা যাইতে পারে যে তাহাদের লক্ষ্যবস্তু অভিন্ন। আবার অন্তঃ-সামাজিক সঙ্ঘের সদস্যদের বহিঃসামাজিক সঙ্ঘের প্রতি একই প্রকার মনোভাব থাকিলে বলা যায় যে এই ক্ষেত্রেও তাহাদের অভিন্ন লক্ষ্যবস্তু। যখন কোন জনসমষ্টি কোন বিশেষ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে তখনও তাহাদের অভিন্ন লক্ষ্যবস্তু আছে বলিয়া বলা যায়।

প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করা। সুতরাং বলা যায় যে, ব্যবসায়ীগণের অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু রহিয়াছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু থাকে। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য হইল অন্যান্য অংশ-গ্রহণকারীদের পরাস্ত করিয়া বিজয়ীর গৌরব অর্জন করা। অনুরূপ লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি। অপর পক্ষে, অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে আমরা সংকীর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অপরের স্বার্থের সঙ্গে আংশিকভাবে সঙ্গতি স্থাপন করি। যেমন, যখন কেহ পরিবারের প্রতি অনুগত থাকে তখন সে ব্যক্তিগত ভালমন্দকে পারিবারিক ভালমন্দের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করে। সাধারণতঃ ব্যক্তি-স্বার্থকে পারিবারিক ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে স্থান দেয় না। এইভাবে যখন আমরা কোন সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকি, তখন কোন কোন বিষয়ে সংকীর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থের সীমানা পরিবর্ধিত হইয়া সমষ্টি-স্বার্থের সঙ্গে মিলিত হয়।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইতে পারে। যেমন, দুইজন ব্যবসায়ীর 'অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু হইল ব্যক্তিগত মুনাফা সর্বাধিক করা। কিন্তু মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইয়া অংশীদার কারবারের পত্তন করিতে পারেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়, যদিও খুবই সীমিত গণ্ডীর মধ্যে। সমাজের নানা ক্ষেত্রে এই ধরনের রূপান্তর অবিরাম ঘটিয়া থাকে।

আবার মানুষের মধ্যে দ্বৈত ভাব আছে বলিয়া একদিকে সে নিজেকে লইয়া ব্যস্ত, অপরদিকে সে নিজেকে অতিক্রম করিয়া অপরাপর লোকের সঙ্গে

মিলিত হইতে ব্যগ্র। সুতরাং মানুষের অধিকাংশ কাজকর্মে অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু এবং অভিন্ন লক্ষ্যবস্তু উভয়ের প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা খুব স্বাভাবিক যে, মানুষ ব্যক্তি-স্বার্থ সংরক্ষণ এবং পরিপুষ্ট করিতে সচেষ্ট থাকে। আবার ইহাও স্বাভাবিক যে, সে কোন কোন বিষয়ে অপরের স্বার্থ-বিরোধী কাজ হইতে বিরত থাকে এবং অপরের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের সঙ্গে এক করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। সুতরাং মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করিলে উভয় প্রকার লক্ষ্য বস্তুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

মানব-শিশু প্রথমাবস্থায় খুব বেশি আত্ম-কেন্দ্রিক থাকে। তাহার বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কেবলমাত্র ব্যক্তি-স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়। সামাজিকী-করণের ফলে সে ধীরে ধীরে সমাজ-সচেতন হইয়া উঠে এবং তাহার মনোভাব এবং লক্ষ্যবস্তুতে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই পরিবর্তন যদি না ঘটিত এবং আমাদের লক্ষ্যবস্তু যদি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হইত, তাহা হইলে সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারিত না। অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু এবং অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় আছে বলিয়াই সমাজ-জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, অনুবৃপ লক্ষ্যবস্তুর তুলনায় অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর প্রতি যাহাতে সমাজস্থ লোক অধিক আকৃষ্ট হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিশুর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই মানদণ্ড দ্বারা রাজনীতিক আদর্শ বা কর্মপন্থারও মূল্যায়ন করা হয়। যে-সব রাজনীতিক আদর্শবাদ অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর প্রতি মানুষকে অধিক আকৃষ্ট করে সেইসব আদর্শবাদকে প্রগতিশীল বলিয়া অ্যাখ্যা দেওয়া হয। আবাব প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শবাদ বলিতে এমন আদর্শবাদ বুঝায় যাহা মানুষকে অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর তুলনায় অনুরূপ লক্ষ্যবস্তুর প্রতি অধিক আকৃষ্ট করে।

প্রেষণা ও সামাজিক আচার-আচরণ

অনেকে বলেন যে, মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে কেবলমাত্র মনোভাব ও লক্ষ্যবস্তু বিবেচনা করিলেই যথেষ্ট হয় না; আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 'কারণ' অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে কোন কার্য করা হয় তাহা জানা দরকার। যেমন, কোন হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে অনেকগুলি কারণের কথা ভাবা যাইতে পারে। কেহ অর্থের লোভে হত্যা করিতে পারে, আত্মরক্ষার স্বার্থে হত্যা করা প্রয়োজন হইতে পারে, অথবা পূর্বের কোন আক্রোশ থাকায় হত্যা করিতে পারে। উল্লিখিত তিনটি কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর এবং সমাজে তিনটি কারণের তাৎপর্যও ভিন্ন। এই কারণ বা উদ্দেশ্য (motive) অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রেষণার (motivation) আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। যখন কোন লক্ষ্যবস্তু অর্জন করিবার জন্য প্রকৃষ্ট এষণা বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় এবং প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা জোগায়, তখন সেই অনুভূতিকে motivation বা প্রেষণা বলা হয়। যে-কোন লক্ষ্যবস্তু অর্জন করিতে হইলে উপযুক্ত প্রেষণা দ্বারা উদ্বোধিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা

না হইলে কোন উদ্দেশ্য সার্থক করা কঠিন। নিজের অথবা অপরের কাজকর্ম বা আচার-আচরণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই বিষয়টি বুঝিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রেষণা কি ভাবে সৃষ্টি হয় অথবা একই পরিবেশে 'মানুষ' হওয়া সত্ত্বেও দুই ব্যক্তির প্রেষণায় কেন বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য। কারণ, প্রেষণা মনের চেতন, অবচেতন এবং অচেতন স্তরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

তবুও বিভিন্ন ভাবে প্রেষণার গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেক মনোবিদ সহজ প্রবৃত্তির (instincts) সাহায্যে প্রেষণা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে পূর্বেই ম্যাক ডুগল ও ফ্রয়েডের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা প্রায় সর্বজনবিদিত যে, ফ্রয়েড যাবতীয় কাজকর্মকে যৌন প্রবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। আমরা সহজ প্রবৃত্তি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় দেখিয়াছি, এই ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে।

অনেকে বলেন, লাভ-ক্ষতির হিসাব দ্বারা মানুষের আচার-আচরণ এবং চিন্তা-ধারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বলা হয় যে, মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। সুতরাং যাহা কিছু তাহার আর্থিক লাভ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে অথবা যাহা তাহার আর্থিক ক্ষতি ন্যূনতম করিতে সাহায্য করে তাহাই সে অনুসরণ করে। ক্ল্যাসিকাল অর্থনৈতিক তত্ত্ব এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

টালকট পারসন্স্ এই প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কিত মতবাদকে ('self-interested' or 'egoistic' theory) নানাদিক হইতে সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে মানুষ সর্বদা যুক্তিসম্মত আচরণ করে অথবা যুক্তিসম্মত আচরণ করার সুযোগ সর্বত্র থাকে, তাহা হইলেই উপরোক্ত মতবাদ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ সব সময় যুক্তিসম্মত আচরণ করে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত আচরণ করা সম্ভব হয় না। আমাদের অনেক আচার-আচরণে ঐতিহ্যের (tradition) প্রভাব সুস্পষ্ট। যুক্তি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া অতীতের অন্ধ অনুসরণ করা মানুষেব স্বাভাবিক ধর্ম। দ্বিতীয়তঃ, বিধি-শাসিত সমাজে বাস করার জন্য মানুষ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লাভালাভের বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হয় না। তাহার নীতি জ্ঞান, ভাবাবেগ, ভালমন্দ সম্পর্কিত ধারণা প্রভৃতি মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং একমাত্র অর্থনৈতিক লাভালাভ দ্বারা তাহার আচরণকে সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ধরনের আলোচনাকে অত্যন্ত একপেশে এবং আংশিক বিশ্লেষণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক লাভ বা সুখস্বাচ্ছন্দ্য সর্বাধিক করার প্রয়াসকে মৌল প্রেষণা-সঞ্জাত প্রয়াস বলিয়া গণ্য করা সমীচীন নহে। নানাপ্রকার প্রেষণার সমাবেশে অর্থনৈতিক প্রেষণার সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক সময় সমাজ-ব্যবস্থা এবং জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা অর্থনৈতিক প্রেষণা প্রভাবিত হয়। এই সম্পর্কে পারসন্স্-

এর উক্তির আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হইল: "Economic motivation is not a category of motivation on the deeper level at all, but is rather a point at which many different motives may be brought to bear on a certain type of situation. Its remarkable constancy and generality is not a result of a corresponding uniformity in 'human nature' such as egoism or hedonism, but of certain features of the structure of social systems of action which, however, are not entirely constant but subject to institutional variation."[1] পারসন্‌স্-এর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অর্থনৈতিক প্রেষণা যে মৌল প্রেষণা নহে এবং ইহা যে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, এই তথ্যটি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যবসায়ী এবং ডাক্তার উভয়েরই উদ্দেশ্য সাধ্যানুযায়ী উপার্জন বৃদ্ধি করা। কিন্তু ব্যবসায়ী যে-ভাবে মুনাফা সর্বাধিক করার লক্ষ্যকে সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরেন এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে-পন্থা অনুসরণ করেন, তাহা ডাক্তারের পক্ষে করা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রত্যেক সমাজেই অর্থ উপার্জন করা ছাড়া ডাক্তারের স্বতন্ত্র সমাজ-কল্যাণমূলক ভূমিকা স্বীকৃতি পাইয়া থাকে। সুতরাং কোন ডাক্তারই অর্থ-গৃধ্নু বলিযা পরিচিত হইতে চান না; বরং সর্বপ্রকারে এই ধরনের অভিযোগ হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করেন। কারণ, রোগীকে নিরাময় করা এবং সমাজকে রোগমুক্ত রাখা তাঁহার অন্যতম প্রধান আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত হয়। সমাজ যদি শক্তিমান এবং সক্রিয় হয তাহা হইলে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লাভালাভের প্রশ্ন ডাক্তারের একমাত্র বা মুখ্য আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শিক্ষকের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। এই বিষযটি আলোচনা করিতে গিয়া পারসন্‌স্ নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন: "We should bear in mind that economic activity takes place within the 'institutional' framework of a society, and that economic behaviour is therefore a phase of institutional behaviour. Deeper moral sentiments are inculcated in early childhood and are deeply built into the structure of personality itself. They are, in the deeper senses, beyond the range of conscious decision and control, except perhaps, in certain critical situations, and even when consciously repudiated, still continue to exert their influence through repressed guilt feelings and the like. In situations of strain these may well come to be in radical opposition to the self-interested impulses of the actor; he is the victim of difficult

1 Talcott Parsons: Essays in Sociological Theory. The Free Press of Glencoe. Collier-Macmillan Ltd. London. 1964 Page 53.

conflicts and problems of conscience. But there is evidence of a strong tendency, the more that people are integrated with an institutional system, for these moral sentiments to be closely integrated with the self-interested elements".1 অর্থাৎ শৈশবাবস্থা হইতে সামাজিকীকরণের ফলে মূল্যবোধ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয় যে, মানুষের মনের অবচেতন এবং অচেতন স্তরে ইহার প্রতিফলন হয়। তাহার অজ্ঞাতসারে কাজকর্ম এবং আচার-আচরণ এই মূল্যবোধের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। প্রকাশ্যভাবে এই মূল্যবোধকে অস্বীকার এবং বর্জন করিলেও কার্যতঃ বর্জন বা উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। জীবনে এমন অনেক সঙ্কটময় মুহূর্ত আসে যখন সমাজ হইতে প্রাপ্ত মূল্যবোধের সঙ্গে অনুসৃত পন্থার বিরোধ বাধে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিবেকের দংশন পীড়িত করে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে পারসন্‌স্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানুষের আচার-আচরণ কেবলমাত্র ব্যক্তি-স্বার্থ দ্বারা নির্ণীত হয় না। স্বার্থ-নিরপেক্ষ নানা কারণে তাহার কার্যকলাপ প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, ব্যক্তি-স্বার্থেও নানা প্রকার-ভেদ দেখা যায়। অন্যের প্রশংসা অর্জন করা, অন্যের নিকট সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হওয়া, আনন্দ বা সন্তুষ্টি লাভ করা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ব্যক্তি-স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকিতে পারে। অতএব উপসংহারে বলা যায় যে, প্রেষণার সৃষ্টি বা গতি-প্রকৃতি সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। প্রেষণার গতি-প্রকৃতি এত জটিল এবং সূক্ষ্ম যে, কোন ব্যাখ্যাই পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

---

1 তদেব পৃষ্ঠা ৫৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Mac Iver and Page — Society. Macmillan & Co Ltd. London. 1959. Chapter II.

২। M. Ginsberg : Sociology. Oxford University Press. London. 1961. Chapter IV.

৩। Talcott Parsons : Essays in Sociological Theory. Revised Edition, 1964. The Free Press of Glencoe Collier-Macmillan Ltd. London. There are two important articles in this book : (1) The Role of Ideas in Social Action. (2) The Motivation of Economic Activities.

৪। Talcott Parsons and Edward A. Shils — Toward a General Theory of Action. Harvard University Press. 1951. There is an important Chapter in this book entitled "Values, Motives and Systems of Action".

৫। W. Mc Dougall : An Inroduction to Social Psychology. Methuen & Co. London. 1908.

৬। W. Mc Dougall : An Outline of Psychology. Methuen & Co. Ltd. 1923.

৭। S. Freud : Beyond the Pleasure Principle. The International Psychó-Analytical Press. London. 1922.

৮। G. W. Allport : Personality : A Psychological Interpretation. Constable & Co. London. 1937.

৯। Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Co. N. Y. 1961. Chapters IX and X.

সমাজতত্ত্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

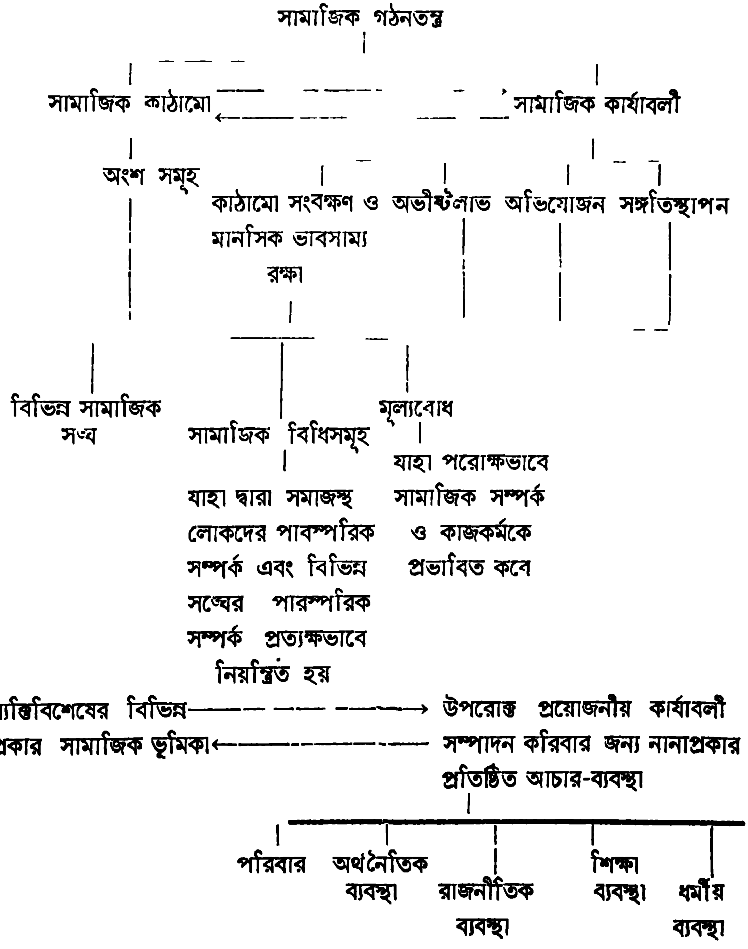
সামাজিক আচার-ব্যবস্থা

নবম পরিচ্ছেদ

সামাজিক গঠনতন্ত্র

সমাজকে একটি সিস্টেম বা গঠনতন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করার প্রচেষ্টা স্পেনসার প্রমুখ লেখকদের আলোচনায় পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞানের প্রভাবে তাঁহারা জীব-দেহেব সঙ্গে সমাজের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ইদানীং কালে সামাজিক কাঠামো এবং তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহীতত্ত্ব (structural-functional theory) সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছে।

এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য একটি নির্লেখেব (chart) সাহায্যে তুলিয়া ধরা হইল ঃ



সামাজিক কাঠামো

সমাজস্থ লোকদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ('interrelated acts of people' or 'interaction system') দ্বারা যে সুসংবদ্ধ, জটিল ও নিবিড় সম্বন্ধজাল সৃষ্টি হয়, তাহাকে সমাজতত্ত্ববিদগণ সামাজিক কাঠামো (social structure) আখ্যা দিয়া থাকেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, সমাজস্থ লোকদের নানাপ্রকার নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচিতি (status) আছে এবং এই পরিচিতি অনুযায়ী তাহাদের ভূমিকাও (role) নির্দিষ্ট করা আছে। একই ব্যক্তির একাধিক সামাজিক পরিচিতি রহিয়াছে এবং তাহাকে সেই অনুসারে বিভিন্ন রকম ভূমিকা পালন করিতে হয়। অতএব সমাজে বসবাস করিয়া কাহারও পক্ষে যথেচ্ছ আচরণ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য সামাজিক কাঠামোকে বিশ্লেষণ করিলে যে কয়টি উপাদান বা অংশের কথা ভাবা যাইতে পারে তাহার মধ্যে সমাজবদ্ধ লোকদের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রযোজন। কে কাহার সঙ্গে কি অবস্থায় কি ভাবে আচরণ করিবে তাহা প্রত্যেকের সামাজিক পরিচিতি দ্বারা নির্ণীত। অতএব সমাজস্থ লোকদের সামাজিক পবিচিতি এবং তৎসম্পর্কিত নির্দিষ্ট ভূমিকাকে সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজস্থ লোকদের পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত আচার-আচবণ ছাড়াও সমষ্টিগত আচার-আচরণ রহিয়াছে। নানাপ্রকার প্রয়োজনের তাগিদে তাহারা নানারকম স্থায়ী এবং অস্থাযী সঙ্ঘ স্থাপন কবে। সঙ্ঘ সম্পর্কিত আচার-আচরণেও একটা সুবিন্যস্ত ধারা লক্ষ্য করা যায়। 'এই ক্ষেত্রে যথেচ্ছ আচরণ বর্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি যে, সমষ্টিগত আচরণে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সামাজিক বিধি-নিষেধের বিচ্যুতি মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। অতএব নানা রকম স্থায়ী এবং অস্থায়ী সামাজিক সঙ্ঘকে সামাজিক কাঠামোর অন্যতম উপাদান বলিয়া গণ্য করা যায়।

তৃতীয়তঃ, আমরা বিধি-শাসিত সমাজে বাস করি। অত্যন্ত শিথিল লোকাচার হইতে শুরু করিয়া কঠোর নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ আইন অবধি নানা রকমের বিধি-নিষেধ সমাজে প্রচলিত আছে এবং ইহারা সামাজিক সম্পর্ককে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত করে। সামাজিক পরিচিতি এবং তৎসম্পর্কিত ভূমিকা সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রভাবাধীন। জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য এই বিধি-নিষেধ সমূহে প্রতিফলিত হয়। সেইজন্য সব সমাজে একই প্রকার বিধি-নিষেধ দেখা যায় না। যেমন, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে পিতা-পুত্রের পারস্পরিক আচার-আচরণে অথবা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে পার্থক্য লক্ষণীয়। এই বিধি-নিষেধ সমূহ জানা না থাকিলে সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভব হয় না বলিয়া এইগুলিকে সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়।

চতুর্থতঃ, সামাজিক বিধিসমূহ ছাড়াও প্রত্যেক সমাজের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ রহিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবন-যাপনে এবং লোকযাত্রায় একটা জীবন-দর্শন

থাকে।[1] সমাজে যাহা বাঞ্ছনীয় এবং আদর্শস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই জীবন-দর্শনের মূল উপজীব্য। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ এবং সমষ্টিগত আচার-আচরণ উভয়ই সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ বা জীবন-দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বলা বাহুল্য, জীবন-ধারায় এবং প্রচলিত বিধি-নিষেধে এই মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখা যায়। মূল্যবোধের অপরিসীম প্রভাব বিবেচনা করিয়া ইহাকে সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ধরা হয়।

সামাজিক কাঠামো সম্পর্কিত কার্যাবলী

সামাজিক কাঠামোর কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব কয়েকটি মৌল সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভরশীল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মনির্বাহী তত্ত্বের প্রবক্তাগণ চারিটি প্রয়োজনীয় কার্যের উল্লেখ করেন।

প্রথমতঃ, সামাজিক গঠনতন্ত্রের (social system) প্যাটার্ন অর্থাৎ সামাজিক কাঠামো সংরক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেকটি ব্যক্তি এবং সঙ্ঘ যাহাতে এই প্যাটার্নের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে এবং এই প্যাটার্ন বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই কারণে সামাজিকীকরণের জন্য নানা প্রকার প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা (institutions) গড়িয়া উঠে। যেমন, পরিবারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইল, নবজাত শিশুর প্রতিপালন করা এবং সমাজে প্রচলিত বিধি-নিষেধ এবং মূল্যবোধের সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া। শিক্ষা ব্যবস্থারও অন্যতম লক্ষ্য হইল সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত কার্যে অংশ গ্রহণ করা।

তাহা ছাড়া, সমাজস্থ লোকেরা আবেগ, উত্তেজনা প্রভৃতি নানা রকম মানসিক অশান্তি ও বিক্ষেপের (emotional disturbances and distractions) দ্বারা পীড়িত বোধ করিতে পারে। সুস্থ সমাজ-জীবন যাহাতে কোনভাবে ব্যাহত না হয় সেইজন্য উদ্বেগ, উত্তেজনা প্রভৃতি প্রশমিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় কার্য নির্বাহ করিবার জন্যও প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেমন, পরিবারস্থ লোকেরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে সহানুভূতি, উৎসাহ, বিপদ-আপদে সাহায্য, শারীরিক অসুস্থতায় সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পারিবারিক সম্পর্কে স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার প্রকাশ যদি না থাকিত, তাহা হইলে জীবন অসহ্য হইয়া উঠিত। অনেক সময় ধর্ম মানুষকে মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করিতে সাহায্য করে। বিশেষ করিয়া, যখন কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় অথবা কোন অজ্ঞাত ও অনির্ণেয় কারণে জীবনে দুর্যোগ উপস্থিত হয়, তখন অনেকে ধর্মে সান্ত্বনা ও আশ্বাস পাইবার চেষ্টা করে।

কর্মনির্বাহী তত্ত্বের (functional theory) প্রবক্তাগণ উপরোক্ত প্রয়োজনীয়

1 "There is a philosophy behind the way of life of every individual and of every relatively homogeneous group at any given point in their histories." Dr. Florence Kluckhohn

কার্যাবলীকে কাঠামো-সংরক্ষণ ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষা (Pattern Maintenance and Tension Management) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক সামাজিক গঠনতন্ত্রের একাধিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। সামাজিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি প্রধানতঃ সমাজস্থ লোকদের সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। এই সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টাকে স্থায়ী ও কার্যকর করার জন্য নানা রকম প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (economic institution) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাজনীতিক ব্যবস্থার (political institutions) সৃষ্টি। বংশধারা যাহাতে অবিচ্ছিন্ন থাকে, তাহা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে বিবাহ ও পরিবাব গড়িয়া উঠিযাছে।

কর্মনির্বাহী তত্ত্বের প্রবক্তাগণ এই ধরনের কার্যাবলীকে অভীষ্টলাভ (goal attainment) সম্পর্কিত ক্রিয়া কলাপ বলিয়া অভিহিত করেন।

তৃতীযতঃ, উপরোক্ত সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ সার্থক করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাগুলিকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযোগী করিয়া (adapt) লইতে হয়। যেমন, উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন। ইহার ফলে সামাজিক পরিচিতি ও তৎসম্পর্কিত সামাজিক ভূমিকায় নানা রকম পৃথক্করণ (differentiation) প্রবর্তিত হয়। এইভাবে প্রত্যেকটি আচার-ব্যবস্থাতে নানা রকম বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন আনয়ন করা হয়।

কর্মনির্বাহী তত্ত্বের প্রবক্তাগণ এই প্রকার কার্যাবলীকে অভিযোজন (adaptation) বলিয়া অভিহিত করেন।

চতুর্থতঃ, কাঠামো-সংরক্ষণ ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষা সম্পর্কিত কাজকর্ম দ্বারা যেমন সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান বা অংশের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন উপাদান বা অংশের পারস্পরিক সম্পর্কেও সঙ্গতিস্থাপন করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। 1 এই প্রকার সঙ্গতি না থাকিলে একটি যৌগিক কাঠামো (complex whole) হিসাবে সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। সমাজস্থ লোকেরা পরস্পরের প্রতি এবং গোটা সমাজের প্রতি যদি অনুগত না থাকে, তাহা হইলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। সামাজিকীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে সমাজপ্রকৃতির সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সম্পূর্ণ সাযুজ্য বা সঙ্গতি সব সময় প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন বিশেষ কাজ করার সময় অথবা কোন বিশেষ অবস্থায় অসঙ্গতি দেখা দেওয়া বিচিত্র নহে।

এই ধরনের কয়েকটি অসঙ্গতিজনিত সমস্যা আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সমাজে এমন অনেক কাজ আছে যাহা সামাজিক বিধি-সম্মত, অথচ

1 "Whereas pattern maintenance and tension management have to do with the units of a system, integration has to do with the interrelations of units". Harry M. Johnson : Sociology. Page 54

এই কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইতে পারে। এই প্রকার বিরোধের কারণগুলি প্রচ্ছন্ন (latent conflicts of interest) অবস্থায় থাকে এবং মাঝে মাঝে খোলাখুলিভাবে বিরোধের রূপ নেয়। কাজেই বিরোধের কারণগুলিকে দমন করিয়া রাখার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ অর্থনৈতিক কাজকর্মের উল্লেখ করা যায়। একই সামগ্রী উৎপাদন করিবার অধিকার বিভিন্ন ব্যক্তির থাকিতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত বিরোধের রূপ নিতে পারে। সেইজন্য প্রতিযোগিতা যাহাতে নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তাহার জন্য নানা রকম অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ রচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও বিরোধ বাধিতে পারে। একই কাজে নিযুক্ত দুই বা ততোধিক কর্মী পরস্পরের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে না পারায় তুচ্ছ কারণে বিরোধের সূচনা হইতে পারে। এই জাতীয় বিরোধ যাহাতে সম্প্রসারিত না হয় এবং সহযোগিতা অটুট থাকে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। তৃতীয়তঃ, সামাজিক বিধি-নিষেধ যতই কঠোর হউক না কেন, কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে ইহাদের লঙ্ঘন করার প্রবণতা (deviant tendencies) থাকা অস্বাভাবিক নহে। সেইজন্য সামাজিক নিয়ামকগুলিকে (mechanisms of social control) শক্তিশালী করিবার জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা (secondary mechanisms) রাখা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে অপরাধী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের পুনর্বাসনের (rehabilitation) জন্য যে-সব প্রচেষ্টা করা হয়, তাহা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার অন্তর্গত।

উপরোক্ত বিভিন্ন উপায়ে সমাজস্থ লোকদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের কারণ দূর করিয়া সঙ্গতি স্থাপন করিবার জন্য যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা কর্মনির্বাহী তত্ত্বে সঙ্গতিস্থাপন (integration) বলিয়া পরিচিত।

সামাজিক কাঠামোর অংশসমূহের পরস্পর নির্ভরশীলতা

সমাজের প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইল, তাহা হইতে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট।

প্রথমতঃ, সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক কার্যাবলী পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত। একদিকে, সামাজিক কাঠামোর আকৃতি-প্রকৃতির উপর সামাজিক কার্যাবলী নির্ভরশীল। কৃষি-প্রধান এবং শিল্প-প্রধান সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য বিবেচনা করিলে এই বিষয়টি বুঝিতে সুবিধা হইবে। অপর দিকে, সামাজিক কার্যাবলী দ্বারা সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতি প্রভাবিত হয়। যেমন, সামাজিকীকরণ বা সঙ্গতি-স্থাপন সংক্রান্ত কার্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হইলে সামাজিক কাঠামোর বন্ধনজাল যত সুদৃঢ় হইবে, অন্যথায় তাহা হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে নানা রকম প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা

সমূহের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রহিয়াছে। ইহাদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করিলেই এই যোগসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য কৃষি এবং শিল্পে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু প্রযুক্তি বিদ্যার সম্প্রসারণ এবঃ গুণগত উৎকর্ষ সাধন করা শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব। যদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই যোগাযোগ না থাকে, তাহা হইলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হয। ইহার ফলে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার রাজনীতিক ব্যবস্থা যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়া সারা সমাজে পরিব্যাপ্ত হয় এবং অপর আচার ব্যবস্থাগুলির কাজকর্মও ব্যাহত হয়। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাসমূহের কাজকর্মে নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। একটি প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা যাহা সম্পাদন করে, তাহা অপরাপর আচার-ব্যবস্থাসমূহকে প্রভাবিত করে। সেইজন্য সমাজতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা সমূহকে গুচ্ছ (cluster of institutions) শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়।

আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ্য। চলিষ্ণু সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যববস্থার মধ্যে কাজকর্ম ও দায-দায়িত্বে প্রয়োজনানুযায়ী পরিবৃত্তি (transfer of functions) ঘটিয়া থাকে। যেমন, প্রাক্ শিল্প-যুগীয় সমাজে পরিবারকে শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, চিকিৎসা প্রভৃতি কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু শিল্প-যুগীয় সমাজে ধীরে ধীরে এই দায়িত্বগুলি অপর আচার-ব্যবস্থার উপর ন্যস্ত হয়। আবার সমাজকল্যাণকামী রাষ্ট্রে সরকারকে আংশিকভাবে অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাগুলি বিশ্লেষণ করিলে সামাজিক পরিচিতি এবং তদনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সহজসাধ্য। যেমন, পারিবারিক সম্পর্কসমূহ বিশ্লেষণ করিলে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতামহ, পিতামহী, নাতী, নাতনী প্রভৃতি নানা রকমের সামাজিক পরিচিতি এবং তদনুযায়ী একের সঙ্গে অপরের পারস্পরিক আচার-ব্যবহার (সামাজিক ভূমিকা) সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। অনুরূপভাবে, কোন দপ্তর, কারখানা বা রাজনীতিক দল বিশ্লেষণ করিলে সংশ্লিষ্ট লোকদের সামাজিক পরিচিতি ও তৎসম্পর্কিত ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই। এই বিষয়টি আবার অন্যভাবেও ব্যক্ত করা যায়। সামাজিক পরিচিতি ও তৎসম্পর্কিত সামাজিক ভূমিকার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে।[1] অনুরূপ-

---

1 The concept of role is "………the key term in our definition of institution." H. Gerth and C W. Mills: Character and Social Structure. Quoted by Bottomore In his book, Sociology. Page 110.

ভাবে, প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাসমূহ বিশ্লেষণ করিলেই সামাজিক কাঠামো সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হয় ।1

সামাজিক গঠনতন্ত্রের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

উপরে বর্ণিত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন অংশের সমাবেশে যে যৌগিক কাঠামো (complex whole) সৃষ্টি হয়, তাহাকে সামাজিক গঠনতন্ত্র (social system) বলা হয়। সিস্টেম বা গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অগবার্ণ ও নিমকফ (Ogburn and Nimkoff) যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। "Wherever there is a whole with related parts, there is a system, such as a clock, a human body, a family. Society, a nation, a city, a village—all are social systems. So also a part of society itself may consist of sub-parts and hence be a social system."2 অর্থাৎ যখনই বিভিন্ন অংশের বিন্যাসের ফলে একটি সামগ্রিক রূপ গড়িয়া উঠে, তখনই গঠনতন্ত্র বা সিস্টেমের সৃষ্টি হইয়াছে বলা যায়। জীবদেহ, পরিবার বা ঘড়িকে গঠনতন্ত্র বলা যায়। কারণ, যে-কোন অংশ বিকল, বিচ্যুত বা প্রয়োজনীয় কার্য-সম্পাদনে অপারগ হইলে সামগ্রিক বস্তুটির কার্যকারিতা হ্রাস পাইতে পারে, এমন কি অস্তিত্বও বিপন্ন হইতে পারে। এই অর্থে সমাজ, নেশন, নগর, গ্রাম প্রভৃতিকেও সামাজিক গঠনতন্ত্র বলিয়া গণ্য করা যায়। অনুরূপভাবে, সমাজের যে-কোন অংশেও গঠনতন্ত্রের লক্ষণগুলি উপস্থিত থাকিতে পারে। সুতরাং সমাজের বিভিন্ন অংশগুলি উপ-গঠনতন্ত্র (sub-system) বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

আরেকটি উপমার সাহায্যে গঠনতন্ত্রের ধারণা প্রকাশ করা যায়। এক পয়সা, দুই পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা বা কুড়ি পয়সা মূল্যের কয়েকটি মুদ্রা একত্র করিয়া একটি টাকার মূল্য পাওয়া যায়। কিন্তু নানা মুদ্রার সমাবেশে যখন একটি টাকা হয়, তখন ইহাকে একটি সিস্টেম বা গঠনতন্ত্র বলা যায় না। কারণ, বিভিন্ন মুদ্রার সমাবেশে কোন যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি হয় না। ইহা একটি সমষ্টি (aggregate) মাত্র। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সমাবেশ করিয়া যখন ঘড়ির সৃষ্টি হয়, তখন ইহা কেবলমাত্র যন্ত্রাংশের সমষ্টি থাকে না। যৌগিক বস্তু হিসাবে সময় নির্দেশ করা ঘড়ির স্বতন্ত্র কাজ। প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ এমনভাবে নিবিড় সম্বন্ধজালে জড়িত যে, একটি বা দুইটি যন্ত্রাংশ স্থানচ্যুত বা বিকল হইলে ঘড়ির কার্যকারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ঘড়িকে একটি সিস্টেম বা গঠনতন্ত্র বলা যাইতে পারে।

---

1 "Just as role is the unit with which we build our conception of institution, so institution is the unit with which we build the conception of social structure" তদেব পৃ: ১১০

2 Ogburn and Nimkoff : A Handbook of Sociology. Page 469

সমাজকে একটি সুসংবদ্ধ গঠনতন্ত্র বলিয়া ভাবার সার্থকতা আলোচনা করিতে গিয়া অগবার্ণ ও নিমকফ নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন। এতাবৎকাল 'গঠনতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার না করিয়াই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা অগ্রসর হইয়াছে। কারণ, বিভিন্ন সামাজিক আচার-ব্যবস্থা বা সম্বন্ধসমূহকে সামাজিক সংগঠনের (social organisation) এক-এক দিক হিসাবে গণ্য করা হইত। কিন্তু এই জাতীয় আলোচনা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত বিন্যাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে, সমাজের সামগ্রিক রূপটি ধরা পড়ে না। সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকিলে সমাজের কাজকর্ম ব্যাহত হয এবং সুসংগঠিত প্রচেষ্টার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। সমাজকে গঠনতন্ত্র হিসাবে বিশ্লেষণ করিলে সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পরনির্ভরশীলতা যথাযোগ্য গুরুত্ব পাইয়া থাকে।1

কর্মনির্বাহী তত্ত্বের মূল্যায়ন

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সম্প্রসারণ এবং পুষ্টিলাভ করার ক্ষেত্রে কর্মনির্বাহী তত্ত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রথমতঃ, অনেক আচার-ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বলিয়া মনে হইলেও সামাজিক কাঠামো সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম (structural-functionalist point of view) বিবেচনা করিলে সেই আচার-ব্যবস্থাগুলির তাৎপর্য বা সার্থকতা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। যেমন, উৎসবাদিতে বাহ্যিক সমারোহ তাৎপর্যহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ডুর্কহেইম ও তাঁহার অনুগামীগণ দেখাইয়াছেন, এই ধরনের বাহ্যিক সমারোহ সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। 2

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশ পরস্পর নির্ভরশীল এবং এক অংশে যাহা ঘটে, তাহা অপরাপর অংশকে প্রভাবিত করে—এই ধারণা সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝিতে আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। একটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে। অনেক সময় সমাজে সচেতনভাবে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে নূতন কিছুর (innovation) প্রবর্তন করা হয়। এই ক্ষেত্রে অভিপ্রেত পরিবর্তন স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান (manifest)। কিন্তু দেখা যায়, অভিপ্রেত পরিবর্তনের সঙ্গে আরও অনেক অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে,

---

1 "Until recently sociologists fared very well without much use of the word 'system', for they dealt with the phenomenon as a phase of social organisation; but we need a term which puts the emphasis on the arrangement and interaction of parts. The concept is important because the effectiveness of organised activity rests upon the interaction of the parts" তদেব পৃঃ ৩৪৪

2 "Durkheim and his associates did much to clarify the significance of public ceremonials as a way of increasing social solidarity......"Alex Inkeles: What is Sociology? Page 35

যাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান নহে (latent)। কেন ইহা ঘটে, এই প্রশ্নের উত্তর সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহী তত্ত্বে (structural-functional theory) পাওয়া যায়। সমাজের কোন বিশেষ অংশে সচেতনভাবে যে-পরিবর্তন প্রবর্তন করা হয়, তাহা অপরাপর অংশকে প্রভাবিত করার ফলে অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটা বিচিত্র নহে।

তৃতীয়তঃ, কর্মনির্বাহী তত্ত্ব বিভিন্ন সমাজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিতে সাহায্য করে; বিশেষ করিয়া, যখন আমরা আমাদের পরিচিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে কোন আদিম (primitive) সমাজ-ব্যবস্থার অথবা আমাদের অবিদিত (strange) কোন সমাজ-ব্যবস্থার তুলনা করি। সমাজের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নির্বাহ করার জন্য বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকিতে পারে। ইহার ফলে আদিম বা অবিদিত সমাজের কোন বিশেষ আচার-ব্যবস্থার তাৎপর্য আমাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে। কিন্তু সামাজিক-কাঠামো সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কিভাবে নির্বাহ হয়, এই ধারায় অনুসন্ধান-কার্য অনুসৃত হইলে প্রত্যেকটি আচার-ব্যবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রকার বিশ্লেষণের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে (variation in the forms of social life) আমরা অধিকতর সচেতন হই।

অপর পক্ষে, সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে নানা দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, সমাজের দিক হইতে যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা বিশেষ শ্রেণী বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বর্জনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে দাসত্ব প্রথা সমষ্টি-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও দাসগণের নিকট এই প্রথা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ছিল না। ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, এই তত্ত্বের অনুসরণে সমাজের বিশ্লেষণ করিলে সমষ্টির স্বার্থে ব্যষ্টি-স্বার্থ উপেক্ষিত হইতে পারে।[1]

দ্বিতীয়তঃ, কর্মনির্বাহী তত্ত্ব অনুযায়ী সামাজিক কাঠামোর প্রত্যেকটি অংশের কোন-না-কোন প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, সমাজে যাহাই প্রচলিত আছে, তাহারই সামাজিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।[2] অনেকে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও পরিবর্তন প্রবর্তন করার বিরুদ্ধে এই যুক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে।[3]

---

1 "The functionalist point of view easily leads one to underemphasise the importance of the individual and his needs relative to those of the group." তদেব পৃ: ৩৬

2 ".........everything which exists in a society at any given time is easily assumed to be there because it is 'functional." তদেব পৃ: ৩৭

3 "This principle can obviously be used to justify opposition to experimentation and social change, on the grounds that what exists, being functional, can not be removed without dire consequences ensuing." তদেব পৃ: ৩৭

তৃতীয়তঃ, সমাজে, বিশেষ করিয়া আধুনিক সমাজে, সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য বজায় থাকে এবং সব সামাজিক আচার-ব্যবস্থা এই ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত—এই প্রকার ধারণাকে রাইট মিলস্ (C. Wright Mills), ল্যুইস কোজার (Lewis Coser) প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিদগণ সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে সমাজ-জীবনে ভারসাম্যের পরিবর্তে শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য স্বার্থজনিত বিরোধ বিরাজ করে। সব সমাজেই বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে ন্যায্য দাবি আদায় করিবার নিরলস প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ইহাই সমাজের বাস্তব চিত্র। কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহী তত্ত্বে এই দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত।

কর্মনির্বাহী তত্ত্বের উপরোক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ সমাজতত্ত্ববিদ সাধারণভাবে এই তত্ত্বের মূল নীতি মানিয়া লন। প্রায় সব সমাজতত্ত্ববিদই স্বীকার করেন যে, সমাজে নির্দিষ্ট ধারা বা শৃঙ্খলা রহিয়াছে। অধিকন্তু, সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সমাজকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কার্য নির্বাহ করিতে হয়, ইহাও প্রায় অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়া থাকে। শৈশবাবস্থা হইতে শিশুর সামাজিকীকরণ বিশেষ প্রয়োজন, অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য সুসংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন—এই প্রকার কার্যাবলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে, সমাজের বিভিন্ন অংশ বা আচার-ব্যবস্থা কি কার্য সম্পাদন করে, তাহা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার বা উপেক্ষা করা কঠিন। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে কর্মনির্বাহী তত্ত্বের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহজেই বুঝা যায়।

এই তত্ত্বের ত্রুটি-বিচ্যুতির দুইটি কারণ রহিয়াছে। একটি হইল, সমাজে প্রচলিত সব কিছুর প্রয়োজন আছে—এই প্রকার ধারণার ফলে অনেক অবাস্তব ও অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপরটি হইল, এই তত্ত্বের অনেক প্রবক্তা ইহাকে এমন একটি মূল সূত্র (master key) বলিয়া গণ্য করেন, যাহার সাহায্যে সব রকম আচার-ব্যবস্থা বা সামাজিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। স্পষ্টতঃ এই দাবি অযৌক্তিক।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

1. Harry M. Johnson : Sociology. Allied Publishers Pvt. Ltd.

2. Ogburn and Nimkoff : A Handbook of Sociology. Routledge and Kegan Paul Ltd. London. 1960. Chapter XVI and XXII.

3. Morris Ginsberg : Essays in Sociology and Social Philosophy. Peregrine Books

4. Alex Inkeles : What is Sociology ? Prentice-Hall of India (Private) Ltd.

5. T. B. Bottomore : Sociology. Unwin University Books. London. 1969. Pages 109-113.

1. Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Co New York. 1961. Pages 135-145 (Section on Levels of Integration of Ends).

দশম পরিচ্ছেদ

বিবাহ ও পরিবার

পরিবারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

পরিবারভুক্ত হইয়া মানুষ সমাজে বসবাস করে। পরিবারে তাহার জন্ম এবং পরিবারেই তাহার আজীবন অতিবাহিত হয়। সমাজ-জীবন যাপন করিবার জন্য মানুষ যে-সব প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার মধ্যে বিবাহ ও পরিবার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন। ইহা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, পরিবারই একমাত্র ব্যবস্থা যাহা ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীবকে মনুষ্য পদবাচ্য করিয়া তুলে। আরেকটি দিক হইতেও ইহা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন না করিলে মনুষ্যজাতি সম্ভবতঃ এতদিনে বর্তমান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছিতে পারিত না।

এই প্রসঙ্গে ইতর প্রাণীর সঙ্গে মনুষ্য জাতির জৈবিক গঠন সম্পর্কে পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, ইতর প্রাণীর তুলনায় মানব-শিশু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় অনেক দেরীতে। দ্বিতীয়তঃ, ইতর প্রাণীর ন্যায় মানব-শিশু পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার উপযুক্ত সহজ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মায় না। তৃতীয়তঃ, ইতর প্রাণীর তুলনায় মানব-শিশুর মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত জটিল এবং আয়তনে বড়। জীববিজ্ঞানীদের মতে, বিবর্তনের ফলে মানুষের মস্তিষ্ক আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। মস্তিষ্কের আয়তন ও শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় সহজ প্রবৃত্তির প্রয়োজন হ্রাস পায় এবং ধীরে ধীরে ইহা হীনবল হইয়া পড়ে।

উপরোক্ত কারণে কেবলমাত্র বাঁচার তাগিদেই মানুষকে পরিবার গঠন করিতে হইয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর বেশ দীর্ঘকাল যাবৎ মানব-শিশু অসহায় অবস্থায় থাকে। প্রকৃতিদত্ত সহজ প্রবৃত্তি বা এমন কোন ক্ষমতা লইয়া সে জন্মায় না যাহার সাহায্যে সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে অথবা প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ করিতে পারে। স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত অন্যের আশ্রয়, তত্ত্বাবধান ও সেবা তাহার বাঁচার জন্য অপরিহার্য।

দীর্ঘকাল যাবৎ মানব-শিশুকে লালন-পালন এবং পরিচর্যা করিতে হয় বলিয়া তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পিতা-মাতা এবং অন্যান্য সন্তানসন্ততির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল যে সময়ের দিক হইতে প্রসারিত হয় তাহাই নহে, উত্তরোত্তর এই সম্পর্ক গভীরতা লাভ করে এবং পরিমার্জিত হয়। এইভাবেই পারিবারিক আচার-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। সামাজিক বিধি অনুযায়ী বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যখন কোন পুরুষ এবং নারী একত্র বাস করে, তখনই পরিবার গঠিত হয়। ম্যাক আইভার পরিবারের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন: **"The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children".1**

---

1 **Mac Iver and Page: Society. Page 238**

অর্থাৎ তিনটি মৌল প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষ পরিবার গঠন করে। প্রথমতঃ, যৌন বাসনা মানুষের, তথা সব প্রাণীরই, স্বভাব ধর্ম। কিন্তু মানুষ সমাজে বাস করে বলিয়া সমাজের দাবি বা প্রয়োজন উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহাকে সমাজের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাসনা-কামনা চরিতার্থ করিতে হয়। সমাজ-জীবনের প্রয়োজন এবং মানববিশেষের জৈব প্রয়োজন এই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব মানুষ পরিবার গঠন করিয়া নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, " জীবপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতি এই দ্বৈরাজ্যের শাসনে মানুষ চালিত " এবং " বিবাহ জিনিষটা সভ্যসমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা "।1 দ্বিতীয়তঃ, সন্তান-উৎপাদন ও সন্তান-পালন মানুষের, বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতির, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কেবলমাত্র পরিবারের মাধ্যমেই এই আকুল কামনা চরিতার্থ হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সন্তান লালন-পালনের সঙ্গে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। বাসস্থানের ব্যবস্থা, খাওয়া-পরা এবং সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজে পরিবারের সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব এবং অধিকার সমাজ দ্বারা স্বীকৃত।

উপরোক্ত প্রয়োজনসমূহের উল্লেখ করিয়া গুড্ (Goode) নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন: "For these reasons, man must live in some sort of family grouping, to be fed, protected, and taught what nature has not provided,"2 এই উদ্ধৃতির শেষাংশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবারের প্রকৃতি সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে এই অংশের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানব-শিশু বাঁচিয়া থাকার সব কৌশল ও শক্তি ইতর প্রাণীর ন্যায় জন্মসূত্রে লাভ করে না। তাহাকে অনেক কিছু শিখিতে হয় এবং এই উদ্দেশ্যে নানা প্রকার আচার-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। পরিবার ইহাদের অন্যতম। সামাজিকীকরণে, অর্থাৎ মানব-শিশুকে সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে, পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং সমাজস্থ লোকদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাহাকে অবহিত না করাইতে পারিলে সমাজ-জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। এই গুরু দায়িত্ব পরিবারের উপর ন্যস্ত।

সুতরাং জৈবিক এবং সামাজিক এই উভয় প্রকার তাগিদ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে পরিবার গঠিত হয়। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। পরিবারভুক্ত লোকদের পারস্পরিক আচার-আচরণ এবং সম্পর্ক কেবলমাত্র জীবপ্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না; সমাজপ্রকৃতিও অর্থাৎ জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যসমূহও ইহার উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পিতা এবং মাতার পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তান সন্ততির সম্পর্ক, ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে,

---

1 রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ত্রয়োদশ খণ্ড। পৃষ্ঠা ৫

2 William J. Goode: The Family. Page 13

সমাজে প্রচলিত জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিত না থাকিলে এই সম্পর্কগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থবহ হয় না। এই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া গুড্ নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন: "...........the sex drive itself is shaped, channeled, and restricted in all societies through the complex learning potential of our brain Some people who might be physically attractive and geographically available—for example, sisters and brothers—come to be viewed as impossible sex partners who arouse no conscious sex desire at all. We learn to feel shame, guilt, and embarrassment when our sex drive causes us to break some of these norms. ....More broadly, our complex neural mechanism permits a rich conditioning to occur, by which only certain familial behavioral patterns seem right or desirable"1. অর্থাৎ আমাদের যৌন বাসনা-কামনার গতি প্রকৃতি সামাজিকীকরণের ফলে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। আমাদের চিন্তন মনন এবং ক্রিয়ার উপর এই শিক্ষার প্রতিফলন এত গভীর যে কয়েকটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌন বাসনার উদ্রেক পর্যন্ত হয় না। যেমন, ভ্রাতা ভগিনীর সম্পর্ক যৌন বাসনা হইতে মুক্ত। ইহাকে conditioned reflex বলা যায। দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষা এবং অভ্যাস থাকাব ফলে আমরা স্বভাবের অনুসরণ না কবিযা স্বভাববহির্ভূত আচরণ করি। পরিবারস্থ লোকদের মধ্যে কে কাহার সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করিবে ইহা প্রত্যেক সমাজে এইভাবেই নির্ধারিত হয়। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুষ যদি কেবলমাত্র জীবপ্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে পরিবার গঠন করা সম্ভব হইত না। সমাজপ্রকৃতি জীবপ্রকৃতিকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়মিত করে বলিয়াই পরিবার টিকিয়া আছে। পরিবারের স্বরূপ সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

পরিবারের কার্যাবলী

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করিতে পারি। সমাজ ও ব্যক্তির নিকট গুরুত্ব অনুযায়ী পরিবারের কাজকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হইল সমাজের দিক হইতে প্রয়োজনীয় কাজ এবং অপরটি হইল ব্যক্তির দিক হইতে প্রয়োজনীয় কাজ। তবে এই দুই প্রকার কাজকর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। যাহা সমাজের দিক হইতে প্রয়োজনীয়, তাহা ব্যক্তির নিকটও প্রয়োজনীয়, তবে পরোক্ষভাবে। অনুরূপভাবে, যাহা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয়, তাহা সমাজের দিক হইতেও প্রযোজনীয়। কারণ, আমরা সমাজবদ্ধ ব্যক্তির কথাই আলোচনা করিতেছি,

1 William J. Goode : The Family Page 13

সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তির কথা নহে। তবুও পরিবারের কার্যাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করিলে সমাজের নিকট পরিবারের প্রয়োজন এবং ব্যক্তিবিশেষের নিকট পরিবারের প্রয়োজন বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

সমাজের দিক হইতে প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সন্তান-প্রজনন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এই বিষয়টি পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে. পরিবার গঠিত না হইলেও নর-নারীর যৌন মিলনে সন্তানের জন্ম হইতে পারে। অতএব এই ক্ষেত্রে পরিবারের গুরুত্ব বা তাৎপর্য কোথায়? আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর মানব-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত অসহায় অবস্থায় থাকে। সুতরাং উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা এবং আদর-যত্ন না পাইলে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিলেই শিশুর লালনপালন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। পরিবারে সন্তান-প্রজনন এবং সন্তান প্রতিপালন হয় বলিয়াই বংশধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং মানব-জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, নব-জাত শিশুর সামাজিকীকরণ পরিবারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। এই বিষয়টিও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শিশুর সামাজিকীকরণে অনেকেই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে—যেমন, পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষায়তন, ধর্মীয় সংস্থা ইত্যাদি। কিন্তু পরিবারের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার কারণ, সামাজিকীকরণে পরিবারের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আছে যাহা অন্য কাহারও থাকে না। (ক) ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব শিশুটি পরিবারে জন্মায় এবং পরিবারেই সামাজিকীকরণের সূচনা হয়। পরিবার হইতে সে যে-অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাহা আজীবন স্থায়ী হয়। প্রথম জীবনের এই প্রভাব কাটাইয়া উঠা দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলিলেও অতিশয়োক্তি হয় না। (খ) পরিবারস্থ লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় পরিবার মনঃপ্রকৃতিতে গভীর এবং প্রায় অনপনেয় রেখাপাত করিতে সক্ষম হয়। (গ) পরিবারস্থ লোকজনের সঙ্গে স্নেহ ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকায় তাহাদের পক্ষে শিশুকে প্রভাবিত করা সহজ হয়। (ঘ) দৈহিক এবং মানসিক প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার জন্য শিশু নানাভাবে পরিবারের উপর নির্ভরশীল। অন্য কোন সামাজিক সঙ্ঘ এই ক্ষেত্রে পরিবারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। সুতরাং পরিবার স্বভাবতই গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম। (ঙ) পরিবারে শিশু দুই প্রকার সম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পায়। একটি authoritarian relationship বা কর্তৃত্ব-আনুগত্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক। যেমন, পিতামাতার সঙ্গে পুত্রকন্যার সম্পর্ক। অপরটি equalitarian relationship বা সখা-সম্পর্ক। যেমন, সমবয়সী ভ্রাতাভগিনীর সম্পর্ক। সামাজিকীকরণে উভয় প্রকার সম্পর্কের গুরুত্ব রহিয়াছে। জীবনে আমাদের এমন অনেক কিছু করিতে বা শিখিতে হয় যাহা আপাতবিরক্তিকর মনে হইলেও পরিণামে কল্যাণকর। নিয়মানুবর্তিতা এবং শাসনের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে

শৈশবাবস্থা হইতে শিক্ষা দিতে হয়। পরিবারে পিতামাতা এবং অগ্রজদের যে ভূমিকা স্বীকৃত, তাহাতে তাহাদের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। আবার সমাজে কিভাবে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়, প্রয়োজনবোধে কি করিয়া অপরের জন্য নিজের সুখসুবিধা সীমিত বা সঙ্কুচিত করিতে হয় ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে সমবয়সী ভ্রাতাভগিনীর সঙ্গে একত্র বাস করিয়া শিক্ষালাভ করা সহজ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। পরিবারেই সে প্রথম সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়, পরিবারের সঙ্গেই তাহার দীর্ঘকালব্যাপী অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় থাকে এবং পরিবারই তাহার যাবতীয় অভাব বা চাহিদা পূরণ করে বলিয়া শিশুর মনন চিন্তন এবং আচার-আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তিবিশেষের নিকট পরিবারের গুরুত্ব নিম্নোক্ত দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, পরিবার আমাদের ব্যক্তিত্ব-গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসা না পাইলে আমাদের অনেক মানসিক বৃত্তি বিকশিত হয় না। পরিবারে এই বৃত্তিগুলি বিকশিত করিবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ, পরিবারস্থ লোকজনের সংখ্যা সীমিত, তাহারা পরস্পরের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ, খাওয়াপরা, শোওয়া প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজকর্ম সাধারণতঃ তাহারা একসঙ্গে নির্বাহ করে। ইহার ফলে পরিবারস্থ লোকজনের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহা অন্য কোন সামাজিক সঙ্ঘে বিরল। দ্বিতীয়তঃ, আমরা পরিবারের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করি বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার পর জন্মসূত্রে বিশেষ সামাজিক পরিচিতি (social status) লাভ করি। জন্মসূত্রে সামাজিক পরিচিতি লাভ করি বলিয়া আমরা শৈশবাবস্থা হইতেই আমাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হই। এই জ্ঞান হইতে আমাদের নিরাপত্তাবোধ জন্মায়।[1] তৃতীয়তঃ, নিরাপত্তা সম্পর্কিত আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও পরিবার আমাদের অন্যান্য মনোগত আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন চরিতার্থ করে। স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিশেষ গুণ বা কাজের সপ্রশংস স্বীকৃতি মানুষের কাম্য। শৈশবে এবং কৈশোরে এই কামনা অত্যন্ত তীব্র থাকে। পরিবারস্থ লোকজনের মধ্যে আত্মীয়তম (most intimate) সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে বলিয়া পরিবারেই এই কামনা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা বেশি। চতুর্থতঃ, পরিবার আছে বলিয়াই বিবাহিত দম্পতির পক্ষে সমাজানুমোদিত পন্থায় যৌন বাসনা চরিতার্থ করা সম্ভব।

পরিবার ও সমাজ

পরিবারের কার্যাবলী আলোচনা করার সময় বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা

1. তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

যাইতে পারে। প্রথমতঃ, শিশুর সামাজিকীকরণ পরিবারের অন্যতম কর্তব্য। এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, পরিবার মনন, চিন্তন এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে মূল্যমান নির্ণয় করে না। ইহা বৃহত্তর সমাজে নির্ণীত এবং প্রচলিত হয় বলিয়াই সামাজিক কাঠামোর (social system) অঙ্গ (sub-system) হিসাবে পরিবার সমাজে প্রচলিত জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণগুলির সঙ্গে নবজাত শিশুকে পরিচয় করাইয়া দেয়। এইজন্য বটোমোর বলিয়াছেন: "The family transmits values which are determined elsewhere; it is an agent, not a principal."1 দ্বিতীয়তঃ, বৃহত্তর সমাজে যে-সব পরিবর্তন ঘটে তাহারই প্রতিফলন হয় পরিবারে। সাধারণতঃ পরিবারে কোন পরিবর্তনের সূচনা হয় না। অপর পক্ষে, সামাজিক ঘটনাবলী পরিবারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই পরিচ্ছেদে পরিবারের উপর শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাব আলোচনা করার সময় এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে বটোমোর মন্তব্য করেন, "......social change originates in other institutions, not in the family; the family changes in response."2 তৃতীয়তঃ, সামাজিক স্তর-বিন্যাসের মূল খুঁটি হইল পরিবার। কারণ, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারা অনুসরণ করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধাদি স্থাপিত হয়। ইহার জন্যই স্তর-বিন্যাস কায়েমী অবস্থায় টিকিয়া থাকিতে পারে। গুড্ (Goode) এই দিকটি আলোচনা করিতে গিয়া বলেন, "......homogamy.....bolsters the existing class structure."3 অর্থাৎ সমান ঘরে সম্বন্ধ করার আকাঙ্ক্ষা প্রচলিত শ্রেণী-বিন্যাসকে শক্তিশালী করে। ভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগত ভিত্তিতে মেলামেশা করেন, আলাপ-আলোচনা করেন, এমন কি খাওয়া-দাওয়াও করেন। কিন্তু তাহারা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পারিবারিক সম্বন্ধাদি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সযত্নে দূরত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন।

বিবাহের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

বিবাহ ও পরিবার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কথা চিন্তা করা যায় না। অতএব বিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

"বিবাহ জিনিষটা সভ্যসমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা।" যৌন বাসনা এবং সন্তান কামনা মানুষের জীবপ্রকৃতির অন্তর্গত। কিন্তু নর-নারীর স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ককে নানাপ্রকার বিধি ও অনুশাসন দ্বারা নিয়মিত ও সংযত না করিতে পারিলে সমাজ এবং ব্যক্তি উভয়েরই ক্ষতি।

---

1 T. B. Bottomore: Soci·logy Page 175.

2 তদেব পৃষ্ঠা ১৭৫

3 William G. Goode: The Family. Page 81.

সমাজের ক্ষতি এই কারণে যে, যৌন ব্যভিচার অবাধে চলিতে দিলে সমাজ-জীবনের মূলে আঘাত পড়ে। এই বিষয়টি বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করা যায়।

প্রথমতঃ, সন্তানের লালন-পালন ও পরিচর্যার দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। লালন-পালন ও পরিচর্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হইলে নব জাতকের জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষ প্রাণধারণের জন্য ইতর প্রাণীর ন্যায় সহজ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে না। এই বিষয়ে তাহার প্রধান সহায় হইল নানারকম জীবন-ধারাপ্রসূত ব্যবস্থাসমূহ (cultural aids)। যেমন, সেবা-শুশ্রূষা, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, পারিবারিক সম্বন্ধ, আহার্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি। অতএব বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হইলেই পিতা-মাতার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা সম্ভব। এইজন্য প্রত্যেক সমাজেই অবিবাহিত নর-নারীর যৌন-সম্পর্ক তিরস্কৃত হয়। এইসব যৌন মিলনের ফলে যে সন্তান জাত হয়, তাহাকে লালন-পালন করার বিষয়ে নানা অসুবিধা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব যে শিশুটি জন্মায় তাহাকে নানাভাবে ঘষিয়া-মাজিয়া সংস্কৃত করিয়া সমাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার দায়িত্বও সুনির্দিষ্টভাবে কাহারও উপর ন্যস্ত থাকা দরকার। না হইলে, সমাজ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সমাজবদ্ধ হইয়া থাক'র অর্থই হইল সামাজিক অনুশাসনসমূহ স্বীকার করা এবং ইহাদের অধীন হইয়া থাকা। কেবল উপর হইতে নিয়ম-বিধি চাপাইয়া দিলেই সমাজের নিবিড় বন্ধনজাল সুদৃঢ় হয় না। অনুশাসনসমূহের সহজ স্বীকৃতির প্রয়োজন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইগুলি মানিয়া চলিলেই সমাজের গতি স্বচ্ছন্দ হয়। সেইজন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই শিশুর সামাজিকীকরণ অনিবার্য হইয়া পড়ে। সমাজ-স্বীকৃত পদ্ধতিতে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই পিতামাতার উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হইতে পারে। এই দিকটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গুড নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন: "The child whose parents are not married does not belong to the father's family, and neither the father nor his family needs to meet more than minimal legal obligations to the child. The child's position is ambiguous, and its socialisation experience is likely to be inadequate."1 অর্থাৎ অবিবাহিত নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে যে সন্তান জাত হয়, তাহার পিতা বা পিতৃকুলের কেহ আইনসম্মত ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করা ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব সাধারণতঃ গ্রহণ করেন না। ইহার ফলে, সন্তানটির শিক্ষা-দীক্ষায় নানারকম অপূর্ণতা এবং ত্রুটি থাকিয়া যায়। ইহার কু-ফল সমাজ-জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, নবজাত সন্তানের সমাজে স্থান কোথায়, পরবর্তী জীবনে কি তাহার

1 William J. Goode: The Family. Page 20

দায়-দায়িত্ব (role obligations), সমাজস্থ লোকদের সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে সমাজ-জীবনের ভিত্তি প্রস্তুত হয় না। এই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মেলিনওস্কি (Malinowski) Principle of Legitimacy বা বৈধ বিবাহজাত সন্তান সম্পর্কিত নীতির উল্লেখ করেন। তাঁহার বক্তব্য হইল: "No child should be brought into the world without a man— and one man at that— assuming the role of sociological father, that is, guardian and protector, the male link between the child and the rest of the community."1 এই উদ্ধৃতিতে sociological father বলার অর্থ হইল, নবজাত সন্তানের পিতৃত্ব সমাজে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, পিতার পরিচয়েই সন্তান সমাজে পরিচিত হয় এবং সন্তানকে লালন-পালন ও পরিচর্যা করার দায়িত্বও সমাজ তাহার উপর ন্যস্ত করে। এই মূল নীতির উপর পরিবারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। পিতৃত্ব অজ্ঞাত থাকিলে মাতার অবমাননা হয় এবং সন্তান সমাজে জারজ সন্তান বলিয়া ধিক্কৃত হয়। এই কারণেই মেলিনওস্কি বিবাহের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন: "Marriage cannot be defined as the licensing of sexual intercourse but rather as the licensing of parenthood."2 মেলিনওস্কির সংজ্ঞার তাৎপর্য বুঝিতে অসুবিধা হয় না যখন আমরা দেখি, কোন অবিবাহিত নরনারীর যৌন মিলনের ফলে যদি সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং সন্তান জাত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে যদি তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সন্তানের সমাজে স্বীকৃতি পাইতে অসুবিধা হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। মাতৃপরিচায়ী (matrilineal) সমাজেও সন্তানের পিতৃত্ব সুনির্ধারিত থাকা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে গুড-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "The illegitimate child is a burden, with no benefit to its mother's kin, since his lack of a secure place in the kinship line means that his obligations to them are not firm or definite. They receive no gifts from the other kinship line, since there has been no marriage. The child represents, in some societies, a violation of the elders' power to decide and execute the marriage itself. Usually, there is no father to assume the social and economic care of the child, and the child is not an extension of the kinship line."3 অর্থাৎ জারজ সন্তান মাতৃকুলের বোঝা স্বরূপ। যাহার ঔরসে তাহার

1 Quoted by Kingsley Davis in his book : Human Society, Page 400

2 Quoted by Davis in his Book : Human Society, Page 401

3 William J. Goode : The Family, Page 21

জন্ম তাহার সঙ্গে মাতার বিবাহ না হওয়ায়, সেই সন্তানের পিতৃকুল বলিয়া কিছু থাকে না এবং সেই তরফ হইতে মাতৃকুলের উপহারাদি পাইবার প্রশ্নও উঠে না। তাহা ছাড়া, জারজ সন্তান বলিয়া মাতৃকুলে তাহার স্থান সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইহার ফলে মাতৃকুলের প্রতি তাহার দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য অমীমাংসিত অবস্থায় থাকে। সুতরাং তাহা দ্বারা মাতৃকুলের উপকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। জারজ সন্তানও নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়। পিতা না থাকায় সন্তানের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দায়িত্ব সাধারণতঃ কেহ গ্রহণ করে না। মাতৃকুলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ স্বভাবতই সুদৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে না এবং তাহাকে প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় অনেকটা পরগাছার মত জীবন কাটাইতে হয়। তাহার নিজের দিক হইতে এবং সমাজের দিক হইতে ইহার ফল মঙ্গলদায়ক হয় না। উপরন্তু, জারজ সন্তানের জননীর বিবাহাদির ব্যবস্থা করাও অভিভাবকদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অতএব পিতৃপরিচায়ী (patrilineal) সমাজের ন্যায় মাতৃপরিচায়ী সমাজেও বিবাহের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যে দেশে সমাজ বহুব্যাপক সম্বন্ধজালে জটিল, সে দেশে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে নানাদিক থেকে দাবিয়ে রাখতে হয়।"1 অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমাজের ইচ্ছার সঙ্গে আপস করিয়া চলিতে হয়। এই আপসের ফলশ্রুতি হিসাবে বিবাহের উৎপত্তি।

ব্যক্তির নিকটও বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। নর-নারীর মিলনকে কেবলমাত্র যৌন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে গেলে ভুল করা হইবে। ইহা অনস্বীকার্য যে "বেশীর ভাগ দম্পতির জীবনে নরনারী পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে প্রথমে আকৃষ্ট হয়।"2 কিন্তু পরবর্তী জীবনে দৈনিক জীবনের সাহচর্য, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাত উভয়ের মধ্যে মিলন-সেতুকে সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করে। এইভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। মনঃপ্রকৃতির বিকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভের জন্যও পুরুষ এবং নারীর নিবিড় সান্নিধ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিচ্ছিন্ন-ভাবে পুরুষ এবং নারী উভয়ই অসম্পূর্ণ। পুরুষ-প্রকৃতি এবং নারী-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। একের প্রকৃতি অপরের প্রকৃতির পরিপূরক। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নর-নারীর ক্ষেত্রেই একজন অপরজনের অসম্পূর্ণতা অন্ততঃপক্ষে আংশিকভাবে ঘুচাইতে সক্ষম।

বিবাহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত তাৎপর্য আছে বলিয়াই প্রত্যেক সমাজে নানা প্রকার অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিবাহ-কার্য সম্পাদিত হয়। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এণ্ডারসন ও পার্কার বলেন: "The wedding is the recognition of the significance of marriage to societies and to individuals

1 রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ত্রয়োদশ খণ্ড। পৃঃ ৫

2 অতুলচন্দ্র গুপ্ত: সমাজ ও বিবাহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৫৩ সাল। পৃঃ ৪৭

through the public ceremony usually accompanying it. Such a ceremony indicates the society's control. The pageantry inpresses upon the couple the importance of the commitment they are undertaking."1 অর্থাৎ বিবাহোৎসবের মাধ্যমে বিবাহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্য সূচিত হয়। বিবাহ জিনিষটি যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, এই বিষয়ে যে সমাজের নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের উপস্থিতিতে বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়। তাহা ছাড়া, বিবাহোৎসবে নব দম্পতিকে পরস্পরের নিকট নানারকম অঙ্গীকার করিতে হয় এবং এই অঙ্গীকারের গুরুত্ব তাহারা যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারে তাহার জন্য বিবাহানুষ্ঠানে সাড়ম্বর অথচ গুরুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়।

বিবাহের প্রকারভেদ

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির অভিপ্রায় ও মানুষের অভিপ্রায় "এই দুই অভিপ্রায়ের মধ্যে বিরোধ বেশি অথবা মিল বেশি তাই নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন বিবাহের মধ্যে চেহারা ও ভাবের প্রধান পার্থক্য ঘটে।"2 বিভিন্ন সমাজে এবং অনেক সময় একই সমাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে বিবাহসম্পর্কিত রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানে পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে বিবাহের কয়েকটি জাতিরূপের উল্লেখ করা হইল।

(১) পতি বা পত্নীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিবাহকে দুইটি জাতিরূপে ভাগ করা যায়। যখন এককালে মাত্র একজনের সহিত দাম্পত্যজীবন যাপন করা হয়, তখন তাহাকে monogamy বা একগামিতা বলে। আবার যখন পুরুষ বা স্ত্রীলোক এককালে একাধিক লোকের সহিত দাম্পত্যজীবন যাপন করেন, তখন ইহাকে polygamy বা বহুগামিতা বলে।

বহুগামিতা তিন প্রকার হয়। যখন একই স্ত্রীলোক একই কালে বহু পতি গ্রহণ করেন, তখন ইহাকে polyandry বা বহুভর্তৃকত্ব বলা হয়। বহুভর্তৃকত্বের প্রচলন পৃথিবীতে খুব বিরল। তিব্বতের কোন কোন অংশে এবং হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য ভূমিতে ইহার প্রচলন আছে। আর্থিক অসচ্ছলতা এবং পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতার জন্য এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। পাঞ্চাল-দুহিতা দ্রৌপদীকে অর্জুন শর-নিক্ষেপে পারদর্শিতা দেখাইয়া জয় করিলে পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই উপাখ্যানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া এণ্ডারসন ও পার্কার নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন: "Like many

---

1 **Anderson and Parker : Society : Its Organisation and Operation. Affiliated East-West Press Pvt. Ltd. New Delhi.**

2 রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ত্রয়োদশ খণ্ড। পৃঃ ৫

race myths, the legend of Arjuna clothes a simple economic fact : in the upland valleys, existence depends upon a limited number of tiny terraced fields and the careful balancing of population against food reserves. Each family avoids dividing its meager tillage in ever-diminishing lots among its progeny by having the younger sons share the wife of the eldest son. Not only does this practice reduce the number of children in each generation, and keep each property permanently within the family, but it has some other curious results. Polyandry, for some reason not wholly accounted for by anthropologists, reduces the fertility of wives, and produces an abnormal ratio of male to female births."1 অর্থাৎ অর্জুন-দ্রৌপদীর উপাখ্যানে একটি সাধারণ অর্থনৈতিক প্রযোজনের প্রতিফলন দেখা যায। হিমালযের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ কম হওযায খাদ্যেব পরিমাণ স্বভাবতই অত্যন্ত সীমিত ছিল। সুতরাং লোকসংখ্যার সঙ্গে খাদ্যের মোটামুটি একটা সমতা রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্য সার্থক কবার প্রথম ধাপ হইল প্রত্যেক পুরুষে যাহাতে কর্ষণযোগ্য ভূমির ভাগাভাগি না হয তাহা নিশ্চিত করা। এইজন্য এইসব পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে তাহাব সহোদরদের বিবাহ করার প্রথা গড়িয়া উঠিযাছে। ইহার ফলে সন্তানের সংখ্যা স্বভাবতই কম হয় এবং পরিবারেব ভূ-সম্পত্তি অবিভক্ত অবস্থায় চিরকালের জন্য পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। বহুভর্তৃকত্বের বেলায় আরেকটি অত্যাশ্চর্য ফলও ফলিতে দেখা যায। স্ত্রীলোকের সন্তান-ধারণ করার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিযা যায এবং স্ত্রী-শিশুর তুলনায় পুরুষ-শিশুর জন্ম-হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের পরিবর্তন কেন ঘটে তাহা নৃতত্ত্ববিদগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুমান-নির্ভর, ইহা অনস্বীকার্য। সুতরাং এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিবাহ প্রথা, তথা সব রকম আচার-ব্যবস্থা, গড়িয়া উঠে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণা মনে রাখিয়া সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন রকম বিবাহ প্রথা বিশ্লেষণ করা উচিত। এই ক্ষেত্রে ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। আরেকটি বিষয়ও স্মরণ রাখিতে হইবে। নিজেরা যে বিবাহ-পদ্ধতি বা আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত তাহার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য সমাজের বিবাহ-পদ্ধতি বা আচার-ব্যবস্থার

1. Anderson and Parker : Society Its Organisation and Operation. Page 146

মূল্যায়ন করিতে যাওয়া অনুচিত। এইসব বিষয়ে মূল্যায়ন করিবার চেষ্টা না করিয়া কিরূপ সামাজিক অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা অনেক বেশি ফলপ্রসূ ও মূল্যবান প্রয়াস।

যখন একজন পুরুষ একই সঙ্গে বহু পত্নী গ্রহণ করেন, তখন ইহাকে polygyny বা বহুপত্নীকত্ব বলা হয়। বহুভর্তৃকত্বের তুলনায় বহুপত্নীকত্বের প্রচলন অনেক বেশি। নানা কারণে এই প্রথার উদ্ভব হইয়া থাকে। কোন কোন সমাজে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বহুপত্নীকত্ব গড়িয়া উঠে। যখন একজন পত্নীর পক্ষে যুগপৎ গৃহস্থালী এবং চাষবাসের কাজকর্ম সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন বাধ্য হইয়া সেই পুরুষকে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে দেখা যায়। আফ্রিকার অনেক দলপতি (tribal chief) কাজকর্ম সঙ্কুলান করিবার জন্য একাধিক পত্নী গ্রহণ করে। অনেক সমাজে বহুপত্নীকত্ব মর্যাদা-সূচক বলিয়া গণ্য হয়। কাজেই বিত্তশালী ব্যক্তিগণ মর্যাদা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন। কোন কোন সমাজে বংশ-রক্ষা করিবার জন্য পুরুষ-সন্তানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে পুরুষ-সন্তান জাত না হইলে বংশ-রক্ষার তাগিদে স্বামী দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেন। হিন্দু-বিবাহ আইন পাশ হইবার পূর্বে অনেকে এই কারণে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে আরেকটি কারণেও বহুপত্নীকত্ব প্রচলিত ছিল। অনেকে জাতে উন্নীত হইবার উদ্দেশ্যে কুলীনবংশজাত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কুলীনবংশজাত পাত্রের সংখ্যা অল্প থাকায় কোন কোন পাত্র একাধিক বিবাহ করিতেন। কুলীনদের বহু বিবাহ সম্পর্কে নানাপ্রকার হাস্যরসাত্মক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। উপরন্তু, ধর্মের সমর্থন থাকিলেও বহুপত্নীকত্বের প্রচলন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইসলামে বহুপত্নীকত্বের সমর্থন থাকায় মুসলমান সমাজে এই প্রথার প্রচলন অপেক্ষাকৃত বেশি।

তৃতীয় প্রকার বহুগামিতার উদাহরণ হইল সমষ্টি বিবাহ (group marriage)। যখন একাধিক পুরুষের একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই কালে বিবাহ হয়, তখন এই প্রকার বিবাহকে সমষ্টি বিবাহ বলা হয়। নিউ গিনি এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি উপজাতির মধ্যে এই ধরনের বিবাহের প্রচলন আছে। কিন্তু এই বিবাহপ্রথা বহুভর্তৃকত্বের তুলনায়ও অনেক বেশি বিরল। যে-সব সমাজে সমষ্টি বিবাহের প্রচলন আছে সেখানেও ইহার সংখ্যা এত অল্প যে, প্রায় নগণ্য বলা চলে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রাজিলের কাইনগেঙ্ (Kaingang) উপজাতির মধ্যে এই বিবাহের প্রচলন আছে। কিন্তু বিগত এক শত বৎসরের কুলজী (genealogy) পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শতকরা মাত্র ৮ ভাগ বিবাহ ছিল সমষ্টি বিবাহের অন্তর্গত, শতকরা ১৪ ভাগ ছিল বহুভর্তৃকত্ব শ্রেণীর, শতকরা ১৮ ভাগ ছিল বহুপত্নীক বিবাহ এবং অবশিষ্ট বিবাহ ছিল একগামী।[1]

বর্তমান যুগে প্রায় সব সমাজেই একগামিতা সর্বোৎকৃষ্ট বিবাহ-প্রথা হিসাবে স্বীকৃত। কোন কোন সমাজে আইনের মাধ্যমে ইহা বলবৎ করা হইয়াছে। যেমন, হিন্দু সমাজে বহুগামিতা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কোন কোন সমাজে ধর্ম একগামিতা বলবৎ করিতে সাহায্য করিয়াছে। ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুগামিতার বিরুদ্ধে ধর্মের অনুশাসন রহিয়াছে। অধিকাংশ সমাজেই অবশ্য পালনীয় আচার হিসাবে একগামিতা স্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছে। কেবল বর্তমান যুগে নহে, অতীত কালেও সাহিত্যে নাটকে এবং উপাখ্যানে একগামিতার সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন এবং সহধর্মিণী হিসাবে স্বর্ণসীতা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই উপাখ্যানে আদর্শ হিসাবে একগামিতাকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

একগামিতার স্বপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা হয। প্রথমতঃ, অধিকাংশ সমাজেই পুরুষ এবং নারীর সংখ্যায় মোটামুটি একটা সমতা দেখা যায়। এই অবস্থায় অন্য কোন বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত হইলে এই ভারসাম্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, একগামী বিবাহে স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে যে আত্মীয়তা (intimacy) গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা বহুগামী বিবাহে আশা করা যায় না। তৃতীয়তঃ, বহুগামী বিবাহে ঈর্ষা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে নানাভাবে মলিন করে। একগামী বিবাহে এইপ্রকার ঈর্ষার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। চতুর্থতঃ, একগামী বিবাহে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর অনেক বেশি সহজসাধ্য। বহুগামী বিবাহে বিষয়-আশয় লইয়া নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

(২) পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার ভিত্তি কি হওয়া উচিত ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহকে দুইটি জাতিবৃপে ভাগ করা যায়। একটিকে বলা হয় **endogamy** বা গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ এবং অপরটিকে বলা হয় **exogamy** বা গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহ।

যখন একই গোষ্ঠী হইতে পাত্র এবং পাত্রী উভয়েরই নির্বাচন সঙ্গত বিধি বলিয়া গণ্য হয়, তখন ইহাকে গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ বলা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে নানাপ্রকার গোষ্ঠীর কথা ভাবা যাইতে পারে। যেমন, ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে সবর্ণ বিবাহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ, হিন্দু-বিবাহ আইন পাশ হইবার পূর্বে অসবর্ণ বিবাহ অ-শাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতকায় ব্যক্তিদের শ্বেতকায় সমাজের মধ্যেই বিবাহাদি সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। কারণ, অধিকাংশ রাজ্যে শ্বেতকায় ব্যক্তিদের সঙ্গে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করার পথে সামাজিক এবং নানারকম পরোক্ষ আইনগত বাধাও রহিয়াছে। অতএব শ্বেতকায় মার্কিনীদের বিবাহ-ব্যবস্থাকে গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক সমাজেই বিশেষ বিশেষ ধর্মাবলম্বী লোকদের বিবাহাদি সম্বন্ধ নিজেদের ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয় এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী লোকদের

সঙ্গে যাহাতে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন করা না হয় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হয়। সুতরাং ইহাকেও গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহের সমর্থনে সাধারণতঃ তিনটি যুক্তি উত্থাপন করা হয়। প্রথমতঃ, এই ধরনের বিবাহ গোষ্ঠীর ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখিতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ সীমাবদ্ধ থাকায় গোষ্ঠীর জীবন-ধারাগত স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। তৃতীয়তঃ, পাত্র এবং পাত্রী উভয়ই একই গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার ফলে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনাদর্শে মোটামুটি অভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং বিবাহিত জীবনে তাহাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং খাপ খাওয়ান সহজসাধ্য হয়।

যখন একই গোষ্ঠীভুক্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় এবং দুইটি ভিন্ন গোষ্ঠী হইতে উভয়ের নির্বাচন সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন এই বিবাহকে গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহ বলা হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রেও নানারকম গোষ্ঠীর কথা ভাবা যায়। যেমন, অজাচার (incest) অথবা নিষিদ্ধ আত্মীয় কুটুম্বের সহিত যৌনসংসর্গ সব সমাজেই নিন্দিত এবং পরিত্যাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। পিতা এবং কন্যার মধ্যে বিবাহ অথবা মাতা এবং পুত্রের মধ্যে বিবাহ সর্বজনীনভাবে সব সমাজেই বর্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে আরও কয়েকটি নিকট আত্মীয়কুটুম্বের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। সুতরাং বিবাহের জন্য নিষিদ্ধ গণ্ডীর বাহির হইতে পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান করিতে হয়। ইহাকে গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহের উদাহরণ বলিয়া গণ্য করা যায়। হিন্দু-বিবাহে সপিণ্ডের মধ্যে বিবাহ-নিষেধের বিধি নিকট সম্পর্কিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ-নিবারণের নিয়ম। এই ধরনের নিষেধ সকল সমাজের বিবাহরীতিতেই কোনও-না-কোন রকম আছে। হিন্দু-সমাজের সনাতন নিয়মানুযায়ী পিতার বংশে সাত ও মাতার বংশে পাঁচ সিঁড়ি উপরে ও নীচে এই নিষিদ্ধ সীমার গণ্ডী। "পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্ধ মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা" (যাজ্ঞবল্ক্য)। আরেক দিক হইতেও হিন্দু-বিবাহ পদ্ধতিকে গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহের উদাহরণ বলিয়া গণ্য করা যায়। প্রচলিত হিন্দু-বিবাহে সগোত্র ও সমান প্রবরের মধ্যে বিবাহে বাধা আছে।

এই প্রসঙ্গে সগোত্র ও সমান প্রবরের বিবাহ নিষেধের বিধি সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে। গোত্র সম্পর্কে বলা হয় যে, জমদগ্নি প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ সকল ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। এই কয়জনের নামই গোত্রনাম। সুতরাং যে ব্রাহ্মণের বংশপরম্পরা যে গোত্র প্রসিদ্ধ, তিনি সেই নামের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রবরের ব্যাপার আরও একটু জটিল। প্রতি গোত্রে অনেকগুলি করিয়া প্রবর আছে। এইগুলিও ব্যক্তি-বিশেষের নাম। কথিত আছে যে, প্রবর-প্রবর্তক ঋষিরা গোত্র-প্রবর্তক ঋষিদের পুত্রপৌত্র। অতএব যত দূরের সম্পর্কই হউক না কেন, সগোত্র ও সমান প্রবর লোকেরা এক বংশের লোক। যাহাদের প্রবর এক, তাহাদের সম্পর্ক একটু নিকট।

গোত্র-প্রবরের যথার্থ ব্যাখ্যা যাহাই হউক, বিবাহে সগোত্র ও সমান প্রবরের বাধার মত অর্থশূন্য বাধা আর কল্পনা করা যায় না। প্রথমতঃ, রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্য বিবাহে যে নিষেধ থাকে তাহার সঙ্গে গোত্র প্রবরের বাধার কোন সম্পর্ক নাই। হিন্দুদের বিবাহ-বিধি অনুসারে যাহার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ সপিণ্ড-সম্বন্ধ সীমার বাহিরে, তাহাকে বিবাহ করা চলে। বাঙলা দেশে আবার সেই সীমার মধ্যেও কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা হইলে তাহাকে বিবাহ করা যায়। অথচ যেখানে রক্ত-সম্বন্ধের কোন ইতিহাস নাই, সেখানে কেবলমাত্র বংশপরম্পরাগত দুইটি নামসাম্য বিবাহের অলঙ্ঘনীয় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি স্বীকার করা যায় যে, একশ পুরুষ পূর্বে সগোত্র স্ত্রীপুরুষের পূর্বপুরুষ এক ছিলেন, কোন্ যুক্তিতে তাহা বিবাহে বাধা হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, গোত্র-প্রবর প্রবর্তক ঋষিরা সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের বংশগত গোত্র-প্রবর থাকা সম্ভব নয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোত্র-প্রবর তাহাদের পুরোহিতদেরই গোত্র-প্রবর। এইগুলি তাহাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে। "যদ্যপি রাজন্য বিশাং প্রাতিস্বিক গোত্রাভাবাৎ প্রবরাভাবঃ তথাঽপি পুরোহিত গোত্র প্রবরৌ বেদিতব্যৌ" (মিতাক্ষরা)। কিন্তু এই আরোপিত গোত্র-প্রবরই বিবাহে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শূদ্রের বিবাহার্থ কোন গোত্র-প্রবর নাই। তৃতীয়তঃ, গোত্র-প্রবর সম্পর্কে আরেকটা অসুবিধা আছে। ভিন্ন গোত্রেও এক প্রবরের নাম আছে। যেমন, উপমন্যু গোত্রের এক প্রবর বশিষ্ঠ, আবার পরাশর গোত্রেরও এক প্রবর বশিষ্ঠ। সুতরাং ভিন্ন গোত্রের লোক এক প্রবর হইতে পারে। সেইজন্য সমানপ্রবরের বাধা বিবাহে সগোত্রের অতিরিক্ত আর এক বাধা। সুতরাং মেধাতিথি মনুভাষ্যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, প্রস্তাবিত বরকন্যা যদি ভিন্ন গোত্রের হয় তাহা হইলে কি করিয়া তাহারা এক ঋষির সন্তান গণ্যে সমানপ্রবর হইতে পারে? তিনি শেষ পর্যন্ত মীমাংসা করিয়াছেন যে, স্মৃতি যখন বলিয়াছেন হইতে পারে, তখন তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, গোত্র-প্রবর জিনিষটি সম্পূর্ণ শ্রুতি-স্মৃতির এলাকার। অর্থাৎ অলৌকিক বস্তু। লৌকিক যুক্তিতে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইবে না।।

(৩) বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে সামাজিক পদ-মর্যাদায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। এই দিক হইতে বিচার করিয়া বিবাহকে দুইটি জাতিরূপে ভাগ করা যায়। একটিকে বলা হয় Hypergamy বা অনুলোম বিবাহ এবং অপরটিকে বলা হয় Hypogamy বা প্রতিলোম বিবাহ।

যখন উচ্চ বংশজাত পাত্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর কন্যার বিবাহ হয়, তখন এই ধরনের বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হয়। ভারতবর্ষে সামাজিক স্তর-বিন্যাসে উচ্চ জাতে উন্নীত হইবার অন্যতম পন্থা ছিল অনুলোম বিবাহ এবং ইহা সমাজে স্বীকৃত ছিল।

আবার যখন নিম্নবংশজাত পাত্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর কন্যার বিবাহ হয়, তখন এই প্রকার বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রতিলোম বিবাহ নিন্দিত হইত এবং এই বিবাহের ফলে যে সন্তান জাত হইত

তাহার সামাজিক মর্যাদা পিতা এবং মাতা উভয়ের সামাজিক মর্যাদার তুলনায় হ্রাস পাইত। কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে যে সন্তান জাত হইত সে চণ্ডাল বলিয়া পরিচিত হইত। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জাত সন্তানের ক্ষেত্রে। এই প্রকার প্রতিলোম বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিত, তাহাকে সূত বা সারথি বলা হইত।

অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহের উপরোক্ত সামাজিক মূল্যায়নে পার্থক্য সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বেশাম বলেন: "This distinction is to be found in other societies ; for instance, in Victorian England the peer who married an actress rarely incurred the same scorn and ostracism as the lady who married her groom."1 অর্থাৎ ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য সমাজেও অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ সম্পর্কে সামাজিক মূল্যায়নে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ইংল্যাণ্ডে ভিক্টোরিয়ন যুগে যদি কোন উচ্চ শ্রেণীর খেতাবধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নটীকে বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তিরস্কৃত বা সমাজচ্যুত হইতেন না। অথচ যদি উচ্চ শ্রেণীর কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার কর্মচারীকে বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে এই বিবাহ সমাজে নানাভাবে ধিক্কৃত হইত এবং তিনি সমাজচ্যুত হইতেন।

(৪) পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি নানা বিষয়ে সমতা এবং অসমতার ভিত্তিতে বিবাহকে দুইটি জাতিরূপে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় Homogamy বা সম বিবাহ এবং অপরটিকে বলা হয় Heterogamy বা অসম বিবাহ।

পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যখন উপরোক্ত বিষয়সমূহে সমতা পরিলক্ষিত হয়, তখন সেই বিবাহকে সম বিবাহ বলা হয়। মনোবিদগণ বলেন যে, সম বিবাহে নব-দম্পতির পক্ষে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং খাপ খাওয়ান সহজসাধ্য হয়। এই কারণে সর্বকালে সর্ব সমাজে সম বিবাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যখন উপরোক্ত বিষয়সমূহে অসমতা পরিলক্ষিত হয়, তখন সেই বিবাহকে অসম বিবাহ বলা হয়। সাধারণতঃ অসম বিবাহে নব-দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্কে গরমিলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই কারণে সব সমাজেই এই প্রকার বিবাহ এড়াইয়া যাইবার দিকে প্রবণতা দেখা যায়।

(৫) বিবাহের পাত্র-পাত্রীকে কি ভাবে মনোনীত করা হয়, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় romantic marriage বা স্ব-নির্বাচিত বিবাহ। অপরটিকে বলা হয় arranged marriage বা সংযোজিত বিবাহ।

যখন পাত্র এবং পাত্রী দুজনেই পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হয়, তখন এই প্রকার বিবাহকে স্ব-নির্বাচিত বিবাহ

---

1 A. L. Basham : The Wonder That Was India. Fontana Books. Rupa & Co, Calcutta.

বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যখন অপর পক্ষ, অর্থাৎ অভিভাবকবৃন্দ, আত্মীয়-কুটুম্ব বা বন্ধু-বান্ধব, পাত্র-পাত্রী মনোনয়ন করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তখন এই ধরনের বিবাহকে সংযোজিত বিবাহ বলা হয়।)

উপরোক্ত উভয় প্রকার বিবাহ-ব্যবস্থার স্ব-পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা হয়।

স্ব-নির্বাচিত বিবাহের স্ব-পক্ষে বড় যুক্তি হইল, যাহাকে লইয়া সারা জীবনের জন্য ঘর বাঁধিবে তাহাকে নির্বাচন করিবার অধিকার পাত্র-পাত্রীর থাকা উচিত। মনোমত জীবন-সাথী নির্বাচন করার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া অনেকে মনে করেন। আবার এই প্রকার বিবাহে অভিভাবকদের কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব না-থাকাটাও স্ব-পক্ষে যুক্তি হিসাবে উত্থাপন করা হয়। তাহা ছাড়া, একমাত্র স্ব-নির্বাচিত বিবাহে সম বিবাহের আদর্শ সার্থকভাবে রূপায়িত হইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কারণ, পাত্র এবং পাত্রী দুজনই দুজনকে ভালভাবে জানিয়া-শুনিয়া ও ভাবের আদান-প্রদান করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হয়।

স্ব-নির্বাচিত বিবাহের বিপক্ষে আবার অনুরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়। বলা হয় যে, বিবাহের পূর্বে যখন যুবক-যুবতী মিলিত হয় তখন রোমান্স তাহাদের চিন্তা এবং দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সুতরাং বিবাহোত্তর জীবনে তাহারা যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হইবে সেইসব সমস্যার মোকাবিলা করা তাহাদের যুক্ত প্রয়াসে সম্ভব কিনা তাহা বিচার করার মত মনের অবস্থা তখন থাকে না। অথচ বিবাহিত জীবনে রোমান্স যদি একমাত্র সম্বল হয়, তাহা হইলে সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরা বিচিত্র নহে।

তবে স্ব-নির্বাচিত বিবাহের এই দিকটি লইয়া বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নহে। স্ব-নির্বাচিত বিবাহ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য সংগৃহীত হয় নাই, যাহার ভিত্তিতে স্ব-পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু জোর দিয়া বলা যায়। যে-সব সমাজে স্ব-নির্বাচিত বিবাহের প্রচলন রহিয়াছে, সেইসব সমাজ রসাতলে যায় নাই, ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আবার যেসব সমাজে সংযোজিত বিবাহের প্রচলন আছে, সেইসব সমাজ হইতে প্রেম বা রোমান্স সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ, প্রত্যেক সমাজে ঐতিহ্য, জীবনাদর্শ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিবাহ প্রথা গড়িয়া উঠে। সুতরাং কোন সমাজের বিবাহতত্ত্ব জানিতে হইলে সেই সমাজের আদর্শগত মূল তত্ত্বটি জানিতে হইবে। এক সমাজের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় এবং মঙ্গলজনক, অপর সমাজের পক্ষে তাহা না-ও হইতে পারে। বিবাহ-পদ্ধতি আলোচনা করিবার সময় এই সত্যটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, স্ব-নির্বাচিত বিবাহ সম্পর্কে একটা ধারণা আছে যে, পাত্র এবং পাত্রী দুজনেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরস্পরকে নির্বাচন করে। বহু ক্ষেত্রেই এই ধারণা সম্পূর্ণ

অলীক। ইহা কেবল আমাদের সমাজে নহে, পাশ্চাত্য সমাজের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শৈশবাবস্থা হইতে নানা উপায়ে আমাদের সামাজিকীকরণ ঘটিয়া থাকে। নানা কথা, কাহিনী, উপাখ্যান ও উপন্যাসের ভিতর দিয়া বিবাহ সম্পর্কে ধারণা—অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবনের আদর্শ, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় ইত্যাদি—রক্তের সঙ্গে একেবারে মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহা স্বাধীনভাবে জীবন-সাথী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এক দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে খুব বেশি সংখ্যক বিবাহ অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণ হইল সামাজিকীকরণের প্রভাব। পাশ্চাত্য দেশে ইহুদি, ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশ বিবাহ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষেও অবস্থা অনুরূপ। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে দুইটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। তাহা ছাড়া, সামাজিকীকরণের প্রভাবে প্রত্যেক সম্ভাব্য বর বা কন্যার মেলামেশার গণ্ডী সঙ্কুচিত হইয়া যায়। আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষার মান প্রভৃতি বিষয়ে দুস্তর ব্যবধান থাকিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিছক প্রেম প্রজাপতির নির্বন্ধ ঘটাইতে সক্ষম হয় না। জ্ঞাতসারে না করিলেও, অজ্ঞাতসারে আমরা সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার-আচরণের নিকট আত্মসমর্পণ করি। আচারের নিকট বিচার পরাভূত হয়, ইহাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য।

ভারতবর্ষীয় বিবাহ তত্ত্ব

ভারতবর্ষীয় বিবাহ তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মূল তত্ত্বটি জানিতে হইবে।

"সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব"1—এই উপলব্ধি প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। অতএব গার্হস্থ্যকে সমাজের আবশ্যক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের সুখসুবিধার সঙ্গে সমাজের দাবিও স্বীকৃত হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ পঞ্চ যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন—ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ। এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ সেবা। গৃহস্থকে এই পঞ্চ যজ্ঞ করিতে বলা হইয়াছে। গীতায় বলা হইয়াছে,

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ গীতা ৩।১৩

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অতুলচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন: "মানুষের ভোগ্য দ্রব্যের মধ্যে অন্নই প্রধান। কারণ অন্ন ভোজন করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং অন্ন দেবতাকে যজ্ঞে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে অন্নভোজনকে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞবান ও যজ্ঞহীন লোকের প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

1. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ষষ্ঠ খণ্ড। পৃঃ। ২৩৮

যজ্ঞবান লোক যে অন্ন পাক করেন তাহা নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য নহে। এই অন্ন হইতে দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে দান করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তিনি ভোজন করেন। যজ্ঞের অবশিষ্টকে অমৃত বলে। যে সজ্জন এই অমৃত ভোজন করেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।…………পক্ষান্তরে যজ্ঞহীন দুরাচারগণ নিজেদের ভোজনের নিমিত্তই অন্ন পাক করিয়া থাকে। তাহারা দেবতাদিগকে অন্নদান করে না, অতিথি আসিলে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সমস্ত নিজের বা স্ত্রীপুত্রের ভোজনের নিমিত্ত ব্যবহার করে। ইহারা দেবতার অন্ন দেবতাকে দান না করিয়া নিজেরা সমস্ত ভোগ করে বলিয়া চৌর্যাপরাধে অপরাধী। ইহারা চোর, সুতরাং পাপী। ইহারা যে অন্ন ভোজন করে তাহা পাপান্ন; সুতরাং ইহারা পাপই ভোজন করে। এস্থলে অন্নভোজন সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা সম্বন্ধেই যজ্ঞের নীতি প্রযোজ্য।… ·মানুষের স্বার্থপরতা, ভোগাকাঙ্ক্ষা হইতেই পাপের জন্ম। যিনি নিজের কামনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া সমস্ত জীবনকে একটা যজ্ঞে পরিণত করেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।"1

ভারতবর্ষীয় সমাজ-ব্যবস্থার এই মূল তত্ত্বটি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "ভারতবর্ষ সম্পত্তিকে অস্বীকার করে নি, গৃহকে ধর্মক্ষেত্র বলে স্বীকার করার দ্বারাই বিষ শোধন করে দিলে। বহুশতাব্দী ধরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাহায্যেই ভারতবর্ষে সমাজধর্ম টিকেছে; ভারতবর্ষের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা ধর্ম কর্ম প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গলই এই সম্পত্তির দ্বারাই বাহিত। ধনীর যথেচ্ছাকৃত বদান্যতার উপর সমাজ যখন নির্ভর করে, তখন তাতে দোষ ঘটায়। কারণ অবিচারে দান গ্রহণ একটা দুর্গতি। কিন্তু ভারতবর্ষে গৃহীর দ্বারা লোকহিত সাধন তার বদান্যতা নয়, সে তার বৈধ কর্তব্য, তাতে তার নিজেরই সার্থকতা। এই দায়িত্ব কেবল যে ধনীর তা নয়, সাধ্যানুসারে সকল গৃহীরই শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াকর্মে আপামরসাধারণ সকলকেই সমাজকে নানা রকম টেক্সো দিতে হয়। মনু বলেছেন, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতসকল ও অতিথিরা গৃহীর উপর আশা স্থাপন করে, জ্ঞানী গৃহস্থ সেই বুঝেই কাজ করবেন। এমনি করে বারে বারে নানা আকারেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, বিশ্বজনের যথাবিহিত দাবিরক্ষা করাই গৃহধর্মের লক্ষ্য।"2

হিন্দু বিবাহের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে সমাজের এই মূল আদর্শ স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে বলিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: "বহু-আলোচিত বিবাহ-ব্যাপারে হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক; সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তারা মোটেই ভাল বলে মনে করে না।"3 সমাজের স্বার্থে বিবাহ সম্বন্ধে ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যকে নানা উপায়ে খর্ব করা হইয়াছে।

---

1. অতুলচন্দ্র সেন: শ্রীমদ্ভাগবদগীতা। পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১
2. রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ত্রয়োদশ খণ্ড। পৃষ্ঠা ৮
3. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ। পঞ্চম খণ্ড। পৃঃ ৪০৭।

বিবাহ সম্পর্কে এই আদর্শ বা মনোভাব একদিনেই গড়িয়া উঠে নাই; ধীরে ধীরে ইহার অভিব্যক্তি হইয়াছে। সেইজন্য প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নানারকম বিবাহ-রীতির প্রচলন দেখা যায়। অনেকদিন পর্যন্ত এই বিবাহ-রীতিগুলি প্রচলিত ছিল বলিয়া মনুকে বাধ্য হইয়া এইগুলিকে বিবাহবিধির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই জাতীয় কয়েকটি বিবাহ-রীতির উল্লেখ করা হইল। যেমন, রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ ও গান্ধর্ব বিবাহ। কন্যাকে যখন টাকা দিয়া কিনিয়া নেওয়া হইত তখন তাহাকে আসুর বিবাহ বলা হইত। কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করাকে বলা হইত রাক্ষস বিবাহ। সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। বরকন্যার পরস্পর ইচ্ছাসংযোগে বিবাহকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ বিবাহকে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। "কেননা অর্থবল বা বাহুবল, বা রিপুর বল স্বভাবতই উদ্ধত, তা পরের বিধি মানতে চায় না।" গান্ধর্ব বিবাহ ততটা নিন্দনীয় ছিল না। মনু এই বিবাহকে কামসম্ভব বলিয়া একটু খোঁটা দিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যে ও ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক দিন পর্যন্ত গান্ধর্ব বিবাহের স্থান ভারতবর্ষীয় সমাজে প্রশস্ত ছিল।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এইসব নানাপ্রকার বিবাহপদ্ধতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া হিন্দু শাস্ত্রকারগণ তদানীন্তনকালের বহু জরুরী সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ বহিরাগতদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হইয়াছে। ইহার ফলে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হইত, সেই পরিবেশে বহু নারী নানা প্রকার অত্যাচারের শিকার হইত। এইপ্রকার বলপ্রয়োগের দরুণ যেসব সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিত তাহাদের স্বীকৃতি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি নিন্দার্হ বিবাহকে স্বীকার করিয়া অবৈধ (illegitimate) সন্তানের সমস্যাকে শাস্ত্রকারগণ সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলপ্রয়োগজনিত জাত সন্তানকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়া সন্তান ও তাহার মাতাকে সমাজে সম্মানের আসন দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বেশামের উক্তি উল্লেখযোগ্য। "It would seem that, with surprising realism, the jurists recognised a wide range of relationships, so that the girl seduced by her lover's promises or carried off by raiders would have some legal claim to wifely status, and her child some degree of legitimacy."1

প্রাচীন ভারতীয়দের বিবাহ তত্ত্ব আলোচনা করিবার সময় আরেকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বিবাহকে 'সংস্কার' বলিয়াছেন। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের দশবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ অন্যতম। এই দশবিধ সংস্কারের উদ্দেশ্য হইল দেহকে পরিমার্জিত করা, পরিশোধিত করা, সংস্কৃত করা।

---

1 A. L. Basham : The Wonder That Was India. Page 170.

কারণ, দেহ হইল উপায়স্বরূপ, লক্ষ্য নহে। জীবপ্রকৃতির নানাবিধ দুর্বলতা এবং সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি পাওয়াই সংস্কারের উদ্দেশ্য। এইসব দুর্বলতা এবং সঙ্কীর্ণতাকে অস্বীকার করিয়া বা উপেক্ষা করিয়া এইসব দুর্বলতা হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে, ভোগকে অস্বীকার করিয়া ভোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় নাই। কারণ, ইহা জীবপ্রকৃতির অন্তর্গত। ত্যাগের দ্বারা ভোগকে শোধন করিয়া লইতে হয়। অনুরূপভাবে, আমাদের যাবতীয় ক্ষুদ্রতা নীচতা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হিসাবে যে-সব কর্তব্য শাস্ত্রকারগণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই সংস্কার। সংস্কারের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মনু বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মীয়ং ক্রিযতে তনুঃ।" (মনু সংহিতা ২।২৮) অর্থাৎ তনুকে সংযত করিযা, নিযমিত করিযা ব্রহ্মতুল্য ভাব আয়ত্ত করা সংস্কারের উদ্দেশ্য। জীবপ্রকৃতির বিভিন্ন দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠার অর্থ হইল ব্রহ্মতুল্য ভাব আয়ত্ত করা।

সেইজন্য গুরুগৃহে পাঠ সমাপ্ত করিযা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলে স্নাতকদের যথাসম্ভব শীঘ্র বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করা কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা হইত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, বেদের অধ্যাপনা শেষ করার পর আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন, প্রজাতন্তু ছিন্ন করিবে না। "প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসী ঃ।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১।১) অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্বক বিবাহ করিযা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবেন এবং সন্তানোৎপাদন করিয়া বংশধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবেন। ইহাই ছিল শাস্ত্রীয় বিধি। অত্রি বলেন, যে-ব্যক্তি বিবাহ না করিয়া গৃহস্থভাবে থাকে, তাহার অন্ন অভক্ষ্য।

বিবাহের উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করার একটি কারণ, জীবপ্রকৃতির তাগিদ সমাজানুমোদিত পন্থায় চরিতার্থ করা বিশেষ প্রয়োজন। অপর কারণ, বিবাহ না করিলে বংশরক্ষা হয় না। তৃতীয় কারণ হইল, বিবাহ না করিলে প্রাত্যহিক লোকযাত্রা পালন করা সম্ভব হয় না।

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥ (মনু ৯।২৭)

অর্থাৎ অপত্যের উৎপাদন ও জাত অপত্যের প্রতিপালন এবং প্রতিদিন অতিথিসেবা, ভিক্ষাদান প্রভৃতি যে-সকল গৃহস্থের কর্তব্য কার্য, তাহা স্ত্রীর সাহচর্যেই সম্ভব।

কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের সুখ-সুবিধার ভিত্তিতে গৃহের পত্তন করা অ-শাস্ত্রীয় কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। শাস্ত্রকারদের মতে, গার্হস্থ্য সমাজের আবশ্যক উপাদান। সুতরাং গৃহ সোপান বা উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নহে। তাঁহারা "গৃহস্থাশ্রমকে বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করেছেন; এই গাছের যেমন স্কন্ধ শাখা পল্লব, তেমনি সমাজের সকল অঙ্গই গৃহের প্রাণে প্রাণবান্।" সংস্কারের মাধ্যমে যেমন ব্রহ্মতুল্য ভাব আয়ত্ত করিয়া দেহকে দেহাতিরিক্ত উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা প্রয়োজন,

ঠিক তেমনি প্রকৃত গৃহীর কর্তব্য হইল গৃহকে সোপান করিয়া সমাজের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হওয়া।

"গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তো ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী।
ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম পরিবর্জিতঃ ॥"

অর্থাৎ যে-গৃহস্থ গৃহে থাকিয়া কেবলমাত্র গৃহসম্পর্কিত কাজকর্মে জড়িত থাকে, তাহাকে সত্যিকারের গৃহী বলা চলে না। আবার স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রতি দায়িত্ব পালন করার অজুহাতে যে সমাজের প্রতি কর্তব্য হইতে বিরত থাকে, সে-ও প্রকৃত গৃহী নহে। এখানে স্বকর্ম বলিতে সঙ্কীর্ণ অর্থে স্বার্থসাধন বুঝায় না। ইহা হইতেছে লোকযাত্রা, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন।

উপরোক্ত আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন বিবাহরীতির মূল্যায়ন করিয়াছেন। এই বিবাহরীতিগুলিকে গুণানুযায়ী তিনটি জাতিরূপে ভাগ করা যায। একটি হইল ধর্ম-ভিত্তিক, দ্বিতীয়টি প্রেম-ভিত্তিক এবং তৃতীয়টি ভোগ-ভিত্তিক।

ধর্ম-ভিত্তিক বিবাহে ধর্ম শব্দটির যে উল্লেখ আছে তাহার সঙ্গে রিলিজিয়ন-এর কোন সম্পর্ক নাই। এখানে ধর্ম বলিতে গার্হস্থ্য ধর্ম বুঝায়। গার্হস্থ্য জীবনের দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য সমাজের বিধি অনুযায়ী পালন করার নামই ধর্ম। স্ত্রীর সাহায্য পাইলে গৃহস্থের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা সহজ হয় বলিয়াই স্ত্রীর আরেক নাম সহধর্মিণী। এই বিবাহে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছার তুলনায় সামাজিক ইচ্ছাই প্রবল। সেইজন্য ধর্ম-ভিত্তিক বিবাহে স্বামী ও স্ত্রীকে পতি ও পত্নী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে এই বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

প্রেম-ভিত্তিক বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসাই প্রাধান্য পায়। কাব্যে, নাটকে ও সাহিত্যে এই বিবাহের সপ্রশংস বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বিবাহে "নরনারীর স্বাভাবিক প্রেমচাঞ্চল্যের সৌন্দর্য-বিকাশ" নানা কাহিনীতে চিরকালের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপ বিবাহ সমাজের আদর্শকে পীড়া দিত বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ইহাকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেন না। এইরূপ বিবাহে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীকে নায়ক ও নায়িকা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভোগ-ভিত্তিক বিবাহে বাসনা-কামনা চরিতার্থ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিবাহে সামাজিক কর্তব্য ও ত্যাগের দ্বারা কামনা পরিশোধিত হয় না। আবার প্রেম-ভিত্তিক বিবাহের অনাবিল প্রেম দাম্পত্য সম্বন্ধকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করে না। কামনার প্রদীপ্ত মশালই এইরূপ বিবাহের একমাত্র আলোক-বর্তিকা। শাস্ত্রকার-গণ এই প্রকার বিবাহকে নিন্দা করিয়াছেন এবং স্বামী ও স্ত্রীকে বৈশিক নায়ক ও সামান্যা নায়িকা বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, যে-উদার আদর্শের উপর ভারতীয় বিবাহ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই আদর্শ কালস্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। গৃহই গৃহস্থের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে। গৃহের প্রবল ও বিচিত্র দাবি মিটাইতে গৃহস্থের সকল শক্তি

নিয়োজিত। সমাজের দাবি, সমাজের স্বার্থ, সমাজের কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "উপলক্ষকে লক্ষ্য করে তোলার মানেই হচ্ছে ছোটকে বড় করে তোলা। পথকে আলয় করে যে, তার মতো দরিদ্র আর নেই। বিশ্বকেই স্বীকার করবার অনুশীলনক্ষেত্র ছিল যখন গৃহ, তখন গৃহের দাবি মানুষকে ছোট করে নি। আজ হিন্দু সমাজে সেই দাবি নিজের দিকেই অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে বলে মানুষকে অত্যন্ত ছোট করছে। ....এতদিন ভারতীয় সমাজের-যে আধারের উপরে তার বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই আধারের বিকৃতি হওয়াতে বিবাহের মূলগত ভাবসকল ও তার ব্যবহার সকল কিছুর সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। সত্যযুগের জন্যে একদল আক্ষেপ করছে, সে আক্ষেপের ডাকে সত্যযুগ সাড়া দিচ্ছে না। এখন সময় এসেছে নূতন করে বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায় করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার মিল করে ভাববার।"1

পরিবারের প্রকারভেদ

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পরিবারকে নানা জাতিরূপে ভাগ করিয়াছেন। সাধারণতঃ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া পরিবারের প্রকারভেদ করা হয় তাহা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, বিবাহ পদ্ধতির পার্থক্য অনুসরণ করিয়া পরিবারকে বিভিন্ন জাতিরূপে ভাগ করা হয়।

যেমন, পতি বা পত্নীর সংখ্যার ভিত্তিতে তিন রকম পরিবার চোখে পড়েঃ একগামী পরিবার, বহুভর্তৃক পরিবার এবং বহুপত্নীক পরিবার। অনুরূপভাবে, গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ এবং গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারকে দুইটি জাতিরূপে ভাগ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, পরিবারে কর্তৃত্ব মাতা বা পিতার উপর ন্যস্ত থাকিতে পারে। এই হিসাবে মাতৃশাসিত (Matriarchy) এবং পিতৃশাসিত (Patriarchy) এই দুই শ্রেণীতে পরিবারকে ভাগ করা হইয়া থাকে।

ম্যাক আইভারের মতে, কোন কালে মাতৃশাসিত পরিবার ছিল কিনা এই সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, বহু ক্ষেত্রে মাতার নামেই পরিবার পরিচিত হইত এবং বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারও কোন কোন ক্ষেত্রে মাতৃকুল ধরিয়াই চলিত। এই কারণে ম্যাক আইভার মাতৃশাসিত পরিবারের বদলে মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার (maternal family) বলা সঙ্গত মনে করেন। মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারের নিম্নোক্ত একটি বা উভয় বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে। (১) বংশ পরিচয় পিতার দিক হইতে না টানিয়া মাতার দিক হইতে টানা হইতে পারে ইহাকে মাতৃপরিচায়ী (matrilineal) পরিবার বলা হইয়া থাকে। (২) বিবাহোত্তর জীবনে পতি পত্নীর পরিবারভুক্ত হইয়া বসবাস করিতে পারে এবং স্বভাবতই তাহাদে

1 রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ত্রয়োদশ খণ্ড। পৃঃ ১৬

সন্তানসন্ততি মাতামহীর আলয়ে প্রতিপালিত হয়। সুতরাং ইহাকে পরিবারের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাকে matrilocal residence বা পত্নী-আবাসিক পরিবার বলা হয়।

পৃথিবীর সর্বত্র পিতৃশাসিত পরিবারের বহুল প্রচলন দেখা যায়। পিতৃ-কর্তৃত্ব ছাড়াও এই প্রকার পরিবারের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। (১) পিতৃশাসিত পরিবারে বংশপরিচয় পিতার দিক হইতে টানা হয়। ইহাকে (patrilineal) বা পিতৃপরিচায়ী পরিবার বলা হয়। (২) বিবাহোত্তর জীবনে পত্নী তাহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করে। ইহাকে patrilocal residence বা পতি-আবাসিক পরিবার বলা হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তিকে দুইটি পরিবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করা যায়। যে পরিবারে তাহার জন্ম এবং যেখানে সে আশৈশব প্রতিপালিত হয়, ইহাকে তাহার family of orientation অথবা পালয়িতৃ পরিবার বলা হয়। আবার বিবাহের পর সে যখন পৃথক পরিবার গঠন করে এবং সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়, সেই পরিবারকে family of procreation অথবা জন্মদাতৃ পরিবার বলা হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, পালয়িতৃ পরিবার এবং জন্মদাতৃ পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া পরিবারকে দুইটি জাতিরূপে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় যৌথ পরিবার (joint or extended family) এবং অপরটিকে বলা হয় দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার (conjugal or nuclear family)।

যখন নববিবাহিত দম্পতি পৃথকভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা না করিয়া স্বামী বা স্ত্রীর পালয়িতৃ পরিবারের অংশ হিসাবে বসবাস করে তখন এই ব্যবস্থাকে যৌথ পরিবার প্রথা বলা হইয়া থাকে। যেখানে পতি-আবাসিক পরিবারের রীতি প্রচলিত, সেই সমাজে নববিবাহিত দম্পতি স্বামীর পালয়িতৃ পরিবারের অংশ হিসাবে এবং পত্নী-আবাসিক পরিবারের নিয়ম প্রচলিত থাকিলে তাহারা স্ত্রীর পালয়িতৃ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করে।

যখন নববিবাহিত দম্পতি তাহাদের উভয়ের পালয়িতৃ পরিবার পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বসবাস (neolocal residence বা স্বয়ম্-আবাসিক পরিবার) করিবার ব্যবস্থা করে, তখন সেই পরিবারকে দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার বলা হয়।

সাধারণতঃ কৃষি-ভিত্তিক গ্রাম-সমাজে যৌথ পরিবার প্রথার প্রচলন বেশি। পক্ষান্তরে, শিল্প-ভিত্তিক নগর-সমাজে দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার প্রথার বেশি প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। উভয় প্রকার পারিবারিক প্রথার মধ্যে গঠন-প্রণালী (structure) এবং ক্রিয়াকলাপের (functions) দিক হইতে পার্থক্য আছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমাজে পরিবারের ভূমিকা

কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমাজে সাধারণতঃ পরিবারের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও দায়দায়িত্ব এবং সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্মকে কেন্দ্র করিয়া পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠে। পরিবারভুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ হয় চাষ আবাদ সংক্রান্ত কাজকর্ম, নতুবা বস্ত্র বয়ন ও সীবন, নতুবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রস্তুত, অথবা বাসস্থান মেরামত প্রভৃতি নানাবিধ কার্যাদি লইয়া ব্যস্ত থাকে। এই প্রকার পরিবারের পুরুষেরা সাধারণতঃ বাহিরের কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকে এবং মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-ভিত্তিক পরিবারে লোক সংখ্যা-বেশি হওয়ার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। কারণ, চাষ আবাদে অধিক সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। দুইটি উপায়ে এই প্রয়োজন মিটিতে পারে। একটি উপায় হইল বংশবৃদ্ধি করিয়া কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এইজন্য কৃষি-ভিত্তিক পরিবারে সন্তানের সংখ্যা সাধারণতঃ বেশি হয়। দ্বিতীয় উপায় হইল, দুই বা ততোধিক পুরুষের (generation) একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করা। এই কারণে, কৃষি-ভিত্তিক পরিবারে যৌথ পরিবার প্রথার প্রচলন বেশি। ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় পরিবারের উল্লম্বী সম্প্রসারণ (vertical expansion) ঘটে। আবার কোন কোন কৃষি-ভিত্তিক সমাজে (যেমন, চীন দেশে) নিকট বা দূর সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের পরিবারে আসিয়া বাস করার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পরিবারের পার্শ্বিক সম্প্রসারণ (lateral expansion) ঘটিয়া থাকে। উভয় প্রকার সম্প্রসারণের ফলে কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ, কৃষি-ভিত্তিক পরিবারে স্ত্রীব গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা থাকায় বিবাহের পাত্রী নির্বাচনে গৃহস্থালী কাজকর্ম করার দক্ষতা বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। পাত্রী নির্বাচনে প্রেম বা ভালবাসার স্থান অতি নগণ্য বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, পাত্র নির্বাচনে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা থাকা বা না-থাকা একমাত্র বিবেচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

চতুর্থতঃ, কৃষি-ভিত্তিক পরিবারকে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করিতে হয় বলিয়া কাহারও পক্ষে পারিবারিক নেতৃত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ পুরুষদের উপর এই নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়।

উপরোক্ত কারণে এবং মেয়েদের আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করার সম্ভাবনা না থাকায় পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষমতা এবং মর্যাদা অনেক সীমিত এবং সঙ্কুচিত হয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গণতন্ত্র-সম্মত সমতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে না। অধিকাংশ পারিবারিক বিষয়ে স্বামীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হয়।

পঞ্চমতঃ, কৃষি-ভিত্তিক পরিবার ভূমি-কেন্দ্রিক হয় বলিয়া পরিবারস্থ লোকদের ভৌগোলিক সচলতা হ্রাস পায়। ইহার ফলে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা সাধারণতঃ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে না। পরিবারের সুনাম বা দুর্নাম দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের মর্যাদা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরিবার ব্যক্তিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, অমুক পরিবারের

ছেলে বা মেয়ে হিসাবে সে সমাজে পরিচিত, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে নহে। অতএব কৃষি-ভিত্তিক গ্রাম-সমাজে সামাজিক পরিচিতি সাধারণতঃ স্বকীয় গুণ দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হয় না, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পরিচিতিই প্রাধান্য পায়।

কৃষি-ভিত্তিক পরিবারকে এত বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করিতে হয় যে, ইহাকে একটি ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় (miniature community) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

কৃষি-ভিত্তিক পরিবারের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব ও কাজকর্মের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, নানা প্রকার উৎপাদনকর (productive) ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করিয়া পারিবারিক কাঠামো গড়িয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-ভিত্তিক পরিবারের অনেক রকম নিরাপত্তামূলক (protective) দায়দায়িত্ব রহিয়াছে। বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য পরিবারস্থ কেহ কাজ করিতে অপারগ হইলে তাহার ভরণপোষণের দায়িত্ব পরিবারের উপর ন্যস্ত হয়। তাহা ছাড়া, অসুখবিসুখে সেবা-শুশ্রূষা করার ভারও পরিবারকেই বহন করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, কৃষি-ভিত্তিক পরিবারের লোকজন বেশি সময় গৃহের বাহিরে থাকে না বলিয়া পরিবারস্থ শিশুরা অগ্রজদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে 'মানুষ' হয়। ইহার ফলে তাহারা সমাজে প্রচলিত আচরণবিধি এবং মূল্যবোধ খুব সহজে এবং স্বচ্ছন্দে আয়ত্ত করিতে পারে। তাহা ছাড়া, শিশুর হাতেখড়ি, অক্ষর-পরিচয় এবং অন্যান্য সব প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা পরিবারেই করা হয়।

চতুর্থতঃ, কৃষি-ভিত্তিক পরিবারে আমোদ-প্রমোদ এবং অবসর যাপনের ব্যবস্থাদি সাধারণতঃ পরিবারস্থ লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। ইহার কারণ হিসাবে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। (ক) পরিবারস্থ লোকজনের সংখ্যা বেশি থাকায় পরিবারের মধ্যেই অবসর-যাপনের ব্যবস্থাদি করা সম্ভব হয়। (খ) ভৌগোলিক সচলতা কম থাকায় পরিবারস্থ সব বয়সের লোকজন একই সঙ্গে অবসর অতিবাহিত করে। (গ) সাধারণতঃ গ্রাম-সমাজে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিনোদনের কোন ব্যবস্থা থাকে না। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য অবসর-যাপন এবং বিনোদনের ব্যবস্থা পরিবারকে করিতে হয় এবং করা সম্ভব হয়।

উপরন্তু, পরিবারের যে-সব স্বাভাবিক কাজকর্ম রহিয়াছে তাহাও কৃষি-ভিত্তিক পরিবারকে করিতে হয়। অতএব সমাজস্থ লোকের অধিকাংশ প্রয়োজন পরিবারের মাধ্যমে চরিতার্থ হয় বলিয়া কৃষি-ভিত্তিক পরিবারকে ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

একটা সময় ছিল যখন উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত পরিবারই পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে এই জাতীয় পরিবার দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে বলা যায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে এই পরিবর্তনের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল।

কৃষি-ভিত্তিক পরিবারের পরিবর্তনের কারণ

পরিবারের সংজ্ঞা আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, ইহাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত গৃহের সঙ্গে তুলনা করিলে ভুল করা হইবে। সংজনন এবং সন্তান-সন্ততির লালন-পালন সংক্রান্ত কাজকর্মকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে স্নেহ এবং ভালবাসা বিজড়িত যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে পরিবারের ভিত্তি। সুতরাং পাবিবারিক জীবন বলিতে এক প্রকার সামাজিক সম্পর্ক এবং আচরণ বুঝায়। নানা কারণে যখন সমাজ-জীবনের অন্যান্য সম্পর্কে এবং আচার-আচরণে পরিবর্তন ঘটে, তখন এই পরিবর্তন পারিবারিক জীবনেও প্রতিফলিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। তাহা ছাড়া, সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া পরিবারেরও যদি পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে অনেক বিষয়ে পরিবার-গঠনেব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতে পাবে। কাজেই ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিযাছে বলিয়াই কৃষি-ভিত্তিক পরিবারেও ব্যাপক পরিবর্তন হইয়াছে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমবা কয়েকটি সামাজিক ঘটনার উল্লেখ কবিতে পারি যাহা পরিবারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিযাছে।

সর্বাগ্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি এবং শিল্পায়নের উল্লেখ করিতে হয। পরিবারের উপর এই পবিবর্তনের প্রভাব তিন দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। (ক) যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং স্থানে স্থানে কলকারখানা স্থাপিত হয়। জীবিকার সন্ধানে পরিবারস্থ লোকেরা বিভিন্ন কলকারখানায় কাজে যোগ দেয়। ইহার ফলে পরিবারস্থ লোকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে এবং পারিবারিক ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিও স্বভাবতই হীনবল হয়। অপরপক্ষে, কৃষি-ভিত্তিক পরিবারে পরিবারস্থ লোকেরা চাষ আবাদের কাজে এবং অন্যান্য উৎপাদনকর ক্রিয়াকলাপে একসঙ্গে যুক্ত থাকায় পারিবারিক বন্ধন স্বভাবতই অনেক বেশি সুদৃঢ় হওয়ার অবকাশ থাকে। (খ) কলকারখানায় কাজ করার পারিশ্রমিক টাকা পয়সায় দেওয়া হয় বলিয়া পরিবারস্থ প্রত্যেক উপার্জনকারী ব্যক্তি যার যার আয় সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে এবং ক্রমশঃ নানা কাজকর্মে এবং আচার-আচরণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাইতে থাকে। যৌথ পরিবারের ভিত্তি স্বভাবতই ধীরে ধীরে হীনবল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, কৃষি-ভিত্তিক পরিবারে একই সূত্র হইতে পরিবারের আয় সংগৃহীত হয়; কাহারও পৃথক রোজগার বলিয়া কিছু থাকে না। এই অবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিবার অবকাশ নাই বলিলেই চলে। (গ) শিল্পায়নের ফলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হয় এবং মেয়েদের উপযোগী কাজ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। সুতরাং আর্থিক বিষয়ে পুরুষের উপর মেয়েদের নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, কৃষি-ভিত্তিক গ্রাম-সমাজে মেয়েদের আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা সম্ভবপর নয় বলিয়া পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় তাহাদের প্রতিপত্তি এবং মর্যাদা অত্যন্ত সীমিত।

দ্বিতীয়তঃ, পরিবারের উপর নগরায়নের প্রভাবও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দিক হইতে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায়। (ক) নগর-সমাজে বাসস্থানের অকুলান হওয়ায় অধিক সংখ্যক লোকের একত্র বসবাস করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং অন্য সব দিকে একান্নবর্তী পরিবারের পরিবেশ অনুকূল হইলেও কেবল পর্যাপ্ত স্থানাভাবে ইহাকে টিকাইয়া রাখা সম্ভব হয় না। (খ) নগর-সমাজে অল্প পরিসর স্থানে অধিকসংখ্যক লোক সমবেত হওয়ার ফলে বিনোদন, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভিত্তিতে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং করা সম্ভবপর হয়। কাজেই নগর-পরিবারের কাজকর্মের পরিধিও স্বভাবতই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। (গ) নগর-পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কর্মব্যপদেশে দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাহিরে কাটাইতে হয়। যে-সব ক্ষেত্রে মহিলারাও বাহিরে কাজ করেন তাঁহাদেরও দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাহিরে থাকিতে হয়। এই অবস্থায় শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব পরিবারকে বাধ্য হইয়া বাহিরে অন্যের উপর অর্পণ করিতে হয়। (ঘ) নগর-সমাজে নৈর্ব্যক্তিক এবং অজ্ঞাত থাকিয়া জীবন-যাপন করা সম্ভব বলিয়া সমাজস্থ লোকদের পক্ষে প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, পরিবারস্থ লোকজন প্রচলিত রীতি-নীতি প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন বা বর্জন করিতে সাহসী হয়। ইহার ফলে পারিবারিক আচার-আচরণে এবং পারস্পারিক সম্পর্কে নানারকম পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে সাম্যের আদর্শ সমাজের সর্ব স্তরে কিছু-না-কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পরিবারও এই প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না। বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কে সাম্য-নীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। পূর্বে স্বামী বা পিতা পারিবারিক বিষয়ে যে আধিপত্য বা কর্তৃত্ব ভোগ করিতেন, তাহা সব সমাজেই অনেক হ্রাস পাইয়াছে। অনেক কারণে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার সম্প্রসারণ অন্যতম কারণ।

চতুর্থতঃ, বিজ্ঞান-চর্চা এবং নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পারিবারিক ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, পূর্বে প্রায় সব সমাজেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অ-ধর্মীয় কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই মনোভাব পরিবর্তিত হইতেছে এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পারিবারিক আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি- পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যদিও উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে পারিবারিক কাঠামো ও কার্যাবলীর পরিবর্তনের কারণ হিসাবে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু এই কারণগুলি পর্যাপ্ত নহে এবং সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হইতে পারে। উপরে বর্ণিত কারণ ছাড়াও অন্যান্য নানাপ্রকার কারণে পরিবারের গঠনে ও কার্যাবলীতে পরিবর্তন হইতে পারে। কাজেই পরিবার-

পরিবর্তনের কোন সাধারণ তত্ত্বের (theory of family change) অবতারণা করা সম্ভব নহে।

শিল্প-ভিত্তিক নগর-সমাজে আধুনিক পরিবার

কি কি কারণে পরিবারে পরিবর্তন ঘটে বা ঘটিতে পারে অথবা কোন্ কারণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্ কারণ কম গুরুত্বপূর্ণ, এই সব বিষয়ে মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে। কিন্তু কাল প্রবাহে পরিবারেব যে পরিবর্তন ঘটিযাছে এবং পরিবর্তনের গতি অব্যাহত আছে, ইহা অনস্বীকার্য। আমরা এই পরিবর্তনকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করিতে পারি। প্রথমটি হইল পারিবারিক কাঠামো-সম্পর্কিত পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়টি হইল পরিবারের কাজকর্ম-সম্পর্কিত পরিবর্তন।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাঠামো-সম্পর্কিত পরিবর্তন নিম্নে বিবৃত করা হইল। প্রথমতঃ, যৌথপরিবারপ্রথা ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহার স্থলে দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। যদিও নগর-সমাজে এই প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু গ্রাম-সমাজেও অনুরূপ পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। ইহা বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না যে, ভবিষ্যৎ পারিবারিক কাঠামো দম্পতি-কেন্দ্রিক হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পরিবারের সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, বিশেষ করিয়া নগর-পরিবারে। পূর্বে স্বেচ্ছাকৃতভাবে পরিবার বড় রাখিবার চেষ্টা করা হইত। বর্তমানে স্বেচ্ছাকৃতভাবে পরিবার সীমিত রাখিবার চেষ্টা করা হয়। তৃতীয়তঃ, পুরুষের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পাওয়ায় মেয়েদের প্রতিপত্তি এবং মর্যাদা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইযাছে। চতুর্থতঃ, পারিবারিক সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করিয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে এবং পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্কে। পূর্বে পরিবারের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার খাতিরে পরিবারস্থ লোকজন বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের আদেশ শিরোধার্য করিয়া চলিত। অগ্রজ-অনুজের পারস্পারিক সম্পর্কে ইহা প্রতিফলিত হইত। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও এই ধারা লক্ষ্য করা যাইত। কিন্তু বর্তমান কালে নানাবিধ পারিবারিক সম্পর্ক সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পারিবারিক বিষয়ে প্রত্যেকেরই কিছু বলার থাকিতে পারে এই নীতি মোটামুটিভাবে সর্বজনস্বীকৃত। পরিবারস্থ সন্তানদের সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটা উক্তি করা হইত যে, children are to be seen and not heard, বর্তমান কালের পারিবারিক সম্পর্ক লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এই মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে। আবার বিবাহিত কন্যার প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠদের উপদেশ হইল :

সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা
সা ভার্যা যা প্রজাবতি।
মনোবাক্ কর্মভিঃ শুদ্ধা
পত্যাদেশানুবর্তিনী ॥ (ব্যাস-সংহিতা)

অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যাকে যে-সকল উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে দুইটি উপদেশ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক হইতে প্রাসঙ্গিক। বলা হয়, যে-নারী পতি-গত প্রাণা এবং পতি যাহা আদেশ করেন যিনি সর্বদা তাহা মানিয়া চলেন, তিনিই প্রকৃত ভার্যা। কিন্তু আধুনিক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্কের মত। পারিবারিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা এবং মতামত বিনিময় করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার রীতিই উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক পরিবারে স্ত্রীকে 'পত্যাদেশানুবর্তিনী' বলিয়া বর্ণনা করিলে প্রকৃত চিত্রটি তুলিয়া ধরা হয় বলিয়া মনে হয় না। পঞ্চমতঃ, আধুনিক পরিবারে স্থায়িত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এবং ভারতবর্ষে নগরাঞ্চলে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার যে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইতে উল্লিখিত পরিবর্তনের গতি সুস্পষ্টভাবে ধরা যায়।1

পরিবারের কাজকর্ম-সম্পর্কিত পরিবর্তন যাহা ঘটিয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইল। প্রথমতঃ, পরিবারের চিরাচরিত (traditional) কাজকর্মের গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আধুনিক পরিবারের কোন উৎপাদনকর কার্য নাই বলিলেই চলে। পরিবারস্থ লোকেরা একত্র খাওয়া-পরা ছাড়া অন্য কোন অর্থনৈতিক কাজ পরিবার হিসাবে একত্র করেন না। উপার্জনকারী ব্যক্তিগণ বাহিরে যে যাহা আয় করেন, তাহাই সংসারে খাওয়া-পরায় ব্যয় হয়। সেইজন্য আধুনিক পরিবার সম্পর্কে বলা হয় যে, ইহা production-unit না থাকিয়া বর্তমানে কেবল consumption-unitএ পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক পরিবার শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজকর্মও করে না। কারণ, সময়ের অভাবে পিতা-মাতা সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কোন কিছু করার অবকাশ পান না। তাহা ছাড়া, আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল রাখিয়া কালোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিতে অধিকাংশ পিতামাতাই অসমর্থ। সুতরাং তাঁহারা নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন, প্রাইমারী স্কুল প্রভৃতি শিক্ষায়তনে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছেলে-মেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সমীচীন মনে করেন। তৃতীয়তঃ, আধুনিক পরিবার নিরাপত্তামূলক (protective) কাজকর্মও বিশেষ করে না। যেমন, চিকিৎসা। ইহার একটি কারণ হইল জনবল এবং সময়ের অভাব। অপর কারণ, হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সু-চিকিৎসার সম্ভাবনা। আবার সামাজিক নিরাপত্তার (social security) ব্যবস্থা করা আধুনিক রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থতঃ, বর্তমান কালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিভিন্ন বয়সোপযোগী বিনোদনের ব্যবস্থা থাকায় অবসর-যাপনের ক্ষেত্রে পরিবারের কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। উপরোক্ত অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম ছাড়া আরও নানারকম কম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যগত কাজ আধুনিক পরিবার করে না। যেমন, কাপড়-চোপড় কাচা,

1 দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

সুস্বাদু ও শৌখীন আহার্য বস্তু প্রস্তুত করা, সাধারণ জামা-কাপড় সেলাই করা প্রভৃতি কাজ গৃহস্থালী কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। গৃহের বাহিরে বিভিন্ন সংস্থার উপর পরিবার ক্রমশঃ নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে।

আধুনিক পরিবারের কাজকর্ম উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হওযার বিষয় আলোচনা করিয়া ম্যাক আইভার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন যে, বর্তমান কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ (specialisation) প্রাধান্য পাইলেও পরিবারকে তিনটি প্রয়োজনীয় দাযিত্ব পালন করিতেই হইবে এবং অন্য কোন সংস্থার পক্ষে এই তিনটি দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। সন্তানের জন্মদান এবং তাহাকে প্রতিপালন করা পরিবারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এই দায়িত্ব অন্য কোন সংস্থার (agency) পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইযা পরিবার গঠন করিলেই বিবাহিত দম্পতির পক্ষে সমাজের দাবি উপেক্ষা না করিযা এবং সমাজানুমোদিত পন্থায যৌন বাসনা চরিতার্থ করা সম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, পরিবার গঠন করিলে মানুষের পক্ষে স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভূতি-বিজড়িত বাসস্থান (home) রচনা করা সম্ভব। মানুষের স্বভাব এমন যে, সে কেবল আশ্রয় পাইলেই সন্তুষ্ট হয় না।। সে নিবিড় স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হইযা বসবাস করিতে চায। একমাত্র পাবিবাবিক সম্বন্ধাদিতে তাহার আকাঙ্ক্ষা চবিতার্থ হইতে পারে। উপরন্তু, স্নেহ, ভালবাসা এবং নিরাপত্তা-বোধের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয। সেইজন্য আধুনিক মনোবিদগণের মতে, শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য পরিবারের অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা হইতে পারে না।

আধুনিক ভারতীয় পরিবার

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান দেশ। সুতরাং সারা পৃথিবীতে কৃষি-ভিত্তিক গ্রাম-সমাজে যে ধরনের পরিবার ছিল এবং এখনও কোন কোন সমাজে আছে, ভারতবর্ষে আবহমান কাল হইতে সেইপ্রকার পরিবার প্রচলিত আছে। বহিরাকৃতির দিক দিয়া ইহাকে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার বলা হয়। কাজকর্মের দিক দিয়া ইহাকে মোটামুটি স্বযংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্রাকার সম্প্রদায় বলা যায। কারণ, খাওয়া-পরা, সেবা শুশ্রূষা, শিক্ষা, অবসর-যাপন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা ইহার কার্যাবলীর অন্তর্গত।

অন্যান্য সমাজের ন্যায় ভারতীয় সমাজেও শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাবে একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। নগরাঞ্চলে এই পরিবর্তনের লক্ষণ সুস্পষ্ট। তবে এই পরিবর্তন কতটুকু ব্যাপক ইহা সঠিক বলা, এমন কি অনুমান করাও, কঠিন। কারণ, আজ পর্যন্ত বিস্তৃত পরিধির মধ্যে নির্ভরযোগ্য কোন সমীক্ষা করা হয় নাই। সেইজন্য সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় নানারকম পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। যেমন, গুড্

তাঁহার পুস্তকে 1 মন্তব্য করিয়াছেন, "......it is not surprising, then, that surveys over the past decade show that a majority of Indian families live in nuclear households......." আবার কাপ্ (K. William Kapp) তাঁহার Hindu Culture, Economic Developmemt and Economic Planning in India নামক পুস্তকে ভারতবর্ষে পারিবারিক গঠন সম্পর্কে লিখিতে গিয়া বলেন : "It is often believed that the number of joint families in relation to nuclear families is declining especially under the impact of urbanisation. However, such limited data as are available on this subject seem to refute this belief. Thus, it has been found that the joint family structure is not disintegrating and that there are almost as many joint families in urban areas as in rural areas."2 এই ধরনের পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আনা সম্ভবপর নহে। আসল কথা হইল, ভারতবর্ষ বিরাট জনবহুল দেশ। আয়তনে ইহা উপমহাদেশ সদৃশ। এখানে বিচিত্র বর্ণ এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য সুবিদিত। এই অবস্থায় কোন সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে সমীক্ষা চালাইলে যে তথ্য সংগৃহীত হইবে তাহাতে সেই অঞ্চলের রূপটি প্রতিফলিত হইলেও সমগ্র দেশের প্রকৃত রূপটি প্রতিফলিত না-ও হইতে পারে। কাজেই ভারতবর্ষে পরিবার সম্পর্কে বর্ণ, ধর্ম, বৃত্তি, অঞ্চল (region) এবং গ্রাম-সমাজ ও নগর-সমাজকে ভিত্তি করিয়া পৃথক পৃথক সমীক্ষা না চালাইলে বর্তমান ভারতবর্ষে একান্নবর্তী পরিবারের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব নহে।

তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, একান্নবর্তী পরিবারের ভিত্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। শিল্প-ভিত্তিক নগর-সমাজে আধুনিক পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় যৌথপরিবার প্রথা ভাঙিয়া যাওয়ার অনেকগুলি কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এই সব কয়টি কারণই প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া, এই দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, বর্তমান কালে পিতা বা অন্য কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির আদেশ বা নির্দেশ বিনা দ্বিধায় বা বিনা তর্কে গ্রহণ করার মত মনোভাব অনুজদের মধ্যে দেখা যায় না। সমাজ যত বেশি জটিল হইবে, এই মনোভাব তত বেশি শক্তিশালী হইবে। যেমন, দেশে প্রযুক্তি বিদ্যার সম্প্রসারণ ঘটিলে এবং দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের প্রচলন বৃদ্ধি পাইলে, অনেক পারিবারিক সিদ্ধান্ত

1. William J. Goode : The Family. Page 50.
2. K. William Kapp : Hindu Culture, Economic Development, and Economic Planning in India. Asia Publishing House. 1963. Page 28.

গ্রহণ করিতে কারিগরি জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে। এই অবস্থায় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আদেশ বা নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়াই তাহা শিরোধার্য করিতে হইবে, এই যুক্তি অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, দেশে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে। ইহার ফলে ভৌগোলিক সচলতা এবং সামাজিক সচলতা উভয়ই যুগপৎ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং একান্নবর্তী পরিবারের সংহতি দুর্বল হইবে, ইহা স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা যত বিস্তৃতি লাভ করিবে, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির জন্য একান্নবর্তী পরিবারের উপর নির্ভরশীলতা তত হ্রাস পাইবে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অনুমান করা অমূলক হইবে না যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে একান্নবর্তী পরিবারের তুলনায় দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার প্রাধান্য পাইবে। তবে পরিবৃত্তিকালে (transition pcriod) দম্পতি-কেন্দ্রিক পবিবারেও একান্নবর্তী পরিবারের নানা বৈশিষ্ট্য জড়িত থাকা বিচিত্র নহে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাক, কোন একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত চার ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাই গ্রামের বাড়ীতে থাকিয়া চাষ-আবাদ এবং জমিজমা দেখাশুনা করেন। বাকি দুই ভাই একই সহরে আপিসে কাজ-কর্ম করেন এবং পৃথগন্ন থাকেন। তাহারা বিবাহ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে দেশের বাড়ীতে যান এবং সেখানে একান্নবর্তী পবিবারভুক্ত হইয়াই বাস কবেন। অনেক সময় দেশের বাড়ীতে বিগ্রহ পূজা বা এই জাতীয় অন্য কোন উদ্দেশ্যে মাসিক তাহাদের দেয় টাকা মনি অর্ডার করিয়া পাঠান। এই উদাহরণে সহরের দুই ভাই দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার প্রতিষ্ঠা করিলেও একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। আবার সহরে যাহারা একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করেন, তাহাদের জীবন-যাপনে নানাপ্রকার দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেক ভাইয়ের প্রদত্ত অর্থ একত্র করিয়া দুই বেলার খাওয়া, দুই বেলার জলখাবার, বাড়ী ভাড়া, ইলেকৃট্রিক খরচ, ঝি-চাকরের মাহিনা প্রভৃতি বাবদ ব্যয় সঙ্কুলান করা হয়। কিন্তু প্রত্যেক ভাইকে যার যার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী এবং নিজের পোষাকপরিচ্ছদ, পড়াশুনা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি বাবদ ব্যয় পৃথকভাবে বহন করিতে হয়। এমন কি, কোন ভাইয়ের অতিথি আসিলে আতিথ্যদান বাবদ ব্যয় পৃথকভাবে করিতে হয়। চিকিৎসাদি সংক্রান্ত ব্যয়ও প্রত্যেকের আলাদা। আজকাল নগর-সমাজে এইপ্রকার পরিবারের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। এইভাবে একান্নবর্তী পরিবার দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবারে পরিবর্তিত হইবার সময় আরও নানারকম বৈচিত্র্য দেখা যাইতে পারে।

পরিবারের ভবিষ্যৎ

বিগত এক শতাব্দীতে শিল্পায়নের ফলে সমাজ-জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন

ঘটিয়াছে এবং এখনও এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত আছে। পরিবারও এই পরিবর্তনের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। আকৃতি, প্রকৃতি এবং কাজকর্মের দিক হইতে পরিবারে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, শিল্পায়ন এবং নগরায়ন এত দ্রুত হারে প্রসার লাভ করিতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে পরিবারে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। পরিবার বলিয়া আদৌ কিছু থাকিবে কিনা, এই সম্পর্কেও অনেকে সন্দিহান। ফার্ডিনেণ্ড লুন্ড্বার্গ (Ferdinand Lundberg) The Coming World Transfoımation নামক পুস্তকে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন: "The family is near the point of complete extinction". অর্থাৎ পরিবাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবার মুখে। মনোবিদ উইলিয়াম উল্ফ্ (William Wolf) মন্তব্য করিয়াছেন: "The family is dead except for the first year or two of child raising. This will be its only function". অর্থাৎ শিশু লালন-পালন করার জন্য প্রথম দু'এক বৎসর ছাড়া পরিবারের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আলভিন টফলার (Alvin Toffler) তাঁহার ১৯৭০ সালের সর্বাধিক বিক্রীত পুস্তক Future Shock-এ একটি অধ্যায়ের নামকরণ করিয়াছেন, The Fractured Family. এই অধ্যায়ে অধি-শিল্পায়নের (super-industrialism) যুগে পরিবারের সম্ভাব্য রূপ কি হইতে পারে এই সম্পর্কে নানা প্রকারের কল্পনাপ্রসূত ছবি তুলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি হইল প্রয়োজনানুযায়ী ছাঁটাই করা (streamlined) পরিবারের ছবি। ইহা বর্ণনা করিতে গিয়া টফলার লিখিতেছেন: "Industrialism demanded masses of workers ready and able to move off the land in pursuit of jobs, and to move again whenever necessary. Thus the extended family gradually shed its excess weight and the so-called 'nuclear' family emerged—a stripped down, portable family unit consisting only of parents and a small set of children. This new style family, far more mobile than the traditional extended family, became the standard model in all the indusırial countries Super-industrialism, however, the next stage of eco-technological development, requires even higher mobility. Thus we may expect many among the people of the future to carry the streamlining process a step further by remaining childless, cutting the family down to its most elemental components, a man and a woman"1. অর্থাৎ শিল্পায়ন সমাজকে এত বেশি বেগবান্ এবং চলিষ্ণু করিয়া তোলে যে, লোকজনের ভৌগোলিক সচলতা বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য

1 Alvin Toffler ; Future Shock. Bentam Paper Edition.

হইয়া উঠে। স্বভাবতই বৃহদায়তন পরিবার এইরূপ সচলতার পথে অন্তরায়। সুতরাং যৌথ পরিবার ভাঙিয়া গিয়া দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবারে পরিণত হয়। যৌথ পরিবারের তুলনায় দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবারের সচলতা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় সব শিল্পোন্নত দেশে ইহাই সর্বজনীনভাবে প্রচলিত হয়। কিন্তু আগামী দিনের অধি-শিল্পায়নের যুগে সমাজ-জীবন আরও বেশি বেগবান এবং চলিষ্ণু হইবে। স্বভাবতই আরও দ্রুত হারে সচলতা বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। সুতরাং অধি-শিল্পায়নের দাবি মিটাইতে গিয়া বহুলোক পরিবারকে আরও ছাঁটাই করিতে উদ্যোগী হইবে। ইহার ফলে দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার সন্তান-সন্ততিবিহীন দম্পতি-সর্বস্ব পরিবারে পরিণত হইবে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মার্গারেট মিডও (Margaret Mead) এইরূপ সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরিবারের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে এবং এইসব পরিবারের প্রধান কাজই হইবে সন্তান-প্রজনন এবং সন্তান-প্রতিপালন ("parenthood would be limited to a smaller number of families whose principal functions would be childrearing")। বাকি সব লোকজন সন্তানোৎপাদন এবং সন্তান-প্রতিপালনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া জীবন-যাপন করিবেন ("free to function for the first time in history—as individuals.")।

আবার অনেকের মতে, আগামী দিনে পরিবারের স্বর্ণ-যুগ আসিতেছে। "Entrance into marriage primarily on an affectional basis, the reduction of economic pressures, and the voluntary bearing and rearing of children would appear in the long run to provide the soundest foundation for an enduring family."[1] অর্থাৎ নর-নারীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ এবং ভালবাসার ভিত্তিতেই আগামী দিনের পরিবার গড়িয়া উঠিবে। ফলিত বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন এত বেশি বৃদ্ধি পাইবে যে, পারিবারিক অসচ্ছলতা অতীতের বস্তুতে পরিণত হইবে। তাহা ছাড়া, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিবিধ কলা-কৌশল লোকের আয়ত্তাধীন হওয়াতে কেবল মাত্র ইচ্ছা থাকিলেই দম্পতিকে সন্তানোৎপাদন এবং সন্তান-প্রতিপালন করিতে হইবে। উপরন্তু, বিজ্ঞানের দৌলতে লোকের অবসর বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিবারস্থ লোকজন একত্র থাকিয়া নানাপ্রকার যৌথ কাজকর্মে জড়িত থাকিতে পারিবে। সুস্থ, সুন্দর এবং সুখী দাম্পত্য-জীবন যাপনের আর কি ভাল পরিবেশ হইতে পারে ?

কিছুসংখ্যক মনোবিদ বলেন যে, ভবিষ্যতের জটিল, ঝঞ্ঝা-সঙ্কুল জীবনে মানুষ বাধ্য হইয়া সুখ ও শান্তি পাইবার প্রত্যাশায় পরিবারের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট

1. Anderson and Parker : Society—Its Organisation and Operation Pages 176-177.

হইবে। তাঁহাদের মতে, সমাজ-জীবনের জটিলতা যত বেশি বৃদ্ধি পাইবে, পরিবারের প্রতি মানুষের আকর্ষণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

ভবিষ্যতে পারিবারিক কাঠামো যে কি রূপ নিবে তাহা সঠিকভাবে অনুমান করা কঠিন। হাজার হাজার বৎসরের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া মানব-সমাজ আজ যে-পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে, তাহা অন্ততঃ পাঁচ শ' বা এক হাজার বৎসর পূর্বে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। বর্তমানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা যেভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে অনুমান করিতে কষ্ট হয় না যে ভবিষ্যতে অভিব্যক্তির গতি অনেক বেশি ত্বরান্বিত হইবে। ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, এই অভিব্যক্তির ফলে সমাজ-জীবনে নানারকম বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্ব দেখা যাইবে। অতীতের মত, কোন বিশেষ সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্ককে অনিবার্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে না। অনেক রকম বিকল্প ব্যবস্থা মানুষের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া মনে হয়। সে তাহার প্রয়োজন এবং অভিরুচি অনুযায়ী যে-কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত। সুতরাং কল্পনা অবারিত।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Mac Iver and Page : Society. Macmillan & Co. Ltd. London. 1959. Chapter XI.

২। Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Co. New York. 1961. Chapter XV.

৩। Anderson & Parker : Society-Its Organisation and Operation. Affiliated East-West Press Pvt. Ltd.]

৪। T. B Bottomore : Sociology Unwin University Books. London. 1962. Chapter X.

৫। Worsley and Others : Introducing Sociology. Penguin Books.

৬। Harry M. Johnson : Sociology. Allied Publishers Pvt. Ltd,

৭। William J. Goode : The Family. Prentice-Hall of India (Private) Ltd. New Delhi. 1965. Chapters I, II, III, IV, V, VIII, X.

৮। A. L. Basham : The Wonder That Was India. Fontana Books. Rupa & Co.

৯। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ সমাজ ও বিবাহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা। ১৩৫৩।

১০। ভারতবর্ষীয় বিবাহ নামক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ।

১১। Alvin Toffler : Future Shock. Bantam Paper Back Edition.

১২। K. M. Kapadia : Marriage and Family in India. Third Edition. Oxford University Press.

একাদশ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

বংশরক্ষা করার মত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা সব সমাজেই অগ্রাধিকার পাইয়া থাকে। এই বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকিলে সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এই ব্যবস্থার আকৃতি-প্রকৃতিতে পার্থক্য থকিতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন, সম্বল এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ভরণপোষণের ব্যবস্থা সব সমাজেই আছে। কারণ, সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইহা অপরিহার্য শর্ত। ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইলে সমাজস্থ লোকদের নানারকম উৎপাদনকর (productive) কাজকর্ম করিতে হয়। ফলমূল আহরণ এবং পশুশিকার হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদায়তন কারখানায় খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন প্রভৃতি সব কিছুই উৎপাদনকর কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এইসব উৎপাদনকর কাজকর্মের মধ্যে শ্রমবিভাগ রহিয়াছে। যেমন, অনেক সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কাজের ভাগ থাকে। সাধারণতঃ ভারী কাজ পুরুষরা করে এবং অপেক্ষাকৃত হালকা কাজ মেয়েরা করে। অথবা গৃহস্থালীর কাজ মেয়েদের এবং বাহিরের কাজ পুরুষদের, এইভাবেও স্ত্রী-পুরুষের কাজের ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়। ইহা ছাড়াও, শ্রমবিভাগে আরও বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজস্থ লোকেরা বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত হইতে পারে। কেহ কামার, কেহ কুমোর, কেহ কৃষক, কেহ তাঁতী ইত্যাদি। আবার একই কাজে নানারকম ভাগ করিয়া বিভিন্ন লোককে এক-একটি ভাগে নিয়োগ করা হয়। আধুনিক কল-কারখানার কাজে অনেক সূক্ষ্ম ভাগ নজরে পড়ে। অর্থনীতিবিদগণ উৎপাদনের এই দিকটি লইয়া অনেকরকম আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সব আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু হইল, কি ভাবে শ্রম বিভাগ প্রবর্তন করিলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা নির্ণয় করা। কিন্তু উৎপাদন-ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ সামাজিক সম্পর্ককেও নানাভাবে স্পর্শ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং শ্রমবিভাগ সমাজতত্ত্ববিদেরও বিবেচ্য বিষয়। এই পরিচ্ছেদে সমাজতত্ত্বের দিক হইতে শ্রমবিভাগের বিশ্লেষণ করা হইবে।

ভরণপোষণের ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদনকর কাজকর্ম ছাড়াও আরেকটি বিষয় সম্পৃক্ত রহিয়াছে। ইহা হইল সমাজের বণ্টন-ব্যবস্থা। উৎপাদনের উপায় এবং উৎপন্ন সামগ্রীসমূহ সমাজস্থ লোকদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে বণ্টিত না হইলে সমাজ-জীবনে কলহ এবং আতঙ্ক যুগপৎ বিরাজ করিবে। বণ্টন-নীতি সুনির্দিষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে বাদ-বিসম্বাদ লাগিয়া থাকারই কথা। যেখানে বাদ-বিসম্বাদ থাকে, সেখানে আতঙ্ক থাকা স্বাভাবিক। কাহারও

নিকট কোন সামগ্রী থাকিলে সে নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্ত মনে সেই সামগ্রী ভোগ করিতে পারিবে না। কেহ যদি গৃহের বাহিরে যাইতে ভয় পায় পাছে তাহার ঘর-বাড়ী অন্যের দ্বারা জবর-দখল হয়, তাহা হইলে এই প্রকার সমাজে খাদ্যাভাব এবং অসচ্ছলতা অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবেশে সুস্থ সমাজ-জীবন যাপন করা অসম্ভব। সেইজন্য সম্পত্তি এবং স্বত্বাধিকার (property) সম্পর্কিত ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট এবং ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এই পরিচ্ছেদে স্বত্বসম্পর্কিত বিষয়েরও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কবা হইবে।

শ্রমবিভাগ

আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ যে কত জটিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট আভাষ পিন্ (pin) উৎপাদন সম্পর্কে এডাম স্মিথের (Adam Smith) বর্ণনায় পাওয়া যায়। ১৭৭৬ সালে স্মিথ পিন-উৎপাদনের বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন: "One man draws out the wire ; another straights it ; a third cuts it ; a fourth points it ; a fifth grinds it at the top for receiving the head ; to make the head requires two or three distinct operations ; to put it on is a peculiar business ; to whiten the pins is another ; it is even a trade by itself to put them into the paper ; and the important business of making a pin is, in this manner, divided into about eighteen distinct operations......" পিন্-উৎপাদন সম্পর্কে স্মিথ যে আঠারটি পৃথক পর্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় উৎপাদন এবং উৎপাদনদক্ষতার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সমাজতত্ত্বের দিক হইতে অনেক প্রশ্ন মনে আসে যাহার উত্তর উপরোক্ত বর্ণনায় পাওয়া যায় না। এই বর্ণনায় পিন্ তৈরীর কারখানায় নিযুক্ত কর্মীদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশের উপর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। সমাজ-জীবনে কর্মীদের স্থান কোথায়, তাহারা কোন্ শ্রেণীভুক্ত এই জাতীয় প্রশ্ন লইয়া স্মিথ মাথা ঘামাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, পিন্ তৈরীর কারখানার মালিক কে এবং মালিকের সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক কি, তাহাদের মধ্যে শ্রমবিভাগের আকৃতি কি প্রকারের—এইসব প্রশ্নেরও উত্তর স্মিথের বর্ণনায় পাওয়া যায় না। আসল কথা হইল, স্মিথ সমস্ত ব্যাপারটাকেই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার করিয়াছেন। সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পটভূমিকায় আমরা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমবিভাগের আলোচনা করিতে পারি।

শ্রমবিভাগের সামাজিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিতে হইলে সর্বাগ্রে কার্ল মার্ক্স এবং ডুর্কহেইমের চিন্তাধারার উল্লেখ করিতে হয়। এই বিষয়ে পরবর্তীকালের সব আলোচনাই এই দুইজন পথিকৃৎ-এর বিশ্লেষণ অনুসরণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

মার্ক্স-এর মতে স্বত্বাধিকার এবং শ্রমবিভাগ প্রবর্তনের ফলেই সামাজিক শ্রেণীবিভাগের উদ্ভব হয়। যাহারা বাবু-কাজ (white collar job) করে এবং যাহারা কায়িক পরিশ্রম করে তাহারা ক্রমশঃ দুইটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। আবার যাহারা মূলধন সরবরাহ করিয়া উৎপাদনের কাজে সহযোগিতা করে এবং যাহারা শ্রমিক হিসাবে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত, তাহারা মালিক-শ্রেণী এবং মজুর-শ্রেণীতে বিভক্ত।

মার্ক্স শ্রমবিভাগ আলোচনা করিতে গিয়া বিচ্ছিন্নতা-বোধ (sense of alienation) সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেন। তাঁহার মতে, নিম্নোক্ত দুইটি কারণে বিচ্ছিন্নতা-বোধের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ, শ্রমিককে বাধ্যতামূলক-ভাবে কাজ করিতে হয়। সে স্বেচ্ছায় কাজ নির্বাচন করে না। কাজে যোগ দেওয়াও তাহার ইচ্ছাধীন নহে। প্রত্যক্ষভাবে কাজ তাহার লক্ষ্য নহে, উপলক্ষ মাত্র। অন্যান্য প্রয়োজন চরিতার্থ করিতে হয় বলিয়াই তাহাকে বাধ্য হইয়া কাজ করিতে হয়। সুতরাং কাজে সে আনন্দ পায় না এবং কাজ করিয়া তাহার সৃজনীশক্তিও বিকশিত হয় না। শারীরিক ক্লান্তি এবং হীনমন্যতা এই অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। এইরূপ কাজের প্রতি তাহার বিরূপ মনোভাব (alien character of work) তখনই প্রকাশ পায় যখন আমরা দেখি কাজ করার বাধ্যবাধকতা না থাকিলে সে কাজ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। আবার দেখা যায়, কাজে থাকাকালীন সে যেমন অসহায় বোধ করে, ঠিক তেমনি অবসর সময়ে সে তাহার স্বাভাবিক সত্তা ফিরিয়া পায় (feels himself at home only during his leisure)। দ্বিতীয়তঃ, কাজের প্রতি তাহার বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার আরেকটি কারণ হইল, সে যে-কাজে নিযুক্ত সেই কাজকে সে নিজের বলিয়া ভাবিতে পারে না ; সে অপরের হইয়া অপরের নির্দেশে কাজ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং কর্মরত অবস্থায় সে নিজের সত্তা হারাইয়া সম্পূর্ণরূপে অপরের অধীন হইয়া পড়ে।

মার্ক্স-এর মতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা-বোধ নিবিড়-ভাবে জড়িত। যখন সে আদিম কম্যুনিজম্-এ বাস করিত, তখন এইপ্রকার বিচ্ছিন্নতা-বোধ উদ্ভব হওয়ার কোন কারণ ছিল না। আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংশ হইয়া সমাজতন্ত্রের ভিতর দিয়া যখন কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনও বিচ্ছিন্নতা-বোধ উদ্ভব হওয়ার অবকাশ থাকিবে না। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হইতে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। "In communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticise after dinner,

just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd, or critic."1 অর্থাৎ কম্যুনিস্ট সমাজে কাহাকেও কোন নির্দিষ্ট কাজে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কাজকর্ম নির্বাচন করিয়া লইতে পারিবে। উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় একজনের পক্ষে আজ এক কাজ এবং আগামী কাল অপর কাজ করা সম্ভবপর। এমন কি, সজীব মনের প্রবর্তনায় একজন সকালের দিকে পশু-শিকার, অপরাহ্নে মৎস্য-শিকার, সায়াহ্নে পশুপালন এবং নৈশ ভোজের পর তার্কিক আলোচনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারিবে। সুতরাং কাহাকেও আজীবন শিকারী, ধীবর, পশুপালক অথবা সমালোচক হিসাবে কালাতিপাত করিতে হইবে না।

মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতা-বোধ সম্পর্কিত চিন্তা অনুধাবন করিলে রুশোর চিন্তাধারার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য নজরে পড়ে। প্রথমতঃ, উভয় দার্শনিকই মানুষের স্বাভাবিক ও অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধি, চরিত্রবল ও বিচারশক্তির উপর আস্থাবান ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, উভয়ই এমন একটি অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে মানুষের সত্তা সুসংহত এবং অবিকৃত অবস্থায় ছিল (man was in full possession of his self)। রুশোর নিকট এই অবস্থাটি হইল প্রাকৃতিক পরিবেশ (state of nature) এবং মার্ক্সের নিকট আদিম কম্যুনিজম। তৃতীয়তঃ, উভয় দার্শনিকেরই অভিমত, স্বত্বাধিকার এবং তৎসম্পর্কিত আচার-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠার ফলে মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। চতুর্থতঃ, উভয়ই এই বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, অসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী-বিভাগের ভিতর দিয়া অসহনীয় (oppressive) সমাজ-জীবনের বিকৃত রূপটি প্রকাশ পায়। ইহা সমাজস্থ মানুষের সহজ পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার পথে প্রধান অন্তরায়। পঞ্চমতঃ, উভয়ই বিশ্বাস করেন যে, সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে মানুষের যে স্বাতন্ত্র্য ও অবাধ স্বাধীনতা ছিল, তাহা পরবর্তীকালে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সঙ্কুচিত হইয়াছে। মার্ক্স-এর মতে, ধনতন্ত্রের নাগপাশে পড়িয়া মানুষ তাহার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়াছে। রুশোর মতে, বিবিধ সামাজিক অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাহার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য খর্ব হইয়াছে।

মার্ক্স-এর বিচ্ছিন্নতা-বোধ সম্পর্কিত আলোচনায় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। তাঁহার মতে, ইহা ধনতান্ত্রিক কাঠামো হইতে উদ্ভূত এবং ধনতন্ত্র অবলুপ্ত হইয়া কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হইলে বিচ্ছিন্নতা-বোধেরও অবলুপ্তি ঘটিবে। তাঁহার বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়ায় যে, বিচ্ছিন্নতা-বোধ কেবলমাত্র বুর্জোয়া সমাজের

1. Edited by Lewis S. Feuer : Marx and Engels : Basic Writings on Politics and Philosophy. Garden City : Doubleday Anchor Books. 1959. Page 254. Quoted by Nisbet in his book, The Sociological Tradition, Page 288.

অঙ্গ। সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজে ইহার কোন স্থান নাই, এমন কি শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিলেও নহে। তাহা হইলে সমাজের মালিকানায় এবং পরিচালনাধীনে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিলে গণসমাজের (mass society) বৈশিষ্ট্যগুলি কি প্রকাশ পাইবে না? শিল্প-প্রধান সমাজে কর্মজীবনের প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে-পরিবেশে বিচ্ছিন্নতা-বোধের সৃষ্টি হয় তাহা শিল্প-প্রধান সমাজের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে সম্পৃক্ত।[1] নানা উপায়ে বিচ্ছিন্নতা-বোধের আকৃতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনয়ন করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার অবলুপ্তি হয়ত সম্ভবপর নহে। উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রয়াসে শিল্পে প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার সামাজিক সমস্যারও উদ্ভব হইবে। ইহা হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের জীবনে ইহা বড় একটা ট্র্যাজেডি যে, নির্ভেজাল ভাল পাইবার হয়ত উপায় নাই। আমাদের অমৃতের সঙ্গে গরলও পান করিতে হয়। সমাজতত্ত্ববিদদের কাজ হইল, গরলের পরিমাণ ও তীব্রতা হ্রাস করার পন্থা উদ্ভাবন করা।

মার্ক্স-এর চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে নানা প্রকার সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে। যেমন, বিভিন্ন বৃত্তি এবং বৃত্তি-ভিত্তিক মর্যাদা সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীবিভাগ এবং সামাজিক সচলতা আলোচনা করার সময় এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ডুর্কহেইম্ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমবিভাগের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে শ্রমবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। প্রাক্‌শিল্প-যুগীয় সমাজে জনসাধারণের মধ্যে অভিন্ন কাজকর্ম, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ এবং জীবনাদর্শ থাকার ফলে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইত। তিনি এই প্রকার সংহতিকে যান্ত্রিক সংহতি (mechanical solidarity) আখ্যা দিয়াছেন। যান্ত্রিক বলার তাৎপর্য হইল, এই জাতীয় সংহতি কেবলমাত্র অভ্যাসবলে বজায় থাকে; স্বাধীন ইচ্ছার কোন ভূমিকা থাকে না। কিন্তু শিল্প-সম্প্রসারণের পরবর্তীযুগে লোকের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, কাজকর্ম এবং চিন্তাধারায় নানারকম বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এই পরিবর্তিত পরিবেশে পূর্বোক্ত উপায়ে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ডুর্কহেইম্-এর মতে এই অবস্থায় সামাজিক সংহতি শ্রমবিভাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, শ্রমবিভাগের দরুণ সমাজস্থ লোকদের পরস্পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং ইহাই তাহাদের পারস্পরিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করে। শ্রম-বিভাগের মাধ্যমে যে সংহতি গড়িয়া উঠে, তাহাকে তিনি সাংগঠনিক সংহতি (organic unity) আখ্যা দিয়াছেন।

---

1 এই অধ্যায়ের শেষ দিকে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

তবে সব রকম শ্রমবিভাগের ফলেই যে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা নহে। ডুর্কহেইম্-এর মতে, এমন অনেক শ্রমবিভাগ আছে যাহা সংহতি সুদৃঢ় করার পরিবর্তে সংহতির ভিত্তি দুর্বল করে। এই জাতীয় সংহতিকে তিনি অস্বাভাবিক (abnormal) শ্রমবিভাগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অস্বাভাবিক শ্রম-বিভাগকে আবার দুইটি জাতিরূপে ভাগ করিয়াছেন। একটিকে আখ্যা দিয়াছেন anomic division of labour বা নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ এবং দ্বিতীয়টিকে আখ্যা দিয়াছেন forced division of labour বা বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ।

শ্রমবিভাগজনিত বিশেষীকরণ যদি এমন চরম পর্যায়ে উঠে যে, শ্রমিক সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইযা পড়ে এবং মালিক-শ্রমিকের মধ্যে পাকাপাকিভাবে বিভেদের প্রাচীর গড়িযা উঠে, তাহা হইলে এই প্রকাব শ্রমবিভাগকে নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ বলা যাইতে পারে। এই প্রকার শ্রমবিভাগকে নিঃসঙ্গতাবর্ধক আখ্যা দেওযার তাৎপর্য হইল, যাহারা সামগ্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া সমগ্র কাজটির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে নিযুক্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক কারণেই একঘেঁয়েমি-জনিত বিরক্তি, উৎকণ্ঠা এবং হতাশার উদ্ভব হয। জটিল শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হইবার পূর্বে এই ধরনের মানসিকতা গড়িযা উঠিবার অবকাশ ছিল না। এই বিষয়টি নিস্‌বেট্ (R. A. Nisbet) নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "In his *Division of Labor* he (Durkheim) had noted the virtually inverse relation between the development of culture and human happiness. States of boredom, anxiety, and despair are relatively unknown in primitive or simple society...... In civilisation they mount and, with them, endemic unhappiness"[1]

এইরূপ অস্বস্তিকর অবস্থা হইতে পরিত্রাণেব উপায় হিসাবে ডুর্কহেইম্ দুইটি পন্থার উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল নানারকম বৃত্তিমূলক সমিতি ও সংঘ (professional associations and corporations) প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহাদের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। অপরটি হইল মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে আপস-মীমাংসা বিধানার্থ আলাপ-আলোচনা যাহাতে সম্ভবপর হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। ডুর্কহেইম্ কর্তৃক প্রস্তাবিত উভয় পন্থাই আধুনিক শিল্পোন্নত দেশগুলিতে স্বীকৃতি পাইয়াছে এবং উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে।

যখন শ্রমিকগণ উপায়ান্তর না পাইয়া অনিচ্ছাবশতঃ কোন বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহাকে ডুর্কহেইম বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে, গুণ ও কর্মের এইপ্রকার অসঙ্গতি হইতেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের সূত্রপাত

1 R. A. Nisbet : The Sociological Tradition. Basic Books, Inc., Publishers, New York.

হয়। অতএব এই জাতীয় অসঙ্গতি দূর করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করিয়া এই অসঙ্গতি সীমিত রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ডুর্কহেইম-এর বিশ্লেষণ অনুসরণ করিয়া আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদগণ অনেক রকমের গবেষণা-কার্যে লিপ্ত আছেন। যেমন, উপার্জনের দিক হইতে উচ্চ পর্যায়ের বৃত্তিগুলিতে প্রবেশ করার পথে সাধারণতঃ কি কি প্রতিবন্ধক আছে এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীভুক্ত লোকেরা এই জাতীয় বৃত্তিগুলিতে প্রবেশ করিয়া থাকে প্রভৃতি নানা বিষয়ে মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদগণ অনেক তথ্যানুসন্ধান এবং আলোচনা করিয়াছেন। সমাজ-তত্ত্বের এই শাখাকে Occupational Sociology বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ডুর্কহেইম্-এর চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মজীবন এবং অবসর যাপনের প্রণালী সম্পর্কে অনেক গবেষণা হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে।

সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার

সমাজস্থ লোকেরা যাহা উপার্জন করে অথবা সমাজ-স্বীকৃত উপায়ে যাহা সংগ্রহ করে, তাহার উপর স্বত্ব সমাজ দ্বারা স্বীকৃত হইলে তাহাই সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। স্বত্বাধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে এই বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। প্রথমতঃ, স্বত্বাধিকার বলিতে বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে স্বত্বাধিকারীর অধিকার এবং কর্তব্য উভয়কেই বুঝায়। সমাজস্থ অপর কেহ বিষয়সম্পত্তিতে সমাজ-অননুমোদিত পন্থায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, ইহাই স্বত্বাধিকারীর অধিকার। আবার সমাজ-নির্ধারিত শর্ত মানিয়া বিষয়সম্পত্তি ভোগ করা তাহার কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, স্বত্বাধিকার হস্তান্তরযোগ্য। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের নিকট লাভজনক মনে হইলে স্বত্বাধিকার বিক্রীত হইতে পারে। আবার উত্তরাধিকার সূত্রে ইহা হস্তান্তরিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, মালিকানা আছে বলিয়াই যে বিষয়-সম্পত্তি স্বত্বাধিকারীর ভোগদখলে থাকিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেহ চুরি করিয়া কোন সামগ্রীর ভোগদখল অর্জন করিতে পারে, কেহ সামগ্রীটি ধার লইয়া ভোগ করিতে পারে, আবার কেহ ভাড়া দিয়া বিষয়সম্পত্তির ভোগদখল পাইতে পারে। চতুর্থতঃ, স্বত্বাধিকার বলিতে কেবল শরীরী (tangible) বস্তুর উপর অধিকার বুঝায় না ; অশরীরী বস্তুর উপর অধিকারও বুঝায়। যেমন, ব্যবসায়ে সুনাম ("good will") কেনা-বেচা করা হয়। পঞ্চমতঃ, অনেক সময় স্বত্বাধিকারের সঙ্গে প্রভাববিস্তারের প্রশ্নও জড়িত থাকে। স্বত্বাধিকারের এই দিকটি সমাজতত্ত্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সহজলভ্য নহে এমন সামগ্রীর স্বত্ব কেহ অর্জন করিলে, এই অধিকার তাহাকে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। যেমন, লোককে কর্মে নিয়োগ করিয়া জীবিকার্জনের

সুযোগ-সুবিধা দিবার ক্ষমতা থাকায় ভূস্বামী কিছুসংখ্যক লোকের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম। সেইজন্য সব সমাজেই স্বত্বাধিকার শর্তাধীন রাখা হয়। স্বত্বাধিকারের অর্জন এবং প্রয়োগ আইন অথবা প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সমাজে সাধারণতঃ তিন প্রকার স্বত্বাধিকার প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। প্রথমটি হইল এজমালী সম্পত্তি (common property)। ইহাতে একাধিক লোকের স্বত্ব স্বীকৃত এবং তাহাদের দ্বারা সমভাবে ভোগ্য। দ্বিতীয়টি হইল যৌথ সম্পত্তি (collective property)। ইহাতে আইনবলে গঠিত কোন বেসরকারী যৌথ সংস্থার (private corporation) বা কোন আধা-সরকারী যৌথ সংস্থার (quasi-public corporation) বা সরকারী যৌথ সংস্থার (public corporation) স্বত্ব স্বীকৃত। তৃতীয়টি হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property)। ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব স্বীকৃত।

কখন কাহাদের মধ্যে কি প্রকার স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, তাহা সঠিক বলা কঠিন। তবে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে নৃতত্ত্ববিদগণ যে-সব গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে মোটামুটি যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল।1 যাহাদের জীবিকা শিকার-নির্ভর (hunters) ছিল অথবা যাহারা পশুপালন করিয়া (pastorals) বা অপরিণত পদ্ধতিতে চাষবাস করিয়া (early agriculturists) জীবনধারণ করিত, তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ এজমালী মালিকানার প্রচলন ছিল। চাষবাস করার পদ্ধতি পরিণত হওয়ার সঙ্গে এজমালী নীতিও ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতে থাকে। কিন্তু এজমালী মালিকানা পরিত্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টি মালিকানার উদ্ভব হয় নাই। বরং দেখা যায়, দলপতিগণ এবং তাহাদের পার্শ্বচরবৃন্দ এজমালী সম্পত্তিতে নিজেদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া আপামর জনসাধারণকে পরাধীন চাষীর পর্যায়ে ঠেলিয়া দেয়। এই পরাধীনতার রূপ অবস্থা-বিশেষে পরিবর্তিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ লোককে দাসত্ব বরণ করিতে হয় অথবা ক্রীতদাসবৎ দায়াবদ্ধ কৃষকগিরি (serfdom) করিতে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজারূপে (tenants) জমির ভোগদখল পাইতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কৃষি-পদ্ধতি পরিণতি লাভ করার ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা উত্তরোত্তর ব্যাপ্তিলাভ করিলেও সংশোধিত আকারে এজমালী নীতির প্রচলন ছিল। যেমন, দলপতির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া জমির ভোগদখল আপামর জনসাধারণ লাভ করিত অথবা সামন্ততান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে ভূমির ভোগদখল বণ্টিত হইত। পশুপালকদের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলন বেশি ব্যাপক ছিল। কারণ, গোষ্ঠী-আরোপিত বাধা-নিষেধের কড়াকড়ি কম থাকায় ব্যক্তিগত ভিত্তিতে সম্পত্তি সঞ্চয় করা

1 এই অংশটি মরিস্ গিন্‌স্‌বার্গের স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত আলোচনার অনুসরণে লিখিত। **Morris Ginsberg : Sociology. Pages 181-195.**

অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। মানব-সমাজ যখন ক্রমশঃ বর্বর অবস্থা হইতে সুসভ্য অবস্থায় আসিতেছিল, তখন স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই পরিবৃত্তিকালে (transitional period) ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার এবং এজমালী স্বত্বাধিকারের মধ্যে মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় ছিল। কিন্তু ইহার পরবর্তীযুগে কতিপয় সম্ভ্রান্তবংশজাত লোকের মধ্যেই স্বত্বাধিকার কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে সাধারণ লোক স্বাধীনতা খোয়াইয়া উত্তরোত্তর স্বত্বাধিকারীদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ইহার পর ধীরে ধীরে সামন্তপ্রথা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে সামন্ত প্রথার বনিয়াদ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ধনতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধনতান্ত্রিক কাঠামোর বিভিন্ন দিক লইয়া অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কেও মতভেদ দেখা যায়। তবে একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই মোটামুটি অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, কাল পরিবর্তনের সঙ্গে ধনতন্ত্রের রূপও পরিবর্তিত হইয়াছে। আমরা উপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় দেখিয়াছি যে, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত আচার-ব্যবস্থা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে, পরিবেশের পরিবর্তনজনিত প্রয়োজনের পরিবর্তন হওয়াতে ধনতন্ত্রে অল্প-বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে নানারকম জটিল প্রশ্ন জড়িত। অনেক প্রশ্ন সমাজতত্ত্বের দিক হইতে প্রাসঙ্গিক নহে। এইজন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তনের একটি সরল রূপরেখা প্রদত্ত হইল।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান কিছুসংখ্যক লোকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং আপামর সাধারণ লোক স্বভাবতই এইপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত। ইহার ফলে, সমাজে সুনির্দিষ্ট শ্রেণী-বিভাগের উদ্ভব হয়। সমাজস্থ লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কে এই শ্রেণী-বিন্যাস প্রতিফলিত হয়। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি অর্থপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয়। ধনতন্ত্রের প্রথমাবস্থায় পুঁজিপতিগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগে অনেক সময় পুঁজিপতিগণ নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়া একচেটিয়া কারবারের পত্তন করিতেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা উত্তরোত্তর মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ার দিকে প্রবণতা ছিল। ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠিতে থাকে এবং আইনগত ও প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিয়া ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হয়। সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নানারকম অর্থনৈতিক সংস্থা গড়িয়া উঠে। সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াও একচেটিয়া ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হয়। অপর দিকে, শ্রমিক পক্ষও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে এবং যৌথ দর-কষাকষির মাধ্যমে মালিক পক্ষের নিকট হইতে পাওনা-গণ্ডা যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের প্রয়াস আংশিক সফল

হইয়াছে। সুতরাং ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে-ধনতান্ত্রিক কাঠামো ছিল তাহার সঙ্গে বর্তমান কালের ধনতান্ত্রিক কাঠামোর ব্যাপক প্রভেদ চোখে পড়ে।

অরেকটি পরিবর্তনও লক্ষণীয়। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবাদস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত সমাজতন্ত্র বলিতে কি বুঝায় এই বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। আবার অনেকের অভিমত হইল, উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। এই বাদানুবাদ এখনও চলিতেছে। আসল কথা হইল, ন্যায়-নীতির উপর বিভিন্ন সামাজিক আচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা—এই দুইটি লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই লইয়া বিভিন্ন সমাজে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলিতেছে।

সভ্যতা-বিকাশের পর হইতে মানব-সমাজে সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত আচার-ব্যবস্থায় বিভিন্ন যুগে যে-পরিবর্তন হইযাছে এবং এখনও চলিতেছে সেই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে দেওয়া হইল। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকারের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিকটি লইয়া আলোচনা করিব।

স্বত্বাধিকার সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

কোন সামগ্রী বা সম্পত্তি অর্জন এবং ভোগদখল করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তি কিনা এই বিষয়ে মনোবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে একটা বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ যে, মালিকানা অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা নানা জটিল জালে জড়িত এবং কয়েকটি মৌল প্রয়োজন হইতে ইহা উদ্ভূত। আমাদের নিকট কোন সামগ্রী দুইটি কারণে 'মূল্যবান' বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন কোন সামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রয়োজন মিটায়, তখন সেই সামগ্রীটি আমাদের নিকট স্বভাবতই বিশেষ মূল্যবান। আবার এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রয়োজন মিটায় না, কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজে প্রচলিত মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা আমাদের নিকট মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। যেমন, হীরা বা মুক্তা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোন প্রয়োজনই মিটাইতে পারে না। অথচ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার দরুণ এই প্রকার সামগ্রীর ভোগদখল প্রচলিত মূল্যমান অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। শৈশবাবস্থা হইতে সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত (through process of conditioning or assimilation) হওয়ার দরুণ এই জাতীয় সামগ্রীর প্রতি নানারকম আবেগজড়িত আকর্ষণ গড়িয়া উঠে।

ইহার ফলে সামগ্রীটি না পাইলে আমরা হতাশ হই এবং পাইলে যুগপৎ আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি। অতএব খুব স্বাভাবিক কারণেই উপলক্ষ লক্ষ্যবস্তুতে পর্যবসিত হয় (a tendency to confuse means and ends); সম্পত্তির ভোগদখল লাভ করিলে আমাদের আত্মাভিমান (sentiment of self-regard) চরিতার্থ হয় এবং না পাইলে বিপরীত মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

তুলনামূলক ব্যবহারিক শাস্ত্র (Comparative jurisprudence) হইতে জানা যায় যে, সম্পত্তির ভোগদখল অর্জন করার জন্য তিনটি মূল পন্থা অবলম্বন করা হয়। প্রথমতঃ, প্রকৃতি হইতে সরাসরি কোন বস্তু লাভ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পরিশ্রম করিয়া কোন বস্তু লাভ করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, অপর লোকের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কোন জিনিষের ভোগ-দখল পাওয়া যাইতে পারে। সম্পত্তি অর্জন করার বিভিন্ন পদ্ধতিতে, বিশেষ করিয়া শেষোক্ত পদ্ধতিতে, আত্ম-সাম্মুখ্য (self-assertion) বা নিজেকে জাহির করার প্রবণতা প্রাধান্য পাইয়া থাকে। মানুষ সম্পত্তি বা বস্তু অর্জন করিতে ভালবাসে। কারণ, সম্পত্তি বা বস্তুর সাহায্যে নানারকম প্রয়োজন চরিতার্থ করা সম্ভব হয়। আরেকটি কারণ হইল, অনেকের ক্ষেত্রে ইহাই মুখ্য কারণ, সম্পত্তির মাধ্যমে অপরের উপর আধিপত্য বা প্রভুত্ব করা সম্ভব।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ বা সম্পত্তি অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা নানা কারণে উদ্ভূত হয়। যেমন, মৌল প্রয়োজনের তাগিদ, আত্মাভিমান, আত্ম-সাম্মুখ্য প্রভৃতি। কিন্তু এই কারণগুলি এত নিবিড় ভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত থাকে যে সব সময় এইগুলিকে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয় না।

নীতিগতভাবে বিষয়সম্পত্তি অর্জন করার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল স্বাধীন, উদ্বেগহীন এবং অর্থবহ জীবন যাপন করার অনুকূল পার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন যে, অধিকাংশ লোকের জীবনে এই উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কিত ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্বের মধ্যে এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্বত্বাধিকারের বিবর্তন সম্পর্কে যে-সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে স্বত্বাধিকার উত্তরোত্তর কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং আম-জনতা স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। এই সম্পর্কে আরেকটি বিষয়ও প্রাসঙ্গিক। সামাজিক আচার-ব্যবস্থা হিসাবে স্বত্বাধিকার অর্জন করার ফলে স্বত্বাধিকারী কেবল যে বিষয়বস্তু যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারেন তাহাই নহে। স্বত্বাধিকারের জোরে এবং সাহায্যে তিনি অপর লোকের উপরও আধিপত্য করিতে সমর্থ হন। তাহা ছাড়া, বৃহদায়তন-উৎপাদন-ব্যবস্থায় সূক্ষ্ম শ্রম-বিভাগ প্রবর্তিত হইবার ফলে অধিক-সংখ্যক শ্রমিক সৃজনমূলক কাজ করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহাও তাহাদের অর্থবহ জীবন যাপন করার পথে আরেকটি দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আম-জনতার দিক হইতে বিচার করিলে স্বত্বাধিকারের মুখ্য উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে তাহাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা স্বতস্ফূর্তভাবে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে বিকশিত হইতে পারে না।

অতএব এই দুরূহ সমস্যার সমাধান হইল, অর্থনৈতিক আচার-ব্যবস্থা এমনভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে মুষ্টিমেয় লোক স্বত্বাধিকাবের সাহায্যে অপর ব্যক্তির উপর আধিপত্য না করিতে পারে এবং সর্বসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিকশিত করার অনুকূল পরিবেশ পাইতে পারে।

শিল্প-প্রধান সমাজে কর্মজীবনের প্রকৃতি

সাধারণ লোকের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকশিত করাব অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করিবার সময় শিল্প-প্রধান সমাজেব পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা দবকার। ইহা হইল, কলকারখানায নিযুক্ত কর্মীদের কর্মজীবনের প্রকৃতি। প্রাক্-শিল্পযুগীয় কর্মীদের কর্মজীবনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করিলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

প্রথমতঃ, শিল্প-প্রধান সমাজে কাজ এবং কাজবিহীন অবসবের (non-work) মধ্যে যে-ভাবে পার্থক্য করা হয়, প্রাক্-শিল্পযুগীয় সমাজে তাহা করা হয় না। শিল্প-প্রধান সমাজে কাজ বলিতে লাভজনক চাকরি-বাকরি বা ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত থাকা (gainful employment) বুঝায়। কাজেই কেহ যদি বাড়ীতে ফুলের বাগান করেন বা গৃহকর্ত্রী যদি গৃহসজ্জা সংক্রান্ত কাজকর্ম করেন, তাহা হইলে এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ কাজবিহীন অবসবের পর্যায়ে পড়িবে, যথার্থ অর্থকরী কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কর্মক্ষেত্র এবং বাসগৃহ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হয়। সেইজন্য আমরা বলি, অমুক কাজ হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে। কাজ হইতে মাহিনা বা মজুরী হিসাবে যাহা পাওয়া যায়, তাহা গৃহস্থালীর জন্য, অর্থাৎ পরিবার প্রতিপালনের জন্য, ব্যয়িত হয়।

প্রাক্-শিল্পযুগীয় সমাজে কাজ এবং কাজবিহীন অবসরের মধ্যে অথবা বাসগৃহ এবং কর্মস্থলের মধ্যে এই প্রকার সুনির্দিষ্ট পার্থক্য করা হয় না। চাষ-আবাদের কাজ এবং অন্যান্য সব রকমের কাজকর্ম পরিবারস্থ লোকজন মিলিয়া-মিশিয়া পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্বাহ করে। সুতরাং কেহ কাজ হইতে বাড়ী ফেরে না। বাড়ীতে থাকিয়াই কাজকর্ম সম্পাদন করে। এই পরিবেশে অবসর এবং লাভজনক কাজকর্মের মধ্যে স্বভাবতই কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-প্রধান সমাজে কর্মীগণ সুবিন্যস্ত এবং সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের (organisation) অঙ্গ হিসাবে কাজকর্ম নির্বাহ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এইসব প্রতিষ্ঠানে যুক্তিসম্মত কর্মপ্রণালী (rationalisation) অনুসরণ করা হয়। যথাসম্ভব দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া মুনাফা সর্বাধিক করা যুক্তিসম্মত কর্মপ্রণালীর

উদ্দেশ্য। সুতরাং এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে লৌকিকতাসূচক আনুষ্ঠানিক (formal) সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

অপর পক্ষে, প্রাক্-শিল্পযুগীয় সমাজে যুক্তিসম্মত কর্মপ্রণালীর (rational action) পরিবর্তে চিরাচরিত বা ঐতিহ্যগত কর্মপ্রণালীর (traditional action) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই অবস্থায় সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে (community basis) অথবা প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের (primary group) মাধ্যমে কাজকর্ম সম্পাদিত হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং এই পরিবেশে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক নিয়মবর্জিত (informal) সহজ সরল ধারায় গড়িয়া উঠিবার অবকাশ আছে।

তৃতীয়তঃ, শিল্প-প্রধান সমাজে কাজকর্মে এত সূক্ষ্ম শ্রম-বিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছে যে, শ্রমিকগণ সম্পূর্ণ জিনিষ উৎপন্ন করার যে আনন্দ তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। এই অধ্যায়ে ডুর্কহেইম্-এর নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ আলোচনা করার সময় এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। প্রাক্-শিল্প যুগীয় সমাজে এত সূক্ষ্ম শ্রম-বিভাগ প্রবর্তিত না হওয়ায় শ্রমিকগণ সৃজনমূলক কাজ করার সুযোগ পায়।

উপরোক্ত তিনটি কারণে শ্রমিকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-বোধের (sense of alienation) উদ্ভব হয়। যে বাস্তব পরিবেশে (objective situation) বিচ্ছিন্নতা-বোধের সৃষ্টি হয়, তাহা শিল্প-প্রধান সমাজে বর্তমান। যেমন, কর্মস্থল এবং বাসগৃহের মধ্যে ব্যবধান, কর্ম-জীবন ও অবসর-যাপনের মধ্যে পার্থক্য, কর্মস্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক, সামগ্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে কর্মীর সংযোগহীনতা প্রভৃতি। এই পরিবেশে কর্মীদের মধ্যে স্বভাবতই ধারণা জন্মায় যে, তাহাদের জীবন নানারকম অর্থনৈতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত এবং মূলধন ও প্রযুক্তি-বিদ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাহারা সম্পূর্ণরূপে অসহায় বোধ করে। এইরূপ হতাশা-ব্যঞ্জক মানসিকতাকে বিচ্ছিন্নতা-বোধ বলা হইয়া থাকে।

অনেকের মতে, বিচ্ছিন্নতা-বোধ ধর্মঘট, নানা প্রকার শ্রমিক-মালিক বিরোধ, সুরাসক্তি (alcoholism) এবং অন্যান্য সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের অন্যতম কারণ। সুতরাং এই জাতীয় মানসিকতা যাহাতে গড়িয়া না উঠিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

সেইজন্য বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত হইল যে, কাজকর্ম কেবলমাত্র রুজি-রোজগারের সহায়ক (instrumental) হইলেই হইবে না। ইহা শ্রমিকদের দিক হইতে অর্থপূর্ণ (expressive) হওয়া দরকার। দুইটি বিষয়ে অর্থপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ, শ্রমিকগণ যে-কাজে নিয়োজিত হইবে, সেই কাজে তাহারা যাহাতে আনন্দ পাইতে পারে এবং সৃজনী প্রতিভা বিকশিত করার অবকাশ পায়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কাজটাই যাহাতে অর্থপূর্ণ হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশেষ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মধ্যে যাহাতে লৌকিকতাবর্জিত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া

উঠে, তাহার ব্যবস্থা করার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। কর্মস্থলে এই ধরনের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে বিচ্ছিন্নতা-বোধ বহুলাংশে হ্রাস পাইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। এই বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদদের অভিযোগ হইল যে আধুনিক শিল্প-প্রধান সমাজে রুজি-রোজগারের ('rewards for work') প্রশ্ন প্রাধান্য পাইয়া থাকে। অথচ অর্থপূর্ণ কাজের ব্যবস্থা ('rewards in work') বা কর্মস্থলে সৌহার্দ্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক-স্থাপনের ('rewards at work') চেষ্টা অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থান অধিকার করে। তাঁহাদের মতে শিল্প-প্রধান সমাজের বহু সমস্যা এই ত্রুটি হইতে উদ্ভূত।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Morris Ginsberg : Sociology. Oxford University Press. London. 1961. Pages 181-195.

২। T. B. Bottomore : Sociology. Unwin University Books. London:

৩। Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Co. N. Y. 1961. Chapter XVII.

৪। Peter Worseley & Others : Introducing Sociology. Penguin Books.

৫। Mac Iver and Page : Society. Macmillan & Co. Ltd. London. 1959. Chapter XIX.

৬। Robert A. Nisbet : The Sociological Perspective. Basic Books, Inc., Publishers. New York.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বিধি-শাসিত সমাজের উল্লেখ বহুবার করা হইয়াছে। এই বিধিগুলির প্রকৃতিতে নানাপ্রকার পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একপ্রকার বিধি আছে যাহা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে-সব বিধি প্রচলিত, তাহা শিক্ষা-ক্ষেত্রে অর্থহীন এবং অনাবশ্যক। তাহা-ছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত না হইলে এই জাতীয় বিধি পরিহার করা বা এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব। অধিকাংশ সামাজিক বিধিব এই দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। একটি বৈশিষ্ট্য হইল, সামগ্রিক সমাজ-জীবনে এই বিধিগুলি প্রযোজ্য নহে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, ইচ্ছা করিলে, অর্থাৎ বিশেষ ধরনের কাজকর্ম বা আচার-আচরণ হইতে বিরত থাকিলে, এই বিধিগুলির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা সম্ভব।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিধি হইল ব্যতিক্রম। সমাজের সর্বস্তরে সর্ব ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য এবং রাষ্ট্রে বসবাসকারী কাহারও পক্ষে এই বিধি পরিহার কবা সম্ভবপর নহে। রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত (stateless) হইয়া থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বাস করিলে রাষ্ট্র-আরোপিত কর্তব্য পালন করিতে হয় এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নিষিদ্ধ কাজকর্ম ও আচার-আচরণ হইতে বিরত থাকিতে হয়। কর্তব্য কর্ম না করিলে এবং নিষিদ্ধ কর্ম হইতে বিরত না থাকিলে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শাস্তি প্রদান করিতে পারে। কেবলমাত্র চাপ সৃষ্টি করিয়াই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ক্ষান্ত হয় না। প্রয়োজন হইলে, বল-প্রয়োগ করিতে পারে। এই ক্ষমতা সমাজে অন্য কাহারও থাকে না। রাজনীতিক কর্তৃপক্ষ এই অনন্য ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, সমাজের স্থায়িত্ব ইহার উপর নির্ভরশীল। কোন কারণে কর্তৃপক্ষ এই অনন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হইলে সমগ্র সমাজ-জীবনে এই দুর্বলতার বিষ সঞ্চারিত হয় এবং স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়।

সমাজতত্ত্বের দিক হইতে রাজনীতিক আচার-ব্যবস্থা সম্পর্কিত দুইটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম এমন যে, কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। সেইজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সুসংগঠিত এবং কেন্দ্রীকৃত (centralised) আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন স্বার্থবাহী সঙ্ঘ (interest groups) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে প্রয়াসী হয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমলাতন্ত্র এবং চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘ (pressure group) সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

আমলাতন্ত্র

আমলাতন্ত্র বলিতেই আমাদের মনে সাধারণতঃ একটা বিরূপ ধারণা জন্মে। লাল ফিতার বাঁধন (red tapism), কাজে অহেতুক বিলম্ব (inordinate delay), নানারকম দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি নানা প্রকারের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের সঙ্গে আমরা আমলাতন্ত্রকে জড়িত করি। এই ধরনের অভিযোগের কোন ভিত্তি আছে কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে আমলাতন্ত্রের গঠন-প্রণালী সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও বলিয়া রাখা ভাল। আমলাতন্ত্র যে কেবলমাত্র সরকারী দপ্তরখানায় রহিয়াছে তাহা নহে। বে-সরকারী সংগঠনেও আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সুতরাং সরকারী দপ্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইবে তাহা বে-সরকারী সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমলাতন্ত্রের স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইহার গঠনবৈশিষ্ট্য জানা দরকার। এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন ম্যাক্স হেবার (Max Weber)। তাঁহার আলোচনা নানাদিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার বিশ্লেষণ অনুসরণ করিয়া আমলাতন্ত্রের গঠনবৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা-প্রয়োগের ভিত্তি (basis of authority) এবং সমস্যা লইয়া আলোচনা করা হইল।

সরকারী হউক বা বে-সরকারী হউক, প্রত্যেক সংগঠনের (organisation) কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (goals) থাকে। এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি যাহাতে সার্থকভাবে রূপায়িত হইতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা আমলাতন্ত্রের দায়িত্ব। কাজেই আমলাতন্ত্রের গঠনব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহাতে ইহা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করিতে পারে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ম্যাক্স হেবার নিম্নোক্ত গঠনবৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) সুনির্দিষ্ট নিয়মের উপর আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। কাজকর্মের দিক হইতে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক। প্রত্যেকটি সমস্যার জন্য যদি পৃথক পৃথক সমাধান বাহির করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি ঘটনাকে (case) যদি স্বতন্ত্র জাতিরূপ (type) বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, নিয়ম-কানুন সুনির্দিষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হইলে বিভিন্ন সমস্যা ও ঘটনাবলীকে কয়েকটি জাতিরূপে সাজাইয়া লওয়া (standardisation) সম্ভব হয়। ইহার ফলে একই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া একাধিক সমস্যার সমাধান করা যায়। সুতরাং সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন আমলাতন্ত্রের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(২) আমলাতন্ত্রে প্রত্যেকের ক্ষমতা এবং কর্তব্য সুনির্দিষ্ট থাকে। এইজন্য (ক) শ্রমবিভাগের নীতির উপর বিভিন্ন কাজকর্মকে ভাগ করা হয়, (খ) প্রত্যেকটি কাজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব পালন করার উপযোগী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, এবং (গ) তাহার ক্ষমতা-প্রয়োগের সীমা সম্পর্কে প্রত্যেকটি ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করা হয়।

(৩) ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের নীতির (hierarchical principle) উপর আমলাতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। ইহার ফলে কোন কাজই অনিয়ন্ত্রিত এবং অবারিত (unchecked) অবস্থায় সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। একজন অপরজনের কাজ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পায়।

(৪) আমলাতন্ত্রের কাজকর্ম যে-সব নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। সুতরাং প্রয়োগগত শিক্ষা (technical training) না পাইলে আমলাতন্ত্রের লোকদের পক্ষে এই নিয়মগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

(৫) আমলাতন্ত্রের লোকদের নিয়োগ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চুক্তি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। পদাধিকারীর মাহিনা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, কাজকর্মের দায়িত্ব, ব্যক্তিগত অভিযোগ নিরসনের উপায় প্রভৃতি বিষয় এই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকে। তবে চাকুরিতে থাকাকালীন তাহাদের যে-সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বা পদত্যাগ করিলে সেই সুযোগ-সুবিধা তাহারা আর ভোগ করিতে পারেন না। আমলাতন্ত্রের সুনাম ও কর্মদক্ষতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ম্যাক্স হেবার প্রস্তাব করেন, কর্মীর ব্যক্তিগত জীবন, বিষয়সম্পত্তি এবং বাসস্থান যথাক্রমে তাহার কর্মজীবন, পদ-সংক্রান্ত (official) বিষয়সম্পত্তি এবং কর্মস্থল হইতে যেন সম্পূর্ণ পৃথক থাকে।

(৬) প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন, নির্দেশ, আদেশ ও সিদ্ধান্তসমূহ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। মৌখিক নির্দেশে কাজকর্ম সম্পাদিত হইলে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় না। নিয়মকানুনের মৌখিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া কাজকর্ম পরিচালিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই প্রকার সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে। এই অবস্থায় আমলাতন্ত্রের স্বজনপোষণের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় থাকে না। সুতরাং যথাসম্ভব লিখিতভাবে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করা বিধেয়।

(৭) আমলাতন্ত্রে যোগ্যতা এবং কর্মজীবনের দৈর্ঘ্যের উপর পদোন্নতি নির্ভর করে। কর্মকুশলতার দিক হইতে বিচার করিলে যোগ্যতাই পদোন্নতির একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত এবং কর্মজীবনের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কর্মজীবনের দৈর্ঘ্য পদোন্নতির সময় উপেক্ষিত হইলে সংস্থার প্রতি কর্মচারীদের আনুগত্য ও আকর্ষণ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ যোগ্যতা বিবেচিত না হইলে তাহারা ভালভাবে কাজ করিতে উৎসাহ বোধ করিবে না। সুতরাং সংস্থার পরিচালনভার যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহাদের কর্তব্য হইল উভয় নীতির মধ্যে এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাহাতে কর্মোদ্যম ও সংস্থার প্রতি আনুগত্য কোনটাই হ্রাস না পায়।

আমলাতন্ত্র যাহাতে দক্ষতার সঙ্গে কর্তব্য পালন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে হেবার উপরোক্ত গঠনবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিন্তু

তাঁহার মতে, নিয়মকানুন দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট নহে। যাহাদের উপর নিয়মকানুন প্রয়োগ করা হয়, তাহাদের তরফ হইতে নিয়মকানুন মানিয়া চলার সহজ স্বীকৃতি প্রয়োজন। তাহারা যদি আদেশ বা নির্দেশ সহজভাবে গ্রহণ না করিতে পারে এবং কেবলমাত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া তাহাদের নিয়মকানুন মানিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-বোধের (alienation) উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। অপর পক্ষে, যাহারা নিয়মকানুনের অধীন তাহারা যদি আদেশকারী বা নিয়ম প্রয়োগকারী ব্যক্তিবর্গেব কর্তৃত্ব সহজভাবে স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে বিচ্ছিন্নতা-বোধ ত' দূরের কথা বরং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জনসাধারণের একাত্মতা-বোধ জন্মে। সেইজন্য ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, আদেশ করার ক্ষমতা থাকা এবং জনসাধারণের সহজ স্বীকৃতি লাভ করা—এই উভয়ের সংমিশ্রণে যথার্থ কর্তৃত্বের (Authority) সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে ম্যাক্স হ্বেবারের মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এত্‌জিয়নি (Amitai Etzioni) যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা হইল : "Weber's study of legitimation introduces a whole new dimension to the study of organisational discipline. He used *power* to refer to the ability to induce acceptance of orders; *legitimation* to refer to the acceptance of the exercise of power because it is in line with values held by the subjects; and *authority* to refer to the combination of the two—i.e., to power that is viewed as legitimate".1

কর্তৃত্ব কি ভাবে এবং কি প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই বিষয় লইয়া হ্বেবার বিশদ আলোচনা করেন নাই। কোন্ কোন্ কারণে কর্তৃত্ব জনসাধারণের স্বীকৃতি পাইয়া থাকে এই বিষয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, তিনটি কারণে বা উপায়ে কর্তৃত্ব সহজ স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে। প্রথমতঃ, চিরকাল অধস্তন ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতেছে, এই যুক্তির ভিত্তিতে কর্তৃত্ব জনসাধারণের সহজ স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে। কর্তৃত্বও যথাসম্ভব কাজকর্মে চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। প্রাক্‌-শিল্পযুগীয় সমাজে কর্তৃত্বকে মানিয়া চলার ইহাই প্রধান যুক্তি ছিল। বিচার বা বুদ্ধি দ্বারা আদেশের তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া অতীতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থাকার ফলে আদেশ বা নির্দেশ শিরোধার্য করা হয়। হ্বেবার এই জাতীয় কর্তৃত্বকে ঐতিহ্যগত (traditional অথবা traditionalistic) বলিয়া বিশেষিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় কর্তৃত্বের আদেশ বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং আইনসম্মত হওয়ার জন্য জনসাধারণ সহজভাবে সেই আদেশ স্বীকার করিয়া লয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কর্তৃত্বকে মানিয়া চলার ইহাই প্রধান কারণ। হ্বেবার এই প্রকার কর্তৃত্বকে বুদ্ধিগ্রাহ্য আইনসম্মত (rational-legal) বলিয়া

---

1 A. Etzioni : Modern Organisations. Prentice-Hall of India (Private) Ltd. New Delhi. 1965. Page 51

বিশেষিত করেন। তৃতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের প্রতি জনসাধারণের স্বাভাবিক আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকার ফলে কর্তৃত্বের আদেশ তাহারা সসম্ভ্রমে মানিয়া লয়। গণ-বিপ্লবের পরে যাহারা ক্ষমতায় আসীন হন, তাঁহারা এই কারণে জনসাধারণের সহজ স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন। অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষ ব্যক্তিত্বের জাদুর (charisma) সহায়তায় জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করিতে সক্ষম হন। যেমন, হিটলার বা মুসোলিনী। ম্যাক্স হ্বেবার এই ধরনের কর্তৃত্বকে ঐন্দ্রজালিক (charismatic) বলিয়া বিশেষিত করেন।

হ্বেবারের মতে, আধুনিক চলিষ্ণু সমাজে বুদ্ধিগ্রাহ্য আইনসম্মত কর্তৃত্ব (rational-legal authority) থাকা বাঞ্ছনীয়। যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত এবং আইন-সম্মত পন্থা অনুসরণ করা হয় বলিয়া সংগঠনের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। জটিল সমাজের নিত্য-নূতন সমস্যা সমাধান করিতে এই প্রকার কর্তৃত্ব বিশেষ পারদর্শী। পক্ষান্তরে, অপর দুই প্রকার কর্তৃত্ব আধুনিক সমাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। অপেক্ষাকৃত সহজ সরল লোকাচাব-শাসিত সমাজে (folk society) গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ করিয়া কর্তৃত্ব জনসাধারণের আস্থা এবং আনুগত্য লাভ করিতে পাবে। কিন্তু জটিল সমাজে তাহা সম্ভব নহে। কারণ, যুক্তি-সম্মত উপায়ে জটিল এবং ক্রম-বর্ধমান সমস্যার সমাধান সম্ভব, চিরাচরিত রীতির অন্ধ অনুসরণ করিয়া তাহা হইবার নহে। আবার ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্বের অধীনে কোন স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। ব্যক্তিত্বের জাদুর সহায়তায় আশু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের সেই ব্যক্তির প্রতি মোহ কাটিয়া গেলে অথবা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী অনুরূপভাবে ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে অসমর্থ হইলে সামাজিক বিপর্যয় চরমে উঠে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য-সমূহের (dysfunctional aspects) আলোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, আমলাতন্ত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, ইহা প্রয়োজনানুযায়ী নিয়মের পরিবর্তন না করিয়া নিয়মের দাস হইয়া পড়ে। আমলারা নিয়মের প্রতি এত বেশি অনুরক্ত হয় যে, নিয়ম উদ্দেশ্যসাধনের মাধ্যম না হইয়া শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। যে-উদ্দেশ্যে নিয়মের প্রবর্তন করা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য অন্তরালে চলিয়া যায় এবং নিয়মের প্রয়োগ করাই আমলাদের একান্ত কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমলাতন্ত্রে অধি-কেন্দ্রীকরণের (over-centralisation) লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের নীতির উপর আমলাতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। ইহার জন্য উর্ধ্বতন কর্মচারীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা সাধারণতঃ নিজেদের করায়ত্ত রাখিতে সচেষ্ট থাকেন। এই অবস্থায় অধস্তন কর্মচারীদের কর্তব্য দাঁড়ায় উর্ধ্বতন কর্মচারীদের নিকট প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পরিবেশন করা। এইভাবে অধস্তন কর্মচারীর নিকট হইতে ফাইল ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ক্রমান্বয়ে একের পর এক কর্মচারীর মন্তব্য দ্বারা ঐশ্বর্যমণ্ডিত

হইয়া শেষ পর্যন্ত যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার নিকট পৌঁছায়। ইহাতে অহেতুক বিলম্ব ঘটে। অনেক সময় এত বেশি বিলম্ব ঘটে যে, গৃহীত সিদ্ধান্তের আর কোন গুরুত্ব বা তাৎপর্য থাকে না। তৃতীয়তঃ, আমলাতান্ত্রিক কাজকর্ম যে ধারায় পরিচালিত হয় তাহাতে কর্মচারীদের নূতন কিছু করার আকাঙ্ক্ষা বা সৃজনমূলক কাজকর্ম করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। যেখানে দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া চলে, সেখানে কে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করে? তাহা ছাড়া, ঊর্ধ্বতন কমচারী অযৌক্তিকভাবে অধস্তন কর্মচারীর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা বাতিল করিয়া দিতে পারেন, এই ভয়েও অধস্তন কর্মচারীগণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক থাকেন। চতুর্থতঃ, যথাসম্ভব দায়িত্ব এড়াইয়া কাজকর্ম পরিচালনা করার ফলশ্রুতি হিসাবে ফাইল ও কাগজপত্র অকারণে এক টেবিল হইতে অন্য টেবিলে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহাতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অথচ কাজের গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হয় না। সেইজন্য ইহাকে কেহ কেহ "active inactivity" বা সক্রিয় নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া অভিহিত করেন। পঞ্চমতঃ, উত্তরোত্তর কলেবর বৃদ্ধি করার দিকে আমলাতন্ত্রের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। অধস্তন কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর মান প্রতিপত্তি ও উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া সাধারণতঃ বিভাগীয় প্রধানদের অধস্তন কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিকে সচেষ্ট থাকিতে দেখা যায়। ইহা পারকিন্‌সন্‌-এর আইন (Parkinson's Law) বলিয়া খ্যাত।

আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য (dysfunctional aspects) আলোচনা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনেক ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন হইতে পারে। নিয়মকানুনের কড়াকড়ি না থাকিলে কোন বৃহদায়তন সংস্থার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যাহা অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা বৃহদায়তন সংস্থার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে। তাহা ছাড়া, আধুনিক কালে সমাজের কাজকর্ম এত বেশি প্রসার লাভ করিয়াছে এবং জটিলতা এত বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, নিয়মকানুনের ভিত্তিতে গঠিত বৃহদায়তন সংগঠন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বিনষ্ট না করিয়া সংগঠনের কাজকর্মের যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা আমলাতান্ত্রিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান।

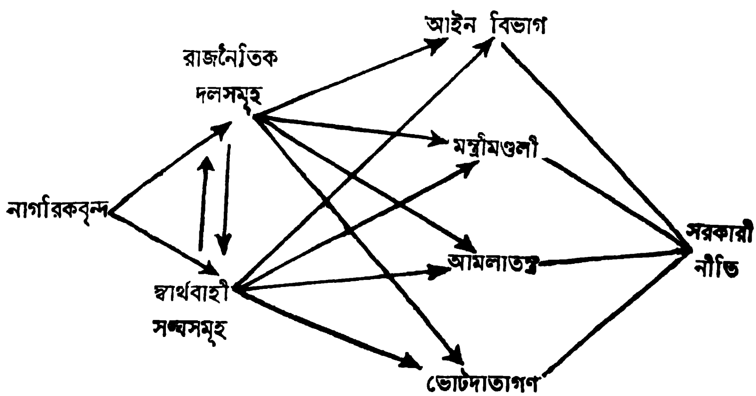
চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর প্রকৃতি সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘের (pressure groups) ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করে। সুতরাং ইহার কর্মতৎপরতা এবং রাজনীতিক ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই মোটামুটি সচেতন। কিন্তু স্বার্থবাহী সঙ্ঘসমূহ লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজকর্ম সম্পাদন করে বলিয়া তাহাদের কর্মতৎপরতা এমনকি অস্তিত্ব সম্পর্কে

অধিকাংশ জনসাধারণ অজ্ঞ। অথচ রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইহাদের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘের গঠন-প্রণালী ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিলে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, এই প্রকার সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা সমভাবাপন্ন (shared attitude) হয়। তাহাদের মধ্যে আদর্শগত এবং উদ্দেশ্যগত মিল থাকে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা অভিন্ন স্বার্থের (common interest) ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। স্বার্থসিদ্ধি করাই তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার মুখ্য কারণ। তৃতীয়তঃ, সরকারী নীতি এবং কার্যাবলী যাহাতে তাহাদের স্বার্থের অনুকূল হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহারা যথাযোগ্য স্থানে নিয়মিতভাবে চাপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, কৃষকদের স্বার্থবাহী সঙ্ঘ (Farmers' Lobby), শিল্পপতিদের স্বার্থবাহী সঙ্ঘ (Industrialists' Lobby) এবং বণিকদের স্বার্থবাহী সঙ্ঘের (Merchants' Lobby) উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া যথাক্রমে কৃষক, শিল্পপতি এবং বণিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এই সঙ্ঘগুলির উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও অন্যান্য স্বার্থসমূহকে কেন্দ্র করিয়া চাপসৃষ্টিকারী সঙ্ঘের উদ্ভব হইয়া থাকে। তবে অর্থনৈতিক স্বার্থবাহী সঙ্ঘের মত ইহারা প্রভাবশালী এবং কর্মতৎপর নহে।

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রকার সঙ্ঘগুলিকে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৎপর থাকিতে দেখা যায়। এই বিষয়টি নিম্নোক্ত নকশায় প্রদর্শিত হইল ঃ



রাজনৈতিক দলের সঙ্গে স্বার্থবাহী সঙ্ঘের পার্থক্য এই যে, কোন বিশেষ স্বার্থের অনুকূলে সরকারী নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সরকারী ক্ষমতা করায়ত্ত করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। কোন স্বার্থবাহী সঙ্ঘ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অর্থ প্রদান করিয়া অথবা অন্যান্য নানা উপায়ে সাহায্য করিতে পারে। এইভাবে সাহায্য

করার উদ্দেশ্য, সেই দলের মাধ্যমে অথবা সেই দলভুক্ত প্রার্থীদের মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করিয়া বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি করা। যদি এই স্বার্থবাহী সঙ্ঘের ধারণা হয় যে, এই দলের দ্বারা সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহা হইলে পরবর্তী নির্বাচনে অন্য রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করিতে দ্বিধা করিবে না। আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় বলিয়া রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন স্বার্থবাহী সঙ্ঘের সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলকেও নানাপ্রকার পরস্পরবিরোধী আদর্শ এবং লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া দলীয় নীতি এবং কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হয়। অপর পক্ষে, স্বার্থবাহী সঙ্ঘে এইপ্রকার সামঞ্জস্য আনয়ন করিবার কোন প্রচেষ্টা স্বভাবতই দেখা যায় না। ইহার সব কাজকর্ম স্বার্থসিদ্ধিব উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। এই কারণে অনেক স্বার্থবাহী সঙ্ঘ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। কাজেই একদিকে যেমন স্বার্থবাহী সঙ্ঘ রাজনৈতিক দলের সাহায্যে উদ্দেশ্য সফল করিতে চেষ্টা করে, অনুরূপভাবে রাজনৈতিক দলও স্বার্থবাহী সঙ্ঘের সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে।

আইনসভার সদস্যদের উপর স্বার্থবাহী সঙ্ঘেব চাপ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আইন প্রণযন করার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। কাজেই কোন স্বার্থবাহী সঙ্ঘ যদি কোন বিশেষ বিলের আইনে পরিণত হইবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি কবিতে চায়, তাহা হইলে সঙ্ঘের প্রভাবিত আইন সভার সদস্যদেব মাধ্যমে করিতে পাবে। সম্পূর্ণভাবে বাধা দিতে না পারিলেও বিল-পাশে বিলম্ব ঘটাইতে পাবে, ইহা নিঃসন্দেহ। অনেক সময়, ইচ্ছানুযায়ী বিলের সংশোধন ঘটাইতে সক্ষম হয। তাহা ছাড়া, স্বার্থবাহী সঙ্ঘের সমর্থক আইনসভার সদস্যগণ নানারকম তথ্য, পরিসংখ্যান প্রভৃতি সভাকক্ষে পরিবেশন করিযা আইন সভার আলোচনা এবং সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীর উপবও স্বার্থবাহী সঙ্ঘ নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। তবে এই ক্ষেত্রে তাহাদের কর্মতৎপরতা লোকচক্ষুর অন্তরালে পরিচালিত হয় এবং উভয় পক্ষই এই বিষয়টি সযত্নে গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক ভাষ্যকারদের প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, এই ক্ষেত্রে স্বার্থবাহী সঙ্ঘের প্রভাব উপেক্ষণীয় নহে।

আমলাতন্ত্রের উপর স্বার্থবাহী সঙ্ঘের প্রভাব সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। সর্ব প্রকার কর্মতৎপরতা অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠিত হয়। নীতি নির্ধারণ এবং নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকায় এই ক্ষেত্রে স্বার্থবাহী সঙ্ঘের কর্মতৎপরতা বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

নানারকম প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে স্বার্থবাহী সঙ্ঘ নিজেদের গোষ্ঠী-বহির্ভূত লোকদের প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। জনমত প্রভাবিত হইলে নির্বাচনে, আইনসভায় এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইহার প্রতিফলন হওয়া বিচিত্র নহে। এই

জাতীয় প্রচার কি রূপ নেয় তাহার একটি নমুনা দেওয়া হইল। ভারত সরকারের খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘের তরফে নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রচার করা হয়ঃ "Foodgrains Trade Takeover: Who benefits? The Foodgrains Trade has offered its full co-operation to the authorities for tiding over the present difficult food situation Why then the takeover and who benefits? Not the producer. Because he will deal with only one State Agency in the absence of competition. Nor the consumer. He will pay more for inferior quality. And a centralised agency may break down any time. Only anti-social elements will thrive. By takeover, 25 lakh persons will be deprived of their livelihood. Many more will be affected when rationing follows." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই জাতীয় প্রচারের কার্যকারিতা সম্পর্কে বোন্ এবং রেনি বলেনঃ "Business has been highly successful in eliciting general approbation from white-collar and professional groups. Its public relations emphasise middle-class values, private enterprise, and initiative, toward which presumably all Americans are sympathetic. Notwithstanding their critical comments about certain businessmen, millions of Americans outside industry subscribe to the view that what is good for business is good for the country—a tribute in part to the public relations program of business."1 অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বণিকসঙ্ঘগুলি তাহাদের প্রচারকার্যে অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকের প্রিয় জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেইজন্য কতিপয় ব্যবসায়ী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিলেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে তাহারা মোটামুটি অনুকূল মনোভাবাপন্ন। বণিক সঙ্ঘ প্রচারের মাধ্যমে তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, ব্যবসায়ের মঙ্গলের সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘের প্রভাব বিস্তার করার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কৌশল সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইল, তাহা হইতে একটা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাহারা অধিকাংশ লোকের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করিতে

1 Bone and Ranney : Politics and Voters, Page 71.

দ্বিধা করে না। স্বার্থবাহী সঙ্ঘের এই দিকটি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া জনসন বলেন: "Pressure groups......often present the interests of one segment of the population as if they were the interests of all .....”1 অর্থাৎ স্বার্থবাহী সঙ্ঘ সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী-স্বার্থ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তথ্যাদি পরিবেশন করিয়া এমনভাবে প্রচারকার্য চালায় যাহাতে ধারণা জন্মায় যে, তাহাদের প্রস্তাবিত পন্থা অনুসরণ করিলে সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে।

এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন নহে। তবে গণতন্ত্রে স্বার্থবাহী সঙ্ঘের প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রথমতঃ, আইন সভায় বিভিন্ন স্বার্থবাহী সঙ্ঘের তরফ হইতে নানাপ্রকার তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিবেশন করা হয়। ইহার ফলে, সমাজের বিভিন্ন অংশে কোন প্রস্তাবিত আইনের প্রতিক্রিয়া কি হইবে তাহা সরকারের পক্ষে জানা সম্ভব হয়। এই সম্পর্কে বোন এবং রেনির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "Legislation is the result of compromise, and the conscientious lawmaker wants to hear from all interested parties. Spokesmen for groups have facts, figures, and interpretations on how proposals can or do affect sizable blocs of people. One of the problems is to provide equal access to all sides so that the legislator has the necessary information and viewpoints to make an adequate decision."2 অর্থাৎ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। কাজেই প্রস্তাবিত আইনে সমাজের বিভিন্ন অংশে কি প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা সরকারের সম্যকভাবে জানা দরকার। সুতরাং ছোট বড় নির্বিশেষে সব রকম স্বার্থবাহী সঙ্ঘ যাহাতে নিজ নিজ বক্তব্য পরিবেশন এবং প্রচার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক ভিত্তিতে নির্বাচন-এলাকা (constituency) স্থির করা হয়। এইপ্রকার নির্বাচন-এলাকা হইতে যে-সব সদস্য নির্বাচিত হন, তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য এবং সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে বিশেষ স্বার্থ (interest group) সম্পর্কে কোন কিছু বলা সম্ভবপর না-ও হইতে পারে। আইনসভার গঠনে ইহা বড় রকমের অসম্পূর্ণতা, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন স্বার্থবাহী সঙ্ঘ নানারকম তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিবেশনের দ্বারা এই ত্রুটি আংশিকভাবে দূর করিতে সাহায্য করে।

তৃতীয়তঃ, নির্বাচনে বিভিন্ন শ্রেণীর সমর্থন লাভ করিবার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে নানাপ্রকার স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়। সুতরাং

1 Harry M. Johnson : Sociology. Page 356.

2 Bone and Ranney : Politics and Voters. Page 75.

রাজনৈতিক দলের নীতিতে এবং কার্যকলাপে কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং চিন্তা-ভাবনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন না-ও হইতে পারে। চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘ বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বার্থ তুলিয়া ধরিয়া রাজনৈতিকদলের পরিপূরক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

অতএব বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক সমাজে চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ভূমিকা রহিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্ঘগুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। কারণ, শাসন কর্তৃপক্ষ যদি দুর্বল বা উদাসীন হয়, তাহা হইলে ইহাদের কার্যকলাপ সমাজের নিকট হিতকর না হইয়া ক্ষতিকর হইতে পারে। এই সম্পর্কে বটোমোর যে-সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ "Where there is a stable political authority pressure groups may be a useful additional means for individuals to make known sectional desires or grievances, or to convey information which is valuable to the administration; where political authority is weak the more powerful pressure groups may usurp governmental functions or hold the rest of the community to ransom .....”[1] অর্থাৎ শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে স্বার্থবাহী সঙ্ঘসমূহ বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর অভাব-অভিযোগ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলিয়া ধরিয়া এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশন করিয়া শাসন-কর্তৃপক্ষকে প্রভূত সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় এবং ইহার কাজকর্মে যদি দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে শক্তিশালী স্বার্থবাহী সঙ্ঘ সমূহ কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া শাসন-ক্ষমতা নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হয়। ইহার ফলে সমাজের অপর সকলকে খেসারত দিতে হয়।

1 T. B. Bottomore : Sociology. Pages 154-155.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Amitai Etzioni : Modern Organisations. Prentice-Hall of India (Pvt.) Ltd. New Delhi. 1965. Chapter V

২। Harry M. Johnson : Sociology. Allied Publishers Private Limited.

৩। T. B. Bottomore : Sociology. Unwin University Books London.

৪। Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Co. N. Y. 1961 Chapter XVIII

৫। Bone and Ranney : Politics and Voters. McGraw Hill Book Company. New York. 1963 Chapter IV.

৬। Alan R. Ball Modern Politics and Government. The Macmillan Press Ltd. London.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার সংজ্ঞা

সমাজস্থ লোকদের মননে চিন্তনে ও আচরণে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থায় নবজাত শিশুর সামাজিকীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্যে যে-সব পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহার মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্যতম এবং কার্যকারিতার দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, একটি ব্যাপক অর্থে এবং অপরটি সঙ্কীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলিতে জীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা বুঝায়। কারণ, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই আমাদের নানাপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে সাহায্য করে। আমরা প্রত্যেকে যার যার অতীত জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, অনেক তুচ্ছ ঘটনা অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। এইদিক হইতে বিচার করিলে বলা যায়, বাঁচিয়া থাকার অর্থই হইল শিক্ষালাভ করা। যখন আমরা বলি, ভ্রমণ করা শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ, তখন ব্যাপক অর্থে আমরা শিক্ষা শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি। বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে আসা, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজকর্ম করা, নানারকম সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান এবং পূজা-পার্বণে অংশ গ্রহণ করা প্রভৃতি সব কিছুই শিক্ষার অঙ্গ। এমন কি, প্রকৃতির সংস্পর্শে আসা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করাও ব্যাপক অর্থে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য দুইটি। প্রথমতঃ, এই প্রকার শিক্ষায় কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা নাই। জীবনের পথ চলায় যাহা শুনি, যাহা দেখি এবং যাহা ঘটে সব কিছুই শিক্ষার উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক নিয়মবর্জিত (informal)। কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া শিক্ষা অগ্রসর হয় না। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। এই প্রকার শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকশিত করার সর্বাধিক সুযোগ পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ব্যক্তিত্বকে সুষমামণ্ডিত করে, সমৃদ্ধ করে।

যখন সচেতনভাবে এবং বিশেষ যত্ন সহকারে কোন বিদ্যা অর্জন করা হয় অথবা কোন কৌশল আয়ত্ত করা হয়, তখন তাহাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলা হয়। সাধারণতঃ শিক্ষা শব্দটি আমরা এই অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে শিক্ষা সম্পর্কে যে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করা হইবে, তাহাও এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে করা হইবে। এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে শিক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে

বিদ্যায়তনে পাঠ গ্রহণ করাকেই শিক্ষা বলা হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পঠন-পাঠন হয়, পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী দেওয়া হয়—এইসব কয়টি প্রক্রিয়া শিক্ষার অন্তর্গত। এই প্রক্রিয়াগুলিতে অসম্পূর্ণতা থাকিলে শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার সঙ্কীর্ণ অর্থ অনুযায়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেকটা দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার ভিত্তিতে শিক্ষক পাঠদান করেন এবং শিক্ষার্থীগণ সেই পাঠ গ্রহণ করে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। যেমন, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা অথবা কোন বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করা অথবা সঙ্কীর্ণ অর্থে কয়েকটি বিশেষ মানসিক বৃত্তি বিকশিত করা। যাহারা অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাহাদের বিশেষ একপ্রকার মানসিক বৃত্তি বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়, আবার যাহারা সাহিত্যে পাঠ নেয় তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিক বৃত্তি বিকশিত করার চেষ্টা করে।

প্রত্যেক সমাজেই শিক্ষাকে সুসংগঠিত আচার-ব্যবস্থা (organised institution) হিসাবে গড়িয়া তোলা হয়। শিক্ষার্থীদের কোন্ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে, শিক্ষার কার্যকাল কি হইবে ইত্যাদি বিষয় অনিয়ন্ত্রিত বা অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকিতে দেওয়া হয় না। সমাজের উদ্দেশ্য, জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার সংগঠন করা হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

সমাজ-জীবনে শিক্ষা-ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক হইতে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল।

শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ

বিভিন্ন সমাজবিদ্যায় শিক্ষাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হয়। যেমন, মনোবিদের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকশিত করিতে সাহায্য করা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কোন কোন শিক্ষাবিদ্ জীবিকা নির্বাহের যোগ্যতা অর্জন করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। এইভাবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়।

অনুরূপভাবে, সমাজতত্ত্ববিদগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের মতে, সমাজকে সংরক্ষণ করা শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য। সমাজ বলিতে কেবল নির্দিষ্ট জনসমষ্টি বুঝায় না; তাহাদের স্বতন্ত্র জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যগুলিও বুঝায়। বংশপরম্পরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি যাহাতে অব্যাহত থাকে সেই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে সমাজের সঞ্চিত ভাবধারা ও ঐতিহ্য সঞ্চারণ করা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমে এই সঞ্চারণ-কার্য সম্পাদিত হয়। সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার এই জাতীয় ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ, নবজাত শিশুর সামাজিকীকরণ অনেক উপায়ে ঘটিয়া থাকে। শিক্ষা বিভিন্ন উপায়ের অন্যতম; ইহা একমাত্র মাধ্যম নহে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাক্-শিল্পযুগীয় সমাজে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার তুলনায় অন্যান্য মাধ্যম প্রাধান্য পাইত এবং এখনও কোন কোন সমাজে পাইয়া থাকে। পূর্বে শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যেমন, প্রাচীন ভারতবর্ষে সাধারণতঃ যাঁহারা যজন-যাজনের বৃত্তি গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাই টোল, চতুষ্পাঠী বা গুরু-গৃহে শিক্ষালাভ করিতেন। সমাজের অন্যান্য সকলে আনুষ্ঠানিক নিয়ম-বর্জিত (informal) উপায়ে জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হইত। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও অনুরূপ অবস্থা ছিল। ১৮৭০ সালে শিক্ষা আইন পাশ হইবার পূর্বে অধিকাংশ ইংরেজ নাগরিক অতি সাধারণ শিক্ষার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত ছিল। তাহাদেরও আনুষ্ঠানিক ধারা-বর্জিত উপায়ে জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করান হইত। শিক্ষার স্থান ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু শিল্পায়নের ফলে সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষার কেবল সম্প্রসারণ ঘটে নাই, শিক্ষায় নানারকম পৃথকীকরণ (differentiation) ঘটিয়াছে। যখন কোন প্রক্রিয়া, ভূমিকা, আচার-ব্যবস্থা বা সংগঠন অন্যান্য প্রক্রিয়া, ভূমিকা প্রভৃতি হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, তখন সমাজতত্ত্বের দিক হইতে পৃথকীকরণ ঘটিয়াছে বলা যায়। পৃথকীকরণ শিল্প-প্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন কাজে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন উদ্ভব হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ অনিবার্য হইয়া উঠে। শিল্প-প্রধান সমাজে জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করান শিক্ষার একমাত্র বা প্রধান লক্ষ্য নহে। শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বা দক্ষ লোকের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও বৈচিত্র্য ঘটে। আধুনিক ভারতবর্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিল্পোন্নত দেশগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে তাকাইলে শিক্ষায় নানারকমের পৃথকীকরণ নজরে পড়ে।

তৃতীয়তঃ, প্রাক্-শিল্পযুগীয় সমাজ সহজ সরল ছিল। সমাজস্থ লোকদের মধ্যে মনোভাব, জীবন-প্রণালী এবং আচার-আচরণে মোটামুটি অভিন্নতা থাকায় সমাজে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাফেরা করার জন্য যে-জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তাহা পরিবার, পাড়াপ্রতিবেশী এবং বন্ধু-মহলে পাওয়া সম্ভব ছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে সামাজিক বন্ধন শিথিল হইবার আশঙ্কা ছিল না। অপর পক্ষে, শিল্প-প্রধান আধুনিক সমাজ অপেক্ষাকৃত অনেক জটিল। কারণ, আধুনিক সমাজে ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন আচারবিশিষ্ট লোকের বাস। যেখানে সমাজস্থ মানুষের মধ্যে প্রভেদ এত বেশি, সেখানে সহজভাবে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে গেলে যে-জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে পাইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং জটিল সমাজে নানা প্রকার আনুষ্ঠানিক উপায়ের মাধ্যমে সমাজস্থ লোকদের মধ্যে সহজ সম্বন্ধ বজায় থাকে। এই আনুষ্ঠানিক উপায়গুলির মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্যতম। শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন অনেক মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের

মধ্যে সঞ্চার করিবার চেষ্টা করা হয়, যাহা সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করিতে বিশেষ সাহায্য করে। এই কারণে আধুনিক সমাজে শিক্ষাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংযোগকারী শক্তি (integrative force) হিসাবে গণ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে রবার্টস্-এর (Bryan Roberts) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "The family provides its children with values and social skills appropriate to the present social position of that family. They do not equip a child to take an effective part in a society that is rapidly changing and becoming more interdependent. In such a society an individual must learn............to interact with people of different social backgrounds. Educational institutions can provide such learning because *ideally* they are not tied to the values and interests of particular groups in society".1

চতুর্থতঃ, উপবোক্ত উদ্ধৃতির সর্বশেষ বাক্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আদর্শের দিক হইতে বিচার কবিলে শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজেব কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থ ও মূল্যবোধের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত থাকে না বলিযা সমাজে ইহার সংযোগকারী শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আদর্শেব দিক হইতে মানিযা লইলেও বাস্তবে ইহার ব্যতিক্রম বিরল নহে। সব সমাজেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্রেণী-বিন্যাসের প্রতিফলন দেখা যায। ডুর্কহেইম্ বলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র বৃহত্তর সমাজের জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে পরিচয় কবান শিক্ষার একমাত্র কাজ নহে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া যাহাতে চলিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করাও শিক্ষার অন্যতম দায়িত্ব ("preparing the child for a particular milieu for which he is destined")। বটোমোর বলেন যে, কার্যক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত মানসিকতা গড়িয়া তোলার অর্থ শ্রেণীগত আদর্শ বা মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার প্রবর্তন করা।2 এই কারণে সব সমাজেই সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। যেখানেই সমাজস্থ লোকেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, সেখানেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যায়তনের ব্যবস্থা আছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত বিদ্যায়তনগুলিতে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা অধ্যয়ন করে। এইসব বিদ্যায়তন-

---

1 Worseley & others : Introducing Sociology. An article on Education by Bryan Roberts. Page 173

2 T. B. Bottomore : Sociology. Page 250. "......the function of education in preparing the child for a particular milieu in society ......has traditionally meant preparing him for menbership of a particular group in the social hierarchy."

গুলিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার নানা কারণে খুবই সীমিত। রবার্টস্-এর মতে, ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা-ব্যবস্থা সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের সঙ্গে নোঙর-বাঁধা ("this (English) system......seems heavily anchored to the English class system.")। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কি কারণে একপ্রকার স্কুলের পরিবর্তে চারি প্রকার স্কুলের ব্যবস্থা রহিয়াছে? কি কারণে মাত্র একাদশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলেই পরীক্ষার মাধ্যমে তাহাদের পরবর্তী সারা জীবনের বিকাশ-ধারা এবং বৃত্তি নির্ণীত হইবে? এই জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করার পর রবার্টস্ মন্তব্য করেন: "The separation of children into different types of schools from an early age seems a close reflection of English stratification, where each class maintains its own habits and styles of life and rarely interacts with others."1 অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেকটি শ্রেণী নিজ নিজ জীবন-যাপনের রীতি স্বতন্ত্র রাখিতে এবং অপরাপর শ্রেণীর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডে খুব অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের পৃথক পৃথক স্কুলে ভাগ করার ব্যবস্থা শ্রেণী বিন্যাসের অনুসরণে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। ভারতবর্ষেও নানা প্রকার স্কুল রহিয়াছে। এইগুলিতে পঠন-পাঠনের মান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিক হইতে বিরাট পার্থক্য আছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্কুলগুলিতে মাহিনাপত্র এত বেশি যে, সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের সেখানে প্রবেশ করার ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের মত এত বেশি প্রকট না হইলেও এখানেও শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্রেণী-বিন্যাসের প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের সম্পর্ক আলোচনা করার সময় আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়। কারণ, শিক্ষার মাধ্যমে শ্রেণী-বিন্যাসের উচ্চতর সোপানগুলিতে উন্নীত হওয়া সম্ভব। উপার্জন এবং মর্যাদার দিক হইতে লোভনীয় কাজকর্মে প্রবেশাধিকার শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে এইসব কাজে প্রবেশ করা শক্ত। সেইজন্য সাধারণতঃ উচ্চতর কাজকর্মে নিযুক্ত কর্মীদের সন্তানগণ অধিক পরিমাণে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডের সামাজিক পটভূমিকা বর্ণনা করিতে গিয়া এলেন পটার (Allen Potter) নিম্নোক্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।2

1 Worseley and Others: Introducing Sociology. An article on Education by Bryan Roberts. Page 167.

2 An article on Parliamentary Opposition in England by Allen Potter included in the book entitled "Political Oppositions in Western Democracies," edited by Robert A. Dahl, Yale University Press, New Haven and London.

ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষালাভ করার সুযোগ গ্রহণ করা বা না-করা প্রধানতঃ পিতার বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্কুলে যাহারা শিক্ষা পাইযাছে তাহাদের পিতার বৃত্তি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, গ্রামার স্কুলের (Grammar Schools) মোট শিক্ষার্থীর ষোল ভাগের এক ভাগেরও কম শিক্ষার্থী অদক্ষ শ্রমিক পিতার (unskilled manual workers) সন্তান, যদিও কুড়ি বৎসর হইতে চৌষট্টি বৎসর বয়সের মোট পুরুষের আটভাগের এক ভাগই হইল অদক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত। এই তথ্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অধিকাংশ সাধারণ শ্রমিক পরিবারগুলি অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও গ্রামার স্কুলে সন্তানদের শিক্ষা দিবার সুযোগ গ্রহণ করে না। সুতরাং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হইলেই যে শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটিবে, এইরকম ধারণা করা অমূলক। ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের পিতার বৃত্তির ভিত্তিতে শ্রেণীভাগ করিলে দেখা যায় যে, বাবু-কাজে (white-collar jobs) নিযুক্ত কর্মীদের পরিবারভুক্ত শিক্ষার্থীদের তুলনায় অদক্ষ শ্রমিক পরিবারভুক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অতি নগণ্য, প্রতি চৌষট্টি জনে মাত্র একজন। সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বয়ংশাসিত বিদ্যায়তনগুলিতে প্রবেশাধিকার বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন, ইটনে (Eton) মোট শিক্ষার্থীর তিন-পঞ্চমাংশ শিক্ষার্থী ইটনে শিক্ষাপ্রাপ্ত পিতার সন্তান। অবশিষ্ট দুই-পঞ্চমাংশ শিক্ষার্থী এমন পরিবার হইতে আসে যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং পদ-মর্যাদা প্রথমোক্ত শ্রেণীর সমগোত্রীয় বলা যায়। এই বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়াও ব্যতিক্রম নহে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য হইতে জানা যায় যে, মস্কোতে উচ্চতর শিক্ষায়তনগুলিতে পাঠরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ সমাজের বুদ্ধিশালী সম্প্রদায়ের (intelligentsia) অন্তর্গত।[1]

বিভিন্ন দেশের উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই ধরনের পার্থক্য দূর করিয়া যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। ইহার একটি কারণ হইল, সামাজিক ক্রমোচ্চ বিভাগে যাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সোপানে অবস্থিত তাহারাই সাধারণতঃ বুদ্ধি ও অন্যান্য যোগ্যতার দিক হইতে অধিকতর ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এইসব পরিবারস্থ সন্তানগণ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা মোটেই বিচিত্র নহে।

সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা

ডুর্কহেইম্ শিক্ষার দ্বি-বিধ লক্ষ্যের উল্লেখ করেন। প্রথম লক্ষ্য হইল, বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে সামাজিক উত্তরাধিকার, প্রচলিত মূল্যবোধ, আচার-আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়া। শিক্ষার এই লক্ষ্য

1 T. B. Bottomore : Sociology, Page 250.

সর্বকালে সব সমাজেই স্বীকৃতি পাইয়াছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল, সামাজিক শ্রেণীর আদর্শানুগ আচার-আচরণ সম্পর্কিত প্রচলিত রীতি-নীতির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া।

উপরোক্ত দুইটি লক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষা-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধি দ্বারা জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য-সমূহের সঙ্গে পরিচিত হইলে, তাহা মনন চিন্তন ও কার্যকলাপকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এইভাবে মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে সমাজপ্রকৃতির বৈপরীত্য ঘুচিয়া গিয়া সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সামাজিক বিধি-নিষেধ সহজভাবে গ্রহণ করিতে অসুবিধা হয় না। সব সমাজেই শিক্ষায়তনগুলির পাঠ্যতালিকা নির্বাচনের সময় এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। যে-সমাজে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর জোর দেওয়া হয়, সেই সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ভাবধারা সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করা হয়। আবার যে-সমাজে সাম্যবাদের আদর্শের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেই সমাজে শিক্ষার্থীরা যাহাতে সাম্যবাদী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণেই সব সমাজে শিক্ষা-ক্ষেত্রে অল্প হউক বা বেশি হউক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার কার্যকারিতা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে। ইহার অনেক কারণ আছে। সর্বাগ্রে বহুল প্রচার মাধ্যমগুলির (media of mass communication) উল্লেখ করিতে হয়। বর্তমান যুগে সংবাদ পত্র, রেডিও ও টেলিভিসনের প্রভাব অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক দলসমূহ এবং বিভিন্ন ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদক-গণ প্রচারের মাধ্যমে কিশোর-মনে যে গভীর রেখাপাত করে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় অনপনেয়। শিক্ষা-ব্যবস্থা যে-আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার সঙ্গে যদি প্রচারমাধ্যমগুলির সঞ্চারিত আদর্শের বিরোধ থাকে, তাহা হইলে শিক্ষার্থীদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। এই অবস্থায় সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার কার্যকারিতা স্বভাবতই বহুলাংশে হ্রাস পায়।

আরেকটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। শিল্প-প্রধান সমাজে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা প্রাধান্য পাইয়া থাকে। সুতরাং বর্তমান যুগে পাঠ্যসূচী অনেক বেশি পরীক্ষামূলক (empirical) জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে যে-চিরাচরিত (traditional) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহার সঙ্গে বিদ্যায়তন হইতে প্রাপ্ত পরীক্ষামূলক (empirical) জ্ঞানের অসঙ্গতিজনিত বিরোধ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাক্-শিল্পযুগীয় সমাজে এই প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। এই প্রকার বিরোধ যত বৃদ্ধি পায়, সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার গুরুত্বও তদনুযায়ী হ্রাস পায়। সেইজন্য দ্রুত পবিবর্তনশীল সমাজে সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার কার্যকারিতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

আধুনিক ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। পূর্বে ভারতীয় মূল্যবোধের মানদণ্ডে শিক্ষা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সমাজে সম্মানার্হ ছিলেন এবং তাঁহাদের মতামত ও আচার-আচরণ অনুকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি সাধারণতঃ সমাজপতির আসন লাভ করিতেন এবং সামাজিক বিধি বা অনুশাসন সম্পর্কে বিরোধ বাধিলে সমাজস্থ লোকেরা তাঁহার মতামত শিরোধার্য করিয়া লইতেন। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে প্রচলিত মূল্যবোধের মানদণ্ডে শিক্ষা পূর্বের ন্যায় গৌরবের স্থান অধিকার করে না। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তিগণের প্রভাব-প্রতিপত্তিও বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব

আমরা পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখিয়াছি যে, সামাজিক নিয়ামক হিসাবে বর্তমান সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহাই একমাত্র পরিবর্তন নহে। আরও কয়েকটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, গণতান্ত্রিক ভাবধারার সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধা সমাজের সর্বস্তরে উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। যে-সব সমাজে আম-জনতার মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, এইরূপ সমাজে রাষ্ট্রকে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা যায়। আধুনিক সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থাকা সভ্যতার অন্যতম প্রধান মাপকাঠি বলিয়া বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান যুগে শিক্ষার বিষয়-বস্তুতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ ঘটায় এই বিষয়গুলি পাঠ্যসূচীতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে বর্তমান যুগে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা প্রায় অসম্ভব। সেইজন্য সর্বস্তরের শিক্ষাতেই বিজ্ঞানের স্থান প্রাধান্য পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, পূর্বে জীবিকার্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা পরিবারে দেওয়া হইত। যেমন, তাঁতি পরিবারভুক্ত ছেলে-মেয়েরা পরিবারেই তাঁত-বোনার কাজ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিত। অনুরূপভাবে, প্রত্যেকটি কারিগরি বিদ্যা অভিভাবকদের শিক্ষাধীন থাকিয়া ছেলেমেয়েরা শিখিত। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক জীবন অনেক বেশি জটিল হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবিরাম চলিতেছে এবং নূতন নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইতেছে। বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশলে অনবরত পরিবর্তন ঘটাইবার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এইজন্য নানা রকমের গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই অবস্থায় পরিবারে বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, পূর্বে যে-আদর্শ এবং মূল্যবোধ সমাজকে বিধৃত করিয়া রাখিত, তাহা বহুলাংশে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ অনেক বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য আচার-ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। পূর্বেকার সহজ সরল বিশ্বাস আধুনিক সমাজে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে বলা যায়। এই অবস্থায় নূতনভাবে সমাজের উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় আদর্শ এবং মূল্যবোধের ব্যাখ্যা করা অথবা পুরাতন মূল্যবোধের পরিবর্তে নূতন মূল্যবোধ প্রবর্তন করা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সেইজন্য বিভিন্ন দেশে নানারকম সামাজিক শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। আধুনিকীকরণের প্রভাবে এবং আধুনিকীকরণের নামে শিক্ষাব্যবস্থায় নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইতেছে এবং যুগোপযোগী নূতন নূতন বিষয়ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে। ইহার ফলে পাঠ্যসূচী (syllabus) এত বেশি ভারী হইয়া পড়িতেছে যে, ক্ল্যাসিকাল ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে পশ্চিম য়ুরোপের বিদ্যালয়গুলিতে ল্যাটিন ভাষাকে ঐচ্ছিক (optional) বিষয় হিসাবে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষেও আমরা অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ক্ল্যাসিকাল ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকার অর্থ হইল অতীতের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনীয় সম্পর্ক ছেদ করা। ইহার ফলে সৃজনী শক্তির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। "গঙ্গোত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করলে প্রাণগঙ্গা শুকিয়ে যাবে. দেশ থাকবে বটে, কিন্তু দেশের মাটীতে রস থাকবে না। যে দেশের অতীত নেই তার ভবিষ্যৎ নেই। অতীত নেই মানে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র নেই। ভবিষ্যৎ নেই মানে নব নব উন্মেষশালিনী সংস্কৃতি নেই। যোগসূত্র ছিন্ন করা চলবে না।"[1] এই দিকটি বিবেচনা করিলে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উভয় সঙ্কট বুঝিতে কষ্ট হয় না। একদিকে, যুগোপ-যোগী বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষাদান না করিলে আধুনিক সমাজে চলাফেরা করা কঠিন। অপর দিকে, সামাজিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচয় না করাইলে সামাজিক বন্ধন বিশ্লিষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সৃজনী প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথ রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব উপরোক্ত উভয় দাবির মধ্যে সঙ্গতিসাধন করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিলে অনেক সামাজিক সমস্যা হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে।

শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব আলোচনা করার সময় আরেকটি বিষয়ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রযুক্তি বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষা-ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। এই প্রতীতি বর্তমান যুগের বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের লেখায় সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান আমাদের বিদ্যার পরিধি (horizon of knowledge) বিস্তার করিতে সাহায্য

1 শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় : বিনুর বই।

করে। কিন্তু বিদ্যা বৃদ্ধি পাইলেই যে বিজ্ঞতা (wisdom) বৃদ্ধি পাইবে ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। আধুনিক জীবনযাত্রায় ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার সঙ্কল্প লইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়। বেকন (Bacon) বলিয়াছিলেন, "Knowledge is power". অর্থাৎ বিদ্যার সাহায্যে শক্তি অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু আজকাল প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী মহলে বলিতে শোনা যায়, "Knowledge is unfortunately power". ইহা বলার· তাৎপর্য, বিদ্যা যে-শক্তি অর্জন করিতে সাহায্য করে, সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে নিয়োজিত করিবার বুদ্ধি বা বিজ্ঞতা প্রদান করে না। এটম বোমা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণায় যাঁহারা সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদের বিভিন্ন স্বীকারোক্তিতে এই হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব প্রকট হইয়াছে। রবার্ট ইয়ুন্‌ক্ (Robert Jungk) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Brighter Than a Thousand Suns-এ এই বিষয়ে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "The age which culminated in the development of absolute weapons identified progress, almost unanimously, with progress in science and technology. But today the outstanding physicist Heisenberg declares: 'The space in which man has developed as an intellectual being has more dimensions than that of the single direction in which he has moved during the last few centuries.'...... This new modesty, like the inhuman and superhuman weapons, has grown from the tree of atomic research....... The atom bomb, whose power is the clearest expression of the lack of moderation in modern man, comes from the same root as the new philosophy of moderation, inspired by the experience of nuclear research."1 অর্থাৎ যে-যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতিকে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে সামাজিক প্রগতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত, সেই যুগেই সাঙ্ঘাতিক মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইজন্য বিশ্ব বিশ্রুত পদার্থ বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, মানুষ এতাবৎ কাল যে-ভাবে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত ও অনুশীলন করিয়া আসিয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে অপরাপর বৃত্তি অনুশীলন না করিলে মানুষ সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিতে অসমর্থ হইবে। এটম সংক্রান্ত গবেষণা হইতে একদিকে যেমন অমানুষিক এবং অতিমানবিক মারণাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে, অপর দিকে মানুষও বিজ্ঞতার অভাবজনিত দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হইয়া নূতনভাবে নম্রতা লাভ করিয়াছে। এটম বোমার

1 Robert Jungk: Brighter Than a Thousand Suns. A Personal History of the Atomic Scientists. Penguin Books. 1964. Pages 304-305.

নির্মম শক্তি মানুষের পরিমিতি-বোধের অভাব নির্দেশ করে। সেইজন্য বিজ্ঞানীদের উচ্চ মহলে পরিমিতি-বোধ ফিরিয়া পাইবার ব্যাকুলতা লক্ষণীয়। অতএব আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান-সাধনা এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করার সময় বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমগ্র সমাজ-জীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সুস্থ সমাজ-জীবন যাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিদ্যাও অনুশীলন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। T. B. Bottomore : Sociology. Unwin University Books. London.

২। Peter Worseley and Others : Introducing Sociology. Penguin Books.

৩। Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Co. New York. 1961. Pages 218-231.

৪। Gillin & Others : Social Problems. The Times of India Press. Bombay. 1

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় ব্যবস্থা

প্রত্যেকটি সমাজেই সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্য সব আচার-ব্যবস্থা হইতে ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। অন্যান্য আচার-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং ইহাদের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণেয়। পক্ষান্তরে, ধর্ম-সম্পর্কিত আচার-ব্যবস্থার লক্ষ্য ও কার্যসূচী বুদ্ধির অগোচর এবং এই কারণে অস্পষ্ট। অতিমানবিক বা অতীন্দ্রিয় আদর্শ ইহার মুখ্য উপজীব্য। লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা চলে না।

দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—একটি বিবর্তনবাদের অনুসরণে এবং অপরটি সামাজিক কাঠামো এবং তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহী তত্ত্বের (structural functional theory) অনুসরণে।

বিবর্তনবাদের অনুসরণে ধর্মের যে-ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা আবার দুই প্রকার। একটি সর্বপ্রাণবাদ (Animism) এবং অপরটি প্রকৃতিবাদ (Naturism or Naturalism)।

সর্বপ্রাণবাদ

সর্বপ্রাণবাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টাইলর (Tylor) এবং স্পেনসার (Spencer) বলেন যে, ধর্মের মূলে রহিয়াছে আত্মা সম্পর্কিত ধারণা। তাঁহাদের মতে আদিম মানব একটি ভুল করিয়া আত্মা সম্পর্কিত ধারণায় উপনীত হয়। নিদ্রিত অবস্থায় দেহ এক জায়গায় অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও স্বপ্নে বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করার অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়। ইহা হইতে তাহাদের দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, মানুষের মধ্যে দুইটি সত্তা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি সত্তা দেহ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে। অপর সত্তা হইতে এই সত্তা অনেক দিক হইতে স্বতন্ত্র। ইহা অনেক বেশি সক্রিয়। কারণ, ইহার পক্ষে চক্ষের নিমেষে দূরদূরান্তরে ভ্রমণ করা সম্ভব। ইহা অনেক বেশি নমনীয়। কারণ, মুখ, নাক, কান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া ইহা অতি সহজে বাহিরে আসিতে পারে। তাহাদের মতে, ইহা এমন জড় পদার্থের দ্বারা গঠিত যাহা ব্যবহারিক জ্ঞানে যে জড় পদার্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাহার তুলনায় অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং বায়বীয় (ethereal)। এই সত্তাকেই তাহারা আত্মা বলিয়া ধরিয়া নেয়, যে-আত্মা অশরীরী অবস্থায় সর্বত্র বিচরণ করিতে পারে। মৃত্যুর পর দেহ পচিয়া গলিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। কাজেই তাহারা ভাবে যে, আত্মা দেহ হইতে মুক্ত

হইয়া অশরীরী অবস্থায় আশপাশে বসবাস করে এবং মাঝে মাঝে যে-কোন জীবন্ত লোকের দেহে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটাইতে সক্ষম। সুতরাং যে-সব ঘটনার যুক্তিসিদ্ধ কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইত না, সেইসব ঘটনার কারণ হিসাবে অশরীরী আত্মার কার্যকলাপকে দায়ী করা হইত। স্বাস্থ্য, জরা, ব্যাধি এবং ব্যক্তিজীবনে অপরাপর সব কিছু ভাল-মন্দের হেতু হিসাবে এইসব অশরীরী আত্মাকে নির্দেশ করা হইত। অতএব প্রার্থনা, বলি, উৎসর্গ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক পূজাপার্বণের মাধ্যমে তাহারা অশরীরী আত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। এইভাবে ধীরে ধীরে আত্মা উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়।

আদিম মানব কেবল মানুষের ক্ষেত্রে আত্মার কল্পনা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। মনুষ্যেতর প্রাণী ও প্রাণহীন বস্তুতেও আত্মার কল্পনা করে। তাহাদের ধারণা হয় যে, মানুষের আত্মা মানুষের দেহ ও কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে এবং অনুরূপভাবে ইতর প্রাণী ও বস্তুর আত্মা বাহ্যিক জগতকে প্রভাবিত করে। নদীর ধারা, নক্ষত্রের গতিবিধি, গাছপালার অঙ্কুরোদগম, ইতর প্রাণীর প্রজনন প্রভৃতি সব কিছুই শেষোক্ত আত্মার প্রভাবাধীন। প্রথমাবস্থায় আদিম মানব বাহ্যিক জগতের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া ইতর প্রাণী ও বস্তুর আত্মাকে প্রার্থনা ও উৎসর্গাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেও সচেষ্ট ছিল। এইভাবে পিতৃপুরুষের পূজা-অর্চনার সঙ্গে প্রকৃতির পূজা-অর্চনা সংযুক্ত হয়। ইহাই সর্বপ্রাণবাদের বিকাশ-ধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

প্রকৃতিবাদ

ম্যাক্স ম্যুলার (Max Muller) প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ টাইলর বর্ণিত আত্মার উৎপত্তি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে মানিয়া লইলেও, তাঁহাদের মতে ধর্মের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা গৌণ। ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে আদিম মানবের উপর বাহ্যিক প্রকৃতির প্রভাব বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাহাদের নিকট প্রকৃতি যুগপৎ ভয়, বিস্ময় এবং আনন্দ উদ্রেক করিত। প্রকৃতির মধ্যেই তাহারা সর্বপ্রথম অসীমের ইঙ্গিত উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধিই তাহাদের মধ্যে ধর্মের অনুপ্রেরণা জোগায়। তখন তাহাদের চোখে প্রকৃতি কেবলমাত্র প্রকৃতি বলিয়া প্রতিভাত হয় না। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে তাহারা অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রকাশ বলিয়া ভাবে এবং বাস্তব ঘটনাবলীকে অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) অর্থাৎ ঈশ্বর ও সৃষ্টি অভেদ এই দার্শনিক মত গড়িয়া উঠে এবং ক্রমোচ্চ নীতির ভিত্তিতে নানাপ্রকার দেব-দেবীর সৃষ্টি হয়।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আত্মা সম্পর্কিত ধারণার অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রকৃতির উপাসনা হইতেই পিতৃপুরুষের উপাসনারও সূচনা হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, সর্বপ্রাণবাদ অনুযায়ী পিতৃপুরুষের উপাসনা প্রথম ধাপ এবং ধীরে ধীরে প্রকৃতির

উপাসনা বা পূজা-অর্চনা প্রবর্তিত হয়। প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী ধর্মীয় ক্রমবিকাশের ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিবর্তনবাদ অনুসারী ব্যাখ্যার সমালোচনা

বিবর্তনবাদের অনুসরণে যে-দুইটি ব্যাখ্যার অবতারণা করা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এই মতবাদগুলি গড়িয়া উঠে নাই। সমগ্র আলোচনাই অনুমান-ভিত্তিক। কাজেই ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার দিক দিয়া এই জাতীয় অনুমান-ভিত্তিক তত্ত্বের মূল্য স্বভাবতই নগণ্য। সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আরও অন্য প্রকার ব্যাখ্যা উপস্থিত করা যাইতে পারে। যেমন, অনেকে বলেন যে বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। বলা হয় যে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কোন দেব বা দেবীর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং উক্ত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বা ক্ষমতা সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করা হয়। জমি বাড়ি প্রভৃতিতে বেআইনীভাবে প্রবেশ করিলে দৈব কোপজনিত কি শাস্তি হইতে পারে তাহা বিশেষভাবে সাধারণ্যে প্রচার করা হয়। ধীরে ধীরে অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে আরও দেব-দেবীর সৃষ্টি হইতে থাকে। আসল কথা হইল, ধর্মের উৎপত্তি কখন কবে কি ভাবে হইয়াছিল ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুতরাং কল্পনার ডানায় ভর করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করা সম্ভব। কিন্তু এই জাতীয় কাল্পনিক তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক এবং মূল্যহীন।

আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য। সর্বপ্রাণবাদ বা প্রকৃতিবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বে আমাদের জীবন-ধারাগত অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়, আদিম মানবের অভিজ্ঞতা নহে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া আমরা বিহ্বল হই, নায়েগ্রা জলপ্রপাত বা গিরিরাজ হিমালয়ের বিশালত্বে ও বৈচিত্র্যে আমাদের মনে সম্ভ্রম-মিশ্রিত ভাবের উদয় হয়, আবার বর্ষায় কীর্তিনাশা পদ্মার রুদ্র মূর্তি দেখিলে আমরা আতঙ্ক অনুভব করি। প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের এইপ্রকার নানা মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আদিম মানবের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করি। এই ধরনের ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ অলীক এবং অস্বাভাবিক, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ডেভিসের মতে, অনেক আদিম অধিবাসীদের নিকট প্রকৃতি সম্পর্কে এইপ্রকার মনোভাব সম্পূর্ণ অর্থহীন। 1

তাহা ছাড়া, বর্তমান সমাজে ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থার স্থান বা তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুমান-নির্ভর বিবরণীর মূল্য নাই বলিলেই চলে। এই সম্পর্কে ডেভিসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে, বিবর্তনবাদীরা পারম্পর্য লঙ্ঘন করিয়া অতি প্রাচীন আচার-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে (যাহার সম্পর্কে

---

1 "Many primitive peoples—for instance, the American Indians—regard this attitude as rather silly". Kingsley Davis: Human Society. Page 514

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নহে) প্রচলিত আচার-ব্যবস্থা (যাহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব) ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অতীতকে জানিবার এবং বুঝিবার একমাত্র সূত্র হইল বর্তমানের সুসভ্য ও আদিম সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান। এই জ্ঞানের আলোক ফেলিয়া তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অতীতের ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। ইহা না করিয়া বর্তমান সমাজকে প্রচলিত ব্যবস্থা (going system) হিসাবে ধরিয়া এই ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে এই প্রচেষ্টা অনেক বেশি সার্থক ও অর্থবহ হইবে। 1

উপরোক্ত সমালোচনাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, বিবর্তনবাদ-অনুসারী ব্যাখ্যা ধর্মের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

ধর্ম সম্পর্কে কর্ম-নির্বাহী তত্ত্ব

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজকে একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাকে এই কাঠামোর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন করিবার মাধ্যম বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি আচারব্যবস্থা পরস্পরনির্ভরশীল এবং সামাজিক কাঠামোর অঙ্গ হিসাবে ইহাদের সার্থকতা। সমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদন করা এই আচারব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য। কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদের মতে, ধর্মীয় আচার-বাবস্থা অন্যান্য সব আচার-ব্যবস্থার ন্যায় সমাজের বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করে। ইহাই ধর্মের উৎপত্তির মূল কারণ।

সমাজের এই বিশেষ প্রয়োজন সমাজস্থ লোকের তিনটি সমস্যা হইতে উদ্ভূত। প্রথমতঃ, মানুষ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে এই বিষয় সম্পর্কে তাহার পক্ষে পূর্ব হইতে অনুমান করা বা প্রস্তুত থাকা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ, যে-পরিবেশে মানুষ বসবাস করে সেই পরিবেশকে সে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। এই অক্ষমতার জন্য স্বভাবতই সে অসহায় বোধ করে। তৃতীয়তঃ, মানুষ যাহা চায় তাহার সবটুকু সে পায় না। কারণ, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োজন মিটাইবার মাধ্যমসমূহ সীমিত। এই অভাব হইতে তাহার ব্যর্থতা আসে এবং সে বঞ্চিত বোধ করে।

এই পৃথিবীতে বসবাস করার শুরু হইতেই মানুষ এই জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। তাহার আয়ত্তাতীত সামগ্রীসমূহকে বা পরিবেশকে বশে আনার জন্য সে তখন হইতেই অনেক রকম চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

তুকতাক

সভ্যতার প্রথম পর্বে মানুষ নানারকম তুকতাক (magic) করিয়া অজ্ঞাত প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহকে বশে আনিতে চেষ্টা করিত। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিন-ওস্কি (Malinowski) ট্রব্রায়ান্ড্ (Trobriand) দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সম্পর্কে

1 তদেব পৃষ্ঠা ৫১৭

যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তুকতাকের গুরুত্ব সম্যকভাবে বুঝা যায়। এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের জীবিকার্জনের মুখ্য উপায় মৎস্যশিকার এবং উদ্যানপালন। এই দুইটি বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান ও কৌশল জানা আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উদ্যানপালনে সাফল্যের জন্য তুকতাক অপরিহার্য বলিয়া তাহারা মনে করে। কারণ, অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা শিখিয়াছে যে, তাহাদের জ্ঞান, কলাকৌশল এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অজ্ঞাত এবং নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য শক্তি সমূহের দ্বারা সব কিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে পারে। অতএব অজ্ঞাত এবং নিয়ন্ত্রণাতীত শক্তি সমূহকে তুকতাকের সাহায্যে বশে আনা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়া ম্যালিনওস্কি মন্তব্য করেন, ট্রব্রায়ানড্ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ দুই প্রকার সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। প্রথম প্রকারের সমস্যা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যবহারিক পন্থায় সমাধান করা সম্ভব এবং দ্বিতীয় প্রকারের সমস্যা সমাধানের জন্য বুদ্ধির অতীত অধি-ব্যবহারিক (supraempirical) পন্থা প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। প্রথম শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের জন্য তাহারা কখনও তুকতাকের আশ্রয় নেয় না। মৎস্য শিকার সম্পর্কে তাহাদের আচরণ আলোচনা করিলে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে। সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত অগভীর হ্রদগুলিতে (lagoon) মৎস্য শিকার করা সহজসাধ্য ও নিরাপদ। প্রয়োগ-কৌশলের উপর নির্ভর করিলেই সাফল্য অবধারিত। সেইজন্য এইপ্রকার মৎস্যশিকারে তুকতাকের প্রয়োগ দেখা যায় না। অপর পক্ষে, গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার করা কেবল যে বিপদসঙ্কুল তাহাই নহে, ফলাফলও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সেইজন্য এই ক্ষেত্রে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং সাফল্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে তুকতাক সম্পর্কিত আচারানুষ্ঠানের প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব বলা যায় যে, মানুষ যখন ভাবে যে তাহার ক্ষমতা, বুদ্ধি এবং কলাকৌশলের উপর সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে না, তখনই সে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইবার জন্য তুকতাকের আশ্রয় লয়।

মানুষ যত বেশি সুসভ্য হইতে থাকে, ততই তুকতাকের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায় এবং ইহার পরিবর্তে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি প্রাধান্য পায়। কিন্তু এই তুকতাকগুলি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে এমন নিবিড় জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, সব সময় এই দুই প্রকারের আচারকে পৃথক করিয়া দেখার উপায় নাই। অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তুকতাকের প্রভাব সুস্পষ্ট।

তুকতাক ও ব্রত

আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। অতীতে যাহা তুকতাক ছিল, তাহাই অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ব্রত হিসাবে সমাজে স্থান পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্মীব্রতের উল্লেখ করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীব্রতের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা

দিয়াছেন। "আমাদের দেশের মেয়েরা প্রধানত তিনটি বড় লক্ষ্মীব্রত করে থাকেন। প্রথম ফাল্গুণ মাসে বীজ বপনের পূর্বে চাষীরাই বেশি এ ব্রত করে—রবিবারে আর বৃহস্পতিবারে। একে বলা যেতে পারে হরিতা-দেবী—সবুজবর্ণ। এই পূজা করে তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে আশ্বিনে কোজাগর-পূর্ণিমায় যখন সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। ইনি হলেন স্বর্ণলক্ষ্মী, হলুদবর্ণ। তৃতীয় লক্ষ্মীব্রত হল অঘ্রানে, যখন পাকা ধান ঘরে এসেছে—ইনি অরুণা লক্ষ্মী। মেয়েরা বছরে আরো কয়েকবার লক্ষ্মীব্রত করেন, যেমন ভাদ্রে, কার্তিকে ও চৈত্রে।"1 অতএব বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, লক্ষ্মীব্রত দেশের তিনটি প্রধান শস্য-উৎসবের সঙ্গে জড়িত। এই ব্রতগুলির সঙ্গে ব্রতচারিণীর মনে ভাল শস্যোৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা সম্পৃক্ত—ইহা সুস্পষ্ট।

মেক্সিকোর কোজাগর লক্ষ্মীপূজার যে ছবি অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে এই দিকটি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "মেক্সিকোতে কোজাগর লক্ষ্মীপূজোয় মেয়েরা এলোকেশী হয়—শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা গোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়।·····মেক্সিকোর পুরাণে আরও দেখা যাচ্ছে, শস্যের রক্ষয়িত্রী তিন বর্ণের তিন দেবতা। একজন অপক্ক হরিৎ শস্যের সবুজ; এক ফলন্ত স্বর্ণশস্যের হলুদ, এবং আর এক আতপতপ্ত সুপক্ক শস্যের সিন্দুরবর্ণ। মেক্সিকোতেও শস্যের নানা অবস্থায় এক-এক দেবী রক্ষা করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে Centeotl এবং তাঁদের একজন Xiloncn সবুজ, অপক্ক শস্যের অধিষ্ঠাত্রী।"2 অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার পুস্তিকায় Myths of Peru and Mexico নামক গ্রন্থ হইতে দুইটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "The women of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long." অপর উদ্ধৃতিটি হইল: "A special group of deities called Centeotl presided over the agriculture of Mexico, each of whom personified one or other of the various aspects of the Maize plant……Xilonen—she typified the Xilote or green ear of the maize."

তুকতাক ও ধর্ম

তুকতাকের সঙ্গে ধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করিলে ধর্মের স্বরূপ বুঝিতে সুবিধা হইবে। প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে সাদৃশ্য চোখে পড়ে। প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় (supraempirical) শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তুকতাক

1 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলার ব্রত। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। পৃষ্ঠা ২১।
2 তদেব পৃষ্ঠা ২৬

ও ধর্ম উভয়ই গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, এই অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব—এই ধারণা হইতে ধর্ম ও তুকতাক উভয়েরই উৎপত্তি হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, ম্যালিনওস্কির মতে, মানুষ যখন নানা সমস্যায় এমনভাবে জর্জরিত হয় যে সম্পূর্ণরূপে দিশাহারা হইয়া পড়ে, অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন সমাধান খুঁজিয়া পায় না, তখনই তাহারা তুকতাক ও ধর্মের আশ্রয় লয়। (They both "arise and function in situations of emotional stress," both "open up escapes from such situations and such impasses as offer no empirical way out except by ritual and belief into the domain of the supernatural.").

তুকতাক ও ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্য এত বেশি যে দুইটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত। প্রথমতঃ, তুকতাক একটি উপলক্ষ মাত্র; কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইহাব প্রয়োগ করা হয়। পক্ষান্তরে, ধর্মকে এই প্রকার নিছক উপলক্ষ বলিয়া ভাবা সঙ্গত নহে। ম্যালিনওস্কি দুইটি উদাহরণের সাহায্যে এই পার্থক্য আলোচনা করিয়াছেন। সন্তান-প্রসবের সময় প্রসূতির যাহাতে মৃত্যু না হয় তাহার জন্য নানারকম তুকতাকের আশ্রয় লইতে দেখা যায়। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আনন্দোৎসবের অঙ্গ হিসাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তবে সব ক্ষেত্রে যে ধর্মের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদের ঐহিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে এই লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। যেমন, যখন কেহ অন্যায় কার্য করার জন্য মনে পীড়া অনুভব করে এবং দোষ স্খালনের জন্য প্রার্থনা বা অন্যান্য ধর্মীয় আচার পালন করে, তখন তাহার লক্ষ্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা এবং পুণ্য অর্জন করা। আবার অনেক সময় অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে লক্ষ্য পার্থিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-পন্থায় এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা ধর্মীয়, তুকতাক সম্পর্কিত নহে। পদ্ধতি-সম্পর্কিত পার্থক্য সম্বন্ধে এই অনুচ্ছেদের শেষদিকে আলোচনা করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত আলোচনা হইতে ধর্ম ও তুকতাকের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তুকতাকের উদ্দেশ্য, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করা (manipulative in essence)। কিন্তু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় শক্তির অনুগ্রহ লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।[1] তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, অতীন্দ্রিয় শক্তির অনুগ্রহ লাভ করিলে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে এই প্রতীতি ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে থাকিতে পারে।

---

1 "Religion offers what is felt to be a way of entering into a relationship with the supraempirical aspects of reality, be they conceived as God, gods, or otherwise" O'dea: The Sociology of Religion. Page 7.

তৃতীয়তঃ, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হইতে তুকতাক ও ধর্মের অনুসৃত পদ্ধতিতে বৈসাদৃশ্য উদ্ভূত হয়। তুকতাকে বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অভিচার (magical rites) এবং কুহক সৃষ্টি (magical spell) করার প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অপর পক্ষে, ধর্মে প্রার্থনা, উপাসনা, শ্রদ্ধাভক্তি, পূজাঅর্চনা প্রভৃতি প্রাধান্য পাইয়া থাকে।

কর্মনির্বাহী তত্ত্ব অনুযায়ী ধর্মের সামাজিক ভূমিকা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তুকতাকের পরিবর্তে ধর্ম উত্তরোত্তর প্রাধান্য পায়। সুতরাং প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ধর্ম সমাজে কি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে? মানুষের জীবনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ না করিতে পারার জন্য অসহায়-বোধ এবং অভাব-জনিত ব্যর্থতা বোধের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। এই অবস্থায় দুইটি দিক হইতে ধর্মের প্রয়োজন। একটি হইল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, অভাবঅভিযোগের ঊর্ধ্বে আরেকটি জগৎ উন্মোচিত করা, যাহাতে জাগতিক দুঃখ অভাব প্রভৃতি সহনীয় হয়। দ্বিতীয়টি হইল, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তুলিয়া ধরা।

উপরোক্ত দুইটি প্রযোজনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-জীবনে এবং ব্যক্তি-জীবনে ধর্মের যে সৃজনমূলক ভূমিকা রহিয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) ধর্মের সাহায্যে মানুষ তাহার দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, পরাজয়ের গ্লানি, ব্যর্থতা প্রভৃতি ভুলিয়া থাকিতে পারে বলিয়া সামাজিক বিক্ষোভ এবং অসন্তুষ্টি স্বভাবতই কম হয়। ইহার ফলে, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশেষ কোন তর্ক উঠে না এবং ইহা অপেক্ষাকৃত সহজভাবে স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হয়।

(২) দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে থাকিলে মানুষ অসহায় বোধ করে এবং দিশাহারা হইয়া পড়ে। এক অতীন্দ্রিয় অপরিবর্তনীয় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ধর্ম মানুষের নিরাপত্তাবোধ বজায় রাখিতে সাহায্য করে। ইহা বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তি-জীবনে এবং সমাজ-জীবনে এই নিরাপত্তা-বোধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) অনেকে সময় বিশেষে সামাজিক বিধি-বহির্ভূত আচরণ করিয়া এবং সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া বিবেকের দংশন অনুভব করে এবং তজ্জনিত মানসিক অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। অন্যায় ক্রিয়াকলাপজনিত অপরাধ লাঘব বা স্খালন করার জন্য ধর্মে প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ থাকায় মানুষ অপরাধবোধ হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে।

(৪) ধর্ম অনেককে জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইতে সাহায্য করে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ফলে তাহাদের অহং-বোধ বিস্তৃতি লাভ করে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহাদের নিকট অর্থবহ হইয়া উঠে। দূর অতীত এবং অন্তহীন ভবিষ্যতের মধ্যে তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব অনুভব করে। এক কথায়, ধর্ম মানুষকে নিঃসঙ্গতা-বোধ (anomie) এবং বিচ্ছিন্নতা-বোধ (alienation) হইতে রক্ষা পাইতে সাহায্য করে।

(৫) সামাজিক সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও ধর্মের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। একদিকে, প্রচলিত মূল্যবোধ, সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণ ধর্মের সমর্থন লাভ করিয়া জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। অপর দিকে, একই প্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করার ফলে সমধর্মাবলম্বীদের মধ্যে স্বভাবতই ঐক্য ও সংহতি গড়িয়া উঠে।

কর্মনির্বাহী তত্ত্বের প্রবক্তাগণ ধর্মের সামাজিক ভূমিকা আলোচনা করিবার সময় কেবলমাত্র ইতিবাচক দিকগুলি তুলিয়া ধরেন। কিন্তু এই ধবনের আলোচনা অত্যন্ত একপেশে। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে এবং বিভিন্ন সমাজে ও বিভিন্ন সময়ে ধর্মের ভূমিকা পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ধর্মের নেতিবাচক (dysfunctional) ভূমিকাও রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যখন ধর্ম সুসংগঠিত আচার-ব্যবস্থা (institutionalised religion) হিসাবে গড়িয়া উঠে, তখনই নেতিবাচক দিকটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অতএব প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

মানব সমাজে দুই প্রকারের ধর্মীয় সংগঠন (religious organisation) দেখা যায়। আদিম সমাজে ধর্ম অসংগঠিত অবস্থায় প্রচলিত ছিল। ধর্মীয় বিধিনিষেধের খুব কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে ধর্ম সুসংগঠিত হয এবং প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া উঠে। বিশেষ কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক অনুভূতিকে (religious experience) কেন্দ্র করিয়া বিশেষ ধরনের পূজাপার্বন, আরাধনা এবং রীতিনীতি প্রচলিত হয়। ম্যাক্স হেবার ইহাকে ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক অনুভূতির অনুসরণে করণীয় কার্যে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট পরম্পরার প্রতিষ্ঠা ("the routinisation of charisma") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন ধর্মের (institutionalised religion) বিবর্তন পর্যালোচনা করিলে তিনটি বিষযের প্রায় একই সঙ্গে উদ্ভব হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, বিশেষ পূজা-পদ্ধতিকে (cult) আশ্রয় করিয়া ধর্মীয় আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি গড়িয়া উঠে। পূজা-পদ্ধতিতে নানারকম প্রতীকমূলক ক্রিয়াকলাপ (liturgies) প্রাধান্য পায়। এইসব ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করিতে হইলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। সেইজন্য প্রথমাবস্থা হইতে প্রত্যেক ধর্মে যাজক শ্রেণী এবং অযাজকীয় ভক্তবৃন্দের (laity) মধ্যে বিভাজন লক্ষণীয়। দ্বিতীয়তঃ, পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধর্মমতও (beliefs) গড়িয়া উঠে। এই ধর্মমতের সঙ্গে অতিকথা (myths) এবং বুদ্ধি-গ্রাহ্য দার্শনিক তত্ত্ব উভয়ই নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। ইহাদের সাহায্যে জন্মমৃত্যুর রহস্য, পাপপুণ্যের প্রকৃতি, জগতের স্বরূপ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হয়। তৃতীয়তঃ, যাহারা এই পূজা-পদ্ধতি এবং ধর্মমত মানিয়া লয়, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই ধর্মীয় সংগঠনের সূচনা হয়। বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক

এবং আধিভৌতিক অভিজ্ঞতার অনুসরণে বিশেষ পূজা-পদ্ধতি ও ধর্মমত গড়িয়া উঠে এবং তাঁহার প্রতি আনুগত্যই হইল ধর্মীয় সংগঠনের মূল ভিত্তি। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে ধর্মের পরস্পরসম্পর্কযুক্ত তিনটি দিক আছে। একটি হইল পূজা-পদ্ধতি সম্পর্কিত (cultic aspect), দ্বিতীয়টি ধর্মমত সম্পর্কিত (intecllectual aspect or aspect of beliefs, creeds and theology) এবং তৃতীয়টি সংগঠন সম্পর্কিত (aspect of religious brotherhood)।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ব্যবস্থা ও সমাজ

একদিকে, প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ব্যবস্থা সমাজস্থ লোকের প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত এবং সমাজ-জীবনের আকৃতি-প্রকৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। অপর দিকে, প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয ব্যবস্থাও নানাভাবে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের উপর ধর্মের ইতিবাচক প্রভাবের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। এই অংশে নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কবা হইবে।

ধর্মীয় ব্যবস্থা কি ভাবে সমাজ-জীবনের আকৃতি-প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়, এই বিষয়টি ম্যাক্স হেবারের আলোচনাব অনুসরণে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম. ইসলাম, হিন্দুধর্ম. বৌদ্ধধর্ম এবং কনফিউশিঅ্যাসের দার্শনিক তত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া হেবার এই সিদ্ধান্তে উপণীত হইয়াছেন যে, পাপপুণ্য বা জগৎ সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাস কাহারা কি ভাবে গ্রহণ করে ইহা অনেকটা তাহাদের সামাজিক পরিচিতির (social status) উপর নির্ভর করে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন। যেমন. শহুরে ছোট ব্যবসায়ী এবং কারিগর জাতীয় লোকেরা কৃষকদের তুলনায় প্রকৃতির উপর অপেক্ষাকৃত অনেক কম নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া, তাহাদের কাজকর্ম যুক্তিসম্মত (rational) লাভ-লোকসানের হিসাব দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যাখ্যার অতীত কোন ঘটনা তাহাদের লাভ-লোকসানের অঙ্কে সাধারণতঃ কোন তারতম্য ঘটাইতে পারে না। অপর পক্ষে, কৃষকগণ প্রকৃতির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণাতীত ঘটনাবলীর জন্য তাহাদের চাষআবাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা আসিতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এই পার্থক্যের জন্য উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ধর্মীয় বিশ্বাসেও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শহুরে ছোট ব্যবসায়ী এবং কারিগর জাতীয় লোকদের জগৎ সম্পর্কে বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্রতি প্রবণতা বেশি। পরিশ্রম করিলে পরিশ্রমলব্ধ ন্যায্য ফল পাওয়া যাইবে—এই বিশ্বাস তাহাদের মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। 1 পক্ষান্তরে, কৃষকগণ নানারকম তুকতাক, ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা যুক্তিহীন

1 "For these reasons, small traders and artisans are disposed to accept a rational world view incorporating an ethic of compensation". Max Weber : The Sociology of Religion. Trans. by Ephraim Fischoff. Beacon Press. Boston. 1963. Page 97. Quoted by O'dea in his book, The Sociology of Religion. Page 57.

এবং পূর্ব হইতে কল্পনা করা যায় না এমন জাগতিক এবং মহাজাগতিক শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। পরিশ্রমলব্ধ ফল পাওয়া যাইবেই—এই ধরনের বিশ্বাসও তাহাদের মধ্যে বিরল। সুতরাং তাহারা স্বভাবতই অধিকতর অদৃষ্টবাদী।

ম্যাক্স হ্বেবার সমাজের সুবিধাভোগী সেরা অংশ (the privileged elite) এবং সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর (the disprivileged) ধর্মীয় বিশ্বাসে বৈসাদৃশ্যেরও উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে, মোক্ষ, পাপ, নম্রতা প্রভৃতি ধারণা প্রথমোক্ত শ্রেণীর নিকট সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ, এই প্রকার ধারণা তাঁহাদের আত্মসম্মানের বিরোধী। বরং তাঁহারা ধর্মের সাহায্যে তাঁহাদের শ্রেণীগত সুখ-সুবিধা এবং জীবনযাত্রা বৈধ এবং যুক্তিসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য অধিকতর আগ্রহী। 1 অপর পক্ষে, যাঁহারা বঞ্চিত শ্রেণীর অন্তর্গত তাঁহারা মোক্ষ-সম্পর্কিত ধর্মীয় ধারণা গ্রহণ করিতে অধিকতর আগ্রহী। যে দুঃখ তাঁহাদের ইহজীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, পরবর্তীকালে সমপরিমাণ সুখ-সমৃদ্ধি তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করে। হ্বেবারের মতে, প্রধানতঃ সামাজিক এবং আর্থিক নিপীড়ন হইতেই মোক্ষ-সম্পর্কিত বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। 2

ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর সমাজ-জীবনের প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া ম্যাক্স হ্বেবার যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্ববিদগণ নানারকম আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে মার্ক্সকে ম্যাক্স হ্বেবারের পূর্বসূরী বলা যাইতে পারে।

এখন আমরা সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলি আলোচনা করিতে পারি।

(১) যাহারা নিজেদের নানা দিক দিয়া ব্যর্থ এবং বঞ্চিত মনে করে, তাহারা ধর্মে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করে। অথবা যাহারা নানা কারণে সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং বিচ্ছিন্নতা-বোধ বা নিঃসঙ্গতা-বোধ হইতে দুঃখ পায়, ধর্ম তাহাদের ছেদ-বেদনা উপশম করিতে সাহায্য করে।

অনেকে বলেন, এইভাবে দুঃখ লাঘব করিয়া ধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার স্পৃহা পরোক্ষভাবে দমন করে। ইহার ফলে সমাজের দিক হইতে অনুকূল পরিবর্তন প্রবর্তন করার পথে ধর্ম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। নিপীড়িত, শোষিত মানুষের সংগ্রাম করিয়া দুঃখজনক অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাইবার মানসিকতাকে

---

1 "Rather they assign to religion the primary function of legitimising their own life pattern and situation in the world". তদেব পৃষ্ঠা ১০৭। O'dea কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৫৯

2 "Since every need for salvation is an expression of some distress, social or economic oppression is an effective source of salvation beliefs". তদেব পৃষ্ঠা ১০৭। O'dea কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৫৯

নষ্ট করে বলিয়া মার্ক্স ধর্মকে আমজনতার নিকট আফিম স্বরূপ (opiate of the masses) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্মরূপী আফিমের প্রভাবে তাহারা বর্তমানের দুঃখ ভুলিয়া ভবিষ্যতের স্বর্গসুখের স্বপ্নে বিভোর থাকে। অথচ কেবলমাত্র স্বীয় চেষ্টায় এবং সংগ্রামের মাধ্যমে অন্যায়ের জগদ্দল পাথর সরাইয়া দিয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে—এত সহজ সরল বিষয়টি ধর্মরূপী আফিমের নেশায় তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

ধর্মের মোহাবেশ যে তাহাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায়, এই সহজ সত্যটি কি কারণে জনসাধারণ বুঝিতে অপারগ, তাহা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেকে বলেন, মানুষ জীবপ্রকৃতির তাগিদে জৈবিক অস্তিত্বের অনুকূল পরিবেশকে গ্রহণ করে এবং জৈবিক অস্তিত্বের প্রতিকূল পরিবেশকে বর্জন করে ও যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। ধর্মীয় উপদেশাবলীর মূল বক্তব্য হইল, তর্কে এবং বিনা দ্বিধায় ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলা কর্তব্য। (যেমন, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর)। কারণ, তাহাতে ভবিষ্যৎ স্বর্গসুখ লাভ করা অবধারিত। অন্যথাচরণ করিলে নরকযন্ত্রণা সুনিশ্চিত। এইভাবে আশৈশব শিক্ষার ফলে জীবপ্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায় নরকযন্ত্রণা এড়াইয়া স্বর্গসুখ লাভ করার প্রতি প্রবণতা গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে সামাজিক বিধি-নিষেধ ও ধর্মীয় অনুশাসন নির্বিবাদে মানিয়া চলা স্বভাবে পরিণত হয়।

আবার ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিদগণ বলেন যে, মানুষ আশৈশব নানা প্রকার নিরাপত্তা-বোধের অভাবজনিত উৎকণ্ঠায় পীড়িত বোধ করে। পিতা বা পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি শিশুর মনে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করেন। পরবর্তী জীবনে আরও শক্তিশালী কাহারও আশ্রয় লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ফলশ্রুতি হিসাবে দৈবশক্তির আশ্রয় এবং অনুগ্রহ লাভ করিয়া মানুষ নিরাপত্তাবোধের অভাবজনিত উৎকণ্ঠা হইতে রক্ষা পায়। সুতরাং ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিদগণের মতে পার্থিব দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ এবং সামাজিক উৎপীড়ন, নিপীড়ন ও শোষণ উপেক্ষা করার উপযুক্ত মানসিকতা এইভাবেই প্রস্তুত হয়।

(২) পার্থিব এবং অপার্থিব সব রকম প্রশ্নের ব্যাখ্যা ধর্মে পাওয়া যাইবে—এই ধারণা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জানা এবং নিয়মিত করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্মে সনাতন বিরোধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর বিচারে এই দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বজনিত অবাঞ্ছিত ফলাফল (এই ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে অজ্ঞানের নিকট জ্ঞানের পরাজয়) মূর্ত হইয়া উঠে। চিন্তার জগতে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধর্মান্ধতা নানা প্রকার অগ্রগতি-বিরোধী সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কাল সম্পর্কে সব কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞান শাস্ত্রে পাওয়া যাইবে, এই ধারণা সর্ব প্রকার সৃজনমূলক কাজের পরিপন্থী। সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, ধর্ম সম্পর্কে এই জাতীয় কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত দাবি উত্থাপন করিয়া যাজক সম্প্রদায় সমাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি না করিয়া বরং সমাজের অবক্ষয় ত্বরান্বিত করেন।

(৩) ধর্মীয় আচার-আচরণ বা রীতিনীতি কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় গড়িয়া উঠে। কিন্তু যখন এইসব আচার-আচরণ বা রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং পরিবেশের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও যাজক সম্প্রদায় অপরিবর্তিত অবস্থায় এই ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর থাকেন, তখন নানা প্রকার সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। যেমন, আদর্শ হিন্দুর আচরণ-বিধি মানিতে হইলে বর্তমান যুগে শিল্পপ্রধান চলিষ্ণু সমাজে চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিকাশের পথ এই কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেকের মতে, হিন্দুধর্মের মায়াবাদ, কর্মবাদ প্রভৃতি তত্ত্ব অর্থনৈতিক উদ্যোগ (entrepreneurship) বিকশিত হইবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনুরূপভাবে, ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছে, তাহাও বর্তমানের তুলনায় অতীতের প্রতি অধিক মাত্রায় আনুগত্য নির্দেশ করে।

তবে এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম-সম্পর্কিত মূল্যবোধ অর্থনৈতিক বিকাশের পথ সুগম করে। ম্যাক্স হেবার The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম মানুষের মনে এমন একটি মূল্যবোধ সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা য়ুরোপে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রশস্ত করে।[1]

(৪) অভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুসরণ করার ফলে সমধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে একাত্মতার (identity function of religion) সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ধর্ম একদিকে যেমন বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকদের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে, অপর দিকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্মতা বা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। অতএব ধর্ম সমাজে সংযোগকারী শক্তি হিসাবে কাজ না করিয়া বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তি হিসাবে কাজ করিতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের নিকট ধর্মের এই নেতিবাচক ভূমিকা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় Crusade বা ধর্মযুদ্ধেরও উল্লেখ করা যায়।

(৫) সম্পূরিত ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিতে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ আছে। কেহ কেহ বলেন, জাগতিক সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে মানুষের দৃষ্টি সম্প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়া ধর্ম তাহার কাজকর্মে, আচার-আচরণে এবং চিন্তাভাবনায় প্রশান্তি আনয়ন করে এবং ব্যক্তিত্বকে সুসংহত এবং সুষমামণ্ডিত করিতে সাহায্য করে। অপর পক্ষে, কেহ কেহ সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে, জীবনের সঙ্কটকালে ধর্মের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তিত্বে ঋজুতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা বিকশিত হয় না। এই বিষয়ে স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু জোর দিয়া বলা কঠিন। কারণ, এই বিষয়টির যাথার্থ্য পরীক্ষামূলকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নহে।

---

1 এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

উপসংহার

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, ধর্মের স্বরূপ, ধর্মের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত জটিল এবং বিতর্কমূলক। যাঁহারা ধর্মীয় ভাবধারায় শ্রদ্ধাভরে অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ধর্ম মানব জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁহাদের মতে, ধর্মের অস্তিত্ব না থাকিলে ঝড়ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে নোঙর-বিহীন নৌকার মত জীবন বিপদসঙ্কুল ও অর্থহীন হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে, যাঁহাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তাঁহাদের মতে ধর্ম হইল অলীক দর্শন এবং সর্বপ্রকার প্রগতির বিরোধী।

উপরোক্ত দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সহজসাধ্য নহে, বোধহয় সম্ভবও নহে। তবে ইহা বলা অযৌক্তিক হইবে না যে, যখনই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া উঠে, তখনই ধর্মের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি অধিকতর প্রকট হয়।

আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ্য। মৃত্যু মানুষের জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে তাহা কোন পার্থিব বা ঐহিক চিন্তা দ্বারা পূরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষ করিয়া, যখন কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় তখন ভাবিতে ইচ্ছা করে মৃত্যুর পরপারে সে সুখে আছে এবং আবার সেখানে আমাদের সঙ্গে তাহার মিলন সম্ভব। মৃত্যুকে সব কিছুর পরিসমাপ্তি বলিয়া ভাবিতে মানুষের মন চাহে না। মৃত্যু সব কিছুর শেষ নহে--এই ভরসা, এই আকাঙ্ক্ষা, এই প্রত্যাশা আমরা ধর্ম হইতে পাইয়া থাকি। এই বিষয়ে যুক্তিতর্কের কোন স্থান নাই। মানুষের নানাবিধ দুর্বলতার মধ্যে ইহা বোধহয় অন্যতম। সেই কারণে ধর্মের সঙ্গে আমাদের নানা প্রকার আবেগ জড়িত থাকে। ধর্ম সম্পর্কে তর্ক করিতে মন আগ্রহী হয় না। এই ক্ষেত্রে সে নিঃসঙ্গ, সে স্বতন্ত্র। এই দিকটি বিচার করিলে মনে হয়, ধর্ম বোধহয় ধ্রুব-তারকার মত মানুষের ব্যক্তি-জীবনে শাশ্বত সত্য হিসাবে চিরদিন বিরাজ করিবে। তবে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে ধর্ম আদৌ থাকিবে কিনা এবং থাকিলে কি রূপ নিবে তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা সম্ভব নহে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Co. New York. 1961. Chapter XIX.

২। Thomas F. O' Dea : The Sociology of Religion. Prentice Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.

৩। Harry M. Johnson : Sociology. Allied Publishers Pvt. Ltd.

সমাজতত্ত্ব

তৃতীয় খণ্ড

সমাজ প্রবাহ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সমাজ প্রবাহ ও সামাজিক পরিবর্তন

সমাজ প্রবাহের প্রকৃতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাজের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি, সমাজকে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করা যায়।

একটি বিশ্লেষণে সমাজের স্থিতিশীলতার দিকটি অধিকতর প্রাধান্য পাইয়া থাকে। সমাজের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য যে-সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, সেই বিষয়গুলি এই জাতীয় বিশ্লেষণের অন্তর্গত। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই দিকটি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা বিধি-শাসিত সমাজে বাস করি। আমাদের কাজকর্ম, আচার ব্যবহার, এমনকি চিন্তা-ভাবনাও, নানাপ্রকার সামাজিক বিধি দ্বারা নিয়মিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। লোকাচার, অবশ্য পালনীয় আচার, প্রথা, আইন প্রভৃতি সামাজিক বিধিগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত। তাহা ছাড়া, সমাজের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য অনেক আচারব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত (institutionalised) হয়। এই প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাগুলি কি ভাবে সমাজের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য বজায় রাখিতে সাহায্য করে, তাহাও আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

আরেকটি দৃষ্টিকোণ হইতে যে বিশ্লেষণ করা হয় তাহাতে সমাজের গতিশীলতার দিকটি অধিকতর গুরুত্ব পাইয়া থাকে। বলা হয় যে, মানুষকে লইয়া সমাজ গঠিত হয়। অথচ মানুষের প্রকৃতি এমন যে, তাহাকে বিধি-নিষেধের নির্দিষ্ট বেড়াজালে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নহে। সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে এবং ইহা তাহার আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বিষয়ে সে স্বতন্ত্র। প্রয়োজন মনে করিলে, সে চিরাচরিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন পন্থা অনুসরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কাজেই সমাজ নিশ্চল অবস্থায় থাকে না, থাকিতে পারে না। সমাজে সম্পূর্ণ ভারসাম্য কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবার দিকে একটা ঝোঁক সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নানা কারণে পরিবেশে অবিরাম পরিবর্তন ঘটায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনাও প্রতিনিয়ত অন্তর্হিত হইতে থাকে। সেইজন্য কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ সমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহাকে **moving equilibrium** বা চলমান ভারসাম্য বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

অতএব সমাজকে যুগপৎ একটি কাঠামো (structure) এবং একটি প্রবাহ (process) বলিয়া ভাবা যাইতে পারে। চলচ্চিত্রের উপমা দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। বিশেষ দৃশ্যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দর্শকদের নিকট মাঝে

মাঝে নিশ্চল বা স্থির (still shot) ছবি প্রদর্শিত হয়। আবার পরক্ষণেই সংশ্লিষ্ট দৃশ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের কথাবার্তা ও চলাফেরার চলমান ছবি প্রদর্শিত হয়। এখানে সামাজিক কাঠামোকে স্থির ছবির সঙ্গে এবং সমাজ প্রবাহকে চলমান ছবির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে উভয় বৈশিষ্ট্যই বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। শারীরবৃত্ত (physiology) বাদ দিযা কেবলমাত্র শারীরস্থান (anatomy) আলোচনা করিলে জীবদেহ সম্বন্ধে একটা নিশ্চল (static) ধারণা জন্মে। অনুরূপভাবে, সমাজের গতিশীলতার দিকটি বাদ দিয়া কেবলমাত্র সমাজের ভারসাম্য যে-সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তাহার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা যায় না। সেইজন্য সমাজপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইদানীং সমাজপ্রবাহের দিকটি আলোচনা করিবার সময় সমাজতত্ত্ববিদগণ Social dynamics বা সামাজিক জঙ্গমত্ব শব্দটি ব্যবহার করিযা থাকেন। সামাজিক জঙ্গমত্বের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহারা সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে, কোন অবস্থাতেই সমাজ নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে না। বরং দেখা যায়, গতিই সমাজের স্বাভাবিক ধর্ম।

সামাজিক জঙ্গমত্ব কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিলে সমাজ প্রবাহ সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হইবে।

আমরা সমাজের বর্ণনা দিবার সময় যখন পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শব্দটি ব্যবহার করি, তখন অর্থপূর্ণ বা অর্থবহ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (meaningful or communicative interaction) বুঝি। কেহ যখন কথা বলে বা কোন অঙ্গভঙ্গি করে, তখন উচ্চারিত শব্দ বা বিশেষ অঙ্গভঙ্গি আমাদের নিকট বিশেষ অর্থ বহন করে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, আমরা যে-অর্থে একজনের কথাবার্তা বা আচারআচরণকে গ্রহণ করি, সেই অনুযায়ী আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি। অর্থাৎ আমরা যে-ভাব বা মতামত ব্যক্ত করিতে চাই, তাহারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমাদের কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে। আবার আর একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, আমাদের ভাব বা মতামতের পশ্চাতে আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল। ইহা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ভাবকে এবং পরোক্ষভাবে আমাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এইভাবেই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। ইহা যেমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য, ঠিক তেমনি দুই বা ততোধিক সঙ্ঘের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচার করিলে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নানা ভাবে ভাগ করা যায়। সমাজপ্রবাহের দিক হইতে তিন প্রকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহারা হইল দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই ত্রয়ী অভিব্যক্তিকে সর্বজনীন বলা চলে। কারণ, সর্ব কালে সর্ব সমাজে এবং সর্বস্তরে এই তিন প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহাবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত তিন প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি হইল সংযোগকারী (associative or conjunctive) এবং অপরটি হইল বিয়োগকারী (dissociative or disjunctive) পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। স্বভাবতই সহযোগিতা প্রথম শ্রেণীর এবং প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

সহযোগিতামূলক কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, নানা রকম আচার-আচরণ সমাজস্থ লোকদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। সেইজন্য এইরূপ আচার-আচরণকে সংযোগকারী আচরণের অন্তর্গত করা যায়। যেমন, সামাজিকীকরণ, অনুসরণ (conformity), অভিযোজন (adaptation), উপযোজন (accommodation), আত্তীকরণ (assimilation) ইত্যাদি।

আবার এমন অনেক আচার-আচরণ আছে যাহা প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করে। এইরূপ আচার-আচরণকে বিয়োগকারী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন, প্রচলিত সামাজিক বিধি হইতে বিচ্যুতি (deviance), সামাজিক স্তর-বিন্যাস, সমাজস্থ লোকদের আয়, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে পৃথক্‌করণ সম্পর্কিত নীতির (principle of segregation) অনুসরণ প্রভৃতি।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে এই বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিয়া সমাজ প্রবাহ ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে যোগসূত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে।

সমাজপ্রবাহ ও সামাজিক পরিবর্তন

সব সমাজেই সামাজিকীকরণের প্রভাবে সমাজস্থ লোকদের জীবন-ধারাগত রীতি-নীতিগুলি অনুসরণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু মানুষ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নহে। সে স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করিতে সক্ষম। সুতরাং সে মাঝে মাঝে ইচ্ছানুযায়ী ভিন্ন আচরণ করিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ-নির্ধারিত পন্থা হইতে বিচ্যুতিও ঘটে। এইরূপ বিভিন্নতা (variation) এবং বিচ্যুতি (deviance) নানা প্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।

সমাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল সামাজিক স্তর-বিন্যাস। সব সমাজেই সমাজস্থ লোকেরা বিভিন্ন অনুভূমিক (horizontal) স্তরে বিভক্ত। এই স্তরগুলি মর্যাদার দিক হইতে ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের নীতির (hierarchical principle) উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইবার প্রয়াস সব সমাজেই দেখা যায়। ইহাকে সামাজিক সচলতা (social mobility) বলা হয়। বলা বাহুল্য, সামাজিক সচলতার ফলে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই বিষয়টি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সব সমাজেই অল্প-বিস্তর অভিবাসন (immigration) এবং প্রবাসন (emigration) ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে সমাজপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি প্রভাবিত হওয়া বিচিত্র নহে। পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলা দেশ) হইতে আগত কোটি কোটি শরণার্থী পশ্চিম বঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে এখানকার সমাজ-জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

খাওয়া-পরা, আচার-আচরণ, এমন কি উচ্চারণভঙ্গিতেও, এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। অভিবাসনের ফলে অভিযোজন (adaptation), উপযোজন (accommodation) এবং আত্তীকরণ (assimilation) সম্পর্কিত নানা সমস্যার উদ্ভব হয় ও তজ্জনিত নানারকম পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ভারতবর্ষের জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বহু "মানুষের ধারা" এখানে অসিয়া মিশিয়াছে।

"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন"।

ইহা কবির কল্পনা নহে। ইহা বাস্তব সত্য। বহু জাতির লোক আসিয়া 'এক দেহে লীন' (যাহা সমাজতত্ত্বে assimilation বা আত্তীকরণ বলিয়া পরিচিত) হওয়ার ফলে ভারতবর্ষীয় জীবন-ধারায় নানা বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। এই অর্থেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-জোড়া সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র (melting pot of world cultures) বলিযা আখ্যাত। ইহা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভাবতবর্ষের ন্যায় এত ব্যাপক হারে অভিবাসন খুব কম ঘটে। কিন্তু যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান যুগে সব সমাজেই অভিবাসন এবং প্রবাসন নিয়মিতভাবে ঘটিযা থাকে, যদিও অনেক সীমিত হারে। ইহার ফলে অত্যন্ত সীমিত গণ্ডির মধ্যে ধীরে ধীরে আমাদেব অজ্ঞাতসারে সংযোগকারী এবং বিয়োগকারী পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। সুতবাং অভিবাসন ও প্রবাসন সামাজিক জঙ্গমত্বের অন্যতম কারণ বলিযা বিবেচিত হইতে পারে।

বহু সমাজে জাতিগত, ধর্মীয় বা আয়ের ভিত্তিতে সমাজস্থ লোকদের মধ্যে পৃথক্‌করণের নীতি (principle of segregation) অনুসৃত হইতে দেখা যায়। দীর্ঘ দিন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উপজীবন-ধারা (sub-culture) গড়িয়া উঠে। কিন্তু সব রকম যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ পৃথককরণ প্রবর্তন করা কোন সমাজ-ব্যবস্থাতেই সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এইভাবে সাময়িক যোগাযোগের ফলে সমাজের এক অংশ অপর অংশকে প্রভাবিত করে।

জন্ম এবং মৃত্যু জীব জগতের স্বাভাবিক ধর্ম। ইহার ফলে সমাজস্থ অধিবাসীদের সংখ্যায় অনবরত তারতম্য ঘটে এবং স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার পরিবর্তিত হয়। তাহা ছাড়া, শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের লোকদের আনুপাতিক হারেও পরিবর্তন হয়। বলা বাহুল্য, সমাজ-জীবনে এই প্রকার পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে।

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। অনেক পরিবর্তন আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে। আবার অনেক পরিবর্তন সুপরিকল্পিতভাবে আনয়ন করা হয়। বর্তমান যুগে অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন মানুষের সযত্ন প্রয়াসের ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে।

সমাজপ্রবাহ বিশ্লেষণ করার সময় আমরা একটি বাধার সম্মুখীন হই। সমাজস্থ লোকদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এত বেশী বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা নজরে পড়ে যে, সব রকম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে।

তাহা ছাড়া, সমাজ-জীবনের উপর যেসব প্রভাব আসিয়া পড়ে, তাহার সব কয়টির সন্ধান পাওয়াও সব সময় সম্ভব হয় না। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে উদাহরণ হিসাবে মাত্র কয়েকটি প্রভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেকগুলি অনুল্লিখিত। কিছু কিছু হয়ত অজ্ঞাত। প্রবহমান নদীর ধারার মত সমাজ প্রবাহও নানাভাবে নানা দিকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে এবং ইহার গতি বিরামহীন। আজ যাহা সত্য, আগামী কাল তাহা সত্য না-ও হইতে পারে। সমাজপ্রবাহ আলোচনা করার সময় এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এইপ্রসঙ্গে ম্যাক আইভারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "Society exists only as a time-sequence. It is a becoming, not a being; a process, not a product. In other words, as soon as the process ceases, the product disappears ....If people no longer observe a custom, the custom no longer exists on the face of the earth. It has no body that remains after it dies. It exists only as a mode of activity, patterned in the minds of those who follow it...........A social structure can not be placed in a museum to save it from the ravages of time."[1] অর্থাৎ সমাজের অভিব্যক্তির ধারা বিরামহীন। বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমাজকে পাওয়া যায়, পরবর্তী সময়ে সেই সমাজের অস্তিত্ব থাকে না। সমাজ বলিতে সমাজস্থ লোকের আচার আচরণ এবং প্রচলিত নানা প্রকার বিধি-নিষেধ বুঝায়। সুতরাং তাহাদের আচার-আচরণে অথবা প্রচলিত বিধি-নিষেধে যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে এইসব আচার-আচরণ বা বিধি-নিষেধের অবলুপ্তি ঘটে। কারণ, যাহারা সামাজিক আচার-আচরণ এবং বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে, তাহাদের জীবনে মূর্ত হইয়াই এইসব আচার-আচরণ সার্থকতা লাভ করে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের আর কোন বাস্তব সত্তা নাই। সুতরাং পুরাতাত্ত্বিক দলিল বা শিলাখণ্ডের ন্যায় সামাজিক কাঠামোকে জাদুঘরে রাখিয়া কালের অবক্ষয় হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে।

1. **Mac Iver and Page: Society. Page . 11.**

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Mac Iver and Page : Society. Macmillan & Co Ltd. London 1959. Foreword to Book III and Chapter XXII.

২। Alex Inkeles : What is Sociology ? Prentice-Hall of India (Private) Ltd. New Delhi, 1965, Chapter VI.

৩। N. F. Washburne : Interpreting Social Change in America. Doubleday & Company. Inc. Garden City, N. Y. 1954. Chapter III.

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা

যখন আমরা মানুষকে সামাজিক জীব বলিয়া বিশেষিত করি, তখন তাহার অপরের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া সহযোগিরূপে বাস করার প্রবণতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাহার মধ্যে এই প্রবণতা না থাকিলে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। কিন্তু সহযোগিতার অনুকূল মনোভাবের সঙ্গে তাহার মধ্যে সহযোগিতা-বিরোধী মনোভাবও রহিয়াছে। একদিকে সে যেমন অপরের সহযোগিতা কামনা করে, অপর দিকে সে তেমনি অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। একদিকে সে যেমন অপরের সহযোগিরূপে কোন অভিন্ন উদ্দেশ্য সার্থক করিতে ব্যগ্র, অপর দিকে সে তেমনি অপরের সঙ্গে টেক্কা দিয়া তাহাকে দাবাইয়া স্বীয় স্বার্থ-সাধনে উৎসুক। এমন কি, যাহারা সহযোগিরূপে এক সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করে, তাহাদের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অবদমিত অবস্থায় দ্বন্দ্বমূলক মনোভাব বিরাজ করিতে পারে।1 আবার যাহারা প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপে নিযুক্ত, তাহাদের মধ্যেও সহযোগিতার মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের চরিত্র এমন যে, তাহার মধ্যে এই প্রকার পরস্পরবিরোধী মনোভাব যুগপৎ বিরাজ করে। সুতরাং সমাজ-প্রবাহের প্রকৃতি সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে দ্বন্দ্বমূলক, প্রতিযোগিতা-মূলক এবং সহযোগিতামূলক আচার-আচরণের বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

দ্বন্দ্ব

সমাজ-জীবনে দ্বন্দ্ব মানুষের নিত্য সহচর। ইহা নানা ভাবে এবং নানা মাত্রায় প্রকাশ পায়। একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইতে পারে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব হইতে পারে, দুই বা ততোধিক সঙ্ঘের মধ্যেও দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইতে পারে। মাত্রার দিক দিয়াও দ্বন্দ্বে অভিন্নতা দেখা যায়। ডেভিস দ্বন্দ্বকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। একটি আংশিক দ্বন্দ্ব (partial conflict) এবং অপরটি সামগ্রিক দ্বন্দ্ব (total conflict)। যখন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিল থাকে, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা সম্পর্কে অমিল থাকে এবং তাহা হইতে বিরোধের সৃষ্টি হয়, তখন ইহাকে আংশিক দ্বন্দ্ব বলা হয়। আবার যখন উদ্দেশ্য

---

1 "It seems that there must always be an element of conflict in our relations with others, as well as one of mutual aid ; the whole plan of life calls for it ; our very physiognomy reflects it, and love and strife sit side by side upon the brow of man". C. H. Cooley : Social Procees. New York. 1918. Page 56. Quoted by Mac Iver and Page in their book, Society. Page 65.

বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা উভয় বিষয়েই অমিল দেখা দেয় এবং এই অমিল হইতে বিরোধের সূত্রপাত হয়, তখন ইহাকে সামগ্রিক দ্বন্দ্ব বলা হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, দ্বন্দ্ব সর্বত্র নিন্দিত হয়। অথচ মানব সমাজে ইহা নিত্য সহচরের ন্যায় সর্ব স্তরে বিরাজ করে। মানব সমাজে যে ঐক্য বা সংহতি দেখা যায়, তাহা মূলতঃ মানসিক বা সাংস্কৃতিক, জৈবিক নহে। নানা রকম শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া এই সংহতি গড়িয়া উঠে। সুতরাং অমিল উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। চিন্তায়, বিচারে এবং মূল্যায়নে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্যের মাত্রা এবং পরিধি বৃদ্ধি পাইলেই বিরোধের সূচনা হয়। সামগ্রিক দ্বন্দ্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল যুদ্ধ। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলা হয় যে, আশৈশব সামাজিকীকরণের ফলে আমাদের মধ্যে একদিকে স্বাজাত্য বৃদ্ধি পায় এবং অপর দিকে অপর জাতির প্রতি বিরুদ্ধ ভাব গড়িয়া উঠে। স্বজাতির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত প্রীতির (ethnocentrism) সঙ্গে অন্যান্য কারণ যুক্ত হইলেই যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। অন্যান্য দ্বন্দ্ব হইতে যুদ্ধ স্বতন্ত্র। কারণ, যুদ্ধে হিংসা ও পাশবিক বল নির্দ্বিধায় এবং অবাধে প্রয়োগ করা হয়। যুদ্ধে এই ধরনের আচরণ মোটামুটিভাবে সর্বজনস্বীকৃত।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া অন্য যে-কোন দ্বন্দ্বে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও বলপ্রয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। একমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষেই বলপ্রয়োগ নীতিসম্মত বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্য কাহারও পক্ষে নহে। যখনই দ্বন্দ্ব হিংসাত্মক রূপ নেয়, তখনই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সর্বতোভাবে ইহাকে দমন করিতে সচেষ্ট হয়।

কিন্তু প্রকাশ্য হিংসাত্মক দ্বন্দ্ব দমন করা হয় বলিয়া মানব সমাজ হইতে দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া ভাবা সঙ্গত নহে। সমাজে নানা প্রকার দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যক্তি স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব, শ্রেণী স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব, ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া দ্বন্দ্ব। কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শের সংঘাতও দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে।

ম্যাক আইভারের মতে, মৌল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দেয়। ইহা শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। তাঁহার বিশ্লেষণের অনুসরণে নিম্নোক্ত উদাহরণগুলির সাহায্যে এই বিষয়টি আলোচনা করা হইল। প্রথমতঃ, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অথবা দুই বা ততোধিক সঙ্ঘের অনুরূপ স্বার্থ (like interest) এমন হইতে পারে যাহার মধ্যে সঙ্গতিসাধন সম্ভবপর নহে (inharmonious)। এই অবস্থায় দ্বন্দ্ব অনিবার্য। ইহা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পাইতে পারে অথবা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে। যেমন, কোন সামগ্রীর যদি দুষ্প্রাপ্যতাজনিত মূল্য (scarcity-value) থাকে, তাহা হইলে যাহাদের নিকট সামগ্রীটি আছে, তাহারা ইহা ধরিয়া রাখিতে চায়। আবার যাহাদের নিকট সামগ্রীটি নাই, তাহারা ইহা পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। এই অবস্থায় দ্বন্দ্বসুলভ আচরণ প্রকাশ পায়। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষমতার লোভ আছে। বিভিন্ন লোকের ক্ষমতার প্রতি লোভের মধ্যে সঙ্গতিসাধন করা সম্ভব নহে। কারণ, 'ক্ষমতা' শব্দটির তাৎপর্য আপেক্ষিক অর্থে

বুঝিতে হইবে। অপরের ক্ষমতা না থাকিলেই একজন ক্ষমতা লাভ করিয়া তৃপ্তি পাইতে পারে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য সামগ্রীর মত ক্ষমতা সমান ভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হয় না। অথচ ক্ষমতা অর্জন করা বা অপরের উপর প্রভুত্ব করার প্রতি লোভ অধিকাংশ লোকের রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকে মানব-সমাজে দ্বন্দ্বের চিরন্তন উৎস বলিয়া গণ্য করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, অসঙ্গতিপূর্ণ অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু (inharmonious like interest) হইতে যেমন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি পরস্পরবিরোধী অসদৃশ লক্ষ্যবস্তু (unlike and antagonistic interests) হইতেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতে পারে। শ্রেণী দ্বন্দ্ব এই পর্যায়ভুক্ত। মালিকের স্বার্থ এবং শ্রমিকের স্বার্থ ভিন্ন এবং উভয়ের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। এই অবস্থায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। এইরকম নানাপ্রকার অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের কথা ভাবা যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা জনসমষ্টি পরস্পরবিরোধী আদর্শ পোষণ করিলে তাহা হইতেও দ্বন্দ্বের সূচনা হওয়া বিচিত্র নহে। তৃতীয়তঃ, অভিন্ন লক্ষ্যবস্তু হইতে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর দ্বৈত ভূমিকা রহিয়াছে। একটি সংযোগকারী (associative) শক্তি হিসাবে এবং অপরটি বিয়োগকারী (dissociative) শক্তি হিসাবে। অভিন্ন লক্ষ্যবস্তু অনুসরণ করার ফলে সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের মধ্যে সংহতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে অপরাপর জনসমষ্টি সম্পর্কে বিরোধী মনোভাবও গড়িয়া উঠে। এই কারণেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অথবা ভিন্ন রাজনীতিক দলের মধ্যে বিরোধ বাধে।

বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ করার সময় আরেকটি বিষয়ও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সমাজে ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিচিতি ও তদনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা অর্পিত হওয়ায় কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে ঈর্ষা ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। যখনই একজনকে অপরের উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তখন ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ইহার প্রতিবাদে হিংসাত্মক প্রতিরোধ গড়িয়া উঠে। ইতিহাসে এই ধরনের নজির প্রচুর আছে। তাহা ছাড়া, শৈশবাবস্থা হইতে শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়িয়া তোলা হয়। পরবর্তী জীবনে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ অনেক সময় হিংসাত্মক বিরোধে পর্যবসিত হয়। সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত থাকে।[1]

1 "............yet as a matter of fact society itself engenders conflict situations and can not avoid doing so. By alloting different statuses to different people it lays the basis for envy and resentment. By giving authority to one person over another it sets the stage for the abuse of authority and for retaliation by force. By instilling ends that are competitive it makes it possible for competition to spill over into violence". Kingsley Davis : Human Society. Page 161

দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অথবা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে নানারকম সামাজিক ব্যবস্থা (social mechanisms) রহিয়াছে। প্রথমতঃ, অনেক সময় কৌতুকরসবোধ (humour) উত্তেজনা হ্রাস করিতে সাহায্য করিয়া হিংসাত্মক কার্যকলাপ হইতে নিবৃত্ত করে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের সঙ্গে বিরোধ বাধিতে পারে তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়াও (social distance or avoidance) বিরোধ এড়ান যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সমাজস্থ লোকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধী মনোভাব (sentiment formation) গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। সেইজন্য সব সমাজেই দ্বন্দ্ব নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, সমাজে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে বলিয়া ভাল-মন্দ বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত নানা প্রকার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অবিরাম পরিবর্তনের ফলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না—এই ধারণা উক্ত অবস্থাকে সহনীয় করিয়া তোলে এবং বিরোধের সম্ভাবনা দূর করিতে সাহায্য করে। পঞ্চমতঃ, অপরকে পরাভূত করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে ইহা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে চরিতার্থ করিবার জন্য সব সমাজেই সুসংগঠিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার (organised rivalry) ব্যবস্থা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যুযুৎসু, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি মানব সমাজ হইতে দ্বন্দ্ব চিরতরে নির্মূল করিতে পারে না। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ডেভিস বলেন: "Conflict is a part of human society because of the kind of thing human society is. There is no social mind, but only the minds of particular individuals; no social end, but only the ends of concrete persons. In so far as harmony is attained, it is through the agreement of individual minds, and this agreement thrives best when there is an external danger.........."[1] অর্থাৎ সমাজের পৃথক কোন সত্তা নাই। সুতরাং সমাজের পৃথক কোন মন নাই; স্বতন্ত্র কোন লক্ষ্যও নাই। সমাজস্থ লোকদের পৃথক পৃথক মন আছে, ইচ্ছা আছে, লক্ষ্য আছে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ইচ্ছা এবং লক্ষ্যের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপিত হইলেই সমাজেও সঙ্গতি স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ বাহ্যিক বিপদের সম্মুখীন হইলেই সমাজস্থ লোকদের ইচ্ছা এবং লক্ষ্যে সঙ্গতি স্থাপিত হয়। অন্যথায় হয় না। এই কারণে মানব সমাজের নিত্য সহচররূপে দ্বন্দ্ব বিরাজ করে।

প্রতিযোগিতা

ম্যাক আইভার প্রতিযোগিতাকে পরোক্ষ দ্বন্দ্ব (indirect conflict) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ডেভিস ইহাকে সংশোধিত আকারে বিরোধ

1 তদেব পৃঃ ১৬২।

(a modified form of struggle) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুইটি ব্যাখ্যা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে ভেদরেখা খুব সুস্পষ্ট নহে। আমরা তিন দিক হইতে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারি। প্রথমতঃ, দ্বন্দ্বের লক্ষ্য হইল বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করা। (Davis : "...conflict...aims to destroy or banish the opponent...". Mac Iver : "When individuals or groups thwart or impede or restrain or injure or destroy one another in the effort to attain some goal, direct conflict occurs.")। পক্ষান্তরে, যখন প্রতিযোগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া অথচ প্রত্যক্ষভাবে তাহার কাজকর্মে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিয়া কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করা হয়, তখন এই প্রকার প্রয়াসকে প্রতিযোগিতা বলা হয়। (Davis : "...competition simply aims to out-do the competitor in achieving some mutually desired goal." Mac Iver : "When individuals or groups do not actually impede the efforts of one another but nevertheless seek to attain their ends in ways which obstruct the attainment of the same ends by others, indirect conflict occurs.")। দ্বিতীয়তঃ, দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তিগণ কি প্রকার আচরণ করিবে এই সম্পর্কে সর্বজনস্বীকৃত কোন নিয়ম নাই। কিন্তু নিয়মনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া প্রতিযোগিতা করিতে হয়। সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত নিয়মের সঙ্গতি থাকে। অতএব প্রতিযোগীদের এইসব নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। তৃতীয়তঃ, দ্বন্দ্বে যে-কোন পন্থা অবলম্বিত হইতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় বলপ্রয়োগ বা অসাধু উপায় বর্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন প্রতিযোগিতায় নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, তখন ইহা দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়। সুতরাং অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

সমাজ-জীবনে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয় ভূমিকা রহিয়াছে। ইহা সমাজকে গতিশীল করিয়া তোলে। প্রতিযোগীগণ পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে সৃজনী শক্তি বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নানা ভাবে এবং নানা দিকে প্রসার লাভ করে। সমাজজীবনও স্বভাবতই সমৃদ্ধ হয়।

প্রতিযোগিতার উপরোক্ত ইতিবাচক দিকটি আলোচনা করিবার সময় ইহার নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোর সমর্থকগণ প্রতিযোগিতার স্বপক্ষে বহুবিধ যুক্তির অবতারণা করেন। কিন্তু ইহার অনিষ্টকারক দিকটি সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ কিছু বলেন না। তাহারা ভুলিয়া যান যে, অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে দিলে প্রাচুর্যের সঙ্গে দারিদ্র্য পাশাপাশি থাকিতে পারে ; অধিকাংশ লোকের আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কে

আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাহারা আরও ভুলিয়া যান যে, অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ লইয়া কিছুসংখ্যক উৎপাদক একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রবর্তন করিতে পারে। ইহার ফলে বিপুলায়তন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়, যাহা সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনীতিক দিক হইতে মোটেই বাঞ্ছনীয় বা কাম্য নহে। নিরাপত্তা এবং যুক্তিসম্মত সুযোগ-সুবিধা লাভ করা মানুষের চিরন্তন কামনা। অবাধ প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে এই কামনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার আশঙ্কা থাকে।

এক সময় শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাঞ্ছনীয়, এমন কি বিশেষ প্রয়োজনীয়, বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বর্তমানের বহু বিশেষজ্ঞের মতে, শিশুর স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে ইহা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ মুষ্টিমেয় শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার দিবার যে-ব্যবস্থা এক সময় জনপ্রিয় ছিল, তাহাও আজকাল বাতিল করা হইতেছে। ইহার পরিবর্তে অধ্যয়নরত সব শিশুদের পুরস্কৃত করা হয়। শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথমাবস্থায় সহযোগিতা-মূলক মনোভাব গঠন করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, পরবর্তী জীবনে শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রতিযোগিতার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক আছে বলিয়া অধিকাংশ সমাজেই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগিতাবর্জিত ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া একটি সমন্বিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হয়।

সহযোগিতা

সাধারণতঃ প্রতিযোগিতার বিপরীত অবস্থাকে সহযোগিতা বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে সহযোগিতার যথার্থ তাৎপর্য এবং সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন অভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য যখন কিছুসংখ্যক লোক সহযোগিরূপে কাজ করে, তখন এই প্রকার প্রয়াসকে সহযোগিতা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সহযোগিতার পরিপূরক হইতে পারে, বিরোধী নহে। সেইজন্য সহযোগিতার লক্ষ্য অধিকতর সার্থক করিবার জন্য অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

অভিন্ন অথবা অনুরূপ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া সহযোগিতামূলক কাজকর্ম বা আচার-আচরণের সূচনা হইতে পারে। অভিন্ন আদর্শ বা লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে সচেতন হইলে জনসাধারণ নানা কারণে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের তুলনায় যৌথ প্রচেষ্টা অধিকতর কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ হয়—এই ধারণা তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, অভিন্ন আদর্শ বা লক্ষ্যের প্রকৃতি এমন যে, ইহা

সমধর্মী লোকদের মধ্যে একাত্মতা বা ঐক্য বোধ সৃষ্টি করে। এই ঐক্যবোধ তাহাদের সহযোগিরূপে কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল মাত্র অভিন্ন লক্ষ্য থাকিলেই সহযোগিতার উদ্ভব হয় না। যখন অভিন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া একাত্মতার সৃষ্টি হয়, কেবল তখনই সহযোগিতার উদ্ভব হয়। সেইজন্য দেখা যায় যে, যখন কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে, তখন রাষ্ট্রনায়কগণ দেশবাসীর মধ্যে অভিন্ন লক্ষ্যকে (এই ক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়লাভ করা) কেন্দ্র করিয়া দেশপ্রেম বা দেশপ্রীতি জাগরিত করিতে চেষ্টা করেন। কারণ, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইলেই দেশবাসীগণ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া অভিন্ন উদ্দেশ্য সফল করিতে উদ্যোগী হইবে।

অনুরূপ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়াও সহযোগিতার উদ্ভব হইতে পারে। একই সামগ্রীর উৎপাদক বা বিক্রেতাগণ কয়েকটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা লাভজনক বলিয়া মনে করিতে পারে। উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা সমবেতভাবে কাঁচামাল ক্রয় করিতে পারে। কারণ, বহু সামগ্রী একত্রে ক্রয় করিলে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে ক্রয় করা সম্ভব হয়। অনেক সময় বিক্রয়ার্থে প্রচারকার্যেও সহযোগিতা করিতে দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বার্থ প্রত্যেকের পৃথক, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখনই ধারণা হয় যে, কোন কোন বিষয়ে সহযোগিতা করিলে ব্যক্তি-স্বার্থ অধিকতর সার্থক হইবার সম্ভাবনা আছে, সেখানেই সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

সমাজতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে এই দুই প্রকার সহযোগিতামূলক কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অভিন্ন লক্ষ্য হইতে যে সহযোগিতার উদ্ভব হয়, তাহার স্থায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে না। অভিন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া যে আদর্শ বা একাত্মতা গড়িয়া উঠে তাহাই সহযোগিতামূলক কাজকর্মে প্রয়োজনীয় উৎসাহ জোগায়। সেইজন্য সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতা অনেক সময় সংহতি আনার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী হয়। যখন কোন জাতি বিদেশী শাসনে নিপীড়িত হয় অথবা কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় অপর ধর্মাবলম্বীদের নিকট লাঞ্ছিত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে উৎপীড়ন হইতে সংহতি গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। অভিন্ন লক্ষ্য হইতে যে সহযোগিতার সৃষ্টি হয়, তাহা নানারকম সৃজনমূলক প্রচেষ্টার পথ প্রশস্ত করে।

পক্ষান্তরে, অনুরূপ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সহযোগিতা গড়িয়া উঠে, তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ইহার স্থায়িত্বও অপেক্ষাকৃত কম। ইহার কারণ, এই প্রকার সহযোগিতায় ব্যক্তি-স্বার্থ প্রাধান্য পায়। কাজেই যতদিন পর্যন্ত সহযোগিতা দ্বারা ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ হয়, ততদিনই সহযোগিতা অটুট থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পৃথক পৃথক স্বার্থের মধ্যে ক্ষণস্থায়ীভাবে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই সহযোগিতা সম্ভব। যখনই স্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, সহযোগিতার বন্ধনও ছিন্ন হয়।

আধুনিক শিল্প-প্রধান সমাজ সূক্ষ্ম এবং জটিল শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এই প্রকার সমাজের স্থিরত্ব (stability) অনুরূপ স্বার্থের মধ্যে সঙ্গতিস্থাপনের উপর নির্ভর করে। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে অসঙ্গতি উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। সেই কারণে শিল্প-প্রধান সমাজে অসঙ্গতিজনিত অস্থিরতা এবং নানা প্রকার বিরোধ দেখা দেয। ব্যক্তি-জীবনে নিঃসঙ্গতা-বোধ (anomie), বিচ্ছিন্নতা-বোধ (alienation) এবং উচ্ছৃঙ্খলতা এই অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি।

দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার মধ্যে সম্পর্ক

সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ করিলে পারস্পরিক সম্পর্কের এই ত্রয়ী অভিব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়। সহযোগিতার নিবিড় বন্ধন-জাল সমাজকে বাঁধিয়া রাখে, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু ইহাও সম পরিমাণে সত্য যে, সমাজে সর্ব স্তরে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব বর্তমান। সৌর জগতে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ এই উভয় শক্তিই যুগপৎ ক্রিয়াশীল। ইহাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এমন একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয, যাহা গ্রহ নক্ষত্রকে নিজ নিজ কক্ষপথে থাকিযা আবর্তন করিতে সাহায্য করে। যদি কখনও আকর্ষণ-বিকর্ষণে তারতম্য ঘটে এবং ইহার ফলে ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে সৌর জগতে প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে। অনুরূপভাবে, সমাজেও দ্বন্দ্ব (প্রতিযোগিতাকে দ্বন্দ্বের সংশোধিত রূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে) এবং সহযোগিতা এমনভাবে বিরাজ করে যে, সামাজিক ভারসাম্য কোনভাবে বিঘ্নিত হয় না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সহযোগিতাই সমাজ-জীবনের মূল ভিত্তি। কোন কারণে যদি সহযোগিতার বন্ধন শিথিল হয় এবং দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পায়, তাহা হইলে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। মাঝে মাঝে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইবার আশংকা যে দেখা দেয় না তাহা নহে। সব সমাজেই এই ধরনের বিপর্যয় কোন-না-কোন সময় আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজকে বাঁচাইয়া রাখার তাগিদ অগ্রাধিকার লাভ করে এবং সমাজে ঐক্যবন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হইল, অনেক সময় দ্বন্দ্বের ইতিবাচক ভূমিকা থাকে। ইহা সমাজ-প্রবাহকে স্রোতোহীন বদ্ধ অবস্থা (stagnation) হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করে। দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি হিসাবে অনেক সামাজিক পরিবর্তন এবং সংস্কার প্রবর্তিত হইতে দেখা যায়। অতএব সমাজ-জীবনে দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা কেবল যে পাশাপাশি বিরাজ করে, তাহা নহে; উভয়ের সহাবস্থান বাঞ্ছনীয়।[1]

---

1 "Co-operation crossed by conflict marks society whereever it is revealed......" Mac Iver and Page : Society. Page 65.

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Co., New York. 1961. Chapter VI.

২। Mac Iver and Page : Socieiy. Macmillan & Co. Ltd. London. 1959. Pages 62-70.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অনুসরণ, বিচ্যুতি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সমাজ প্রবাহের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে তিনটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, সমাজস্থ লোকদের অধিকাংশ সামাজিক বিধি এবং অনুশাসন অনুসরণ (conformity) করিয়া চলে। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক বিধি হইতে বিচ্যুতির (deviance) সংখ্যা ও ব্যাপকতা অপেক্ষাকৃত সীমিত। তৃতীয়তঃ, সামাজিক বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নানা প্রকার সামাজিক নিয়ামক (mechanisms of social control) রহিয়াছে।

সমাজ প্রবাহ সম্পর্কিত আলোচনাকে অর্থবহ করিতে হইলে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর আলোক সম্পাত করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সমাজস্থ লোকেরা কেন সামাজিক বিধিসমূহ অনুসরণ করিয়া চলে? দ্বিতীয়তঃ, কি কি অবস্থায় সামাজিক বিধি হইতে বিচ্যুতি ঘটিতে দেখা যায়? তৃতীয়তঃ, কি কি উপায়ে সামাজিক নিয়ামকসমূহ বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করে?

অনুসরণ

অনুসরণের ব্যাখ্যাস্বরূপ সর্বাগ্রে সামাজিকীকরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শৈশবাবস্থা হইতে শিশুর মনে বিভিন্ন উপায়ে সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, আদব-কায়দা প্রভৃতি অনুপ্রবেশ করান হয়। ভাষা-শিক্ষার মাধ্যমে সে যে কেবল ভাষার বৈশিষ্ট্যমূলক প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয় তাহাই নহে, সে বিভিন্ন শব্দের ব্যঞ্জনা সম্পর্কে অবহিত হয়। প্রত্যেক সমাজের ঐতিহ্য সেই সমাজে প্রচলিত ভাষার প্রকাশভঙ্গিতে এবং শব্দের দ্যোতনায় প্রতিফলিত হয়। সুতরাং একদিকে পরিবারস্থ লোকজন, শিক্ষক এবং পাড়াপ্রতিবেশী শিশুকে সমাজে যাহা ন্যায় বলিয়া স্বীকৃত তাহা অনুসরণ করিতে এবং যাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত তাহা হইতে বিরত থাকিতে শিক্ষা দেন। অপর দিকে, ভাষা শিক্ষা করার মাধ্যমে সে অজ্ঞাতসারে সমাজের ঐতিহ্য আত্মস্থ করিয়া থাকে। অতি শৈশবাবস্থায় যখন শরীর এবং মন উভয়ই গঠিত হইতে থাকে, সেই সময় চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্মের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় সঙ্গতি স্থাপিত হয়।[1] অর্থাৎ শিশু যাহা ভাবে, তাহা তাহার বাহ্যিক

1 "In thts formative period (i. e. infancy) the physiological and mental aspects of habit, the ways of acting and the ways of thinking, are most thoroughly and intimately unified". Mac Iver and Page : Society. Page 144

আচরণে প্রতিফলিত হয়। অতএব তাহাকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং অজ্ঞাতসারে বিভিন্ন সূত্র হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া সে আত্মস্থ করে, সব কিছুই তাহার বাহ্যিক আচার-আচরণে প্রকাশ পাইতে থাকে। পূজনীয়দের বিশেষ কোন আদেশ বা নির্দেশ সে অমান্য করিতে পারে; কিন্তু যে সিস্টেম বা গঠনতন্ত্র হইতে এই আদেশ বা নির্দেশ উদ্ভূত হয়, সেই সিস্টেমকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তাহার নাই। অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় তাহার পক্ষে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কিছু বর্জন করিয়া বাকিটুকু গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। সামাজিকীকরণের এই পর্যায়কে social indoctrination বা সামাজিক কর্তব্যা-কর্তব্য সম্বন্ধে দীক্ষিতকরণ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

দীর্ঘকাল যাবৎ দীক্ষিতকরণ চলিবার ফলে সমাজস্থ লোকদের সামাজিক বিধি-সমূহ মানিবার অনুকূলে মানসিকতা তৈরী হইয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে সমাজ-প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘুচিয়া যায়। চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ এবং কাজকর্মে তাহারা সমাজ-নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে। তাহারা সামাজিক রীতিনীতিকে অপরিহার্য ও মঙ্গলদায়ক বলিয়া গ্রহণ করে। যে-সব রীতিনীতির সঙ্গে তাহারা অপরিচিত, সেইগুলিকে তাহারা অপ্রয়োজনীয় এবং সেই কারণে বর্জনীয় বলিয়া গণ্য করিতে শিখে। এইভাবে ধীরে ধীরে সমাজে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী তাহারা চিন্তা এবং আচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। অভ্যস্তকরণের কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকার ফলে শেষ পর্যন্ত সামাজিক রীতিনীতিসমূহ তাহাদের মনন চিন্তন ও বিভিন্ন আবেগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। এক কথায়, সামাজিক রীতিনীতি-সমূহ মানিয়া চলা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। সামাজিকীকরণের এই পর্যায়কে habituation বা সমাজবিষয়ে অভ্যস্তকরণ বলা হয়।

সামাজিকীকরণ ছাড়া অনুসরণের (conformity) আরেকটি কারণ হইল যে, যখনই সমাজের স্বীকৃত ধারা হইতে কোন বিচ্যুতি ঘটে, তখন সমাজ নানা উপায়ে এই বিচ্যুতি প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হয়। এই উপায় সমূহকে সামাজিক নিয়ামক বলা হয়। এই পরিচ্ছেদের শেষ দিকে এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

বিচ্যুতি

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এইরূপ ধারণা করা ঠিক হইবে না যে, সমাজস্থ লোকদের আচার-আচরণ বা চিন্তা-ভাবনায় বিভিন্নতা (variation) থাকে না। সব সমাজেই এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই বিভিন্নতা সামাজিক বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। সমাজের বিধি লঙ্ঘন করিয়া সামাজিক রীতিনীতি-বহির্ভূত আচরণকে সামাজিক নিয়মের বিচ্যুতি বলা হয়। বিচ্যুতি নানা রকমের হইতে পারে।

এমন অনেক বিচ্যুতি আছে যাহা সমাজে সব সময় ঘটিতেছে, অথচ

শাসন কর্তৃপক্ষ বা জনসাধারণের তরফ হইতে এই বিচ্যুতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার বিশেষ কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। যেমন, সামাজিক বিধি হইল, দুই বা ততোধিক রাস্তার সংযোগস্থলে অথবা রাস্তার অপর কোন চিহ্নিত স্থানে (zebra crossing) রাস্তা পার হইতে হয়। কিন্তু এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া রাস্তা পার হইতে প্রায়ই দেখা যায়। অথচ এইরূপ বিধির লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সমাজে তেমন কোন সোরগোল শুনা যায় না। ইহার কারণ, সামাজিক মূল্যবোধসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।1 কিছু মূল্যবোধ আছে যাহা মুখ্য বা প্রধান (dominant) বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার কিছু মূল্যবোধ আছে যাহা গৌণ বা পরিবর্তনশীল (variable) বলিয়া গণ্য হয়। শেষোক্ত মূল্যবোধ ও তৎসম্পর্কিত রীতিনীতিসমূহ কেহ অনুসরণ করিতে পারে, আবার না-ও করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্বভাবতই বিভিন্নতা দেখা যায়।

আরেকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যায়। সমাজে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের কিছু কিছু সামাজিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়। স্পষ্টতঃ সমাজ-বিরোধী কোন কাজ না করিলেও তাহারা কোন কোন বিষয়ে সামাজিক ধারা-সম্মত কাজ করিতে অনিচ্ছুক। উদাহরণস্বরূপ হিপিদের (hippies) কথা উল্লেখ করা যায়। সমাজের তরফ হইতে এইরূপ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন প্রয়াস নাই। এই প্রকার বিচ্যুতিকে বিপথগমন (aberration) বলা যাইতে পারে।

কিন্তু হিপিদের যখন মাদকাসক্ত (drug addict) এবং চোরাগোপ্তা (clandestine) মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ে জড়িত হইতে দেখা যায়, তখন ইহাকে নিছক বিপথগমন বলিয়া গণ্য করা হয় না। সমাজ এই জাতীয় বিচ্যুতি দমন করিতে উদ্যত হয়। আইনের দৃষ্টিতে ইহা দণ্ডনীয় অপরাধ। আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ (crime) বিচ্যুতির চরম উদাহরণ। স্বভাবতই এই জাতীয় অপরাধের সঙ্গে সমাজের প্রধান মূল্যবোধ লঙ্ঘনের প্রশ্ন জড়িত। যেখানেই প্রধান মূল্যবোধ সংক্রান্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সমাজ দণ্ডবিধি প্রয়োগ করিতে অন্যথা করে না। আমরা দেখিয়াছি যে, এমন অনেক অপরাধ আছে যাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও কার্যক্ষেত্রে নিষ্ঠা সহকারে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হয় না। কারণ, এইগুলি গৌণ মূল্যবোধ সম্পর্কিত অপরাধ।

আবার কিশোর-কিশোরীরা যখন আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ করে, তখন ইহাকে তরুণবয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা (juvenile delinquency) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এইসব ক্ষেত্রে শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া থাকে।

সমাজে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা কোন কোন প্রচলিত আচার-ব্যবস্থাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না এবং ইহাদের আশু সংশোধন কামনা করেন। সেইজন্য তাঁহারা সুচিন্তিতভাবে সংশ্লিষ্ট আচার-ব্যবস্থাসমূহ লঙ্ঘন করেন এবং

1 Dr. Florence Kluckhohn তাঁহার Variation in Value Orientations নামক গ্রন্থে 'dominant' এবং 'variable' এই দুই প্রকার মূল্যবোধের উল্লেখ করেন।

ইহা সর্বসাধারণের নিকট ফলাও করিয়া প্রচার করেন। এই ধরনের লোককে (non-conformist) বা চিরাচরিত পন্থার বিরোধী বলিয়া বর্ণনা করা যায়। সাধারণতঃ এইভাবেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (religious sect) উদ্ভব হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত সমাজ-সংস্কারকদের এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

তাহা ছাড়া, এমন অনেক অপরাধ আছে যাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধী ব্যক্তিগণ শাস্তি এড়াইয়া যাইতে সক্ষম হয়। এই প্রকার অপরাধ বাবু-কাজের সঙ্গে জড়িত (white collar crimes)। কর ফাঁকি দেওয়া, ঘুষ নেওয়া, ব্যাঙ্ক বা কোন প্রতিষ্ঠানের তহবিল তছরূপ করা প্রভৃতি শেষোক্ত শ্রেণীর অপরাধের অন্তর্গত।

মানুষ কি কারণে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করে ইহা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহার মূল কারণ মনস্তত্ত্ব-সম্পর্কিত। অনেক লোকের নিয়ম-বিরোধী কাজ করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। তাহাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিপথগামীর বৈশিষ্ট্যসমূহ (deviant characteristics) ফুটিয়া উঠে। ইহাকে মানসিক ব্যাধির লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং চিকিৎসার মাধ্যমে তাহাদের এই ব্যাধি দূর করা যাইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, বিশেষ সামাজিক অবস্থায় বা পরিবেশে বিপথগামীর বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পায়। যেমন, কেহ যদি শৈশবে স্নেহ, ভালবাসা বা সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় অথবা কাহারও পিতা-মাতার মধ্যে সদ্ভাব না থাকায় যদি পারিবারিক পরিবেশ সুস্থ জীবন-যাপনের প্রতিকূল হয় অথবা আর্থিক অনটনের জন্য কেহ যদি স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সমাজ-বিরোধী আচরণ করার প্রবণতা গড়িয়া উঠা অস্বাভাবিক নহে।

প্রকৃতপক্ষে, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং সমাজতত্ত্বসম্পর্কিত ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। একটিকে অপরটির পরিপূরক বলা যাইতে পারে। শৈশবাবস্থায় সুযোগ-সুবিধা বা স্নেহ-ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় এমন এক প্রকার মানসিকতা গড়িয়া উঠে যাহা সুস্থ সমাজ-জীবন যাপন করার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যদি শৈশবাবস্থা হইতে সুষ্ঠুভাবে সমাজানুমোদিত আচার-আচরণ অনুসরণ করার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সামাজিকীকরণে ত্রুটি থাকায় বিচ্যুতি ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ যদি শক্তিমান ও সক্রিয় হয়, তাহা হইলে সামাজিক বিধির লঙ্ঘন হ্রাস পায়। কারণ, বিচ্যুতি ঘটিলে শাস্তি পাইবার ভয় থাকে। তৃতীয়তঃ, অনেক গৌণ বিষয়ে বিচ্যুতির সুযোগ দিয়া সমাজস্থ লোকদের নানাবিধ সঞ্চিত উত্তেজনাকে নিরাপদভাবে নিরসন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে বিচ্যুতি safety valve-এর কাজ করে। এই বিষয়টি পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, মার্টন (Robert K. Merton) বলেন যে, অনেক সমাজে

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে বিচ্যুতির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়া তিনি বলেন যে, সেখানে শৈশবাবস্থা হইতে আর্থিক সাফল্য অর্জন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র বৈধ সমাজ-স্বীকৃত পন্থায় (legitimate means) সাফল্য অর্জন করা সঙ্গত, এইরূপ শিক্ষার উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ইহার ফলে লক্ষ্য (ends) প্রাধান্য পায়, উপায় বা পন্থা (means) সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়। বৈধ বা অবৈধ উপায় নির্বিশেষে সাফল্য অর্জন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সমাজ-নির্দিষ্ট পন্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটা বিচিত্র নহে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত ব্যবস্থাসমূহকে দুই দিক হইতে বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রথমতঃ, সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত। সামাজিক বিধিসমূহ মানিয়া চলিবার উপযুক্ত মানসিকতা গঠন করার প্রচেষ্টা সফল হইলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য এবং আস্থা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। সেইজন্য এই দুইটি আচার-ব্যবস্থাকে সামাজিক নিয়ামক হিসাবে গণ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, সবরকমের শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও সামাজিক বিধি লঙ্ঘিত হইতে পারে। সেইজন্য সব সমাজেই বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থাগুলি ইতিবাচক ও নেতিবাচক হইতে পারে। আবার ইতিবাচক ও নেতিবাচক—এই উভয় প্রকার ব্যবস্থা শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে।

যখন কেহ সমাজানুমোদিত পন্থা অনুসরণ করে, তখন তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য এবং অপরের নিকট আদর্শ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ইতিবাচক ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়। যখন কোন শিশুকে ভাল কাজ করার জন্য আদর করা হয়, তখন ইহাকে শারীরিক ক্ষেত্রে (on the physical level) ইতিবাচক ব্যবস্থার প্রয়োগ বলা যাইতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রশংসা করিয়া বা নানারকম সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াও সমাজানুমোদিত কাজকর্মে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইহা মানসিক ক্ষেত্রে (on the socio-psychological level) ইতিবাচক ব্যবস্থার প্রয়োগের উদাহরণ। আবার অনেক সময় আর্থিক দিক হইতে লাভজনক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া বাঞ্ছিত কাজকর্মে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ইহা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (on the economic level) ইতিবাচক ব্যবস্থার প্রয়োগ।

যখন কেহ সমাজানুমোদিত পন্থা লঙ্ঘন করে এবং সমাজের অননুমোদিত কাজকর্মে লিপ্ত হয়, তখন শেষোক্ত প্রকার কাজকর্ম হইতে বিরত করার উদ্দেশ্যে সমাজ নানারকম নেতিবাচক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। নেতিবাচক ব্যবস্থাও তিন রকমের

হয়। প্রথমেই দৈহিক শাস্তি-প্রয়োগের উল্লেখ করা যায়। অবাধ্য শিশু হইতে শুরু করিয়া বয়স্ক অপরাধী ব্যক্তির উপর এইরূপ শাস্তি প্রযুক্ত হয়। যাহাতে ভবিষ্যতে আর সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করিতে সাহস না পায়, তাহা নিশ্চিত করার জন্য এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের অননুমোদিত কাজকর্ম করার জন্য নিন্দা বা ভর্ৎসনা করা হয় (social-psychological)। এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায়ে (small community) বিশেষভাবে কার্যকরী। কারণ, এই প্রকার সম্প্রদায়ে পরস্পর পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকায় কোন কাজকর্ম বা আচরণের জন্য নিন্দা বা সমালোচনা হয়, ইহা কেহ চায় না। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করিয়া সমাজ-বিরোধী কাজকর্ম হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করা হয়। যেমন, আদালতে অপরাধী ব্যক্তির উপর জরিমানা বা অর্থদণ্ড ধার্য করা হয়। অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের হাত-খরচ বন্ধ করিয়া বা কমাইয়া দিয়া অননুমোদিত আচরণ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করার রীতি সর্বজনবিদিত।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য সমাজে বিভিন্ন রকম আচার-ব্যবস্থা রহিয়াছে। লোকাচার, অবশ্য পালনীয় আচার, প্রথা, প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা, আইন প্রভৃতিকে সামাজিক নিয়ামক বলিয়া গণ্য করা যায়। সামাজিক সঙ্ঘও, বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ, সামাজিক নিয়ামকের অন্তর্গত।

সামাজিক নিয়ামক সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতা প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, যাহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তাহাদের নিকট নিয়ন্ত্রণকারীদের প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য যত কম বা বেশি হইবে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কম বা বেশি কার্যকর হইবে। যেমন, পুত্র বা কন্যার চরিত্র-গঠন করার বিষয়ে পিতামাতার প্রচেষ্টা অধিকতর কার্যকর হয়। কারণ, সন্তান পিতামাতাকে ভালবাসে এবং তাঁহাদের স্নেহ লাভ করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত থাকে। অনুরূপভাবে, ক্ষুদ্রায়তন ও বিচ্ছিন্ন (isolated) গ্রাম-সমাজে ভৌগোলিক সচলতা সীমিত থাকায় ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করার জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হয়। এই অবস্থায় সামাজিক রীতিনীতির বিচ্যুতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিলে সমাজের তরফ হইতে নানা প্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং এই চাপের নিকট নতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ সুসংহত (unified) হইলে সামাজিক নিয়ামকসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, এইরূপ সমাজে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন আচার-ব্যবস্থা না থাকায় সামাজিক রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য কোন কারণে শিথিল বা বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অপর পক্ষে, জটিল নগর-সমাজে সমাজস্থ লোকের আনুগত্য লাভ করিবার জন্য নানা প্রকার সঙ্ঘ ও সমিতি সচেষ্ট থাকে। ইহার ফলে সামাজিক রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য স্বভাবতই

বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সামাজিক নিয়ামকসমূহের কার্যকারিতা তদনুযায়ী হ্রাস পায়। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে যদি বিরোধ বা অসঙ্গতি থাকে, তাহা হইলে সামাজিক নিয়ামকসমূহের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। কারণ, অসঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষার ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং বিভ্রান্তি হইতে সমাজে স্বীকৃত আচার-আচরণ হইতে বিচ্যুতি ঘটে। আধুনিক শিল্প-প্রধান সমাজে তরুণ-তরুণীদের বেখাপ্পা আচরণ (maladjusted behaviour) সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া UNESCO-এর একটি প্রতিবেদনে এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষি-ভিত্তিক সমাজে সামাজিক পরিচিতি (social status) এবং তৎসম্পর্কিত ভূমিকা (role) সম্পর্কে কাহারও মনে কোন সংশয় ছিল না। সুতরাং সামাজিক অনুশাসন মানিয়া চলা মোটামুটি স্বভাব-সিদ্ধ আচরণে পরিণত হয়। কিন্তু জটিল শিল্প-প্রধান সমাজে বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষায় অসঙ্গতি থাকায় সামাজিক পরিচিতি ও তৎসম্পর্কিত ভূমিকা সম্পর্কে সংশয় থাকে। এইরূপ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বেখাপ্পা আচরণের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে। UNESCO-এর প্রতিবেদন হইতে একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হইল: "In contrast to non-industrialised society, where moral principles and customs are something pre-determined and understood, to which everyone is expected to conform, the great social changes introduced by industrialised society bring in their train the breaking up of these norms. In this urban civilisation with its new freedom for the individual, each person must find and create his own way of life. Freedom from old feudal and class distinctions has presented man today with the problem of freedom to establish a new standard of morals and values. The relationship of young people to God and the Church is typical of this process today."[1] অর্থাৎ প্রাক্ শিল্প-যুগীয় সমাজে নৈতিক মান ও প্রথা পূর্ব-নির্ধারিত এবং সর্বজন-স্বীকৃত ছিল। কিন্তু শিল্প-ভিত্তিক সমাজে যে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে এই সব নীতি ও প্রথা সম্পূর্ণরূপে ছিন্নমূল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান শিল্প-সভ্যতায় চিরাচরিত নীতি ও প্রথার বন্ধন শিথিল হওয়ায় প্রত্যেক মানুষকে নূতনভাবে নৈতিক মান ও মূল্য নির্ধারণ করিতে হইতেছে। পূর্বেকার শ্রেণী-বিন্যাসও বিপর্যস্ত হইয়াছে। কাজেই পরিবর্তিত মূল্যমান অনুসারে নূতনভাবে

1 Report of the International Expert Meeting on "The Maladjusted Behaviour of Young People in Present Day Society.' Bulletin of UNESCO Youth Institute, June 1958. Number Two. Page 36.

সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করাও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর ও তৎসম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে লোকের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের মনোভাবের অনিশ্চয়তা নির্দেশ করে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Harry M. Johnson : Sociology. Allied Publishers Private Ltd.

২। Mac Iver and Page : Society. Macmillan & Co. Ltd. London. 1959. Chapter VII.

৩। Alex Inkeles : What is Sociology? Prentice-Hall of India Pvt Ltd. New Delhi.

৪। T. B. Bottomore : Sociology. Unwin University Books.

৫। Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Company. New York. 1961. Chapter III.

৬। Albert K. Cohen : Deviance and Control. Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.

৭। Ogburn and Nimkoff : A Handbook of Sociology. Routledge and Kegan Paul Ltd. London. 1960. Chapter IX.

৮। Anderson and Parker : Society : Its Organisation and Operation. Affiliated East-West Press Pvt. Ltd. New Delhi.

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে সামাজিক পরিবর্তন বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা প্রয়োজন। অধ্যাপক মরিস্ গিন্‌স্‌বার্গ সামাজিক পরিবর্তনের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন: "By social change I understand a change in social structure, e.g. the size of a society, the composition or balance of its parts or the type of its organisation.........The term social change must also include changes in attitudes or beliefs, in so far as they sustain institutions and change with them." 1 গিন্‌স্‌বার্গের মতে সামাজিক পরিবর্তন দুই প্রকারের পরিবর্তন নির্দেশ করে। প্রথমতঃ, সামাজিক কাঠামো এবং তৎসম্পর্কিত কার্যাবলীর পরিবর্তন। দ্বিতীয়তঃ, যেসব আদর্শ, মূল্যবোধ বা সামাজিক বিধি সামাজিক কাঠামোকে সংহত করিয়া রাখে এবং ইহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিতে সাহায্য করে, ইহাদের পরিবর্তন। এই দুই প্রকার পরিবর্তনকে পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা অনুচিত। কারণ, একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। সমাজস্থ লোকের চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটিলে, ইহা সামাজিক কাঠামোতে সঞ্চারিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিম যুরোপের দেশগুলিতে পরিবারের আয়তন ছোট হইবার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া গিন্‌স্‌বার্গ বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে জন্মহার সঙ্কোচন করার ফলেই সীমিত পরিবারের উদ্ভব হয়। 2 এই ক্ষেত্রে মানুষের ভাবধারার পরিবর্তন সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করিয়াছে। আবার সামাজিক কাঠামোতে পবিবর্তন ঘটিলে, মানুষের চিন্তাজগতে তাহার গভীর প্রতিফলন হইতে দেখা যায়। গ্রাম-সমাজের পরিবর্তে নগর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কেবল যে সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটে তাহা নহে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন সূচিত হয়। অতএব বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এই দুই প্রকার পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উভয় প্রকার পরিবর্তনকে অভিন্ন বলিয়া ভাবাই সঙ্গত।

---

1 Morris Ginsberg: Essays in Sociology and Social Philosophy. Peregrine Book.

2 "There is a general agreement that this has been brought about in the main by voluntary restriction of births." তদেব পৃষ্ঠা ১৩৮

কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ এই উভয় প্রকার পরিবর্তনকে যুক্তভাবে জীবন-ধারাগত পরিবর্তন বা cultural change বলিয়া অভিহিত করেন এবং সামাজিক পরিবর্তনকে ইহার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহাদের মতে সামাজিক পরিবর্তন বলিতে কেবল সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কার্যাবলীর পরিবর্তন বুঝায়। প্রসঙ্গতঃ ডেভিসের উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ "By 'social change' is meant only such alterations as occur in social organisation—that is, the structure and functions of society. Social change thus forms only a part of what is essentially a broader category called 'cultural change.' The latter embraces all changes occurring in any branch of culture, including art, science, technology, philosophy, etc. as well as changes in the forms and rules of social organisation." 1 অধ্যাপক ডেভিস যে-সব উদাহরণের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য আলোচনা করিয়াছেন, এই উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, দার্শনিক তত্ত্ব, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিদ্যার পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। য়ুরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সীমিত পরিবারের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অধ্যাপক গিন্‌স্‌বার্গ জনসাধারণের নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে, মহিলাদের মুক্তি-আন্দোলনও জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ সুগম করিয়াছিল।2 সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ বুঝিতে হইলে কাঠামোগত পরিবর্তন এবং জীবন-ধারাগত পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য না করাই বিধেয়। কারণ, সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় অনেক জীবন-ধারাগত পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক কাঠামোর সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কিন্তু কিছুকাল পর সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিলে বুঝা যায় যে, জীবনধারাগত পরিবর্তন সমূহের পরিণতি হিসাবে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উপরে উল্লিখিত উদাহরণগুলি এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করে।

সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে আরেকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে নিবিড় সম্বন্ধজাল তৈরী হয়, তাহাই সমাজ। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অবিরাম পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাহা হইলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে পরিরর্তন ঘটে, তাহাকে কি সামাজিক পরিবর্তন বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়?

---

1 Kingsley Davis: Human Society. Page 622

2 "To these must be added changes of moral and religious outlook, and the fact that, for various reasons, the movement for the emancipation of women came in many countries to be associated with propaganda in favour of birth control."

আমরা সামাজিক পরিবর্তনের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী এই প্রকার পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলিয়া আখ্যাত না করার কোন কারণ নাই। এই অর্থেই বলা হয় যে সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে ইহাকে আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করা উচিত। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অবিরাম নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটে। ইহাকে metabolism বা রাসায়নিক রূপান্তর বলা হয়। আমরা এই ধরনের পরিবর্তন বা রূপান্তর সম্পর্কে প্রায়ই অবহিত বা সচেতন থাকি না। কিছুকাল গত হইলে রাসায়নিক রূপান্তরের ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটে, সেই সম্বন্ধে সচেতন হই। এই জাতীয় পরিবর্তনকেই আমরা দৈহিক বা চরিত্রগত পরিবর্তন বলিয়া আখ্যা দেই। অনুরূপভাবে, সমাজে অবিরাম যে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহাকে social metabolism বা সমাজদেহের রাসায়নিক রূপান্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইসব সূক্ষ্ম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন রূপান্তরের ফলে সামাজিক কাঠামোতে বা জীবন-ধারায় যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই কেবল সামাজিক পরিবর্তন বলিযা আখ্যা দেওয়া সঙ্গত। তবে সমাজস্থ লোকদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সহজসাধ্য নহে।1 কারণ, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার দাবি-দাওয়া লইয়া মালিক-গোষ্ঠীর এবং শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে মতপার্থক্য হওয়ার ফলে সুসংগঠিত শ্রমিক সঙ্ঘের উৎপত্তি হয়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ সামাজিক পরিবর্তনই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত।2

এই কারণে ডেভিসের অভিমত হইল, সামাজিক পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে আলোচ্য সময়ের ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলে ভাল হয়। তাহা হইলে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে কোন প্রকার বিভ্রান্তি ঘটিবার অবকাশ থাকিবে না। আলোচ্য সময়ের ব্যাপ্তি সঙ্কীর্ণ হইলে অনেক ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। উপরন্তু, কোন বিশেষ সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা করিতে হইলে কোন্ সময় হইতে কোন্ সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন সংঘটিত হইল তাহা নির্দেশ করিলে আলোচনা অর্থবহ হয়।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় আরও কয়েকটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ, পরিবর্তনের মাত্রা (unit of change) কি হইবে?

---

1 "The distinction between interaction and change may seem elementary, but in practice it is not always clear." Kingsley Davis: Human Society. Page 623

2 "……..interaction is possible because there is a structure, and change is possible because there is interaction." তদেব পৃষ্ঠা ৬২৩

সামাজিক পরিবর্তন বলিতে কি গোটা সমাজের পরিবর্তন বুঝায়, না সমাজের অংশ বিশেষের পরিবর্তন বুঝায়? কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববিদ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজকে কয়েকটি জাতিরূপে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সামাজিক পরিবর্তন বলিতে এক জাতিরূপ হইতে অপর জাতিরূপে সমাজের রূপান্তর বুঝায়। এই প্রসঙ্গে সরোকিনের নামোল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁহার Social & Cultural Dynamics নামক গ্রন্থে সমাজকে নিম্নোক্ত দুইটি জাতিরূপে • ভাগ করিয়াছেন: Ideational ও Sensate।1 কিন্তু এই ধরনের প্রয়াস তাৎপর্যহীন বলিয়া গণ্য হয়। কারণ, দুই বা ততোধিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য এত বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, মাত্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজের জাতিরূপ নির্ণয় করা কঠিন। উপরন্তু, পরিবর্তনের মাত্রা হিসাবে গোটা সমাজকে গ্রহণ করার আরেকটি অসুবিধা আছে। সমাজে নানা ভাবে নানা পরিবর্তন ঘটিতে পারে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন গবেষক নিজেদের পছন্দানুযায়ী বিশেষ পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বা গতি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। এই অবস্থায় একই প্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা হওয়া বিচিত্র নহে। এই সব অসুবিধার কথা ভাবিয়া অনেক সমাজতত্ত্ববিদের সুচিন্তিত অভিমত হইল যে, গোটা সমাজের পরিবর্তনের গতি বা প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা না করিয়া সমাজের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তনগুলির পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, শিক্ষায়, কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পে বা পারিবারিক গঠনে ও কার্যাবলীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিনা • এবং ঘটিয়া থাকিলে কি প্রকারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিলে প্রচেষ্টা অনেক বেশি সার্থক ও অর্থবহ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের কোন্ অংশে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ইহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন। ইহা না করিলে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট থাকিয়া যায়। যেমন, এক ব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা হইলে এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, পরিবর্তন ত' অনেক রকমের হইতে পারে। স্বাস্থ্য, মন, মেজাজ, ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিতে পারে। কাজেই কোন্ বিষয়ে বা কোন্ দিকে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ইহা পরিষ্কারভাবে না বলিলে বক্তব্যটি অর্থবহ হয় না। তৃতীয়তঃ, পরিবর্তনের 'হার' পরিমাপ করা এবং পরিবর্তনের 'গতি' নির্দেশ করার ক্ষেত্রেও অসুবিধা

1 The ideational culture emphasises the spiritual and non-material; the sensate stresses materialism and agnostic concepts of value and reality. Taoist China, Buddhistic India and mediaeval Christian Europe represent ideational cultures. The Western culture of today represents the sensate system.

দেখা দেয়। এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে পরিবর্তনের 'হার' পরিমাপ করিতে অসুবিধা হয় না। যেমন, গত পঞ্চাশ বৎসরে লোকসংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে অথবা শিশু মৃত্যুর হার কি পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে—এই জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করা কঠিন নহে। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে পরিবর্তনের 'হার' নির্দেশ করা সম্ভব নহে। যেমন, গত পঞ্চাশ বৎসরে কোন বিশেষ সমাজের লোক কি পরিমাণ যুক্তিবাদী হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করা প্রায় সাধ্যাতীত। পরিবর্তনের 'গতি' নির্দেশ করাও সমভাবে অসুবিধাজনক। যেমন, কেহ যদি প্রশ্ন করেন, সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা প্রগতি না প্রত্যাগতি (retrogression) সূচিত হয়, তাহা হইলে এই ধরনের প্রশ্নের কোন সোজা উত্তর দেওয়া কঠিন।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যে-সব সমস্যা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি স্মরণ রাখিলে সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ বুঝিতে সুবিধা হইবে।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব

সামাজিক পরিবর্তন কেন ঘটে, এই সম্পর্কে সমাজতত্ত্বে নানা রকম মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদগুলিকে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কয়েকটি মতবাদকে আবর্তনশীল (cyclical) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই জাতীয় মতবাদের মূল বক্তব্য হইল যে, পারম্পর্য রক্ষা করিয়া বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই জাতীয় মতবাদ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর একই প্রকার পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। ইহা অবাস্তব। আবার কয়েকটি মতবাদকে রৈখিক (linear) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই জাতীয় মতবাদের মূল বক্তব্য হইল যে, সমাজের বিভিন্ন অংশে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই পরিবর্তন বিরামহীন। অতীতে যাহা ঘটিয়াছে, বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে—সব পরিবর্তনই অনন্য। একটির সঙ্গে অপরটির কোন মিল খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। নানা প্রকার শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আবর্তনশীল মতবাদসমূহে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করা হয় (philosophy of history)। পক্ষান্তরে, রৈখিক মতবাদসমূহে সামাজিক পরিবর্তনগুলির মূল কারণসমূহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়। আবার কিছু মতবাদকে নিয়ন্ত্রণবাদ-সম্পর্কিত (deterministic) বলিয়া অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই জাতীয় মতবাদে সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যাস্বরূপ কোন বিশেষ একটি কারণ নির্দেশ করা হয়। যেমন, সামাজিক পরিবর্তনের হেতু বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কেহ কেহ কেবলমাত্র ভৌগোলিক পরিবেশে পরিবর্তনের উল্লেখ করেন। অনেকে কোন বিশেষ একটি সামাজিক কারণের উল্লেখ করিয়া সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। এই ধরনের মতবাদ

গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ, সমাজ নানাভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং অন্যান্য সব রকম প্রভাব উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র একটি প্রভাব বিবেচিত হইলে সমগ্র আলোচনাই অর্থহীন হইয়া পড়ে।

আমরা বহুল প্রচারিত কয়েকটি মতবাদ বা তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিতে পারি।

মার্ক্সীয় মতবাদ

মার্ক্সের মতে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলুপ্ত হইয়া কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণী-দ্বন্দ্ব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিরাজ করিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। তিনি যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ। উৎপাদন-পদ্ধতি (forces of production) দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক (relations of production) নির্ধারিত হয়। সুতরাং কোন্ শ্রেণী সমাজে প্রাধান্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে, ইহা প্রধানতঃ উৎপাদন-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। যে-শ্রেণী প্রাধান্য অর্জন করে, স্বভাবতই সেই শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল আইন-কানুন, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি (superstructure) বিষয়ের সৃষ্টি হয়। এক কথায়, উৎপাদন-পদ্ধতির প্রভাব সারা সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকে না। যখনই উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে, তখন সামাজিক সম্পর্কেও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। পূর্বে উৎপাদনের উপায়গুলি (means of production) করায়ত্ত থাকার ফলে যাহারা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত, তাহাদের স্থলে নূতন এক শ্রেণী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য ভোগ করিয়া থাকে। ইহার ফলে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে-শ্রেণী উৎপাদনের উপায়সমূহ করায়ত্ত করে, তাহাদের প্রভাব স্বভাবতই সারা সমাজে প্রতিফলিত হয়। আইন-কানুন, সাহিত্য প্রভৃতি (superstructure) অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয়।

এই তত্ত্বের সাহায্যে মার্ক্স সমগ্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এতাবৎ কাল পৃথিবীতে যত রকমের সমাজ-ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে, সব কয়টি সমাজই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া উদ্ভূত হইয়াছে।1 শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং তৎসম্পর্কিত পরিবর্তন চলিতে থাকিবে।

সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যাস্বরূপ মার্ক্সের মতবাদকে নানা দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, দুইটি সমাজে অভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসৃত হইলেও সামাজিক সম্পর্কে বিভিন্নতা থাকা বিচিত্র নহে। বর্তমান যুগে সব সমাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। তাহা

1 "The history of all hitherto existing society is the history of class struggle." Marx

সত্ত্বেও এক সমাজ হইতে অপর সমাজের সামাজিক সম্পর্ক পৃথক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপাদন-পদ্ধতি অভিন্ন বলা চলে। কিন্তু দুইটি রাষ্ট্রের সমাজ-ব্যবস্থা পৃথক। তাহা ছাড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। মানুষের চিন্তাধারা, আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অভিন্ন চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ বিরাজ করিতে পারে। উপরন্তু, উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উভয়ই পরিবর্তিত হইতেছে। ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইতেছে বলিলেও ভুল হয় না। ইহার কারণ, প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফল পাইতে হইলে প্রযুক্তি বিদ্যার দাবির (demands of technology) সঙ্গে আপস করিতে হয়। মানুষের স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য নানারকম দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আচার-ব্যবস্থাদি (institutions) প্রবর্তন করা হইতেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষণীয়। ইহা অনস্বীকার্য যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র শব্দ দুইটি যে অর্থ বহন করিত, বর্তমান কালে ঠিক সেই অর্থ বহন করে না। এই পরিবর্তনের গতি রুদ্ধ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং ভবিষ্যতে ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র কি রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার এই সর্বব্যাপী ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব মার্ক্সের আলোচনায় উপেক্ষিত হইয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পর্বে প্রযুক্তি বিদ্যার সামাজিক তাৎপর্য অনুমান করা মার্ক্সের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক দিক ছাড়া সামাজিক জঙ্গমতার (social dynamics) বাকি সব দিক মার্ক্সের আলোচনায় উপেক্ষিত হইয়াছে। দুই বা ততোধিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যখন বিরোধ বাধে অথবা এক জাতির (race) সঙ্গে যখন অপর এক জাতির সংঘর্ষ হয়, তখন এই প্রকার দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মার্ক্সের অনুসরণে কেবল অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে সমস্যার অত্যন্ত সরলীকরণ করা হয়। দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক কারণ থাকিতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে না-ও থাকিতে পারে। অর্থনৈতিক কারণ থাকিলে, তাহার সঙ্গে অন্যান্য কারণও সম্পৃক্ত থাকিতে পারে। সুতরাং সব সামাজিক ঘটনাকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার করিলে আলোচনা আংশিক ও একপেশে হয়।

তৃতীয়তঃ, সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা প্রভৃতি সৃজনমূলক প্রয়াসকে অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করা অনুচিত। এই সব ক্ষেত্রে যাহা সত্যিকারের সৃজন-মূলক এবং সর্বকালজয়ী বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে, তাহা বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হইতে সঞ্জাত—এই উক্তি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। আসল কথা হইল,

অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্যতীত মানুষ অন্যান্য উৎস হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া সৃজনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। মার্ক্সের আলোচনায় এই দিকটিও উপেক্ষিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে শোষণ চিরতরে অন্তর্হিত হইবে, ইহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অর্থনৈতিক স্বার্থ না থাকিলেও একজন অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে অথবা একজন অপর জনকে নিপীড়ন করিতে পারে। মানুষকে কেবল যুক্তিবাদী বলিয়া ভাবা অন্যায়। তাহার মধ্যে পশু-প্রবৃত্তিও অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার চরিত্রগত রূপান্তর ঘটিবে, ইহা প্রমাণসাপেক্ষ। যুক্তিতে এই উক্তির কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।[1]

মার্ক্সের মতবাদের মূল্যায়ন করিবার সময় আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীর প্রভাব সম্পর্কে মার্ক্সই সর্বপ্রথম আলোক সম্পাত করেন। আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। জাগ্রত অবস্থার অধিকাংশ সময় আমরা নানা রকম অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অতিবাহিত করি। অতএব আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। অর্থনৈতিক স্বার্থজনিত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়া সমাজে অনেক আলোড়ন ও পরিবর্তনের সূচনা হয়, ইহাও অনস্বীকার্য। কিন্তু মার্ক্সীয় মতবাদের সর্ব-প্রধান দুর্বলতা হইল যে, অর্থনৈতিক কারণকেই সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে অপরাপর কারণগুলি উপেক্ষিত হয়। সেইজন্য অর্থনৈতিক কারণকে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করা অনুচিত। মার্ক্সীয় মতবাদের যে-সব সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা এই ত্রুটি হইতে উদ্ভূত।

সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করার বিষয়ে মার্ক্সের অবদান আলোচনা করিবার সময় আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পরিবেশ শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অনুকূল হইলেও সমাজস্থ জনসাধারণ শ্রেণী-সচেতন হইয়া বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার মানসিকতা অর্জন না করা পর্যন্ত বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে না বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে টাল্‌কট্ পারসন্‌স্ সামাজিক কার্যকলাপে স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা সম্পর্কে যে তত্ত্বের (voluntaristic theory of social action) অবতারণা করিয়াছেন, তাহারই পূর্বসূরী হিসাবে মার্ক্সকে গণ্য করা যাইতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা সম্পর্কে যে-অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মার্ক্সের লেখায় পাওয়া যায়, তাহা

---

1 "......the power of man over man has deeper roots than economic advantage and that it can be at least as formidable and as tyrannical under a socialist economy as under any other kind of regime." Mac Iver and Page : Society, Page 565.

ম্যাক্স হ্বেবারের লেখায় আরও সুস্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হুসেলিৎস্ (Hoselitz) সম্পাদিত A Readers' Guide to the Social Science নামক পুস্তক হইতে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য: "...he (Marx) was perhaps the first scholar to anticipate what Talcott Parsons calls the voluntaristic theory of social action. Marx's conception that revolution, although in an ultimate sense inevitable, occurs only when people are motivated to carry it out (when they have become 'class conscious') implies that deterministic social forces exist, but that they become operative only through affecting voluntary action—an important insight made explicit and elaborated by Max Weber."1

ম্যাক্স হ্বেবারের মতবাদ

ম্যাক্স হ্বেবারের চিন্তাধারা তাঁহার সমকালীন দুইটি বিতর্কের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। একটি বস্তুতন্ত্রবাদ বনাম আদর্শবাদ (materialism-idealism) এবং অপরটি ইতিহাস বনাম বিজ্ঞান (history-science issue)। এই দুই প্রকার বিতর্কের নিরসন করিতে গিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহাই The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সামাজিক পরিবর্তন, তথা ঐতিহাসিক বিবর্তন, সংঘটিত হয় বলিয়া মার্ক্স যে অভিমত প্রকাশ করেন, ম্যাক্স হ্বেবার তাহার সমালোচনা করেন। তাঁহার মতে, সমাজস্থ লোকের মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানের (practical ethics) সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লোকের মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে, এই মার্ক্সীয় তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন।2 তাঁহার মতের সমর্থনে তিনি নানা তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ক্যালভিনের ধর্মমত ও তৎসম্পর্কিত ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান (ethic of Calvinism) অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম য়ুরোপে আধুনিক

---

1 A Readers' Guide to the Social Sciences. Edited by B. F. Hoselitz. The Free Press, Glencoe, Illinois. 1960. Page 167.

2 "Weber saw that there is a direct relation between the practical ethics of a community and the character of its economic system, but he refused to accept the position that the latter determines the former". Mac Iver and Page : Society. Page 582

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের পথ সুগম করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্ এবং স্কটল্যাণ্ডে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীদের (ক্যালভিনের অনুগামীগণও ইহাদের অন্তর্গত) সংখ্যা ছিল এইসব অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার মাত্র ৭ ভাগ। কিন্তু সারা গ্রেট ব্রিটেনে (অর্থাৎ আয়র্ল্যাণ্ডসহ) যত ব্যবসায়ী অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবাবিষ্কৃত পন্থা ব্যবসায়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন (innovators) তাহাদের মধ্যে অর্ধেকসংখ্যক ব্যবসায়ী প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীদের অন্তর্গত।1 হ্বেবারের মতে, ক্যালভিনের পূর্ববিধানবাদ (doctrine of pre-destination) তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে একটি নূতন ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। ইহাকে তিনি 'worldly asceticism' বা পার্থিব তপশ্চর্যা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ক্যালভিনের মতে, এই পৃথিবী মানুষের পাপে কলুষিত। কিন্তু তাই বলিয়া এই মলিন পৃথিবী ছাড়িয়া মঠে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইবার উপায় নাই। পাপের সঙ্গে আপস করাও অন্যায়। নিষ্ঠার সঙ্গে পার্থিব কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া এবং নিরলস প্রয়াসের দ্বারা এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করিয়া তোলাই প্রকৃত ধর্মীয় কর্তব্য। তিনি তাঁহার অনুগামীদের আরও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এই পৃথিবীতে সুকাজ করার ফলে মানুষ যে পুণ্য অর্জন করিয়া মোক্ষ লাভ করিবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। কারণ, ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। সুতরাং নিষ্ঠা সহকারে পার্থিব কাজকর্ম করা এবং কঠিন পরিশ্রম করার আদর্শ ধর্মীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, মুক্তি পাইবার উপায় হিসাবে নহে। ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, ক্যালভিনের ধর্মমত তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে এমন একটি মূল্যবোধ (value orientation) সৃষ্টি করে, যাহা ধনতন্ত্রের বিকাশ সুগম করে।

তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে হ্বেবার পোপ-বিরোধী খ্রিষ্টীয় ধর্মবিপ্লবের (Reformation) সময় পশ্চিম য়ুরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে অপরাপর দেশের অনুরূপ অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি পশ্চিম য়ুরোপ ও চীনদেশের তদানীন্তন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, চীনদেশেও পশ্চিম য়ুরোপের ন্যায় ধনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার অনুকূল পরিবেশ ছিল। কিন্তু সেখানে ধর্মীয় ভাবাদর্শ পার্থিব তপশ্চর্যা (worldly asceticism) গড়িয়া উঠার পথে অন্তরায় ছিল বলিয়া তখন চীনদেশে আধুনিক ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয় নাই।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ম্যাক্স হ্বেবার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি নূতন দিক উন্মোচিত করেন। অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, এই বিষয়টি তিনিই প্রথম আমাদের গোচরে আনেন। আদর্শবাদী দার্শনিকগণ যে অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধের কথা বলেন, হ্বেবার সেই মূল্যবোধ নির্দেশ করেন নাই। তাঁহার মতে, যে-মূল্যবোধ সমাজের আপামর জনসাধারণের

---

1 E. E. Hagen : On the Theory of Social Change. Vakils, Feffer and Simons Pvt. Ltd., Bombay 1. 1962. Page 15

মধ্যে প্রচলিত, তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। তাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে, চিন্তা-ভাবনায় এই মূল্যবোধের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষ সামাজিক পরিবেশে বিশেষ এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, ইহা বলা যথেষ্ট নহে। তাঁহার মতে, কি সামাজিক পরিবেশ অর্থনৈতিক বিকাশের অনুকূল বা প্রতিকূল মানসিকতা এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে, তাহা নির্দেশ করা অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ম্যাক্স হেবারের চিন্তাসূত্র অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে অনেক গবেষণা হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিকাশমুখী অর্থনীতিতে (Growth Economics) মানুষের প্রেষণা (motivation), মূল্যবোধ এবং মানসিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকৃত।

তবে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব হিসাবে ম্যাক্স হেবারের আলোচনা অসম্পূর্ণ। মূল্যবোধ ছাড়া সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য হেতু সম্পর্কে তিনি কোন কিছু আলোচনা করেন নাই।

ভেবলেনের মতবাদ

ভেবলেনকে technological determinist বলা হয়। কারণ, তাঁহার মতে মানুষ যে-কাজে নিযুক্ত থাকে, বিশেষ করিয়া উৎপাদন-ক্ষেত্রে সে যে কলাকৌশল অনুসরণ করে, তাহা দ্বারা তাহার মনন চিন্তন প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। অভ্যাসের দ্বারা কর্ম-পদ্ধতির প্রভাব মনোজগতে সঞ্চারিত হয়। তাঁহার আলোচনা হইতে দুইটি সংক্ষিপ্ত উক্তি উদ্ধৃত করিলে তাঁহার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে: "The way of habit is the way of thought" অথবা "As he (man) acts, so he feels and thinks".

এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাজকর্ম সম্পর্কিত পরিবেশ এবং কলাকৌশলের পরিবর্তন হইলে মানুষকে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মনের দিক দিয়া সঙ্গতি স্থাপন করিতে হয়। কারণ, পূর্বে প্রচলিত পরিবেশ ও কলাকৌশলের প্রভাবে যে ধরনের মানসিকতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা পরিবর্তিত অবস্থায় অচল। সুতরাং অবস্থার চাপে পড়িয়া মানুষকে সর্বদা নানারকম মানসিক অভিযোজন (mental adaptation) করিয়া চলিতে হয়। এইভাবেই সমাজের অভিব্যক্তি বা পরিবর্তন সংঘটিত হয়।[1]

---

1 "The evolution of society is substantially a process of mental adaptation on the part of individuals under the stress of circumstances which will no longer tolerate habits of thought formed under and conforming to a different set of circumstances in the past". The Theory of the Leisure Class by Veblen, Page 192-193, Quoted by Mac Iver & Page : Society. Page 567

এই প্রসঙ্গে ভেবলেন আরও বলেন যে, সমাজে যদি কোন শ্রেণী উৎপাদনের কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন প্রবর্তিত হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করে। অবসরভোগী বিত্তবান শ্রেণীকে (the wealthy leisure class) তিনি এই দলভুক্ত বলিয়া মনে করেন।1 তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন।

সামন্তপ্রথায় উৎপাদন-ব্যবস্থার কলা-কৌশল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উৎপাদন-কার্য লোকবলের (man power) যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য এই প্রথায় অধিকসংখ্যক লোককে অল্পসংখ্যক লোকের নির্দেশে কায়িক পরিশ্রম করিতে হয় ("it represents a system of trained manpower organised on a plan of subordination of man to man")। উপরন্তু, প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের অধীন থাকিয়া নিরলস পরিশ্রম করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ("it prescribes diligent unremitting toil and obedience to the superiors............")। স্বভাবতই উৎপাদনব্যবস্থার আদলে সামাজিক কাঠামো ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের নীতি অনুযায়ী গড়িয়া উঠে।

কিন্তু লোকবলের পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সমগ্র সমাজ-জীবনে এই পরিবর্তনের প্রতিফলন হইতে দেখা যায়। সামন্তপ্রথায় উৎপাদন-কার্যে লোকবলের প্রয়োগ যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহা সুনিশ্চিত করার জন্য অধিক সংখ্যক লোকের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাদের অল্পসংখ্যক লোকের অধীন করিয়া রাখার প্রয়োজন ছিল। যান্ত্রিক শক্তি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এই প্রয়োজন আর রহিল না। সামন্তযুগীয় চিন্তাধারার পরিবর্তে নূতন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠে। ভেবলেনের মতে, যাহারা উৎপাদন-কার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কেবল তাহারাই যান্ত্রিক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু যাহারা উৎপাদন কার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নহে (যেমন, অবসরভোগী বিত্তবান শ্রেণী) তাহারা অনুরূপভাবে প্রভাবিত হয় না। সুতরাং এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে দুইটি ভিন্ন জীবন-ধারা গড়িয়া উঠে ("Hence there are two cultures instead of one within society")। অথচ নিম্নোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই সামাজিক আচার-ব্যবস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, এবং তাহারা স্বভাবতই তাহাদের ভাবধারা অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় উৎপাদনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সাধারণ লোকের নিকট

1 "If any portion or class of society is sheltered from the action of the environment in any essential respect.........it will.........tend to retard the process of social transformation. The wealthy leisure class is in such a sheltered position with respect to the economic forces that make for change and readjustment". Mac Iver & Page: Society. Page 567

আইনকানুন কষ্টকর নিপীড়ন ("at best a wearisome tribulation") ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ, শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য যে-সব আইন প্রবর্তন করা হয়, তাহার অন্তর্নিহিত আদর্শ বা মূল্যবোধ সামন্তযুগীয়। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রয়োজনের সঙ্গে ইহার কোন সঙ্গতি নাই। এইভাবে উৎপাদনের কলাকৌশলে পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের একটি অংশের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ প্রভৃতি পরিবর্তিত হইবে। আবার কিছুসংখ্যক লোকের (যাহারা উৎপাদন কার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকিবে না) মনন ও চিন্তন পূর্বেকার ধারা অনুসরণ করিয়া চলিবে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতির উপর শিল্প-ভিত্তিক সমাজ ("industrial-democratic regime") প্রতিষ্ঠিত হইলে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব সমাজস্থ লোকদের মধ্যে অধিকতর সম্প্রসারিত হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। তবে উৎপাদনের কলাকৌশলের পরিবর্তন যতদিন চলিবে, ততদিন মানুষের চিন্তাজগতে এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকিবে। ইহার কোন পরিণতি বা সমাপ্তি তিনি নির্দেশ করেন নাই।

প্রসঙ্গতঃ মার্ক্সের সঙ্গে তাঁহার মতবাদের পার্থক্য লক্ষণীয়। মার্ক্সের মতে, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে উৎপাদন-পদ্ধতিজনিত দ্বন্দ্ব ও সামাজিক পার্থক্য চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। শ্রেণীহীন সমাজেরমধ্যেই সামাজিক বিবর্তন পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে। 'সকলেব তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই ভাব সমাজ-জীবনে সর্বত্র বিরাজ করিবে।1

মনোজগতে যান্ত্রিক সভ্যতার গভীর প্রভাব ভেবলেনের আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সম্পর্কে যে চিত্রটি তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন— যেমন, "all alike tend to think in terms of mechanism, of geometrical relations, of standardised patterns, of inexorable law"—তাহা বহুলাংশে সত্য। কিন্তু তাঁহার আলোচনা আংশিক এবং একপেশে। কোন কারণে যদি মানুষের মনন, চিন্তন ও মূল্যবোধে পরিবর্তন ঘটে (ম্যাক্স হেবার দেখাইয়াছেন যে ইহা ঘটা বিচিত্র নহে), তাহা হইলে যান্ত্রিক কলাকৌশলাদির প্রয়োগের উপর যে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, এই বিষয়ে তিনি কোন আলোচনা করেন নাই।

সামাজিক পরিবর্তন ও কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

খাদ্য, সংজনন (reproduction) এবং আত্মরক্ষা—এই তিনটি সব প্রাণীরই মৌল প্রয়োজন। এই তিনটি প্রয়োজন চরিতার্থ না হইলে ব্যক্তি হিসাবে বা জীব হিসাবে কাহারও পক্ষেই বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। মনুষ্যেতর প্রাণী

---

1 "He (Marx) projects a goal or consummation of social evolution which ....will bring about a great liberation of the human spirit and a new social harmony. It is a form of revelation. Veblen............ offers no revelation, no goal." Mac Iver and Page : Society. Page 569

জন্মসূত্রে কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি (instincts) এবং নানা রকম শারীরিক বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মায়, যাহা দ্বারা এই মৌল প্রয়োজনগুলি চরিতার্থ করা সম্ভব। এই ধরনের সহজ প্রবৃত্তি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য জন্মসূত্রে লাভ না করার ফলে মানুষকে মৌল প্রয়োজনগুলি মিটাইবার উদ্দেশ্যে জীবন-ধারা ও সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন চরিতার্থ করাই সামাজিক আচার-ব্যবস্থাগুলির লক্ষ্য। আমাদের মৌল প্রয়োজন হইতে আবার অনেক রকম গৌণ প্রয়োজনও (derived demands) উদ্ভূত হয়। বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থাগুলির সাহায্যে আমরা উভয়প্রকার প্রয়োজন চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করি।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থায় সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ, মানুষের প্রয়োজনে পরিবর্তন ঘটিলেই সংশ্লিষ্ট সামাজিক আচার-ব্যবস্থাতে পরিবর্তন ঘটে। জৈবিক প্রয়োজন অপরিবর্তিত থাকার ফলে মৌল প্রয়োজনে পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু গৌণ প্রয়োজনসমূহ প্রায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। যেমন, সমাজস্থ লোকের কোন বিশেষ অংশ কোন বিশেষ আহার্য সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। এই অবস্থায় আহার্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থায় এবং পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। যে-কোন সমাজের গত পঞ্চাশ বৎসরের খাদ্য তালিকা তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, আহার্য বিষয়ে মানুষের রুচি এবং তৎসম্পর্কিত প্রয়োজনে কি ভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

কেবল যে রুচি বা পছন্দ-অপছন্দের জন্য মানুষের প্রয়োজনে পরিবর্তন ঘটে, তাহা নহে। নূতন নূতন সামগ্রী উৎপন্ন হওয়ার ফলে আমাদের প্রয়োজন তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। কৃত্রিম রেশম বস্ত্র (synthetic fibre) আবিষ্কারের ফলে আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদে ইহা প্রাধান্য পাইতেছে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বলিতে যাহা বুঝাইত, বর্তমানে ঠিক তাহা বুঝায় না। অতীতের রীতিগত সরল রণসম্ভারের (conventional armaments) স্থলে নানা প্রকার জটিল রণসম্ভার (sophisticated armaments) প্রবর্তিত হইয়াছে। উপরন্তু, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিদ্যার অনুশীলন হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন রকম গবেষণামূলক কাজকর্মও প্রতিরক্ষার অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, এইসব পরিবর্তনের ঢেউ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে নানাভাবে স্পর্শ করে।

অনেক সময় আমাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার জন্য যে ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিবর্তন ঘটিলে নূতন প্রয়োজনের উদ্ভব হয়। যেমন, দ্রুত গতিতে যাতায়াত করিবার জন্য এক সময় কেবলমাত্র ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এখনও অনেক সীমিত সংখ্যায় ইহাদের প্রচলন আছে। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীর বদলে মোটর গাড়ীর প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তাঘাট চওড়া করার সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নানা কারণে আমাদের প্রয়োজন পরিবর্তিত হইতে পারে, এবং ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে সামাজিক আচার-ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত আচার-ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে অসমর্থ হইলে এই আচার-ব্যবস্থাগুলির পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেমন, কোন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবাধ প্রতিযোগিতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি হওয়ায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংব্যবস্থার প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন হইতে পারে। তাহা না করিলে স্বল্প আয়বিশিষ্ট লোকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অন্য কারণেও প্রচলিত আচার-ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে অসমর্থ হইতে পারে। সামাজিক আচার-ব্যবস্থার কার্যকলাপজনিত ফলাফল সাধারণতঃ দুই প্রকার। একটি অভিপ্রেত ও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান (intended and manifest function) এবং অপরটি অনভিপ্রেত ও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান নহে (unintended and latent function)। প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যেই কোন বিশেষ আচার-ব্যবস্থা গৃহীত হয়। যেমন, দক্ষতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায়ের উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সাধারণ ক্রেতা মুনাফালোভীদের শিকারে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে যাহা ছিল অনভিপ্রেত এবং স্পষ্টতঃ অপ্রতীয়মান, তাহা এত বেশি প্রকট হইয়া উঠে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠে। সরকারকে বাধ্য হইয়া নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই বিষয়টি অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়। সামাজিক কাজ-কর্মের ইতিবাচক (positive) এবং নেতিবাচক (negative or dysfunctional) দিক আছে। এই কারণে এমন অনেক ব্যবস্থা আছে যাহা প্রবর্তিত হইবার ফলে এত সুদূরপ্রসারী অবাঞ্ছিত ফলাফল দেখা দিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থাকেই বর্জন করিতে হয়। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে দাবি আদায় করার উদ্দেশ্যে নিয়মমাফিক কাজ (work to rule or go slow method) করার রীতি গৃহীত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এই পন্থা অনুসরণ করার ফলে কলকারখানায় উৎপাদন এত সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয় যে, শেষ পর্যন্ত শ্রমিকগণ ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন হয়। সেইজন্য দাবি আদায়ের পন্থা হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মমাফিক কাজ করার রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, যখন প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় উদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতিতে আমাদের প্রয়োজন অধিকতর সুষ্ঠুভাবে চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তখন স্বভাবতই পুরাতন পদ্ধতিকে বাতিল করিয়া নূতন পদ্ধতি গৃহীত হয়। ইহার ফলে সামাজিক আচার-ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন ঘটে। যেমন, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহদায়তনে সামগ্রী উৎপাদন করিলে একদিকে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং

অপর দিকে সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পায়। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগের ফলে পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত আচার-বাবস্থাগুলি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া কর্মনির্বাহী তত্ত্বের প্রবক্তাগণ যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা খুবই মূল্যবান। প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ-জীবনে যে প্রতিনিয়ত নানারকম পরিবর্তন ঘটিতেছে, ইহা অনস্বীকার্য। তবে ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, নূতন প্রয়োজন উদ্ভূত হইলেই অথবা পুরাতন প্রয়োজনের গুরুত্ব হ্রাস পাইলেই সামাজিক আচার-ব্যবস্থার পরিবর্তন সহজে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘটিয়া থাকে। আমরা নানা কারণে পুরাতন আচার-ব্যবস্থা আঁকড়াইয়া থাকি এবং অনেক সময় ইহার পরিবর্তন বা সংশোধনের বিরোধিতা করি। অভ্যস্তকরণ ইহার একটি প্রধান কারণ। আমরা সাধারণতঃ চিরাভ্যস্ত পদ্ধতি বা আচার-আচরণ, এমন কি চিন্তাধারাও, পরিত্যাগ করিতে চাই না। ইহা আমাদের মানসিক নিষ্ক্রিয়তার (mental intertia) লক্ষণ। উপরন্তু, দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের নানারকম কায়েমী স্বার্থ জড়িত হইয়া পড়ে।' সুতরাং আচার-ব্যবস্থার পরিবর্তন বা সংশোধনের বিরোধিতা হওয়া বিচিত্র নহে। সেইজন্য দেখা যায়, যে-সব আচার-ব্যবস্থার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কমূলক, সেইসব আচার-ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু যে-সব আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজস্থ লোকের মুখ্য বা প্রধান (dominant) মূল্যবোধ জড়িত, সেই সব আচার-ব্যবস্থা প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তিত হয় না। ইহার ফলে নানা সামাজিক সমস্যার উৎপত্তি হয়। প্রচলিত আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের শক্তিশালী অংশের কায়েমী স্বার্থ জড়িত থাকিলেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কর্মনির্বাহী তত্ত্বে সামাজিক পরিবর্তনের এই দিকটিতে আলোকসম্পাত করা হয় নাই।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত সাধারণ মতবাদ বা তত্ত্বের ত্রুটি এই যে, এইসব মতবাদের সাহায্যে সব রকম সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। নানা কারণে সমাজ পরিবর্তিত হইতে পারে। সব সমাজে একই প্রকার কারণ সক্রিয় না-ও থাকিতে পারে। আবার একই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণের গুরুত্বে তারতম্য হইতে পারে। সেইজন্য যে-সব কারণে সামাজিক পরিবর্তন সাধারণতঃ সংঘটিত হয়, এই কারণগুলি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আমরা সর্বাগ্রে অধ্যাপক মরিস্ গিন্‌স্‌বার্গের আলোচনার উল্লেখ করিতে পারি। তিনি উদাহরণের সাহায্যে আটটি কারণ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।[1]

1 Morris Ginsberg: Essays in Sociology and Social Philosophy. Peregrine Book.

(১) সমাজস্থ লোকদের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা-সঞ্জাত সঙ্কল্প গ্রহণের ফলে সমাজে পরিবর্তন ঘটিতে পারে। উদাহরণ হিসাবে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলিতে সীমিত পরিবারের উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে, এইসব দেশে জনসাধারণ ব্যাপক হারে জন্মনিয়ন্ত্রণের পন্থা গ্রহণ করার ফলে সীমিত পরিবারের উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত কারণসমূহের উল্লেখ করেন। (ক) জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচার। (খ) বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন। ইহার ফলে শ্রমজীবী হিসাবে বালকদের অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ বন্ধ হয়, এবং শিশু প্রতিপালন করা ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠে। (গ) শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় মহিলাদের কর্মে নিয়োগ-সম্ভাবনা স্বভাবতই বাড়ে। বাড়ীর বাহিরে কাজকর্ম করিতে হয় বলিয়া তাহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণে আগ্রহান্বিত হয়। (ঘ) উল্লম্বী সচলতার (vertical mobility) সুযোগ বৃদ্ধি পাওযায অনেক মাতাপিতাই সন্তানদের শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়া তাহাদের পদমর্যাদায় উন্নীত করার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠেন। সীমিত পরিবারেই ইহা সম্ভব। (ঙ) গৃহের বাহিরে আমোদ-আহ্লাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করার প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। (চ) জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুকূলে নীতিগত এবং ধর্মীয় ভাবধারার পরিবর্তন।

বর্তমানে ভাবতবর্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার প্রতি যে প্রবণতা দেখা যাইতেছে, তাহা গিন্‌স্‌বার্গের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এইদিক হইতে ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

(২) অবস্থা বা পরিবেশ অনুকূল হইলে সমাজস্থ লোকেরা সম্মিলিতভাবে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে সিদ্ধান্ত বা সঙ্কল্প গ্রহণ করার ফলে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ইংল্যাণ্ডে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দাসত্বপ্রথা বিলোপের উল্লেখ করেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের ফলশ্রুতি হিসাবে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু গিন্‌স্‌বার্গের অভিমত হইল, অবস্থা অনুকূল না হইলে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কার্যের ফলে এই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘটিত হইত না।[1] আমাদের পরিচিত উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করিলে বিষয়টি অর্থবহ হইবে। ইদানীং কালে ছাত্রসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালক-মণ্ডলীতে ছাত্রদের

1 "Here we have a tremendous change effected through countless transactions between individuals, each pursuing, as he no doubt thought, his own ends. Were these individual acts the sole cause of the change? Clearly not, for they would not have occurred, had not the circumstances favoured the transition from an arrangement based primarily on a natural economy to one based increasingly on commercial & contractual relations."

প্রতিনিধিত্ব দাবি করা হইতেছে। এই দাবি নীতিগতভাবে মোটামুটি স্বীকৃত। কোন কোন শিক্ষায়তনে এই দাবি কার্যকর করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এই দাবি যে সর্বত্র গৃহীত হইবে, ইহা প্রায় সুনিশ্চিত। শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইহা একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের চিরাচরিত রীতির পরিপ্রেক্ষিতে। ছাত্রমহলে অশান্তি ও শিক্ষায়তনে নানারকম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ার জন্য পরিচালক-মণ্ডলীতে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বের দাবির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, পরিবেশ অনুকূল না হইলে এই দাবি, গৃহীত হওয়া ত দূরের কথা, বিবেচিত হইত কিনা সন্দেহ। সেইজন্য গিন্‌স্‌বার্গ বলেন: "The causes are the motivated acts, but the motives are shaped by the change in the conditions."

পক্ষান্তরে, অবস্থা অনুকূল না হইলে সামাজিক পরিবর্তন যে সংঘটিত হয় না, তাহা হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত আন্দোলনের ব্যর্থতায় দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, আর্য সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন এবং ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত হিন্দু সমাজে বিধবাদের পুনর্বিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই।

(৩) সামাজিক কাঠামোর কোন বিশেষ অংশে পরিবর্তন হওয়ার জন্য ("changes in the parts of a structure") সামাজিক ভারসাম্যে বিশৃঙ্খলা ("lack of equilibrium between the parts" of a structure) দেখা দিতে পারে। ইহার ফলে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ গিন্‌স্‌বার্গ বলেন যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নগর-সমাজের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ হওয়ার ফলে য়ুরোপে জমিদারের প্রভাবাধীন স্বয়ম্ভর গ্রামীন অর্থনীতি (domain economy) টিকিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। একদিকে, নগরসমূহ গ্রামাঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে গ্রামের চাষবাস পরিচালিত হইতে থাকে।[1] অপর দিকে, ভূস্বামীগণও নির্দিষ্ট রাজস্বের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইতে অসমর্থ হন। সুতরাং পূর্বেকার গ্রামীন অর্থনীতির (domain economy) অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ ইহা বিলুপ্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে জাতিভেদ প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হওয়ার বিষয়টি (ইহা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে) স্মরণ করা যাইতে পারে।

গিন্‌স্‌বার্গ আরও বলেন যে, অনেক সময় সমাজের এক অংশে পরিবর্তন হওয়ায় অপরাপর অংশের সঙ্গে অসঙ্গতি (তিনি ইহাকে structural strain

---

1 "As production became remunerative, the idea of working for profit began to exercise people's minds." তদেব পৃ: ১৪১।

বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন) দেখা দিতে পারে। তখন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি পশ্চিম য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অভিন্ন বাজার (common market) প্রতিষ্ঠা করার বিষয় উল্লেখ করেন। পশ্চিম য়ুরোপে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর এই স্বাতন্ত্র্য অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় অভিন্ন বাজার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে পশ্চিম য়ুবোপের দেশগুলিতে সমাজ-জীবনে নানা প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হইবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[1]

(৪) অপর সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সংস্পর্শ নানা রকমের হইতে পারে। বিজিত জাতি হিসাবে বিজেতার অধীন হইযা থাকিলে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয। ভাবতবর্ষ মোগল, পাঠান বা ইংরেজদের অধীনে দীর্ঘকাল থাকার ফলে ভারতীয জীবন-ধারা বিচিত্র উপায়ে বিজেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। আবার যাতাযাতেব মাধ্যমে অথবা বহুল প্রচার মাধ্যমসমূহের সাহায্যে পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারে। অনুকরণ-প্রবণতা মানুষের স্বভাবজাত। অতএব পরোক্ষ যোগাযোগের ফলে বিভিন্ন সমাজের লোকজনের মধ্যে আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-পরা প্রভৃতি বিষযে সংমিশ্রণ ঘটা বিচিত্র নহে। এমন কি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানেও এই প্রকার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয। ভারতীয় সংবিধানে অপরাপব রাষ্ট্রের সংবিধানেব প্রভাব সুস্পষ্ট।

(৫) সামাজিক পরিবর্তন প্রবর্তনের বিষয়ে প্রতিভাধব বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা নগণ্য নহে। সমসাময়িক ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রভাব অস্বীকাব করিবার উপায় নাই। অবশ্য সমাজ-জীবনে বিশিষ্ট ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, বিশেষ সামাজিক পরিবেশে বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্ভব হয়। সুতরাং পরিবেশ বিবেচনা না করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তির ভূমিকার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা অর্থহীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় রাজনীতিতে বিসমার্কের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু তিনিও অনুকূল পরিবেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন : "The statesman can do nothing for himself. He can only lie in wait and listen until amid the march of events he can hear

---

1 "Closely connected with the interactions between the different parts of the social structure are what I have called structural strains. By this I mean tensions set up within a society......by the fact, now illustrated vividly in the movement for European unity, that units which have developed to meet certain requirements, e.g. political, are not suited for others, e.g. economic. These strains set up disturbances, latent or overt, which sooner or later find expression in movements for change." তদেব পৃ: ১৪১

the footsteps of God. Then he leaps forward and grasps the hem of His garment. That is all he can do".

তবে পরিবেশের প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য, ঠিক তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তির ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নহে। অনুকূল পরিবেশের সুযোগ লইয়া কেবল 'ক' বা 'খ' যুগধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিয়া কেন কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেন? অপর কেহ কেন অগ্রসর হন না? ইহাই হইল বিচার্য বিষয়। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কে অস্বীকার করিতে পারে? ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের পরিবেশে রবীন্দ্র-মানসের সৃষ্টি, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বলিলেই কি তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত মূল্যায়ন করা হয়?

(৬) অনেক সময় সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম ঘটনা বা অবস্থার এমন সমাবেশ হয়, যাহার ফলে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপক গিন্‌স্‌বার্গ রাশিয়ার বিপ্লবের উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে, রাশিয়ায় নিম্নোক্ত ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশ হওয়ায় বিপ্লব সম্ভব হয়। (ক) দীর্ঘকালব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার ফলে জার সরকার আর্থিক দিয়া হীনবল হইয়া পড়ে। (খ) কৃষকগণের জমির জন্য বুভুক্ষা (land hunger) এবং দুর্গত কৃষকদের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সহাবস্থান। (গ) জারের আমলে বাহিরের চাপে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে শিল্পের বিকাশ ঘটে। ইহার ফলে প্রলেতারিয়াতের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহার সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীন উদ্যোক্তার (an independent class of bourgeois entrepreneurs) সৃষ্টি হয় নাই। (ঘ) ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্য হইতে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদারের উদ্ভব না হওয়ায় তাঁহাদের বুর্জোয়া শ্রেণী বা বুর্জোয়া আদর্শের প্রতি গভীর আনুগত্য ছিল না। (ঙ) কিছুসংখ্যক লোকের বিপ্লব ঘটাইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রাস করার দৃঢ় সঙ্কল্প। (চ) লেনিনের মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার অভ্যুদয়।

যে-কোন দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে আপাত-দৃষ্টিতে সম্পর্কবিহীন বলিয়া মনে হইলেও নানা প্রকার ঘটনার একত্র সমাবেশে যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ভারতবর্ষে শিল্পের বিকাশ এবং নগরায়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, অনেকগুলি কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই এই পরিবর্তনসমূহ সম্ভব হইয়াছে। কলিকাতা নগরীর পত্তন ও প্রসার এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "জব্ চার্ণকের কলিকাতায় ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্থান নির্ণয়ের কারণ— গঙ্গার বাম দিকে জলের গভীরতা, বহু তাঁতির বাস, তন্তুবায়দিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত শেঠেদের বাস, যাঁহাদের সহিত কোম্পানির ব্যবসা সম্পর্ক ছিল, এবং মহারাষ্ট্রদের তথায় যাইবার আশঙ্কা কম ছিল"।[1]

---

1 হরিহর শেঠ: প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৯ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। ১৯৫২। পৃষ্ঠা ৫

(৭) নানারকম আকস্মিক ঘটনার ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গিন্‌স্‌বার্গ একটি উদাহরণ দিয়াছেন যাহা হইতে দেখা যায় যে, অতি তুচ্ছ কারণ একটি জাতির জীবনে কত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনিতে পারে। ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে যখন প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয় (যাহা ইতিহাসে **Black Death** বলিয়া আখ্যাত), তখন সারা য়ুরোপের অধিবাসীদের মধ্যে কুসংস্কারজনিত আতঙ্কের ঢেউ বহিতে আরম্ভ করে। জার্মানীতে ইহুদিদের বর্বরোচিত নির্যাতনের ভিতর দিয়া এই আতঙ্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ, সেখানকার অধিবাসীদের ধারণা জন্মে যে, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে এবং ইহুদিরাই ইহার জন্য দায়ী। নির্যাতনের ফলে ইহুদিরা পোলাণ্ডে পলায়ন করে। ধীরে ধীরে পূর্ব য়ুরোপে ইহুদিরা স্বতন্ত্র পাড়া স্থাপন করিয়া (ইহাকে **East European Jewry** বলে) বাস কবিতে আরম্ভ করে। এইভাবে দীর্ঘকাল স্বতন্ত্রভাবে বাস করার ফলে তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানসিকতা গড়িয়া উঠে। তাঁহাদের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ইহার পরিণতি।

প্রত্যেক সমাজেই নানা রকম আকস্মিক ঘটনার ফলে আচার-আচরণে ও চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন সংঘটিত হইতে দেখা যায়। ভারত-বিভাগকে একটি আকস্মিক ঘটনা বলা যাইতে পাবে। এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য কেহ প্রস্তুত ছিল না। ইহাব ফলে ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাঙালী ও পাঞ্জাবী সমাজ-জীবনে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। এই পরিবর্তন ভবিষ্যতে কত সুদূরব্যাপী হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন।

(৮) সমাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে সমাজস্থ লোকদের মধ্যে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (**"the emergence of a common purpose"**) গড়িয়া উঠার ফলে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয। স্বাধীনতার পূর্বে জাতীয কংগ্রেসের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচারাভিযানের প্রভাবে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গড়িয়া তোলার আকাঙ্ক্ষা জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। ইহার ফলে সরকারী মালিকানায বা নিয়ন্ত্রণাধীনে শিল্পের সম্প্রসারণ এবং অপরাপর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সরকারী উদ্যোগের প্রসার এবং বে-সরকারী উদ্যোগের সঙ্কোচন ঘটিতেছে।

মরিস্ গিন্‌স্‌বার্গের কার্যকারণসম্বন্ধগত যুক্তিপরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সামাজিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের (**Natural Science**) ন্যায় সমাজবিষয়েও কোন পরিবর্তনের হেতু হিসাবে একাধিক কারণের সমাবেশকে নির্দেশ করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র একটি বা দুইটি কারণের উল্লেখ করিয়া সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। উপরের আলোচনায় বর্ণিত বিভিন্ন উদাহরণ হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, অনেক

রকম ঘটনার একত্র সমাবেশ হইলে ইহাদের সম্মিলিত রূপ এমন দাঁড়ায় যাহা সমাজ-জীবনে পরিবর্তন ঘটাইতে সক্ষম হয়। সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার সময় এই সত্যটি উপলব্ধি করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি-বিজ্ঞানে সঠিকভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব। কারণ, প্রাকৃতিক ঘটনা-সমূহের মোটামুটি একই ধারায় পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে এই প্রকার পুনরাবৃত্তি আশা করা বৃথা। সুতরাং সমরূপ ঘটনার সামাজিক প্রতিক্রিয়া যে সর্বত্র একই রকম হইবে, ইহা সঠিকভাবে বলা যায় না। পরিবর্তনের গতি এবং প্রকৃতি কি হইতে পারে, কেবল ইহা নির্দেশ করা যায়। তৃতীয়তঃ, সমাজস্থ লোকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়াবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি সামাজিক ঘটনাবলীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকায় কে কি অবস্থায় কি ভাবে আচরণ করিবে, ইহা অনুমান করা যায় মাত্র, সঠিকভাবে নির্দেশ করা কঠিন। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাহা চেতনাহীন। একটি বল মাটিতে ছুড়িয়া মারিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভূমিস্পর্শ করিয়া উপরে লাফাইয়া উঠে। এই ব্যাপারে চেতন মনের কোন ক্রিয়া নাই। সুতরাং কত জোরে বলটি মাটিতে ছুড়িলে ইহা আবার কত জোরে ফিরিয়া আসিবে (অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া কি হইবে) ইহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব। কিন্তু কোন প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিষয় সম্পর্কে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কি হইবে, তাহা সঠিক বলা যায় না। কারণ, এই ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া চেতনাসূচক।[1]

সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করার সময় এই বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কোন বিশেষ একটি কারণ নির্দেশ করিয়া সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার সময় অপরাপর যে-সব ঘটনা পরিবর্তনের অনুকূল বা সহায়ক হইয়াছে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত। অর্থাৎ একটি বা দুইটি কারণ বা ঘটনার মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া সমাজের বিচিত্র সম্বন্ধ জালের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অধ্যাপক গিন্‌স্‌বার্গের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সামাজিক পরিবর্তনের এই দিকটি উন্মোচিত হইয়াছে।

তবে গিন্‌স্‌বার্গের আলোচনায় জন্মমৃত্যুর হার ও প্রযুক্তি বিদ্যার (technology) ব্যাপক প্রচলন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিশ্লেষণ নাই। অথচ বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম হেতু হিসাবে এই দুইটি বিষয়ের অপরিসীম গুরুত্ব রহিয়াছে। সেইজন্য এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

জনসংখ্যা ও সমাজ

Demography বা জনসংখ্যান আমাদের সমাজ প্রবাহ সম্বন্ধে ধারণা

---

1 "Individuals 'respond' rather than 'react' to their environment and they do so selectively........." তদেব পৃষ্ঠা ১৫০

করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। নিম্নোক্ত চারিটি বিষয় এই বিদ্যার আলোচনার অন্তর্গত: (১) নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অন্তর্গত লোকসংখ্যা নির্ণয় করা। (২) পূর্বের তুলনায় এই সংখ্যা হ্রাস না বৃদ্ধি সূচনা করে, ইহা নির্ণয় করা। (৩) লোকসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা। (৪) উপরোক্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লোকসংখ্যার ভবিষ্যৎ গতি নির্দেশ করা।

জনসংখ্যায়ক (demographer) জনসংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি নিম্নোক্ত তিনটি পরিবর্তনীয় (variables) উপাদানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন: জন্ম; মৃত্যু ও পরিযাণ (migration)। তিনি জন্মসংখ্যা হইতে মৃত্যুসংখ্যা বিয়োগ করিয়া স্বাভাবিক জনসংখ্যা নির্ণয় করেন এবং অভিবাসনের (immigration) সংখ্যা হইতে প্রবাসনের (emigration) সংখ্যা বিযোগ করিয়া নীট পরিযাণের সংখ্যা নির্ণয় করেন। এই বিষয়টি একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। যদি পূর্ববর্তী সময়ের লোকসংখ্যা $ক_1$ এবং পরবর্তী সমযের লোকসংখ্যা $ক_2$ হয়, তাহা হইলে সমীকরণটি এইরূপ দাঁড়ায়:

$ক_2 = ক_1$ + (জন্মসংখ্যা—মৃত্যুসংখ্যা) + নীট পরিযাণ

অতএব কোন বিশেষ সমাজের জনসংখ্যা এবং তৎসম্পর্কিত হ্রাস-বৃদ্ধি জানিতে হইলে জন্মসংখ্যা, মৃত্যুসংখ্যা, অভিবাসন এবং প্রবাসন সম্পর্কিত সংখ্যা বিবেচনা করিতে হয়।

সমাজতত্ত্বের দিক হইতে এই প্রকাব আলোচনাব তাৎপর্য দুইটি। প্রথমতঃ, জন্ম, মৃত্যু এবং পরিযাণ কেবলমাত্র জৈবিক বিষযেব উপব নির্ভর করে না। নানা রকম সমাজসম্পর্কিত বিষয়—যেমন, মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ—এইগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়তঃ, জন্ম, মৃত্যু ও পরিযাণ সমাজ-জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।[1]

সর্বাগ্রে জন্মহার কি কি সমাজ-সম্পর্কিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহা আলোচনা করা যায়। নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু বিষযটি কেবল জীববিজ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে ভুল করা হয়। কারণ, সমাজে এমন অনেক আচার-বিচার আছে যাহা জন্মহার সীমিত করিতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। (১) পুরুষ এবং নারীর অবাধ মেলামেশায় অনেক রকম বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। যেখানে বিবাহে বাধা আছে, সেইসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক মেলামেশায় নিষেধের কড়াকাড়ি বেশি। যেমন, কোন পুরুষের সঙ্গে কুমারী মেয়ের অধিক রাত্রি পর্যন্ত বাড়ীর বাহিরে থাকা সব সমাজেই নিন্দনীয় আচরণ বলিয়া বিবেচিত। (২) সমাজ-নির্দিষ্ট পন্থা ব্যতীত নর-নারীর যৌন মিলন সব সমাজেই গর্হিত অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। জন্মহার সীমিত রাখার ক্ষেত্রে এই বিধি বিশেষ

---

1 "..............fertility, mortality, and migration are all to a great extent socially determined and socially determining." Kingsley Davis: Human Society. Page 552

কার্যকরী। বিবাহও নানা প্রকার নিষেধসমূহ দ্বারা নিয়মিত হয়। অনেক সমাজেই বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর ন্যূনতম বয়স আইন দ্বারা নির্ধারিত থাকে। আবার অনেক সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী আইন-নির্দিষ্ট ন্যূনতম বয়স-সীমার অনেক ঊর্ধ্বে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইসব ব্যবস্থার ফলে মেয়েদের জন্মদায়ক কাল (reproductive period) কার্যত সীমিত হইয়া পড়ে এবং জন্মহারও স্বভাবতঃ হ্রাস পায়। বিধবা বিবাহের ব্যাপক প্রচলন না হওয়ার ফলও অনুরূপ। তাহা ছাড়া, বিবাহিত দম্পতির যৌন মিলনও কোন কোন সমাজে নানা প্রকার সামাজিক আচার-বিচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (৩) বহু সমাজেই অর্থনৈতিক অথবা বিবাহিত মহিলার স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কারণে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার রীতি স্বীকৃত। বর্তমান যুগে অধিকাংশ সমাজে অধিকাংশ ধর্মাবলম্বীদের নিকট গর্ভনিরোধক দ্রব্যাদি ব্যবহার করার নৈতিক বাধা অন্তর্হিত হইয়াছে বলা যায়। বলা বাহুল্য, এইসব কারণে জন্মহার হ্রাস পায়। (৪) কোন কোন সমাজে বিশেষ অবস্থায় গর্ভপাত (abortion) আইনসিদ্ধ এবং সমাজস্বীকৃত।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, জন্মহার নানারকম সামাজিক আচার-বিচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

আবার অনেক সামাজিক আচার-বিচার আছে যাহা জন্মহার বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। হিন্দুগণের নিকট বংশরক্ষা করা ধর্মীয় আচরণ বলিয়া বিবেচিত। সেইজন্য হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হইবার পূর্বে পুত্র সন্তানের কামনায় অনেককে একাধিকবার পানিগ্রহণ করিতে দেখা যাইত। কৃষি-কেন্দ্রিক গ্রামীন পরিবারে অধিকসংখ্যক সন্তান থাকা অর্থনৈতিক দিক হইতে প্রয়োজনীয় এবং সুবিধাজনক। সেইজন্য এই জাতীয় সমাজে অধিকসংখ্যক সন্তানের অনুকূল পরিবেশ ও জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণ গড়িয়া তোলার প্রয়াস লক্ষণীয়।

বহু প্রাচীন কাল হইতে জরা, ব্যাধি, মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। সভ্যতার প্রথম যুগে বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা না থাকায় নানা প্রকার তুকতাক ও ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জরা, ব্যাধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিয়া মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হইত। ধীরে ধীরে জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে তুকতাকের পরিপূরক হিসাবে হাতুড়ে চিকিৎসার প্রচলন হয়। অবশেষে বিজ্ঞানবিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। বর্তমান যুগে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মৃত্যুহারও কেবলমাত্র জৈবিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় না। সামাজিক আচার-বিচার ও ব্যবস্থাদি দ্বারা ইহা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

নানা কারণে মানুষ স্থানান্তরে গমন করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারে। স্থানান্তরে গমন করার সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক কারণ

ব্যক্তিকে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রভাবিত করে। ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় বা এইপ্রকার অন্যান্য সামাজিক নিপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কেহ কেহ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। য়ুরোপ হইতে আটল্যাণ্টিক মহাসাগর পারি দিয়া যাহারা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই তৎকালীন য়ুরোপীয় পরিবেশকে তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় বলিয়া মনে করিত। অনেকে আবার শিক্ষা অনুযায়ী কাজকর্ম করার সুযোগসুবিধা না থাকায় বিদেশে চলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই জাতীয় প্রবাসন brain drain বা বুদ্ধিজীবীদেব দেশত্যাগ বলিয়া আখ্যাত। বাসস্থানের অসুবিধা বা প্রতিকূল অবস্থা সম্পর্কে ধারণা অতিরঞ্জিত এবং আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন হইতে পারে অথবা এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে। অনুরূপভাবে, গন্তব্যস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণাও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞাতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে অথবা আংশিক বা পুরাপুরি কাল্পনিক হইতে পারে। আসল কথা হইল, বাসস্থানের সামাজিক পরিবেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিলেই অন্যত্র যাওয়ার বাসনা বা ইচ্ছা জাগরিত করে।

পরিযাণ দুই প্রকারের হইতে পারেঃ (১) দেশান্তরে গমন বা (২) দেশের মধ্যেই স্থানান্তরে গমন। পরিযাণেব কারণ সম্বন্ধে যাহা সাধারণভাবে আলোচনা করা হইল, তাহা উভয় প্রকার পরিযাণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, জন্মহার, মৃত্যুহার এবং পরিযাণের মোট পরিমাণ নানাভাবে সামাজিক কারণে প্রভাবিত হয়। আবার জন্মহার, মৃত্যুহার এবং পরিযাণের পরিবর্তনও সমাজকে প্রভাবিত করে। শেষোক্ত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

সমাজস্থ লোকের জীবনযাত্রার মান কি ভাবে জনসংখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়, এই বিষয়ে ম্যালথাস (Malthus, 1766—1834) সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁহার বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমাজ-জীবনে একটি ট্র্যাজেডিস্বরূপ। কারণ, জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে (geometrical progression) এবং খাদ্য সামগ্রী সমান্তর হারে (arithmetical progression) বৃদ্ধি পায়। অতএব কালক্রমে খাদ্য সামগ্রীর অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে খাদ্যে ঘাটতি পড়িবে। এই অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি খাদ্যাভাব, বুভুক্ষা, অপুষ্টি, ব্যাধি এবং অকাল মৃত্যু। সুতরাং সুপরিকল্পিতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ না করিলে এই ভয়াবহ পরিণতি হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

ম্যালথাসের মতবাদ যে-যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা উপেক্ষা করা কঠিন। তবে তাঁহার পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, জন্মনিরোধক সামগ্রীর বহুল প্রচারের ফলে জন্মহার গুণোত্তর হারে বৃদ্ধি

না পাইয়া হ্রাস পাইতে পারে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম য়ুরোপের নয়টি দেশে বৎসরে গড় জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ৩৪.১। প্রায় পচাত্তর বৎসর পর এই দেশগুলিতে জন্মহার অর্ধেকে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করার ফলে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন সমান্তর হারের পরিবর্তে গুণোত্তর হারে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বর্তমান যুগে এই প্রকার উদাহরণ বিরল নহে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ম্যালথাসের পক্ষে পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে কোন কিছু অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির দিকে তাকাইলে ম্যালথাসের উক্তির যাথার্থ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইসব দেশে জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত না করিলে কেবল সবুজ বিপ্লবের দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রসঙ্গতঃ অর্থনৈতিক বিকাশ (economic growth) এবং জনসংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। অনেকে বলেন যে, আধুনিকীকরণের ফলে জনসংখ্যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন (demographic revolution) ঘটিয়া থাকে। অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সমাজস্থ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ইহার অব্যবহিত ফল দাঁড়ায় নিম্নরূপ। একদিকে, জনস্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থাদিতে উন্নতি, উন্নততর চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তন এবং নিয়মিত খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহের ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। অপর দিকে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় প্রথম দিকে জন্মহার বৃদ্ধি পাইবার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। সরকারী উদ্যোগে পরিবার সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা গৃহীত হইলেও প্রথম পর্বে অনুন্নত সাবেকী (traditional) সমাজে এই ধরনের প্রয়াস বিশেষ কার্যকর হয় না। কারণ, উপযুক্ত মানসিকতা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত সীমিত পরিবারের আদর্শ সাধারণ লোক গ্রহণ করিতে পারে না এবং এইরূপ মানসিকতা গড়িয়া উঠা সময়সাপেক্ষ। অতএব অর্থনৈতিক বিকাশের অব্যবহিত ফল দাঁড়ায় জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি। ইহাকে অনেকে population explosion বা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলিয়া আখ্যাত করেন। বলা বাহুল্য, জীবনযাত্রার মানের উপর ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। কিছুকাল এইভাবে চলার পর এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকিলে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায়। স্বভাবতই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করে।

সমাজস্থ লোকের মানসিকতার উপরও জনসংখ্যার (the size of population) প্রভাব রহিয়াছে। এই বিষয়ে ম্যাক আইভারের উক্তি উল্লেখ্য ঃ "......countries with growing populations and relatively limited resources have under appropriate conditions, an incentive to imperialism and to militarism, while these attitudes in turn encourage a further increase of population." 1

1 Mac Iver and Page: Society. Page 537

অর্থাৎ কোন দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে যদি সীমিত সঙ্গতি থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক মনোবৃত্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং পরবর্তীকালে এইরূপ মনোভাবই আরও জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাপানীদের জঙ্গী মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেকে ভৌগোলিক আয়তন অনুপাতে জনসংখ্যার আধিক্য এবং সীমিত সম্বলের উল্লেখ করেন। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে ইটালী ও জাপানেব সামরিক মনোবৃত্তির উদ্ভব কোন কোন মহলে অনুরূপ যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়।

জন্মহার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার ফলে কেবল যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহাই নহে, বয়স-ভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাসেও (age-group composition) পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজে গড় বয়স (average age) বৃদ্ধি পাইবে না হ্রাস পাইবে, ইহা প্রধানতঃ মৃত্যুহাব এবং জন্মহারেব যথাক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধিব আনুপাতিক হারের উপর নির্ভর করিবে। যদি গড় বয়স বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমাজে অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার যদি গড় বযস হ্রাস পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমাজে অল্প বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বয়স-ভিত্তিক জনসংখ্যাব বিন্যাস সামাজিক পরিবর্তনের দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বয়স্ক লোকের আধিক্য হইলে চিরাচরিত আচার-আচরণ অনুসরণ করার প্রতি প্রবণতা বেশি থাকা স্বাভাবিক। বিপরীত অবস্থায় চিরাচরিত আচার-আচরণ বর্জন কবিযা পরিবর্তিত আচার-আচবণ গ্রহণ করার দিকে ঝোঁক থাকার সম্ভাবনা বেশি।

সমাজের উপর জনসংখ্যার প্রভাব আলোচনা করিবাব সময় আবেকটি বিষয বিবেচনা করা দরকার। আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে, বংশগতির প্রভাবে মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিতে পার্থক্য ঘটে। ইহার ভিত্তিতে এক সময় সৌজাত্য (Eugenics) বলিয়া একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা খুব জনপ্রিয় হইযাছিল। কিন্তু ইহার জনপ্রিয়তা দীর্ঘ দিন স্থায়ী না হওয়ার কারণ হইল, বিশেষ বিশেষ গুণ বিবেচনা করিয়া বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করিলে এই বিবাহজাত সন্তান প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়া জন্মাইবে কিনা ইহা সুনিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে জর্জ বার্ণার্ড শ'-এর উক্তি উল্লেখ্য। কথিত হয় যে, একবার বিখ্যাত নর্তকী ইসাডোরা ডানকান (Isadora Duncan) বার্ণার্ড শ'-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একটি পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি সৌজাত্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের বিবাহের ফলে যে সন্তান জাত হইবে সেই সন্তান শ'-এর মনীষা এবং শ্রীমতী ডানকানের দৈহিক সৌন্দর্য লাভ করিবে। প্রত্যুত্তরে বার্ণার্ড শ' তাঁহার স্বভাবসুলভ পরিহাসভঙ্গিতে মন্তব্য করেন যে, তাঁহাদের সন্তান যে শ'-এর কুৎসিত মুখাবয়ব এবং শ্রীমতীর দুর্বল মস্তিষ্কের শক্তি লইয়া জন্মাইবে না, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? পরিহাসচ্ছলে বার্ণার্ড শ' যে মন্তব্য করিয়াছেন, ইহাই সৌজাত্যের স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে পরিগণিত হইবার পথে প্রধান অন্তরায়।

পিতা ও মাতার কি কি বৈশিষ্ট্য সন্তান জন্মসূত্রে পাইবে ইহা পূর্ব হইতে সঠিক বলা অসম্ভব, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাতা পিতা দুইজন যদি ভিন্ন জাতির লোক হন, তাহা হইলে সন্তানের আকৃতি যে মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে পৃথক হইবে, ইহা অনস্বীকার্য। পূর্বে যখন সামাজিক এবং ভৌগোলিক সচলতা সীমিত ছিল, তখন বিবাহাদি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। ইহার ফলে, এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে আকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু আধুনিক সমাজে উভয় প্রকার সচলতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য বিবাহের গণ্ডী পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি বিস্তৃত হইয়াছে। আজকাল বিভিন্ন জাতি বা ধর্মাবলম্বী বা ভাষাভাষী লোকের মধ্যে বিবাহ বিরল নহে। এই প্রকার বিবাহের ফলে পরবর্তী পুরুষের সন্তানগণের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ইহা সুদূরব্যাপী সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে।

প্রযুক্তিবিদ্যা ও সমাজ

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা হইতে প্রযুক্তিবিদ্যাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নহে। পোষাক-পরিচ্ছদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্যসম্ভার, বিভিন্ন রকম আহার্য বস্তু এবং চলাফেরা করার প্রয়োজনীয় যানবাহন—সব কিছুই প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে তারতম্যের ভিত্তিতে প্রধানতঃ সাবেকী ও আধুনিক সমাজের মধ্যে ভেদরেখা টানা হয়। অগ্রসর এবং অনগ্রসর সমাজের মধ্যে পার্থক্যও অনুরূপ ভিত্তিতে করা হয়।

সমাজ-জীবনের উপর প্রযুক্তিবিদ্যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রহিয়াছে। সমাজতাত্ত্বিক দিক হইতে এই বিষয়টি আলোচনা করিবার সময় তিনটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার সম্পর্ক কি? দ্বিতীয়তঃ, কি প্রণালীতে (the proccss of social change under the impact of technology) প্রযুক্তিবিদ্যা সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করে? তৃতীয়তঃ, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে কি কি সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়?

সাধারণ অর্থে প্রযুক্তিবিদ্যা বলিতে শিল্পাদিতে প্রয়োগ-কৌশল বুঝায়। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় এই শব্দটি প্রয়োগ-কৌশল ছাড়া আরও অতিরিক্ত অর্থ বহন করে। প্রযুক্তিবিদ্যা বলিতে কেবলমাত্র কলকারখানা বা বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জামের প্রবর্তন বুঝায় না, যথোচিত মানসিক ও সামাজিক প্রস্তুতিও নির্দেশ করে। কারণ, শেষোক্ত পরিবর্তন না ঘটিলে প্রযুক্তিবিদ্যার সম্যক বিকাশ সম্ভব নহে। বিশেষ ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় প্রযুক্তিবিদ্যা গৃহীত হয়। কিন্তু উপযোগী মানসিকতা এবং সামাজিক কাঠামো গড়িয়া না উঠিলে এই প্রত্যাশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যা আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইয়াছে এবং কোন কোন সমাজে তাহা হয় নাই। জীবন-ধারাগত পার্থক্যের মধ্যে ইহার কারণ

পাওয়া যায়। সেইজন্য কয়েকজন সমাজতত্ত্ববিদ technological development না বলিয়া ইহার পরিবর্তে socio-technological development বলা অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করেন।[1]

প্রসঙ্গতঃ ম্যাক্স হ্বেবারের ধনতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ করিলে বক্তব্যটি আরও অর্থবহ হইবে। তাঁহার মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথমাবস্থায় পার্থিব তপশ্চর্যার (worldly asceticism) বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধনতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর পার্থিব তপশ্চর্যার প্রয়োজন রহিল না। ধনতান্ত্রিক কাঠামো ধীরে ধীরে পশ্চিম য়ুরোপীয়দের মানসিকতা এমনভাবে গড়িয়া তোলে যে, ধনতান্ত্রিক কাঠামোব অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। অনুরূপভাবে, সামাজিক ও মানসিক প্রস্তুতি না থাকিলে প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নহে. বাহিব হইতে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানী করিলেই আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। এই কারণে প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়টি কেবল কারিগরি দিক হইতে বিচার করিলে যথেষ্ট হয় না। সমাজতাত্ত্বিক দিকটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাঠামো ও সমাজস্থ লোকের মানসিকতা পরিবর্তিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ন্যায প্রযুক্তিবিদ্যাও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাইয়া নিজের জোরেই অগ্রসর হইতে থাকে।

জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য কি ভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন ও বিকাশকে প্রভাবিত করে, এই বিষয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশসমূহেব সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলন এবং সম্প্রসারণের সঙ্গে মুখ্য মূল্যবোধের (dominant values) প্রশ্ন জড়িত। ষোড়শ শতাব্দীর য়ুরোপে পোপ-বিরোধী খ্রিষ্টীয় ধর্ম বিপ্লবের (Reformation) ফলে মানুষের চিন্তাজগতে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে তাহা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। পূর্বে নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণ লোকের ধর্মীয় বিশ্বাস গড়িয়া উঠে। প্রথা এবং চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী যাবতীয কাজকর্ম পরিচালিত হইত। এই প্রকার মনোভাব নূতন কিছু প্রবর্তিত হওয়ার পথে স্বভাবতই অন্তরায়স্বরূপ ছিল। কিন্তু ধর্মবিপ্লব ও তৎপরবর্তী পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষ অপেক্ষাকৃত বেশি যুক্তিবাদী হইয়া উঠে এবং পূর্বতন ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তে ইহজগতে সুখভোগ ও

---

1 "Technological development is, indeed, a complex process. It does not simply mean the overt acceptance of material and technical improvements. It implies a cultural, social, and pyschological process as well. Some writers, therefore, prefer to use the term socio-technological development". G. M. Foster : Traditional Cultures and the Impact of Technological Change. Harper and Brothers. N. Y. Page 2

স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার আদর্শ গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, এই আদর্শ প্রযুক্তিবিদ্যা গৃহীত হইবার পথ সুগম করে।1

অপর পক্ষে, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশসমূহে অপার্থিব জীবনাদর্শ প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলন ও বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডেভিসের উক্তি উল্লেখ্য: "One common feature of the fixed society is what might be called diffuse other worldliness—the tendency to fix attention on transcendental world and to view the material world primarily as symbolic of transcendental realities. Since technology and science deal with the intrinsic relations between phenomena, the insistence upon a supernatural interpretation in every detail is a serious obstacle".2 অর্থাৎ ইহজগতকে যদি অতিপ্রাকৃত জগতের প্রতীক এবং সেই কারণে 'মায়া' বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে পার্থিব ঘটনাবলীকে অতিপ্রাকৃত যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইবে, ইহা স্বাভাবিক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব এই প্রকার মনোভাবের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোন সঙ্গতি নাই। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "The ideal pattern of Hindu values was woven round 'wantlessness'. How could technology and machines geared to the production of goods for the satisfaction of wants, which created more wants, joint wants, derived wants, the infinite hyperbola of wants, be consonant with the pattern of Hindu norms? How could such norms square, for that matter, with economics, grounded as it was on wants and their satisfaction? If absolute separation of the soul from the body be the utter sum of existence then Gandhiji, and with him every Hindu,............would,

1 "The transition from traditional to modern industrialised societies in Europe was greatly facilitated by a process of secularisation which had its beginning in the Renaissance and took specific shape in the Protestent Reformation...........This secularisation changed the outlook and attitude of large masses of people...........Instead of a popular religiosity surrounded by group rituals and superstitions resisting change, and strong reliance on custom and tradition man in modern societies may be said to be more open to the pragmatic test, more hedonistically ratioual and experimental". K. W. Kapp: Hindu Culture, Economic Development and Plannnig. Pages 5-6

2 Kingsley Davis : Human Society. Pages 446-447

raise the eternal query : Why this craze for machinery? Why machine civilisation at all ?"1 অর্থাৎ যাবতীয় অভাবকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করা হিন্দু জীবনাদর্শের পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে হিন্দু জীবনাদর্শের কোন সঙ্গতি থাকিতে পারে না। কারণ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতির মুখ্য উদ্দেশ্য, নূতন নূতন ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভাবিত সামগ্রীসমূহের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করা। দেহ হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবা যেখানে জীবনেব মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে যান্ত্রিক সভ্যতার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক।

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলন এবং সম্প্রসারণের সঙ্গে 'প্রগতি' সম্পর্কে ধারণা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। য়ুরোপে সাধারণ লোকের জীবনাদর্শ এবং লক্ষ্য ধর্মীয় বিধিনিয়মাদি হইতে মুক্ত (secularisation of thought) হওয়ার ফলে পার্থিব জগতকে আবও সুস্থ জীবন-যাপনের উপযোগী করার প্রতি প্রবণতা লক্ষণীয়। সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন হওয়া বিচিত্র নহে।2

অপর পক্ষে, এই জগতকে যদি 'মায়া' বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে স্বাভাবতই এই জগতকে উন্নত করার জন্য কোন প্রচেষ্টা না থাকারই কথা। সব কিছু আনন্দ, সার্থকতা ও সুখভোগ যদি মরণোত্তর জীবনে বিরাজ করে, তাহা হইলে পার্থিব জগত উপেক্ষিত হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ইহার ফলে প্রাত্যহিক কাজকর্মে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব লাভ করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রচলন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় আরেকটি বিষয়ও বিবেচ্য। এমন অনেক সমাজ আছে যেখানে লোকেরা অভিনবত্বের প্রতি উদাসীন। আবার এমন অনেক সমাজ আছে যেখানে কোন কিছু অভিনব বলিযাই লোকেরা ইহাকে পরীক্ষা করিয়া গুণাগুণ বিচার করিতে আগ্রহী।3 সাধারণতঃ ভারতবর্ষের মত সাবেকী (traditional) সমাজগুলিতে প্রথমোক্ত ভাবধারা এবং শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশসমূহে শেষোক্ত ভাবধারা বিরাজ করে। বলা বাহুল্য, অভিনবত্বের প্রতি ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে।

---

1 D. P. Mukherjee : Mahatma Gandhi's views on Machinery and Technology. International Social Science Bulletin. Vol. 6. No. 3. UNESCO. Paris. 1954.

2 এই প্রসঙ্গে ক্যালভিনেব মতবাদ বিবেচ্য।

3 "Some cultures value positively novelty and change for their own sake. The fact that something is new and different is sufficient reason to examine it and perhaps to try it." G. M. Foster: Traditional Cultures and the Impact of Technological change. Pages 64-66

প্রযুক্তিবিদ্যা কি প্রণালীতে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করে—এই বিষয়টি অগবার্ন (Ogburn) তিনটি দিক হইতে আলোচনা করিয়াছেন।

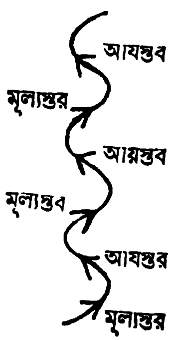
প্রথম প্রণালীটিকে তিনি dispersion বা বিকিরণ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোন যান্ত্রিক উপায় আবিষ্কৃত হইলে তাহার সুদূরপ্রসারী সামাজিক প্রতিক্রিয়া থাকে। এই প্রতিক্রিয়া আবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হইতে পারে। অগবার্ন রেডিওর এক শত পঞ্চাশটি ফলাফল নির্দেশ করিয়াছেন।1 সেচের কাজের জন্য অথবা রাস্তায় এবং বাড়ীঘরে আলো সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তি সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে কেবল উপরোক্ত মুখ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে না। ধীরে ধীরে গ্রামীন শিল্প গড়িয়া উঠে এবং ইহার প্রভাবে পল্লীবাসীদের পারিবারিক জীবন, সমাজ-জীবন এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যে-কোন যান্ত্রিক উপায়ের ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে এই প্রকার বিকীর্ণ প্রতিক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

অগবার্ন দ্বিতীয় প্রণালীটিকে convergence বা সমকেন্দ্রিকতা বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে-কোন যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে যেমন সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হইতে পারে, ঠিক তেমনি অনেকগুলি যান্ত্রিক আবিষ্কারের সম্মিলিত ফল হিসাবেও সুদূরব্যাপী সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বড় নগরের উপকণ্ঠে উপপুরের (suburbs) উল্লেখ করা যায়। মোটর গাড়ী, বাস, ইলেকট্রিক ট্রেন প্রভৃতি দ্রুত যানের প্রবর্তন, টেলিফোনের সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ব্যাপক প্রসার, স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে উপপুরের উদ্ভব হয়। উপরোক্ত সব কয়টি ব্যবস্থার স্বতন্ত্র প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সম্মিলিত ফল হিসাবে উপপুর গড়িয়া উঠে। যদি দ্রুত যানের ব্যবস্থা, চিকিৎসা-কেন্দ্র ও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা ইত্যাদি না থাকিত, তাহা হইলে উপপুর গড়িয়া উঠিত কিনা বলা শক্ত। আরও অনেক উদাহরণের কথা ভাবা যাইতে পারে। পূর্বে সর্বত্র জ্বালানি হিসাবে কাঠ ব্যবহৃত হইত। সেইজন্য রান্নাঘর বাসগৃহ হইতে পৃথক করিয়া রাখার রীতি ছিল। পূর্বে বর্তমান যুগের ন্যায় স্যানিটারী পায়খানাও ছিল না। সুতরাং গৃহ হইতে যথাসম্ভব দূরে পায়খানার স্থান নির্দিষ্ট করা হইত। ভারতবর্ষে গুটিকয়েক নগর বাদ দিলে প্রায় সর্বত্র এই ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু যেখানেই কাঠের পরিবর্তে কয়লা, কেরোসিন বা গ্যাস ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং স্যানিটারী পায়খানার প্রচলন শুরু হইল, সেখানেই গৃহ নির্মাণ করার রীতির পরিবর্তন হইয়া গেল। এমন কি, পল্লী অঞ্চলেও যাঁহারা এই দুইটি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের গৃহ-নির্মাণ রীতিতেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। ভবিষ্যতে

1 এই বিষয়ে অগবার্নের বিশ্লেষণ পড়িলে বুঝা যায়, কোন যান্ত্রিক উপায় প্রবর্তিত হইলে তাহার ফলাফল কত সুদূরব্যাপী হইতে পারে। See Ogburn and Nimkoff: A Handbook of Sociology. Pages 517-521

এইরূপ উন্নত ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন হইলে পল্লী অঞ্চলের ঘর-বাড়ীর চেহারায় আমূল পরিবর্তন হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনুরূপভাবে, একাধিক উদ্ভাবিত ব্যবস্থার যোগসাধন হইলে নানা রকমের পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

তৃতীয় প্রণালীটিকে অগবার্ন spiral বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।1 সাধারণ অর্থে spiral বলিতে খাড়া ঘোরানো সিঁড়ি বুঝায়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করিলেই spiral শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝা যাইবে। প্রথমেই অর্থনীতি হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। উৎপন্ন সামগ্রীর তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ইহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়-বৃদ্ধির দাবি উঠে। আয়-বৃদ্ধির ফলে জিনিষপত্রের চাহিদা বাড়ে এবং মূল্যস্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, মূল্যস্তর ও আয়স্তর পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া উভয়েরই ঊর্ধ্বগামী হওয়ার প্রবণতা রহিয়াছে। নকশায় ঘটনাটি নিম্নরূপ দেখান যাইতে পারে।

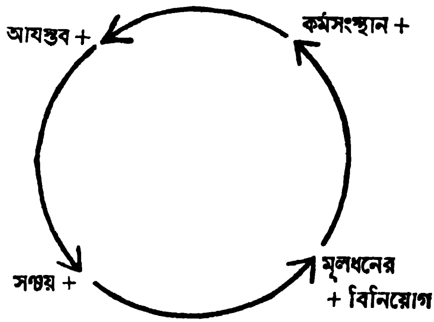


অনুরূপভাবে, সমাজ-জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ‘ক’-এর পরিবর্তন হওয়ার ফলে ‘খ’-এর পরিবর্তন ঘটে। আবার ‘খ’-এর পরিবর্তন ‘ক’-কে প্রভাবিত করে এবং ‘খ’ও তদনুযায়ী প্রভাবিত হয়। যেমন, অনুন্নত দেশে মূলধনের অভাব শিল্পের সম্প্রসারণে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জোগাড় করিয়া অথবা বৈদেশিক মূলধন ঋণ হিসাবে আনিয়া যদি বিনিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান (employment) ও তজ্জনিত আয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। এই বিষয়টি একটি নকশার সাহায্যে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইল।

সুইডেনের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ মির্ডাল (Gunnar Myrdal) সামাজিক পরিবর্তনের এই গতিকে ‘a circular cumulative

1 কোন যন্ত্র বা সামাজিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইলে সামাজিক পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হওয়ার বিষয়টি তিনি spiral-এর সাহায্যে আলোচনা করিয়াছেন।

accelerating process' অথবা বৃত্তাকার ক্রমপুঞ্জিত দ্রুতিশীল প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।1 আলোচ্য উদাহরণে মূলধনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার



ফলে যে-সব পরিবর্তন ঘটে তাহাদের প্রভাবে মূলধনের বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইভাবে পরিবর্তনের প্রবাহ বৃত্তাকার ঘুরিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে মির্ডালের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে বিবেচ্য। তাঁহার মতে, অনগ্রসর দেশসমূহের তুলনায় অগ্রসর দেশগুলিতে সামাজিক পরিবর্তনের বৃত্তাকার ক্রমপুঞ্জিত প্রবাহ অধিকতর দ্রুত। ইহার ফলে অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে জীবনযাত্রার মান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়ে পার্থক্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহার যুক্তি অকাট্য। তথ্যের দিক হইতেও তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে।

সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা করিবার সময় এইরূপ বিশ্লেষণের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। ভারতবর্ষে তফসিলী সম্প্রদায়কে (scheduled castes) অপরাপর সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে তুলিবার জন্য শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং চাকরি-বাকরিতে অগ্রাধিকার দান বা আসন সংরক্ষণ করার নীতি অবলম্বিত হয়। এই নীতি অবলম্বন করার আসল উদ্দেশ্য হইল, অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের সমকক্ষ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, শিক্ষার অধিকতর সুযোগ পাইলেই তাহাদের চাকরি-বাকরির পথ প্রশস্ত হইবে এবং তজ্জনিত আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চাকরি-বাকরিতে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয় মান নামাইয়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষার সম্প্রসারণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা বিধেয়। স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে চাকরি-

1 **Gunnar Myrdal: Development and Underdevelopment.**

ব্যকরিতে স্থান সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন হইলেও দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিলে সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদের উন্নয়ন অধিকতর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইসব ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বৃত্তাকার ক্রমপুঞ্জিত প্রবাহ দ্রুততর হইবার সম্ভাবনা বেশি থাকিবে, সেইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। অতএব সমাজ-সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার সময় এই দিকটি বিবেচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব সর্বব্যাপী। ব্যক্তি-জীবন এবং সমাজ-জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহা ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও প্রযুক্তিবিদ্যা সামাজিক পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত করিয়াছে। অতীতের সঙ্গে বর্তমান কালের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই বিষয়টি বুঝিতে পারা যাইবে। আজকাল এক দশকে যে-হারে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঁচ দশকে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটিত বলিয়া মনে হয় না। প্রযুক্তিবিদ্যার বহুল প্রচলনের জন্যই এই ব্যাপক পরিবর্তন এত দ্রুতগতিতে সংঘটিত হয়। বিভিন্ন দিক হইতে প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। বর্তমান যুগের শিল্প-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাক্ শিল্প-যুগীয় সমাজে ছোট বহরে উৎপাদন চলিত এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল বিকেন্দ্রীকৃত। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তনে উৎপাদন শুরু হয় এবং বড় বড় কলকারখানার মাধ্যমে কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ইহা একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। কারণ, সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে এই পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পজাত এবং কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটি হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এক শত বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-শ্রমিকের উৎপাদন-হার গড়ে ছয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরে শিল্পে বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ার ব্যাপক প্রচলন (application of electronics) হওয়ায় উৎপাদনের হার আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনুরূপ হারে না হইলেও ভারতবর্ষে শিল্প-শ্রমিকের উৎপাদন-হার প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তনের ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন-বৃদ্ধি লক্ষণীয়। মাত্র ৪।৫ বৎসরে ভারতবর্ষে গমের উৎপাদন আশাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাকে সবুজ বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তনের ফলেই সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, প্রযুক্তিবিদ্যা সমাজস্থ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে সাহায্য করে। জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন চারিটি দিক হইতে বিশ্লেষণ করা

যায়। (ক) শিল্পজাত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী অনেক বেশি সহজলভ্য হয়। (খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রচলনের ফলে নূতন নূতন সামগ্রী উৎপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, টেরিলিন, টেরিকট, ভয়েল প্রভৃতি নানা রকমের কৃত্রিম রেশম বস্ত্রের (synthetic fibre) উল্লেখ করা যায়। বর্তমান যুগে মানুষের আহার-বিহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদে যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রযুক্তিবিদ্যার পরোক্ষ অবদান। (গ) প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের কেবল পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই, গুণগত উৎকর্ষও ঘটিয়াছে। নানা প্রকার গবেষণা-কার্যের সাহায্যে গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা অবিরাম চলিতেছে। (ঘ) যন্ত্রপাতি এবং নানাবিধ কলাকৌশল প্রয়োগ করার ফলে মানুষ অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে অধিক কাজ করিতে পারে। ইহার ফলে তাহার অবসর সময় পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চতুর্থতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত নানা প্রকার কলাকৌশল অবলম্বিত হওয়ায় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের গতিবেগ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি অলোচনা করা যাইতে পারে। পূর্বে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না থাকায় দিবালোকে যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করিতে হইত। কাজেই সূর্যাস্তের পর হইতে মানুষ পূর্ণ মাত্রায় অবসর ভোগ করিত। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতে তাহার কাজকর্ম অধিক রাত্রি পর্যন্ত চলিতে থাকে। কলকারখানার কাজ চব্বিশ ঘণ্টা চলে। পূর্বে পরিবহনের ব্যবস্থা মন্দগামী ছিল। সুতরাং যাতায়াতে আরাম না থাকিলেও অবসর ভোগ করার অবকাশ ছিল। বর্তমানে দ্রুতগামী যানবাহনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় যাতায়াত এত বেশি ত্বরান্বিত হইয়াছে যে চলাফেরায় অবসর পাইবার সম্ভাবনা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্বে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রা, কবিগান, কথকতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানুষ যুগপৎ আনন্দ এবং বিশ্রাম উপভোগ করার সুযোগ পাইত। অতএব বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত কলাকৌশলের বহুল প্রচলনে মানুষের জীবন অত্যন্ত অস্থির ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চমতঃ, অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটাইয়া প্রযুক্তিবিদ্যা পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছে। দশম পরিচ্ছেদে পরিবারের কাঠামোগত ও কার্যাবলী সম্পর্কিত পরিবর্তন আলোচনা করিবার সময় আমরা এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

ষষ্ঠতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যা পূর্বের নিশ্চল শ্রেণীব্যবস্থার (closed class system) পরিবর্তে সচল শ্রেণীব্যবস্থার (open class structure) উদ্ভব ঘটাইতে সাহায্য করিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য অনেক নূতন নূতন বৃত্তিরও সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক কালের মর্যাদা অনুসারী শ্রেণী (status groups) প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

সপ্তমতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনাদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বলা হয় যে, বর্তমান যুগের লোকেরা অপেক্ষাকৃত বেশি বাস্তবধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলে তাহারা কোন কিছু গ্রহণ করিতে নারাজ। বিমূর্ত মূল্যবোধের (abstract value) তুলনায় প্রয়োজনের দিক হইতে কার্যকর ভাবধারাকে (functional utility) তাহারা অধিকতর গুরুত্ব দিয়া থাকে। আরও বলা হয় যে, জ্ঞানার্জন বা অপরাপর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করার চাইতে ধনদৌলত আহরণ করা জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে অধিকতর প্রাধান্য পাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, আধুনিক সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে বর্তমান যুগের অস্থিরতা প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।[1]

অষ্টমতঃ, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ায় সরকারকে নূতন নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইতেছে। যৌথ পরিবার প্রথা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহে সরকারকে নানা প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (social security measures) গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও সরকারকে অনুরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। উপরন্তু, প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যাপক প্রচলনের ফলে বৃহদায়তন শিল্প-সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। নানা কারণে ইহাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাক্ শিল্পযুগীয় সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হইত। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বর্তমান কালে বৃহদায়তন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহাদের অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকিতে দেওয়া সর্বসাধারণের মঙ্গলের দিক হইতে বিপজ্জনক।

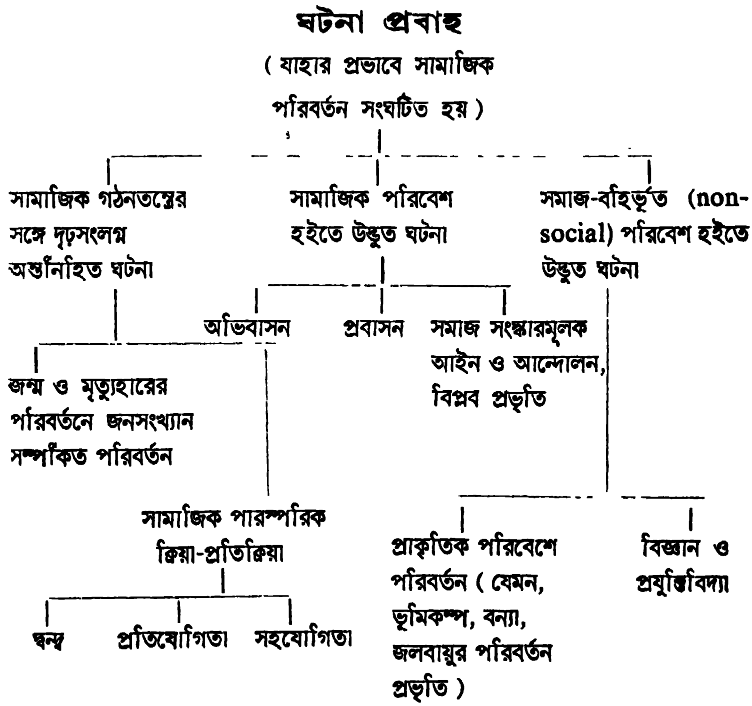
উপরোক্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হওয়া ছাড়া প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে অনেক রকম ছোটখাট পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যেমন, যানবাহনের উন্নতি হওয়ায় পাড়া বলিতে যাহা বুঝাইত তাহা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইতেছে। প্রতিবেশিগণের সঙ্গে পূর্বতন সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে স্থানীয় লোকাচার, প্রথা প্রভৃতির প্রভাবও উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা শ্রমিকের মানোন্নয়ন করিয়া (from the position of status to one of contract) গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। এই কয়েকটি উদাহরণ হইতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে সমাজ-জীবনে প্রযুক্তিবিদ্যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রহিয়াছে।

উপসংহার

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কারণসমূহ আলোচনা করা

1 এই প্রসঙ্গে ভেবলেনের মতবাদ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

হইল। একটু সূক্ষ্মভাবে এই কারণ ও তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কোন একটি তত্ত্ব বা কারণের সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করার উপায় নাই। সমাজের বিভিন্ন অংশ এমনভাবে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, একাধিক কারণে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অধ্যাপক গিন্‌স্‌বার্গের আলোচনায় এই দিকটি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়টি নিম্নে অঙ্কিত নির্লেখে তুলিয়া ধরা হইল :



উপরের নির্লেখটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই অন্তর্নিহিত (inherent) অবস্থায় থাকে। অন্য কোন ঘটনা যদি না-ও ঘটে, সামাজিক পরিবর্তন অব্যাহত থাকিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। আবার সুপরিকল্পিতভাবে মানুষ নানাবিধ পরিবর্তন আনয়ন করে। নানা প্রকার মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রেষণা সমাজ সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত থাকিতে পারে। সমাজ-জীবনের উপর সমাজ-বহির্ভূত ঘটনাবলীর প্রভাবও অপরিসীম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Kingsley Davis : Human Society. The Macmillan Co. New York. 1961. Chapter XVI, XX, XXII.

২। Morris Ginsberg : Essays in Sociology and Social Philosophy. Peregrine Book.

৩। T. B. Bottomore : Sociology. Unwin University Books.

৪। Wilbert E. Moore : Social Change. Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi 1965.

৫। Mac Iver and Page : Society. Macmillan & Co. Ltd. London. 1959. Pages 531-538, 552-571, 582-587.

৬। N. F, Washburne : Interpreting Social Change in America. Doubleday & Co., Inc. Garden City, N. Y. 1954. Chapter II.

৭। K. W. Kapp : Hindu Culture, Economic Development and Economic Planning in India. Asia Publishing House. Bombay. 1963. Chapters I, II, III.

৮। Ogburn and Nimkoff : A Handbook of Sociology. Routledge and Kegan Paul Ltd. London. 1960. Chapter XXIV.

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতত্ত্ব দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইতিহাস-চর্চার (philosophy of history) ধারা অনুসরণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। কঁৎ, মার্ক্স, স্পেনসার ও ম্যাক্স হেবারের আলোচনায় ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষণীয়। যদিও ডুর্কহেইম এই ধারায় সমাজতত্ত্ব আলোচনা করার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ তিনিও অভিব্যক্তিমূলক ধারা (evolutionary approach) সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার শ্রমবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি আদিম যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমাজের ক্রমবিকাশ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে হবহাউস, এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক (Westermarck) ও মরিস্ গিন্‌স্‌বার্গের আলোচনায় অভিব্যক্তি-মূলক চিন্তার প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

সমাজতত্ত্বের প্রথম যুগের আলোচনায় পরিবর্তন (change), বিবর্তন (evolution), ক্রমবিকাশ (development) এবং প্রগতি (progress) শব্দসমূহ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রেই এই শব্দসমূহ সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য করা হইলেও ইহাদের যুক্তিসম্মত সম্বন্ধযুক্ত শব্দ হিসাবে গণ্য করা হইত (treated as logically related terms)। পরবর্তীকালে সমাজ-বিষয়ে এইসব শব্দ-প্রয়োগের যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে। আবার এই শব্দগুলির মধ্যে কতটুকু যুক্তিসম্মত সম্বন্ধ বিরাজ করে, এই বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং বিবর্তন, ক্রমবিকাশ ও প্রগতি শব্দসমূহ দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে এইসব শব্দ-প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

সামাজিক বিবর্তন

সমাজের নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের দিকটির উপর জোর দিতে গিয়া অনেক সমাজতত্ত্ববিদ বিবর্তন শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। কালস্রোতে সমাজ যে পরিবর্তিত বা বিবর্তিত হইয়াছে, ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এই বিষয়টি বুঝিতে বা বুঝাইতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন জীব-অভিব্যক্তির অনুসরণে সামাজিক অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হয়,

তখন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। স্পেনসার তাঁহার Principles of Sociology নামক গ্রন্থে সমাজের সঙ্গে জীবদেহের সাদৃশ্য আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি জীব-অভিব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক অভিব্যক্তির তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। টাইলরও (Tylor) তাঁহার Primitive Culture নামক পুস্তকে অনুরূপ তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, স্পেনসার, টাইলর প্রমুখ লেখকগণ সমাজে সুশৃঙ্খল পরিবর্তন (orderly change) বুঝাইতে গিয়া বিবর্তন শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানে এই শব্দটি বিশেষ এক প্রকার সুশৃঙ্খল পরিবর্তন বুঝায়। যখন কালপ্রবাহে জীবজগতে পরিবর্তিতরূপে বংশধরদের উদ্ভব ('descent with modifications') ঘটে, তখন ইহা জীব-অভিব্যক্তি (biological evolution) বলিয়া পরিচিত হয়। অর্থাৎ অভিন্ন পরাজাতির (genus) মধ্যে বিচিত্র রকমের উপজাতির উদ্ভব (the diversification of species) জীবঅভিব্যক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জীব-অভিব্যক্তির এই বিশেষ দিকটি স্পেনসার, টাইলর প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদদের আলোচনায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে।

জীববিজ্ঞানে যে অর্থে অভিব্যক্তি শব্দটি ব্যবহৃত হয় (অর্থাৎ descent with modifications), ঠিক সেই অর্থে সমাজের মত অজৈব (inorganic) ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য কিনা এই বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রে জীব-অভিব্যক্তির ধারণাটি সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। যে-সব ভাষাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলিয়া গণ্য করা হইত, সেইসব ভাষা কোন অভিন্ন উৎস হইতে উদ্ভূত হইতে পারে বলিয়া তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে (comparative philology) ইঙ্গিত দেওয়া হয়।[1] এই প্রসঙ্গে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উল্লেখ করা যায়। এই ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য জীব-অভিব্যক্তির সঙ্গে ভাষার বিবর্তন তুলনীয়।

কিন্তু সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে জীব-অভিব্যক্তির অনুসরণে তুলনামূলক আলোচনা করা কষ্টকল্পিত প্রয়াস ছাড়া কিছুই নহে। কারণ, আজ পর্যন্ত জীববিজ্ঞানের ন্যায় সমাজতত্ত্বে সমাজের গঠনসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যসমূহ (social morphology) সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত বা গৃহীত হয় নাই। ডারউইনের

1 "Languages have been classified into families or stocks and their similarities and differences have been studied with the aid of a theory which can be appropriately described as 'descent with modification'. The tendency of recent comparative philology has been, I understand, to establish connexions between linguistic stocks which had formerly been regarded as remote from each other, and their derivation from a common source seems not unlikely." M. Ginsberg Essays in Sociology and Social Philosophy. Page 101.

Origin of Species নামক গ্রন্থে চতুর্দশ পরিচ্ছেদে জীবদেহের যে বিস্তারিত শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, সমাজতত্ত্বে গঠন-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অনুরূপ সামাজিক শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং জীব-বিজ্ঞানে descent with modification নির্দেশ করা সম্ভব, সমাজতত্ত্বে স্বভাবতই ইহা করা সম্ভব নহে।

উপরন্তু, সামাজিক পরিবর্তন যে-ধারায় সংঘটিত হয় তাহা জীব-অভিব্যক্তির ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষ তাহার বিবিধ প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার জন্য ইতর প্রাণীর ন্যায় কোন বিশেষ সহজ প্রবৃত্তি বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য জন্মসূত্রে লাভ করে না। সেইজন্য সে জীবন-ধারাগত নানা উপায় (cultural aids) আবিষ্কার করিয়াছে। এই উপায়গুলি তাহার দেহ হইতে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ বাহিরের বস্তু। প্রয়োজন হইলে সে এইগুলি ব্যবহার করে, আবার প্রয়োজন না থাকিলে সে এইগুলি অনায়াসে বর্জন করে। এই উপায়গুলির ব্যবহার সম্পর্কে সে জন্মসূত্রে কোন জ্ঞান লাভ করে না। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সে এই উপায়গুলি ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করে। স্বভাবতই মানুষ সুপরিকল্পিতভাবে ইচ্ছানুযায়ী জীবন-ধারাগত উপায়সমূহ প্রবর্তন, নিয়ন্ত্রণ, ত্বরান্বিত অথবা বিলম্বিত করিতে পারে। অপর পক্ষে, জীব-অভিব্যক্তির ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। এই ক্ষেত্রে সব কিছু পরিবর্তন জৈবিক উপায়ে সংঘটিত হয়। ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন স্বতন্ত্র ভূমিকা নাই বলিলেই চলে।

সামাজিক ক্রমবিকাশ

অতএব সমাজে সুশৃঙ্খল পরিবর্তন নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে জীব-অভিব্যক্তির অনুসরণে বিবর্তন শব্দের প্রয়োগ সমীচীন নহে। সামাজিক পরিবর্তনের অভিব্যক্তি-মূলক আলোচনার দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনেক সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক ক্রমবিকাশ (social development) শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। সামাজিক ক্রমবিকাশ নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার মানদণ্ডের (criteria) নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন, হবহাউস তাঁহার Social Development নামক গ্রন্থে চার রকম মানদণ্ডের উল্লেখ করেন—যথা, সম্প্রসারণ, দক্ষতাবৃদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতার বিস্তার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রসার। তাঁহার মতে, আদিম অবস্থা হইতে সমাজ যত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উপরোক্ত চারিটি বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু পরিবর্তনের এই ধারাকে কি ক্রমবিকাশ (development) বলা যায়? কারণ, ক্রমবিকাশ শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে। যখন বীজ বা অঙ্কুরাবস্থা হইতে কোন কিছু ক্রমশঃ বিকশিত হয়, তখন ইহাকে ক্রমবিকাশ বলিয়া অভিহিত করা যায়। শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনাগুলি (potentialities) অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকে, সেইগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে যখন বিকশিত হইতে থাকে, তখন এই পরিবর্তনকে আমরা শিশুর ক্রমবিকাশ বলিয়া

অভিহিত করি। আমরা কি ঠিক এই অর্থে সামাজিক ক্রমবিকাশ শব্দটি ব্যবহার করিতে পারি? ক্রমবিকাশ নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে যে-সব মান-নির্দেশকের উল্লেখ করা হয়, সেই মানগুলি কি আদিম সমাজে অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকে? সব উন্নত সমাজেই কি পারস্পরিক সহযোগিতা বা স্বাধীনতা সমানভাবে বিকাশ লাভ করে? অতএব বিবর্তনের পরিবর্তে ক্রমবিকাশ শব্দ ব্যবহার করায় বিভ্রান্তির সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় development বা ক্রমবিকাশ শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, অর্থনৈতিক দিক দিয়া অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য করার সময় প্রথমোক্ত দেশগুলিকে developed বা উন্নত এবং শেষোক্ত দেশগুলিকে underdeveloped বা অনুন্নত বলিয়া বিশেষিত করা হয়।

সামাজিক প্রগতি

সামাজিক পরিবর্তনের গতি নির্দেশ করিতে গিয়া অনেক সমাজতত্ত্ববিদ প্রগতি (progress) শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। সামাজিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রগতি অনিবার্য, এই ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় অবিসংবাদিত সত্য হিসাবে গৃহীত হইত। গিন্‌স্‌বার্গ ইহার দুইটি কারণের উল্লেখ করেন। 1 ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য মানুষের মনে প্রাণবন্ত আশার সঞ্চার করে। পরবর্তী কালে ডারউইনের বিবর্তনবাদ এই আশাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তোলে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উজ্জ্বল স্বপ্ন নানা প্রকার রাজনীতিক ও সামাজিক আন্দোলন করিতে মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। প্রগতি বলিতে কি বুঝায়, এই সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই। প্রগতি সম্পর্কিত কোন নিয়ম বা নীতিও সূত্রবদ্ধ করা হয় নাই। কিন্তু এই অস্পষ্টতা সত্ত্বেও প্রগতির ধারণা মানুষের মনন, চিন্তন ও কার্যকলাপকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। সমাজে যাহা কিছু ঘটে তাহাই প্রগতির নির্দেশক, এই সম্বন্ধে অনেকের মনেই কোন সংশয় ছিল না।2

1 "The popularity of the idea (i. e. the idea of progress) was due in great measure to the buoyant hopefulness inspired by the triumphs of applied science. On the scientific side the idea was later given poweful impetus by its association with the biological theory of evolution. The culminating point was reached towards the end of the century (i. e. 19th century"). M. Ginsberg's article on "The Idea of Progress: A Revaluation". তদেব পৃষ্ঠা ৭১

2 "Thus, for example, de Tocqueville, for whom progress consisted in the movement towards equality urged that it was a providential fact, possessing all the characteristics of a Divine decree : 'it is universal, it is durable, it eludes all human interference.' From a totally different point of view, Spencer concluded that 'The ultimate development of the ideal man is logically certain—as certain as any conclusion in which we place the most implicit faith." তদেব পৃষ্ঠা ৭৩

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মানুষের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা প্রগতির প্রতি মানুষের অগাধ আস্থা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সাফল্য অর্জন করিলেই যে সামাজিক ও নৈতিক মান উন্নত হইবে, এইরূপ বিশ্বাস মহাযুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষকে আরও আশাবাদী না করিয়া তাহাকে 'সভ্যতার সঙ্কট' সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। সেইজন্য আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

প্রগতি সম্বন্ধে সমাজতত্ত্ববিদদের উদাসীনতার আরও কারণ আছে। প্রথমতঃ, কোন সামাজিক পরিবর্তন প্রগতির নির্দেশক কিনা, এই বিষয় বিচার করার কোন সর্বসম্মত মানদণ্ড নাই। সুতরাং একজনের নিকট কোন ব্যবস্থা প্রগতিমূলক বলিয়া বিবেচিত হইলেও অপর লোকের নিকট তাহা প্রত্যাগতির (retrogression) সূচক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যদি কোন দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই দেশে প্রগতিমূলক পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া কি নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায়? কিছুসংখ্যক লোক হয়ত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে প্রগতির সূচক বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী থাকিবেন। আবার কিছুসংখ্যক লোক হয়ত নৈতিক মানোন্নয়নকে প্রগতির মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিবেন। সুতরাং প্রগতি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকা স্বাভাবিক। আসল কথা হইল, যাহা বাঞ্ছনীয় বা শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পবিবর্তনকে প্রগতিমূলক পরিবর্তন বলা হয়। কিন্তু বাঞ্ছনীয় বা শ্রেয় সম্পর্কে বিচার সম্পূর্ণরূপে বিষয়ীগত (subjective)। এইরূপ বিচারে সর্বজনস্বীকৃত বিষয়গত (objective) কোন মানদণ্ড নাই। সুতরাং মূল্যায়নে পার্থক্য ঘটিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি! দ্বিতীয়তঃ, সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পরনির্ভরশীল। অতএব এক অংশে কোন পরিবর্তন ঘটিলে অপর অংশে তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটে। অনেক সময় এই প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিয়া থাকে। কোন কোন সময় এই প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে অবাঞ্ছিত। কাজেই সামাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক এই দুইটি দিক আছে। যাহারা পরিবর্তনের ইতিবাচক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন, তাহারা পরিবর্তনকে প্রগতিমূলক বলিয়া বিশেষিত করেন। আবার যাহারা পরিবর্তনের নেতিবাচক দিকটির উপর জোর দেন, তাহারা এই পরিবর্তনকে প্রত্যাগতি (retrogression) বলিয়া অভিহিত করেন। সংসারে অবিমিশ্র ভাল বলিয়া কিছু না থাকায় এইরূপ মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ, সর্ব বিষয়ে সর্বকালে ভাল-মন্দের বিচারে অভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় না। অতীতে যাহা ভাল বা শ্রেয় বলিয়া সমাজের স্বীকৃতি পাইত, আজ তাহা না-ও পাইতে পারে। এক সময়ে সতীদাহ মহা পুণ্যের কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ এই প্রথা বর্বরোচিত বলিয়া গণ্য হয়।

প্রগতির সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা দেওয়ার বিষয়ে উপরোক্ত অসুবিধাগুলি দেখা দেওয়ায় অনেক সমাজতত্ত্ববিদ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক প্রগতির উল্লেখ

করেন। যেমন, কৃষি বা শিল্পক্ষেত্রে প্রগতি অথবা শিক্ষা বিষয়ে প্রগতি। এইরূপ আংশিক প্রগতির আলোচনায় মতপার্থক্যের সম্ভাবনা কম। কারণ, সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের সাহায্যে এইসব ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিমাপ করা যায়। অগ্রগতি সম্পর্কে কোন বিতর্ক উপস্থিত হইলে পরিসংখ্যানের সাহায্যে সন্দেহের নিরসন করা সম্ভব। কিন্তু পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে প্রগতি সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও সব কিছু মিলাইয়া সামগ্রিক প্রগতি হইয়াছে কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলির জন্য প্রগতি সম্পর্কে ধারণাকে বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজও মানব-মন প্রগতির ধারণা হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। অধ্যাপক টয়েনবী (Toynbee) সভ্যতার আবর্তনশীল পরিবর্তন-ধারায় (cyclic theory of civilisations) বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার শেষে এই আশা পোষণ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন সভ্যতার অবনতি ও অবক্ষয় হয়ত ধর্মীয় স্তরে উচ্চতর কোন লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়স্বরূপ।1 যদিও মার্ক্সবাদীরা প্রগতি সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণাকে (bourgeois concept of progress) প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু প্রথম যুগের যুক্তিবাদীদের (early rationalists) ন্যায় তাহারা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ স্বীয় চেষ্টায় তাহার স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। তাহারা অধীর আগ্রহে এবং পরম বিশ্বাসভরে সেই অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় আছেন, যখন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং স্বাধীনতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে। সভ্যতার আদি যুগ হইতে মানুষ ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে। আজও মানুষের স্বপ্ন দেখায় ছেদ পড়ে নাই। ইহার কাবণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ম্যাক আইভার বলেন যে, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষকে কাজ করিতে হয় এবং কাজ করিতে হইলে তাহাকে কিছুটা গ্রহণ এবং কিছুটা বর্জন করিতে হয। ভাল-মন্দ বা বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের মানদণ্ড দ্বারা এইরূপ বাছবিচার করা হয়। অতএব প্রগতি সম্পর্কিত ধারণা হইতে মুক্তি পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। ম্যাক আইভারের উক্তির উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। ইহা প্রণিধানযোগ্য। "To live is to act, and to act is to choose, and to choose is to evaluate. Hence, as human beings, we cannot get rid of the concept of progress, though we are of course entitled to deny the reality of progress. The fact that men inevitably differ about it, that we cannot demonstrate the validity of our concept as against theirs, only makes it more indubitably ours. If none can prove it, none can refute it. At the least it is a vital myth, ineradicable from the creative strivings of life".2

1 "...........the breakdowns and disintegrations of civilisations might be the stepping stones to higher things on the religious plane". Civilisation on Trial, P 240

2 Mac Iver and Page : Society. Page 619

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। T. B. Bottomore : Sociology. Unwin University Books, London.

২। Mac Iver and Page : Society. Macmillan and Co. Ltd. London. 1959. Chapter XXVIII.

৩। Morris Ginsberg : Essays in Sociology and Social Philosophy. Peregrine Book.

বিংশ পরিচ্ছেদ

সমাজে অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি

যখন কোন সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তখন সমাজের সব অংশ সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। সমাজের বিভিন্ন অংশে অসম পবিবর্তনজনিত যে অসঙ্গতি ঘটে, ইহাকে সমাজতত্ত্ববিদগণ পৃথক পৃথক নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতির নানা দিক আছে। যাহারা যে-দিকে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহারা তদনুযায়ী ইহার নামকরণ করিয়াছেন। যেমন, জীবন-ধারাগত বাস্তব উপাদানের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রতীকমূলক উপাদানসমূহ যদি তাল না রাখিতে পারে, তাহা হইলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে অগবার্ন cultural lag বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নানা কারণে সমাজের বিভিন্ন অংশে অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। এই কারণগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ম্যাক আইভার অসঙ্গতির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন—যেমন, technological lag, technological restraint, culture clash ও cultural ambivalence আবার এইরূপ অসঙ্গতির ফলে গোটা সমাজ সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয় বলিয়া গিন্‌স্‌বার্গ অসঙ্গতিজনিত অবস্থাকে structural strain বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।1

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় অগবার্নের Cultural Lag সম্পর্কিত মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তাঁহার মতবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া ম্যাক আইভার আলোচনার গণ্ডী আরও ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম অসঙ্গতির উল্লেখ করেন। অতএব আমরা সর্বাগ্রে অগবার্নের বক্তব্য আলোচনা করিতে পারি।

জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের পশ্চাদ্‌বর্তিতা

অগবার্ন ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে Social Change নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম সমাজের বিভিন্ন অংশে অসম পরিবর্তনজনিত যে অসঙ্গতি ঘটে তাহার উল্লেখ করেন। প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনের ফলে জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের সঙ্গে যে অসঙ্গতি ঘটে, এই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল। তাঁহার মতে, জীবন-ধারার বাস্তব উপাদানসমূহ (material elements of culture) যত স্বচ্ছন্দে ও দ্রুত পরিবর্তিত হয়, প্রতীকমূলক

1 "By (structural) strains I mean tensions set up in a society by a lack of equilibrium between its parts". M. Ginsberg in Essays in Sociology and Social Philosophy. Page 140

উপাদানসমূহ (non-material elements of culture) তত সহজে ও দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং বাস্তব উপাদানসমূহের সঙ্গে প্রতীকমূলক উপাদানসমূহের অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি দেখা দেয়।1 এই অবস্থাকে তিনি cultural lag বা জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের পশ্চাদ্‌বর্তিতা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে অগবার্নের বক্তব্য ব্যাখ্যা করা যায়। যখন যাতায়াত করার যান হিসাবে ঘোড়ার গাড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল, তখন কলিকাতা মহানগরীর রাস্তাঘাট, অলিগলি তৈয়ারী করা হইয়াছিল। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্তে যখন মোটর গাড়ির প্রচলন শুরু হয়, তখন দেখা যায় যে প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তাঘাট ও অলিগলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। স্বভাবতই মোটর গাড়ির প্রবর্তনের সঙ্গে রাস্তাঘাট চওড়া করা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে, ঘোড়ার গাড়ি প্রচলিত থাকাকালীন রাস্তাঘাটে যানবাহন ও পথচারীর চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যেসব নিয়মকানুন ছিল, তাহা মোটর গাড়ি প্রবর্তিত হইবার পর অনুপযোগী হইয়া পড়ে। তাড়াতাড়ি নিয়মকানুন পরিবর্তন করিলেও নিয়মকানুন মানিয়া রাস্তায় চলাফেরা করার অভ্যাস গড়িয়া উঠিতে সময় লাগে। এখানে জীবন-ধারার বাস্তব উপাদান (ঘোড়ার গাড়ির পরিবর্তে মোটর গাড়ি) দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া গেল। কিন্তু প্রতীকমূলক উপাদানের (রাস্তায় চলাফেরা করার প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনের প্রবর্তন ও তাহা মানিয়া চলার অভ্যাস) সঙ্গতিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিতে বিলম্ব হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এইরূপ অনেক অসঙ্গতির উল্লেখ করা যায়। যখন আমরা বলি, মানুষের বিদ্যা (knowledge) যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তদনুযায়ী তাহার বিজ্ঞতা বা জ্ঞান (wisdom) বৃদ্ধি পায় নাই, তখন এইরূপ অসঙ্গতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। আধুনিক পারমাণবিক যুগে এইরূপ অসঙ্গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়।2 যে কোন মুহূর্তে পারমাণবিক বোমার সাহায্যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু ধ্বংস করার বিদ্যা মানুষ যত তৎপরতার সঙ্গে আয়ত্ত করিয়াছে, বহু শতাব্দীর পরিশ্রমলব্ধ সভ্যতাকে এইরূপ সর্বাত্মক ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জ্ঞান সে আজও অর্জন করে নাই।

---

1 "Technological progress produces rapid changes in the material aspects of our culture, but the non-material aspects fail to adjust or they do so only after an excessive time lag. As a result, many troublesome social problems are created".

2 "In atomic cultural lag, the leading variable is the maximum area within which, at any given date, people could be killed from a given base. The lagging variable is the ability to prevent this accelerating power from damaging or destroying the kind of civilisation which is valued wthin the accpted frame of values." Allen, Hart, Miller, Ogburn and Nimkoff: Technology and Social change. Edited by J. F. Cuber. Page 432

কেবলমাত্র প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রচলনের ফলেই যে এইরূপ অসঙ্গতি দেখা দেয়, তাহা নহে। নানা প্রকার প্রযুক্তিবিদ্যা-বহির্ভূত সামাজিক নূতন ব্যবস্থা (non-technological social innovation) প্রবর্তনের ফলেও অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। যেমন, একটি দেশ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর মন্ত্রিশাসিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে গেলে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিক ধাত ও রাজনীতিক মতাদর্শ থাকা প্রয়োজন। যদি উভয়ের মধ্যে অসঙ্গতি থাকে, তাহা হইলে মন্ত্রিশাসিত শাসন-ব্যবস্থা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর মন্ত্রিশাসিত শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উৎপাদনসমূহ ইহাব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় অধিকাংশ দেশে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা পবিত্যক্ত হইয়াছে। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ আধুনিক বাষ্ট্রেই ক্রমবর্ধমান হারে (at a progressive rate) আয়কর ধার্য করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইযাছে। ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করার ফলে কিছুসংখ্যক লোকের দেয় করের পরিমাণ এত বেশি যে, তাহারা নানা কৌশলে কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা কবে। দেয় করের পরিমাণ যত বেশি হয়, কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পায়। এইবূপ কব ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করার জন্য পাকাপাকি কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত বা প্রবর্তিত হয় নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও অসঙ্গতি দেখা যায। ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করার ব্যবস্থার সঙ্গে কর ফাঁকি বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়ার ফলে এই প্রকার অসঙ্গতির উদ্ভব হয।

বলা বাহুল্য, এইবূপ অসঙ্গতি হইতে নানা রকমের সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। কলিকাতা মহানগরীর মোটর চলাচলের রাস্তা সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলে নগর-জীবন যে কি সমস্যাসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা প্রায় সর্বজনবিদিত। কর ফাঁকি দেওয়ার ফলে 'কালো টাকার' সমস্যায় ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবন জর্জরিত। অগবার্নের আলোচনার মূল্য এইখানে যে, তিনি সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অসঙ্গতিজনিত সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যাহারা নূতন নূতন আচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সমাজে সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন ঘটাইতে চান, তাহাদের নিকট এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যখন কেহ নূতন কিছুর প্রবর্তন করিতে উদ্যত হইবেন, তখনই ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার সমাজের অপরাপর অংশের সঙ্গে উদ্ভাবিত ব্যবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। যদি সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে অগ্রেই ভাবিয়া দেখা দরকার অসঙ্গতিজনিত সমস্যার মোকাবিলা কি উপায়ে করা হইবে।

সমাজতত্ত্ববিদগণ অগবার্নের জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের পশ্চাদ্‌বর্তিতা সম্পর্কিত মতবাদকে নানা দিক হইতে সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, সমালোচকগণ বলেন যে, জীবন-ধারার বাস্তব উপাদানসমূহ যে সর্বদাই প্রতীকমূলক উপাদানসমূহকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হয়, ইহা ঠিক

নহে। কারণ, বাস্তব উপাদান এবং প্রতীকমূলক উপাদান পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত। একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। যেমন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য বাস্তব উপাদানের সৃষ্টি হয় মানুষের মনে। চিন্তাভাবনা ও গবেষণার ফলে নানা রকম আবিষ্কার সম্ভব হয়। আবার এইসব আবিষ্কার হইতে উদ্ভূত নানা রকম কলাকৌশলের ব্যবহারিক প্রয়োগ সমাজস্থ লোকের অনুকূল মানসিকতা ও উপযুক্ত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ম্যাক্স হেবারের আলোচনায় এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। অতএব বাস্তব উপাদানসমূহকে অগ্রগামী এবং প্রতীকমূলক উপাদানসমূহকে পশ্চাদ্‌গামী বলিয়া গণ্য করা অনুচিত।

দ্বিতীয়তঃ, অগ্রগামী বা পশ্চাদ্‌গামী শব্দ প্রয়োগ করার সঙ্গে মাননির্ণয়ের (valuation) প্রশ্ন জড়িত। কারণ, কোন নির্দিষ্ট মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করিলে এই দুইটি শব্দের কোন তাৎপর্য থাকে না। অতএব একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, সব ক্ষেত্রে বস্তু-নিরপেক্ষ বিচারের মান আছে কি? যেসব ক্ষেত্রে যোগ্যতা বা দক্ষতার প্রশ্ন জড়িত, সেইসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানের সাহায্যে যোগ্য-অযোগ্য, দক্ষ-অদক্ষ নির্ণয় করা সম্ভব। এইসব ক্ষেত্রে অগ্রগামী বা পশ্চাদ্‌গামী শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত নির্দিষ্ট মান নাই, সেই সব ক্ষেত্রে এই শব্দগুলির প্রয়োগ অর্থহীন।[1]

তৃতীয়তঃ, সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে নানা কারণে সামঞ্জস্য ব্যাহত বা বিনষ্ট হইতে পারে। এইরূপ অসামঞ্জস্যকে কেবল মাত্র জীবন-ধারার প্রতীক-মূলক উপাদানসমূহের পশ্চাদ্‌বর্তিতা বলিয়া বর্ণনা করিলে কি কারণে কি প্রকারের পশ্চাদ্‌বর্তিতার উদ্ভব হইল, ইহা জানিবার উপায় থাকে না। যেমন, আমরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বনসম্পদ আমাদের প্রয়োজনে নিয়োগ করিতে পারি, কিন্তু বনসম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জন করিতে বিলম্ব ঘটিতে পারে। আবার মোটর গাড়ির প্রবর্তনের ফলে রাস্তা প্রশস্ত করার প্রয়োজনীয় কাজ কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতার জন্য বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। এই দুইটি উদাহরণে সমাজের একটি অংশ অপর অংশের তুলনায় পাশ্চাদ্‌বর্তী, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চাদ্‌বর্তিতার প্রকৃতি ভিন্ন। সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই জাতীয় বিভিন্নতা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অগবার্নের মতবাদে এইরূপ বিভিন্নতা পরিস্ফুট হয় না।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলি থাকার জন্য ম্যাক আইভার সমাজের বিভিন্ন অংশের অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতিকে নিম্নোক্ত জাতিরূপে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

---

1 "Wherever one part or aspect of a productive system fails to measure up in efficiency to another part or aspect, the term lag is relevant. But wherever the question at issue is not one of comparative efficiency, the use of this term becomes dubious and may convey erroneous implications." Mac Iver and Page: Society. Page 575.

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌বর্তিতা

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে নানা রকম পশ্চাদ্‌বর্তিতার উদ্ভব হইতে দেখা যায়। যেমন, উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগের ফলে বস্ত্রবয়নের (weaving) কাজ ত্বরান্বিত হইতে পারে; কিন্তু সুতাকাটার (spinning) কাজে অনুরূপ উন্নততর কলাকৌশলের প্রয়োগ না হওয়ায় বস্ত্রবয়ন-বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সুতার যোগান দেওয়া সম্ভব না-ও হইতে পারে। উৎপাদন ব্যাহত হইবার এইরূপ নানা রকম উদাহরণের কথা ভাবা যাইতে পারে। দুই তিন বৎসর পূর্বে উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগের ফলে পাঞ্জাব ও হারিয়ানা অঞ্চলে গমের উৎপাদন আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। ইহা সবুজ বিপ্লব বলিয়া পরিচিত। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক গোলা তৈরি না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় ফসল কাটিয়া গোলাজাত করা বা স্থানান্তরে প্রেরণ করায় অসুবিধা দেখা যায। কোন কোন অঞ্চলে কিছু কিছু ফসল এই কারণে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছিল। এই উদাহরণে গোলাতৈরির কাজ এবং যানবাহনের ব্যবস্থা করার কাজ উৎপাদনের কলাকৌশলের তুলনায পিছাইযাছিল, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে-পশ্চাদ্‌বর্তিতা দেখা যায়, তাহাব বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, পরস্পরনির্ভরশীল বিভিন্ন অংশের কর্মদক্ষতা পরিমাপনসাধ্য। অতএব একটি অংশ যদি অপরাপর অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিযা চলিতে না পারে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট অংশের পশ্চাদ্‌বর্তিতা নির্ধারণ করা সম্ভব।

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক

প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত উন্নততর পন্থা বা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইলেই যে এই উপায়সমূহ সহজে গৃহীত হইবে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। নানা কারণে ইহাদের ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্বন্ধে বিরোধিতা হইতে পারে। এইরূপ অবস্থাকে ম্যাক আইভার technological restraint বা প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে।

উন্নততর পন্থা বা পদ্ধতির ব্যাপক প্রবর্তনে কায়েমী স্বার্থ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। উন্নততর পন্থা গৃহীত হইলে পূর্বেকার সম্মান, প্রতিপত্তি বা অর্থপ্রাপ্তিতে অন্তরায় ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় উন্নততর পদ্ধতির প্রয়োগে বিরোধিতা করা হয়। সব দেশেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নূতন কিছু প্রবর্তন করিতে গেলে আমলাতন্ত্রের তরফ হইতে আপত্তি উঠে। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, নানা প্রকার কায়েমী স্বার্থ এইরূপ বিরোধিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বিভিন্ন রকম কায়েমী স্বার্থের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থই প্রাধান্য পায়। আমাদের দেশে পরিগণকের (computer) ব্যাপক প্রচলন হইলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে, ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু পাছে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত

হয়, এই ভয়ে বিভিন্ন শ্রমিক সঙ্ঘের তরফ হইতে পরিগণক-প্রবর্তনের বিরোধিতা করা হইতেছে।

অনেক সময় উন্নততর পদ্ধতির বিরোধিতা জীবন-ধারাগত বিশিষ্ট্য হইতে উদ্ভূত হয়। পাঁচ ছয় দশক পূর্বে যখন সর্বপ্রথম এই দেশে পানীয় জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে নলকূপ (tube well) প্রবর্তন করা হয়, তখন পল্লী অঞ্চলে অনেক গোঁড়া হিন্দু এই জল ব্যবহার করিতে অস্বীকৃত হন। কারণ, চামড়ার সংস্পর্শে আসার ফলে পানীয় জল অপবিত্র এবং সেই কারণে খাওয়ার অযোগ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন।

অতীতে প্রচলিত চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের বিরোধী হওয়ার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত সহজভাবে স্বীকৃতি পায় নাই। প্রচলিত ধারার বিরোধী মতবাদ পোষণ ও প্রচার করার জন্য গ্যালিলিওকে বহুবিধ অত্যাচার ও নিপীড়নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইদানীং কালে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী যাজকগণ চিরাচরিত ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধী বলিয়া ডারউইনের মতবাদের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠেন।

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন যদি প্রচলিত জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যের বিরোধী হয়, তাহা হইলে নানাভাবে ইহার ব্যাপক প্রচলন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুন্নত সাবেকী সমাজে অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যা আলোচনা করিবার সময় এই বিষয়টি ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

জীবন-ধারার পার্থক্যজনিত সংঘর্ষ

প্রচলিত জীবন-ধারার সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার অসঙ্গতি সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করা হইল তাহার মধ্যে জীবন-ধারার পার্থক্যজনিত সংঘর্ষের (culture clash) ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে আরব ও সমীপবর্তী অঞ্চল হইতে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করার ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জীবন-ধারা সর্বপ্রথম হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবন-ধারার সম্মুখীন হয়। নানা কারণে এই দুইটি জীবন-ধারা প্রথমাবস্থা হইতে উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পরস্পরবিরোধী বলিয়া গণ্য হয়। সেইজন্য পরস্পরের মধ্যে আত্তীকরণ ত' দূরের কথা, বরং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং এই সংঘর্ষ আজও চলিতেছে। দুইটি জীবন-ধারা পাশাপাশি বিরাজ করিলে একটি অপরটিকে দমন করিবে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।[1] প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, নানা প্রকার

1 "We do not include under culture clash the conflicts of creeds and ideologies so frequent in every modern society. We refer only to conflicts between two entire culture patterns, each of which embraces a whole way of life...........usually one of the cultures concerned is an imported culture, while the other is indigenous or at least has long been established in its present home............ Culture clash may broadly be said to exist wherever two ways of life or modes of thought within the same community are so opposed that they can not live side by side, in such wise that the very presence of the one implies the suppression of the other." Mac Iver and Page : Society. Pages 579-580

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ এইরূপ আশঙ্কাকে বদ্ধমূল করিতে সহায়তা করে। ধীরে ধীরে এইপ্রকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব হ্রাস পাইলে এবং পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের গণ্ডী সম্প্রসারিত হইলে, জীবন-ধারার পার্থক্যজনিত সংঘর্ষ প্রশমিত হয়। ইদানীং কালে ভারতবর্ষে ইহার লক্ষণ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

জীবন-ধারার পার্থক্যজনিত খোলাখুলি সংঘর্ষ ছাড়া কোন ব্যক্তি দুইটি জীবন-ধারার প্রভাবে এমন টানা-পড়েনে পড়িতে পারে যে, তাহার কথাবার্তা ও চিন্তায় বিপরীতধর্মী ভাব (ambivalence) যুগপৎ বিদ্যমান থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহাতে ব্যক্তিত্বের সংহতি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। ম্যাক আইভার এই অবস্থাকে cultural ambivalence বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আধুনিক শিল্প-প্রধান সমাজে তরুণ-তরুণীদের বেখাপ্পা আচরণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, cultural ambivalence হইতে এইরূপ বেখাপ্পা আচরণ উদ্ভূত হয়। অনুরূপভাবে, সনাতন ও আধুনিক মূল্যবোধের টানা-পড়েনে পড়িয়া কিছুসংখ্যক লোককে বেমানান আচরণ করিতে দেখা যায়।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Mac Iver and Page : Society. Macmillan & Co. Ltd London. 1959. Chapter XXVI Pages 574-580

২। Ogburn and Nimkoff : A Handbook of Sociology. Routledge & Kegan Paul Ltd. London. 1960. Pages 541-546

একবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তন

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতবাসীদের সমাজ-জীবন নানা ভাবে এবং নানা দিক দিয়া পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এই পরিবর্তনের ধারা এখনও অব্যাহত আছে। পরিবর্তনগুলির ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য এত বেশি যে, সব কয়টি পরিবর্তনের গতি, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন, দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে যে-পরিবর্তন অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে সেই পরিবর্তনকে কেন্দ্র করিয়া যুগান্তকারী পরিবর্তনের যে সূচনা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? তাহা ছাড়া, অনেক পরিবর্তন প্রায় প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের অগোচরে ঘটিতেছে। ধীরে ধীরে এইরূপ পরিবর্তনের পূর্ণ আকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। অতীতের ভারতীয় সমাজ-জীবনের ইতিহাস এবং অপরাপর সমাজের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করা হইয়াছে। উপরন্তু, সমাজ-জীবন নানা রকম নিবিড় সম্বন্ধ-জালে জড়িত। সুতরাং রাজনীতিক ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাহা ঘটে, তাহার প্রতিক্রিয়া সমাজ-জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। সব সময় এইরূপ সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করা সম্ভব নহে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা করিবার সময় এই মন্তব্যগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

পরিবর্তনের কারণ

কি কারণে বা কি ভাবে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এইরূপ সুদূরব্যাপী পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিংবা ঘটিতেছে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, সুপরিকল্পিত প্রয়াসের ফলে যেমন কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ঠিক তেমনি একত্র জলপ্রবাহতাড়িত বস্তুসমূহের ন্যায় ঘটনা-প্রবাহের প্রভাবে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সমাজতত্ত্বে প্রথমোক্ত পরিবর্তনকে planned social change, social movement ইত্যাদি আখ্যা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনকে socio-cultural drift, unplanned social change ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তন যদিও উপরোক্ত উভয় প্রকারেই সংঘটিত হয়, তবুও পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বহুল প্রচলন। শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সমাজ-জীবনে ইহার প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী হইতে পারে, তাহা আমরা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, নানা

রকম সমাজসংস্কারমূলক আইনের প্রবর্তন। যেমন, Special Marriage Act (1954), Hindu Marriage Act (1955), Hindu Succession Act (1956), Hindu Adoption and Maintenance Act (1956), অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আইন, গর্ভপাত সম্পর্কিত আইন, বিভিন্ন রাজ্যের জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রভৃতি সমাজসংস্কারমূলক আইনের ফলে সমাজ-জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, ভারত-বিভাগ যে কেবলমাত্র রাজনীতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাহা নহে; সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহার অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং পূর্বাঞ্চলে ভারত-বিভাগের প্রভাব সুস্পষ্ট। চতুর্থতঃ, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Development Programme) প্রবর্তন এবং পঞ্চায়তী রাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রাম-সমাজে নানাবিধ পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমাজতন্ত্রের নীতি-অনুসারী কর্মপন্থা গ্রহণ এবং পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করার প্রয়াস সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবর্তন

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইল।

সর্বাগ্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং তজ্জনিত সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখ করিতে হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাস্তাঘাটের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে যে-সব অঞ্চল অপরাপর অঞ্চল হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং অগম্য ছিল, সেইসব অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। তদুপরি, সংবাদপত্র এবং বিশেষ করিয়া রেডিও সহজলভ্য হওয়ায় পূর্বেকার লোকাচার-শাসিত গ্রামীন সমাজ (rural folk society) ধীরে ধীরে জটিল নগরসমাজের আবর্তে পড়িয়া রূপান্তরিত হইতেছে। পরিবৃত্তিকালে (transitional period) এই পরিবর্তন গ্রাম-সমাজে স্বভাবতই নানা প্রকার অস্থিরতার সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, পূর্বেকার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিদিত আচার-ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য হ্রাস পাইয়াছে, অথচ জটিল শিল্প-প্রধান নগর-সমাজের উপযোগী মূল্যবোধ ও আচার-ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের সহজ আনুগত্য গড়িয়া উঠে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, নানা কারণে একান্নবর্তী পরিবারের বনিয়াদ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্তে দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ পরিবর্তনের লক্ষণ নগরাঞ্চলে অধিকতর স্পষ্ট। তবে এই বিষয়ে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া সমীক্ষা না হওয়ায় পরিবর্তনের ব্যাপকতা সঠিক নির্দেশ করা অসম্ভব।[1]

---

1 দশম পরিচ্ছেদে পারিবারিক পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বে জাতিভেদ প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। স্বাধীনোত্তর যুগে ব্যাপক শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে জাতিভেদ প্রথার কাঠামোর মধ্যে আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাস চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উপরন্তু, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রেও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপক প্রচলন, হোটেল, রেঁস্তোরা, কলকারখানার সংশ্লিষ্ট ক্যান্টিনসমূহে বিভিন্ন জাতের লোকদের একত্র খাওয়াপরা ইহার নিদর্শন। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতিভেদজনিত ব্যবধান স্বীকৃতি এবং পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইল শিল্পপ্রসারের ফলে নূতন নূতন বৃত্তির সংযোজন এবং মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর উদ্ভব। ভারতবর্ষের সনাতন জীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে উপরোক্ত পরিবর্তনসমূহকে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া যায়।1

চতুর্থতঃ, স্বাধীনোত্তর যুগে নানা দিক দিয়া মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইনগত অনেক অসুবিধা ছিল। আইন বিধিবদ্ধ করিয়া হিন্দু রমণীদের বিবাহ, পোষ্য-গ্রহণ এবং উত্তরাধিকারলাভের ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান অধিকার অর্পণ করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনগুলি হইল: The Special Marriage Act of 1954, The Hindu Marriage Act of 1955, The Hindu Succession Act of 1956, The Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956. তবে এই আইনগুলি অহিন্দু রমণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। তাহা ছাড়া, ভারতীয় সংবিধান রাজনীতিক ক্ষেত্রে এবং সরকারী চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের পুরুষের সমানাধিকার অর্পণ করিয়াছে।

উপরোক্ত আইনগুলি ছাড়া স্বাধীনোত্তর যুগে সরকারী এবং বে-সরকারী উদ্যোগে মেয়েদের পরিপূর্ণ ও সার্থক জীবন যাপন করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের একটি প্রতিবেদনে 2 দেখা যায়, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক ছেলেদের ৭৩.৮ ভাগ এবং মেয়েদের ৩৪.৭ ভাগ স্কুলে পড়াশুনা করে। উচ্চতর শ্রেণী-গুলিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে কম। গত ১৫।১৬ বৎসরে এই অনুপাত অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা যাহাতে আরও সম্প্রসারিত হয়, সেই বিষয়ে সরকারী এবং বে-সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে The Central Social Welfare Board নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলে মহিলা ও শিশুদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধানের ক্ষেত্রে এই পর্ষদ

1 ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই পরিবর্তনগুলির বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

2 The Report of The National Committee on Women's Education, 1958.

বিশেষভাবে সক্রিয়। তাহা ছাড়া, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এবং রাজ্যভিত্তিতে এই উদ্দেশ্যে আরও অনেক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন, Kasturba Gandhi National Memorial Fund, National Association for Moral and Social Hygiene, The Indian Women's Conference, National Council of Women in India ইত্যাদি। এইসব প্রচেষ্টার ফলে মেয়েদের শিক্ষা, চাকরি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি প্রশস্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়েরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। চাকরিবাকরির সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়ায় বিবাহিত মেয়েরা পূর্বের ন্যায় স্বামীর উপর অর্থনৈতিক দিক হইতে নির্ভরশীল নহে। হিন্দু রমণীদের বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনানুগ স্বীকৃতি পাওয়ায় তাহারা পূর্বের ন্যায় দুঃখজনক পরিবেশে ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় না। উপরন্তু, জন্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য হওয়ায় তাহারা অবাঞ্ছিত সন্তান-পালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, উপরোক্ত সব কয়টি ব্যবস্থা মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করার পথ সুগম এবং তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ভারতীয়দের মৌল জীবনাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়া মনে হয়। জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের প্রভাবে আপামর জনসাধারণের মনে যে-অদৃষ্টবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে। চাষ-বাসের ক্ষেত্রে উন্নততর চাষ-পদ্ধতির প্রয়োগ ইহার নিদর্শন। যেসব চাষী কিছু দিন পূর্বেও বিশ্বাস করিত যে, চাষের ফলন হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাদের কপালের উপর নির্ভরশীল, তাহারা মাত্র গত কয়েক বৎসরে উন্নততর চাষপদ্ধতি জানিতে এবং প্রয়োগ করিতে বিশেষ আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে। উন্নততর চাষ প্রণালী নিরক্ষর কৃষকদের নিকট আদৌ জনপ্রিয় হইবে কিনা, এই বিষয়ে এক দশক পূর্বেও কৃষি-বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় এইরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের সূচক। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যে যাহারা নিযুক্ত, তাহারাও খুব বড় রকমের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন নাই। এইরূপ অভিযানের বিরুদ্ধে কোন স্থানে সংগঠিত গণ-বিক্ষোভ প্রকাশ পায় নাই। আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক। জনসাধারণের তরফ হইতে সক্রিয় প্রতিরোধ না আসাও পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায় করার বিষয়ে জনসাধারণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সচেতন ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। মহামতি গোখলে

দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে righteous indignation-এর অভাব রহিয়াছে। অর্থাৎ আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে অসমর্থ। গোখ্‌লের এই অভিযোগ আংশিক সত্য, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের সনাতন জীবনাদর্শের সঙ্গে এইরূপ মনোভাব গভীরভাবে সম্পৃক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নানা প্রকার অনাচার, অত্যাচার, শোষণ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আমজনতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। দাবিদাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। এই সবই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নির্দেশ করে।

বর্তমান ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি

স্বাধীনতালাভের পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পর ভারতীয় সমাজ-জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে সুস্পষ্ট কোন ছবি ভাসিয়া উঠে না। একদিকে, সনাতন মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শের প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়। অপর দিকে, পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের অনুকরণে ভারতীয় সমাজকে ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়াস প্রায় সর্বস্তরে লক্ষণীয়। সেইজন্য আমাদের কথাবার্তায়, আচার-আচরণে এবং নানাবিধ কাজকর্মে অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। ইহা বলার অর্থ এই নহে যে, ভারতীয় সনাতন জীবনাদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞান-ভিত্তিক পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের অন্তর্নিহিত বিরোধ রহিয়াছে। কিন্তু দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনাদর্শের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা না হয়, তাহা হইলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেওয়া বিচিত্র নহে।

এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারতীয় সনাতন আদর্শের মূল সুরটি একটি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। ইহা হইল 'জীবন-জিজ্ঞাসা'। আত্যন্তিক জড় বস্তুর সাধনা মানুষে-মানুষে বিভেদ ঘটায়, মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিশ্লিষ্ট করে, মানুষের আত্মাকে অবমাননা করে—এই বোধ হইতে ভারতীয় মনীষীগণ জড়বাদ (materialism) এবং অধ্যাত্মবাদ (spiritualism) এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যায়। সাতটি রঙের সমাবেশে সাদা আলো প্রকাশ পায়, যে-আলোতে আমরা দৈনন্দিন কাজকর্ম করিয়া থাকি। কিন্তু উৎসব জমাইতে হইলে চাই রঙিন আলো। অনুরূপভাবে, ভারতীয় মনীষীদের মতে গৃহীর জীবনাদর্শ হইল সুসমঞ্জস জীবন (balanced life)। অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সব কয়টির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলাই আদর্শ গৃহীর কর্তব্য। তাঁহারা বস্তুসাধনা পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। কারণ, বস্তুসাধনা পরিত্যক্ত হইলে পার্থিব জীবন শ্রী হারাইবে, এই বিষয়ে তাঁহাদের মনে কোন সংশয় ছিল না। অথচ জড় বস্তুর প্রকৃতি এমন যে, ইহার একান্ত সাধনা সমাজে ধনী-নির্ধনের ব্যবধান বৃদ্ধি করে ও কাঞ্চন-কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা করে, ব্যক্তি-জীবনে আকাঙ্ক্ষার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া

প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাগপাশে মানুষকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলে। সেইজন্য ভারতীয় মনীষিগণ বলিয়াছিলেন, জড় বস্তুর সাধনাকে ত্যাগের দ্বারা শোধন করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ জড় বস্তুর ঊর্ধ্বে লক্ষ্য স্থাপন করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী জড় বস্তুর সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উপলক্ষ হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা করিলে ব্যক্তিবিশেষের সুখ-সমৃদ্ধির সঙ্গে সমাজের সুখ-সমৃদ্ধির সমন্বয়-সাধন সম্ভব হয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে সমাজকে নাড়া দিবার জন্য, জড় বস্তুর ঊর্ধ্বস্থিত অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য দ্রষ্টার (prophet) প্রয়োজন হয়। তাঁহারা জীবনে একটি বা দুইটি রঙিন বাতি জ্বালাইয়া উৎসবের আয়োজন করেন। তাঁহারা গৃহীর জীবন যাপন করিতে আসেন না। রঙিন আলোতে লোকেরা আকৃষ্ট হয়, তাহারা জড় বস্তুর সাধনার ঊর্ধ্বস্থিত আদর্শে নূতন ভাবে অবগাহন করে এবং জীবনের ভারসাম্য ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করে। শাস্ত্রে এই দ্রষ্টাগণকে ঋষি, লোকনায়ক, সন্ন্যাসী প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। তাঁহারা শ্রদ্ধেয়, কিন্তু সর্বতোভাবে অনুকরণীয় নহে। যে-গৃহী ইঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে, সে জীবনকে ব্যর্থ করিবে। সে না পারিবে উৎসবের রঙিন আলো প্রজ্জ্বলিত করিতে, না পাইবে সাত রঙের সমন্বিত সাদা আলো। সে না হইবে সার্থক গৃহী, না হইবে সার্থক সন্ন্যাসী।

আমরা যখনই ভারতীয় জীবনাদর্শের দোহাই দেই, তখন এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ত্যাগের, তিতিক্ষার এবং মূল্যবোধের ভ্রান্ত এবং অবাস্তব ধারণা তুলিয়া ধরিলে আমরা সমাজের সম্মুখে কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য রাখিতে পারিব না।

পাশ্চাত্য দেশের বস্তুসাধনা একদিকে মানুষকে ধনদৌলত, পার্থিব সুখভোগ প্রভৃতির ডালি ষোড়শোপচারে সাজাইতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু অপর দিকে এইরূপ আত্যন্তিক বস্তুসাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব, শোষণ, উৎপীড়ন, নিঃসঙ্গতাবোধ (anomie), বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation) প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ দেখা গিয়াছে। মার্ক্সীয় মতবাদ এইসব অবাঞ্ছিত উপসর্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ।

আমরা স্বাধীনোত্তর ভারবতর্ষের সম্মুখে কোন্ আদর্শ স্থাপন করিব, ইহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে দুইটি ভিন্ন আদর্শের টানা-পড়েনে পড়িয়া আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। গত ছাব্বিশ বৎসরের ঘটনাবলী ও চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, আমরা সনাতন আদর্শের দোহাই দিয়া প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় নিজেদের ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি। অপর পক্ষে, বাছ-বিচার না করিয়া পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুকরণে আমাদের সমাজ গড়িবার চেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। ইহার ফলে, দেড়শত বৎসর পূর্বে শিল্পায়নের প্রথম পর্বে

পাশ্চাত্য সমাজ যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, আমরা আজও নূতনভাবে সেইসব সমস্যার সৃষ্টি করিতেছি। তাহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় এবং আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া নূতন কোন ব্যবস্থার কথা আজও আমরা ভাবিতে পারি নাই। আমাদের শিল্প-নগরসমূহে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বস্তি গড়িয়া উঠিতেছে, বিভিন্ন আয়-বিশিষ্ট লোকদের আবাস এমনভাবে তৈয়ারি করা হইতেছে যে, আয়ের পার্থক্য যেন বাস-গৃহে বিমূর্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা সুস্থ সমাজ-জীবনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। এইভাবে আরও অনেক উদাহরণ হইতে ইহা মনে হয় যে, আমরা পাশ্চাত্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে কোন শিক্ষা লাভ করি নাই।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশের আত্যন্তিক বস্তুসাধনার বিষয়ে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন: "লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে।" আমরা লক্ষ্মীর সাধনার শ্রীবৃদ্ধির দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কুবেরের ধনসংগ্রহে ব্যস্ত। বর্তমান ভারতবর্ষে কোটি কোটি কালো টাকার সমস্যা ইহার নিদর্শন। জাতীয় লক্ষ্য এবং আদর্শ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ এবং কার্যকর না করার ফলে আমরা পাশ্চাত্য সমাজের 'সু' হারাইয়া 'কু' পাইতেছি, নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আস্থা হারাইতেছি।

ডক্টর দুবে (Dr. S. C. Dube) স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন: "The small modernising elite continues to have a dominant voice, but the forces of tradition and conservatism are by no means dead or even insignificantly weak. When plans for progress fail, appeals of obscurantism become attractive. But whatever the lip-service rendered to traditional ideals and forms, the goal of modernisation appears to have been generally accepted. There is, however, no consensus on the elements of tradition to be preserved and no assessment of the social costs of economic development and technological change: thinking on these themes continues to be hazy and wishful. It would be desirable not to approach the "take off" stage with a divided mind on these seminal issues."1 অর্থাৎ ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করার বিষয়ে মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্ত প্রগতিশীল লোকের মুখ্য ভূমিকা রহিয়াছে। কিন্তু

1 Some Aspects of Social Change in India. Edited by Kuppuswamy and Prayag Mehta. An article entitled Formulating the Goals of Change by Dr. S. C. Dube. Page 55.

গোঁড়া সনাতনপন্থীদের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নহে। যখনই কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন সনাতন আদর্শের দোহাই দিয়া ব্যর্থতার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিবার অপচেষ্টা করিতে দেখা যায়। যদিও সনাতন জীবনাদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়, নীতি হিসাবে আধুনিকীকরণ স্বীকৃতি পাইয়াছে। কিন্তু সনাতন আচার-ব্যবস্থার কি কি বিষয় সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, এই বিষয়ে আজও কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনুরূপভাবে, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন ও শিল্পবিকাশের জন্য যে-সব সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হওয়া সম্ভব, তাহাও সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত হয় নাই। এইসব মৌল বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট না হইলে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলাফল শুভ না হওয়ারই কথা।

কৃষি এবং শিল্প বিকাশের লক্ষ্য সুস্পষ্ট : শস্যোৎপাদন এবং শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করা। ভারতীয় যোজনা কমিশন এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং জনসাধারণের সমক্ষে জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ স্থাপনা করার বিষয়ে অনুরূপ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ ও অনুসরণ করিতে পারেন নাই। এই কারণে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি, উদ্দেশ্যহীনতা এবং লক্ষ্যচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ডক্টর দুবে বলেন : "The main failures have been on the educational and communicational fronts. Efforts in these fields lack direction : they are weak, poorly organised, and not quite in harmony with the national effort on the agricultural and industrial fronts. Their major failures are : (i) They have not effectively projeted a positive image of the New India—of what the country wants to be, and of what it should be. (ii) They have not seriously tried to inculcate the attitudes and values that are conducive to modernisation. (iii) A new system of rewards and sanctions, necessary for economic development and social change, has not received imaginative and careful handling on their part."[1]

বর্তমান ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে কোন সুস্পষ্ট ছবি ভাসিয়া না উঠার অন্যতম কারণ, বিভিন্ন জনসমষ্টির জীবন-যাপনের রীতিতে, চিন্তা-ভাবনায় এবং আচার-আচরণে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে কোন কোন জনসমষ্টি সর্ব বিষয়ে অতি আধুনিক, কেহ কেহ হয়ত বিশেষ বিষয়ে আধুনিক এবং অপর বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া সনাতনপন্থী। কোন কোন অঞ্চলে জীবন-যাপনের রীতি লক্ষ্য করিলে মনেই হয় না যে, ঊনবিংশ শতাব্দী বিংশ

1 তদেব পৃষ্ঠা ৫৫

শতাব্দীতে পদার্পণ করার পর আরও চুয়াত্তর পচাত্তর বৎসর অতীত হইয়াছে। এইরূপ আকাশ-পাতাল তফাৎ বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া, আচার-বিচার সব কিছুতেই লক্ষণীয়। এই কারণে অশোক মেহতা বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দীর সহাবস্থান ('co-existence of centuries') সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অগবার্ন জীবন-ধারার বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তনের মধ্যে যে-অসমতার (concept of cultural lag) উল্লেখ করেন, তাহার নিদর্শন বর্তমান ভারতবর্ষে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Edited by B. Kuppuswamy add Prayag Mehta : Some Aspects of Social Change in India. Sterling Publishers (P) Ltd. Delhi 6.

২। T. B. Bottomore : Sociology. Unwin University Books. London.

৩। নির্মলকুমার বসু ঃ হিন্দু সমাজের গড়ন। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

৪। M. N. Srinivas : Social change in Modern India. Orient Longman.

সমাজতত্ত্ব

চতুর্থ খণ্ড

সামাজিক সমস্যাবলী

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সামাজিক সমস্যাবলী

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

সমাজের বিভিন্ন অংশে অসম পরিবর্তনজনিত নানা রকমের বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। পরিবর্তন যত ব্যাপক ও দ্রুত হয়, সামাজিক শৃঙ্খলাও তদনুযায়ী অধিকতর বিপর্যস্ত হয়। আমরা নবম পরিচ্ছেদে সামাজিক গঠনতন্ত্র আলোচনা করিবার সময় দেখিয়াছি যে, সমাজের বিভিন্ন অংশে সর্বদা ভারসাম্য বজায় থাকার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। ইহাকে সামাজিক শৃঙ্খলা বলা হয়।

নানা কারণে এবং নানা ভাবে সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইতে পারে। বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদির ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিলে অথবা যুদ্ধ বাধিলে সমাজ-জীবন উলটপালট হইয়া যায়। উপরোক্ত কারণে সমাজে যে-পরিবর্তন ঘটে, তাহার বিস্তৃতি বিবেচনা করিলে ইহাকে আকস্মিক দুর্বিপাক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিশৃঙ্খলা সমাজে বিরল। তিন চার দশক অথবা আরও দীর্ঘকালের ব্যবধানে সমাজ এই প্রকার বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়। সমাজ কখনও চরম বিশৃঙ্খলা অথবা পূর্ণ শৃঙ্খলা এই দুই প্রান্ত সীমায় (two extremes) থাকে না। প্রতিনিয়ত সমাজে নানা রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেইজন্য সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে একটি অনবচ্ছেদ বিষয় (continuum) বলিয়া ভাবা উচিত।

অগবার্ন ও নিমকফ্ (Nimkoff) সামাজিক বিশৃঙ্খলার তিনটি মৌল কারণের ('the basic causes of social disorganisation') উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সমাজস্থ লোকের বা তাহার জীবন-ধারার অসঙ্গতি ঘটিলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।1 দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির স্বভাবের সঙ্গে সমষ্টিগত জীবনের বা জীবন-ধারার সমন্বয়ের অভাব হইতে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইতে পারে।2 তৃতীয়তঃ, জীবন-ধারার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি হইতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।3 এক কথায়, বিশ্বজগতের

---

1 "............the maladjustment of man and culture to the natural environment, particularly certain extraordinary manifestations such as epidemics, floods, and earthquakes." A Handbook of Sociology. Page 546

2 "...the lack of adjustment of man's inherited nature to the demands of group life and culture". তদেব পৃষ্ঠা ৫৪৭

3 ".........the stress caused in correlated parts of culture when they change at unequal rates of speed............Social disorganisation thus results from conflict between the basic factors in human experience, that is, between geographical influences and culture, between heredity and culture, and between the various parts of culture."
তদেব পৃষ্ঠা ৫৪৭

সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের সমন্বয়-সাধনের (adjustmcnt) সমস্যা হইতে বিবিধ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়।1

সামাজিক বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিলে ইহা হইতে উদ্ভূত নানা রকম সামাজিক সমস্যাবলীর প্রকৃতি বুঝিতে সুবিধা হইবে। শৃঙ্খলার অভাবকে বিশৃঙ্খলা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যখন ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এবং একটি বা একাধিক অংশ স্বাভাবিক কাজকর্ম করিতে অপারগ হয়, তখন সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া বা বিনষ্ট হওয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। যে-কোন যান্ত্রিক বিশৃঙ্খলার সঙ্গে তুলনা করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। যেমন, একটি টাইপ মেশিনে (type writer) টাইপ করিতে গিয়া যদি কাগজ আটকায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মেশিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বা সমন্বয় কোন কারণে বিপর্যস্ত হইয়াছে। তবে টাইপ মেশিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বা সমন্বয় বিনষ্ট হওয়ার জন্য মেশিনে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহা প্রকৃতিতে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সমগোত্রীয় নহে। মেশিনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বা কার্যকারিতার মাপকাঠিতে বিশৃঙ্খলা পরিমাপনসাধ্য। কিন্তু সামাজিক বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে দক্ষতা বা কার্যকারিতা একমাত্র মাপকাঠি নহে। ভাল-মন্দ বা বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের প্রশ্ন ইহার সঙ্গে জড়িত থাকে। যেমন, খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ঘাটতি থাকায় দেশের কিছু কিছু অঞ্চল যখন দুর্ভিক্ষের কবলে, তখন সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট চালাইয়া যদি রেলকর্মীগণ ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায় করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কার্যকারিতার দিক হইতে ধর্মঘটের সাফল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-কবলিত অঞ্চলে লোকের দুঃখ-দুর্দশা নিদারুণ হওয়ার আশঙ্কা থাকায় ধর্মঘটজনিত বিশৃঙ্খলা অবাঞ্ছিত এবং সেই কারণে বর্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে, খাদ্যশস্য মজুদ করিয়া ব্যবসায়ীগণ যখন মুনাফা শিকারের আশায় খাদ্যে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে, তখন এই প্রকার আচরণ নিন্দণীয় এহং শাসনযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া যদি সমাজের বিশেষ কোন অংশ সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে বিশৃঙ্খলা এবং তজ্জনিত সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। অতএব সমাজের বিভিন্ন অংশের কাজকর্ম কেবলমাত্র দক্ষতার মাপকাঠিতে বিচার্য নহে। সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল-অমঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের অংশ বিশেষের কাজকর্মের মূল্যায়ন করা হয়। আবার সমাজে প্রচলিত নীতি বা মূল্যবোধের যাহা অনুকূল তাহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং যাহা প্রতিকূল তাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে অগবার্ন ও নিমকফ্-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল: "Some of the disorganisation discussed

1 "All social problems grow out of *the* social problem – the problem of the adjustment of man to his universe, and the social universe to man." Gillin & others: Social Problems. Page 451

as social problems and called immoral may be the result of efficient functioning of an organisation but disorganising to society, as in crime, labour problems, and race relations. A border raid may be efficient but disorganising to the community."1

সুতরাং যাহা সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের পরিপন্থী বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকেই সামাজিক সমস্যা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এখানে 'সামাজিক' এবং 'সমস্যা' এই দুইটি শব্দ-প্রয়োগের তাৎপর্য আলোচনা করিলেই সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি বুঝিতে সুবিধা হইবে।

সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সমাজস্থ লোকের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং প্রচলিত জীবন-ধারাগত আদর্শ বা মূল্যবোধ জড়িত থাকে বলিয়া সামাজিক শব্দ দ্বারা সমস্যাকে বিশেষিত করা হয় ("They (the social problems) are social in the sense that they pertain to human relationship and to the normative contexts to which all human relationships exist".)।2 যেমন, কোন একটি ছাত্র বা ছাত্রী পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর না পাওয়ায় যদি উচ্চতর শিক্ষায়তনে প্রবেশাধিকার বা উপযুক্ত চাকরি না পায়, তাহা হইলে ইহা সম্পূর্ণরূপে তাহার ব্যক্তিগত সমস্যা। কারণ, সমাজের সামগ্রিক জীবন এইরূপ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা দ্বারা জর্জরিত হয় না। কিন্তু বিদ্যায়তনের পাঠ্যসূচী (syllabus) সমাজ-জীবনের প্রয়োজন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যদি ছাত্র-ছাত্রীরা উপযুক্ত চাকরি-বাকরি পাইতে অথবা বিদ্যায়তন হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ইহাকে সামাজিক সমস্যা বলিয়া গণ্য করা যায়। কারণ, সমগ্র সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া পরিব্যাপ্ত হয়।

আবার যে-সব বিশৃঙ্খলা সামাজিক গঠন ও পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে অসঙ্গতি ও সমাজস্থ লোকের প্রত্যাশিত বা আকাঙ্ক্ষিত জীবন যাপন করার পথে ব্যাঘাত ঘটায় এবং সমাজে প্রচলিত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে, সেইসব বিশৃঙ্খলা সামাজিক সমস্যার উদ্ভবের কারণ("They (the social problems) are problems in the sense that they represent interruptions in the expected or desired scheme of things; violation of the right or the proper, as a society defines these qualities; dislocation in the social patterns and relationships that a society cherishes".)।3

1 Ogburn and Nimkoff: A Handbook of Sociology. Page 535

2 Nisbet and Merton: Contemporary Social Problems. N. Y. 1961. Page 4. Quoted by Sm. Bela Dutt Gupta in her book entitled 'Contemporary Social Problems in India'. 1964. Page 4

3 তদেব পৃষ্ঠা ৪

সমাজস্থ লোকের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের মান সর্বদা এক থাকে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মান প্রয়োগ করা হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মানের প্রচলন দেখা যায়। তাহা ছাড়া, পরিবেশের পরিবর্তনও অবিরাম ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য সময়-ভেদে ও স্থান-ভেদে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে যাহা সমস্যা হিসাবে গণ্য হইত, বর্তমানে তাহা সমস্যা বলিয়া পরিগণিত না-ও হইতে পারে। ভবিষ্যতে হয়ত এই সমস্যার রূপ পরিবর্তিত হইয়া অন্য আকারে দেখা দিতে পারে। আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজে একই সমস্যার প্রকৃতি পৃথক হয়। নামসাম্য বজায় থাকিলেও মূলতঃ সমস্যার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক হইতে পারে। সুতরাং স্থান ও কাল বিবেচনা না করিয়া সমস্যার বিশ্লেষণ করা অযৌক্তিক ও অর্থহীন। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যায়। আজ হইতে এক শত বৎসর পূর্বে দারিদ্র্য বলিতে যাহা বুঝাইত, বর্তমানে ঠিক তাহা বুঝায় না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্য শব্দটি যে অর্থ বহন করে, ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে ঠিক সেই অর্থ বহন করে না। অতএব মানুষের মূল্যবোধ ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটিলে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়। এক সময় মানুষ দাসত্ব প্রথার প্রবর্তন করিয়া যান্ত্রিক উপায়ের অভাবজনিত সমস্যা সমাধান করে। কিন্তু পরবর্তী কালে মানুষের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত হওয়ার জন্য দাসত্ব প্রথা একটি সমস্যায় পরিণত হয়।

এই বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় সামাজিক সমস্যার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। নিম্নে কয়েকটি সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করা হইল। এই সমস্যাগুলি স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। ইহার ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সারা সমাজে ইহার প্রতিক্রিয়া পরিব্যাপ্ত হয়। উপরন্তু, বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে আরও অনেক রকম সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। যেমন, তরুণ-তরুণীদের দুষ্ক্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবাহ-বিচ্ছেদকে গণ্য করা হয়।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ঠিক কি কারণে ঘটে, ইহা নির্ণয় করা শক্ত। সাধারণভাবে বলা যায় যে, দীর্ঘকাল যাবৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাব থাকিলে বিবাহ-বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ত হয়। নানা কারণে এইরূপ অসদ্ভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অসদ্ভাবের সৃষ্টি হইলেই যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একাধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, অনেক সময় তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মনোমালিন্যের পরিসমাপ্তি হয় বিবাহ-বিচ্ছেদে। আবার এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি তিক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে না। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, বিশেষ

কয়েকটি সামাজিক কাঠামোগত ও জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য থাকিলে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রথমতঃ, বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে ধর্মীয় নিষেধ-বিধি যত কম হয় বিবাহ-বিচ্ছেদের হারও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে। এই বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের কড়াকড়ি থাকায় ক্যাথলিক বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার প্রটেষ্ট্যাণ্ট বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। জাপান ও আরব দেশগুলিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার অত্যন্ত বেশি। ধর্মীয় নিষেধ-বিধির শিথিলতা ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ-বিচ্ছেদের পথে আইনগত বাধা যত কম হয়, বিবাহ-বিচ্ছেদের হার তদনুযায়ী বৃদ্ধি পাওয়ার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে বিবেচ্য। সেখানে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইন অত্যন্ত কঠোর ছিল। ব্যভিচারই বিবাহ-বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। অন্য কোন কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন অগ্রাহ্য হইত। তাহা ছাড়া, বিবাহ-বিচ্ছেদ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল—পাঁচ শত পাউণ্ডের অধিক ব্যয় হইত। কিন্তু ১৯১৪ সালের পর হইতে নানা প্রকার আইন পাশ করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদকে অনেক বেশি সহজসাধ্য করা হয়। ১৯১৪ সালে একটি আইন পাশ করা হয় যাহার বলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা বিনা ব্যয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে আইনজ্ঞের সাহায্য পাইতে পারে। পূর্বে মহিলারা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনিতে পারিত না। কিন্তু ১৯২৩ সালে আইন পাশ করিয়া মহিলাদের উপর হইতে এইরূপ প্রতিবন্ধক দূর করা হয়। ১৯২৬ সালে অপর একটি আইনে সংবাদপত্রের উপর এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তাহারা যেন বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত মামলার বিস্তারিত বিবরণ না ছাপায়। ১৯৩৭ সালের একটি আইনে পার্লামেণ্ট স্থির করে যে, ব্যভিচার ছাড়া নিম্নোক্ত তিনটি কারণেও বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করা যাইতে পারেঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে (১) একজন অপর জনকে পরিত্যাগ করার অজুহাতে, (২) একজন অপর জনের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করার অভিযোগে, অথবা (৩) যে-কোন একজনের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে এই কারণে। এইসব আইন পাশ হওয়ার ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজসাধ্য হয় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের হার স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩ সালে প্রতি এক হাজার বিবাহে মাত্র দুইটি বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটিত। ১৯৪৭ সালে এই হার বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় প্রতি হাজার বিবাহে এক শত আটত্রিশটি।

তৃতীয়তঃ, শিল্পায়নের ফলে এমন কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে যাহা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বন্ধনকে শিথিল করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ত করে। (ক) উৎপাদন-কার্য পরিবার হইতে ফ্যাক্টরীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় পরিবারস্থ লোকের পরস্পরনির্ভরশীলতা স্বভাবতই হ্রাস পায়। (খ) শিল্পায়নের ফলে মহিলাদের কর্ম-সংস্থানের সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হয় এবং পুরুষের উপর তাহাদের নির্ভরশীলতা

অনেক কমিয়া যায়। (গ) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদিত হওয়ায় (commercialisation of services) আহার্য প্রস্তুত করা, পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ার করা, কাপড় কাচা, বিনোদন প্রভৃতি সেবামূলক কার্যের জন্য পুরুষ এবং নারীর পরিবারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

বলা বাহুল্য, সুস্থিত (stable) পারিবারিক সম্পর্ক সহযোগিতামূলক কাজকর্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। সুতরাং সহযোগিতামূলক কাজকর্মের পরিধি যত বেশি সঙ্কুচিত হইবে, পারিবারিক সম্বন্ধাদিও তদনুযায়ী শিথিল হইবে। শিল্পায়ন এইরূপ সহযোগিতামূলক কাজকর্মের গণ্ডী সঙ্কুচিত করিতে সাহায্য করে।

চতুর্থতঃ, নগরায়ন বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। কারণ, নগর-সমাজে বে-নামা জীবন যাপন করা সম্ভব এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীল জীবন-প্রণালী গড়িয়া উঠে না। সুতরাং সামাজিক নিয়ামকগুলির কার্যকারিতা স্বভাবতই দুর্বল হয়। কাজেই গ্রাম-সমাজের তুলনায় নগর-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনেক বেশি ব্যাপক। সুইডেন ও নরওয়ের বিবাহ-বিচ্ছেদের হার তুলনা করিলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। এই দুইটি দেশে সমরূপ জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে। অর্থাৎ উভয় দেশের লোকদের মধ্যে অভিন্ন ঐতিহ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ রহিয়াছে। কিন্তু সুইডেনের অধিবাসীগণ অপেক্ষাকৃত বেশি শহুরে এবং নরওয়ের অধিবাসীগণ অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রাম্য। সুতরাং নরওয়ের তুলনায় সুইডেনের বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বেশি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করিতে গেলে এই বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ করা যায়।

পঞ্চমতঃ, সামাজিক পদ-মর্যাদা ও জীবন-ধারার দিক দিয়া অসম বিবাহ হইলে বিবাহিত দম্পতির মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এইসব ক্ষেত্রে মনোমালিন্যের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাও বিচিত্র নহে।

ষষ্ঠতঃ, অনেক সমাজতত্ত্ববিদ বলেন যে, আধুনিক কালে বিবাহেচ্ছু যুবক-যুবতীগণ বিবাহের রোমান্সের দিকটির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে ; বিবাহিত জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাহারা অবহিত থাকে না। পরবর্তী কালে যখন তাহারা এইসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন বাস্তবের আঘাতে তাহাদের অলীক স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। ইহার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে।

উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের যেসব কারণ আলোচনা করা হইল, এই কারণগুলি বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই কারণগুলি উপস্থিত থাকিলেই যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবে ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

ব্যক্তি-জীবনে এবং সমাজ-জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদ নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে বলিয়া বিবিধ উপায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়। প্রথমতঃ, সব সমাজেই সমবিবাহের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ, অসম বিবাহে সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বেশি। দ্বিতীয়তঃ, সব সমাজেই বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদের, বিশেষ করিয়া মেয়েদের, দাম্পত্য

জীবনের নানা প্রকার সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করাইবার চেষ্টা করা হয়। দাম্পত্য জীবনে রোমান্সই যে একমাত্র সম্বল নহে, এই শিক্ষা বৈবাহিক আচার-অনুষ্ঠানাদিতে প্রাধান্য পায়। বৈবাহিক অনুষ্ঠানে পাত্র-পাত্রীকে পরস্পরের নিকট অনেক রকম অঙ্গীকার করিতে হয়। এইসব অঙ্গীকারে বিবাহিত দুইটি জীবনের মিলনাদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন, মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে ঃ

ওঁ অন্যোন্যস্যাব্যভীচারো
ভবেদামরণান্তিকঃ
এষ ধর্মঃ সমাসেন
জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ ॥

অর্থাৎ, পতির বিষয়ে পত্নী যেমন, পত্নীর প্রতি পতি তেমনি আমরণকাল একনিষ্ঠমতি রহিবেন। কেহই ব্যভিচারে রত হইবেন না। ইহাই সংক্ষেপে বিবাহিত দুইটি জীবনের পরম ধর্ম। তৃতীয়তঃ, সব সমাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পথে আইনগত নানাপ্রকার বাধা থাকে। বিশেষ কয়েকটি শর্ত পূরণ না হইলে আইনানুগ বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না। অনেক সময় ইচ্ছা থাকিলেও আইনের বেড়া-জাল ইচ্ছা-পূরণের পথে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য কিংবা তাহা ছেদন করা অত্যন্ত কঠিন, সমাজ এবং আইনের এইরকম ব্যবস্থা নরনারীকে অনেক দুঃখকষ্ট, অত্যাচার সহ্য করিয়াও পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করে। এইরূপ মনোভাবের অভাবে শিথিল বিবাহ-বন্ধন সভ্য সমাজে বহু বন্ধনকেই শিথিল করিয়া দেয়। সেইজন্য অনেক সভ্য সমাজেই বিবাহের বন্ধন-ছেদনকে যথাসম্ভব কষ্টসাধ্য করা হইয়াছে।

অপরাধ ও তৎসম্পর্কিত সমস্যা

সমাজে যাহা বাঞ্ছিত বা মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ যদি তাহার বিরোধী কাজ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা অপরাধের অত্যন্ত ব্যাপক সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কেহ যদি সামাজিক আচার না মানে, তাহা হইলে সে অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' এই দুইটি শব্দ আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ-নির্দিষ্ট পন্থার বিরোধী কাজ করার ফলে যাহারা প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা আইনতঃ অপরাধী (criminal) বলিয়া গণ্য হয়। অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ অর্থে অপরাধ (crime) শব্দটি আইন সম্পর্কিত ধারণা (legal concept)। সামাজিক বিধি-নিষেধ অমান্য করা সত্ত্বেও কেহ যদি প্রচলিত আইন লঙ্ঘন না করে, তাহা হইলে তাহাকে অপরাধী বলা হয় না। এই পরিচ্ছেদে আমরা এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থেই অপরাধ শব্দটি ব্যবহার করিব। ইহা যদিও আইনের বিষয়, তবুও সমাজতত্ত্ববিদের নিকট অপরাধ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে মূল্যবান। এই সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। (১) অপরাধ শব্দটি আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আজ যাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, ভবিষ্যতে তাহা না-ও হইতে পারে।

তাহা ছাড়া, এক সমাজে যাহা অপরাধ, অপর এক সমাজে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য না-ও হইতে পারে। সুতরাং এইরূপ পার্থক্য বুঝিতে হইলে আইনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। (২) কি অবস্থায় এবং কেন আইন-বিরোধী কার্য করা হয়, ইহার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কারণ, অপরাধমূলক কাজকর্ম সমাজ-জীবনে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে। (৩) অপরাধমূলক কাজকর্ম নিবারণ করার উদ্দেশ্যে সমাজে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা সমাজতত্ত্ববিদের বিবেচ্য বিষয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে নিজ নিজ জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আবার একই সমাজে বিভিন্ন রকম অপরাধের জন্য বিভিন্ন রকম শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। জীবন-ধারাগত আদর্শ দ্বারা অপরাধের মাত্রা বিচার করা হয়।

মানুষ কেন এবং কি অবস্থায় অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, এই বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এই মতবাদগুলি আলোচনা করা হইল।

কিছুসংখ্যক গবেষক অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইতালীয় অপরাধতত্ত্ববিদ্ লম্ব্রোসো (Lombroso) পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের (crime against the person) সংখ্যা সমতলভূমিতে সর্বনিম্ন, পার্বত্য অঞ্চলে কিঞ্চিৎ অধিক এবং অত্যুচ্চ অঞ্চলগুলিতে সর্বাধিক। কিছুসংখ্যক গবেষক দেখাইয়াছেন যে, উষ্ণ জলবায়ুতে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের সংখ্যা বেশি এবং অপেক্ষাকৃত শীতল জলবায়ুতে অধিক সংখ্যক অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পত্তি সংক্রান্ত। অনেকে আবার ঋতুর সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, শীতকালে সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ এবং গ্রীষ্মকালে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রাধান্য পায়।

ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, ঋতু প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এই প্রভাব পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা অবাস্তব এবং কষ্টকল্পিত। শীতকালে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হইল, শীতের প্রকোপে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্বভাবতই কমিয়া যায়। এই সময়ে বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ, শীতের সময় লোকের অভাবজনিত দুর্দশা চরমে উঠে।

কয়েকজন অপরাধতত্ত্ববিদ বংশগতির সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। লম্ব্রোসোর মতে, অপরাধী ব্যক্তিগণ জন্মসূত্রে অপরাধ প্রবণতা লাভ করে। তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্বাভাবিক লোকজনের তুলনায় অপরাধী ব্যক্তিদের শারীরিক বেদনাবোধ অনেক কম এবং তাহাদের মধ্যে মৃগীরোগের (epilepsy) প্রাধান্য পরিলক্ষিত

হয়। ইংল্যাণ্ডের জেল বিভাগের অন্তর্গত একজন সরকারী কর্মচারী চার্লস গোরিং (Charles Goring) আট বৎসর যাবৎ প্রায় ৩০০০ কয়েদীর শারীরিক গঠন সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। এই তথ্যগুলি স্বাভাবিক লোকজনের শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া তিনি উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য পান নাই।

বংশগতির সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের যোগাযোগ সম্পর্কে অতীতে অনেক বিতর্ক হইয়াছে এবং বর্তমান কালেও এই বিতর্ক চলিতেছে।[1]

অনেক অপরাধতত্ত্ববিদ পারিবারিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধমূলক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিশু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং পরিবারেই সে বড় হইয়া উঠে। পরিবার হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষা স্বভাবতই তাহার উপর গভীর রেখাপাত করে। পরবর্তী জীবনে তাহার আচার-ব্যবহার ও চিন্তা-ভাবনায় ইহার প্রতিফলন হইতে দেখা যায়। সেইজন্য অপরাধতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, পারিবারিক পরিবেশেব প্রভাবে অপরাধ-প্রবণতা গড়িয়া উঠিতে পারে। এই বিষয়ে কয়েকটি সম্ভাবনার উল্লেখ করা হইল।

পরিবারের বাহিরে কি ধরনের লোকের সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় বা যোগাযোগ স্থাপিত হইবে, ইহা পারিবারিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। যেমন, পরিবারস্থ লোকজন যদি এমন একটি এলাকায় বসবাস করেন যেখানে প্রতিনিয়ত অপরাধমূলক কার্যকলাপ ঘটে, তাহা হইলে স্বভাবতই শিশুটি অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণের সান্নিধ্যে আসিবে। তাহার খেলার সাথীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক থাকিবে যাহারা এই জাতীয় পরিবারের অন্তর্গত। এই অবস্থায় তাহার মধ্যে অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা প্রকাশ পাওয়া বিচিত্র নহে।

পরিবারের মধ্যেও সুস্থ মানসিকতা গড়িয়া উঠিবার পরিবেশ না-ও থাকিতে পারে। যেমন, পিতা-মাতার মধ্যে সদ্ভাব না থাকিতে পারে অথবা পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসবাস করিতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। স্নেহ-ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ তাহার মনে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। ইহা তাহাকে অ-সামাজিক করিয়া তুলিতে এবং সমাজ-বিরোধী কাজকর্ম করিতে প্ররোচিত করিতে পারে।

অনেক মনোবিদের মতে, অপরাধ-প্রবণতা অসম্পূরিত ব্যক্তিত্বের (personality maladjustment) বহিঃপ্রকাশ। সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ না থাকার জন্য অথবা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষার জন্য ব্যক্তিত্বে অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে। তাঁহাদের মতে, এই প্রকার অপরাধ-প্রবণতা উপযুক্ত চিকিৎসায় দূর হইতে পারে।

1 "While it is now generally accepted that there are no inherited characteristics, physical or mental, that definitely identify people as actual or potential criminals, it is by no means established that there is no relation at all between criminality and inheritance, or between criminality and physical type. Indeed, recent studies have brought this issue very much to the forefront again." E. F. Hunt : Social Science. Page 347.

অনেক সময় দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন-ধারার সংস্পর্শজনিত বিরোধ (cultural conflicts) হইতে অপরাধমূলক কার্যকলাপের সূচনা হইতে পারে। তিন প্রকার জীবন-ধারাগত বিরোধের কথা ভাবা যায়।

প্রথমতঃ, আদর্শগত বা ধর্মীয় কারণে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক আচরণ করিতে পারে। যেমন, কেহ যদি কায়মনোবাক্যে শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শে বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে সে নির্দ্বিধায় ধনী ব্যক্তির প্রাণনাশ বা বিশেষ অবস্থায় ধনসম্পদ বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুঠ করিতে পারে। ইহা আইন-বিরোধী কার্য এবং সেই কারণে দণ্ডনীয় অপরাধ, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার ধর্মান্ধ ব্যক্তি অপর ধর্মাবলম্বীর উপর বে-আইনীভাবে অত্যাচার বা নিপীড়ন করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি কোন অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়, তখন সেই জাতির মূল্যমান, আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি স্বভাবতই প্রভাবাধীন অঞ্চলে সম্প্রসারিত করা হয়। ইহার ফলে এই অঞ্চলের কোন কোন সাবেকী আচার-আচরণ বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যখন সাইবেরিয়ার উপজাতিদের মধ্যে সোভিয়েত আইন বলবৎ করা হয়, তখন মহিলাদের সাবেকী প্রথায় ঘোমটা টানা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যাহারা এই আইন মানিতে গিয়া ঘোমটা পরিত্যাগ করে, সাবেকী প্রথা উপেক্ষা করার জন্য তাহাদের আত্মীয়-স্বজন তাহাদের হত্যা করে। অনুরূপ-ভাবে, আলজিরিয়াতে ফরাসী আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ব্যভিচারিণীকে বধ করা তাহার ভ্রাতা বা পিতার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু ফরাসী আইন অনুসারে এইরূপ প্রাণনাশ দণ্ডনীয় অপরাধ।[1] এই অবস্থায় বে-আইনী কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নহে।

তৃতীয়তঃ, যখন কোন সমাজের কিছুসংখ্যক লোক অপর এক সমাজে যাইয়া বসবাস করে, তখনও এইরূপ জীবন-ধারার পার্থক্যজনিত অপরাধমূলক কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই বিষয় বা ঘটনাটি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ, আলজিরিয়ার অধিবাসীগণের একাংশ যদি ফ্রান্সে যাইয়া বসবাস করে এবং সাবেকী আচার-আচরণ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের আচরণ ফ্রান্সের প্রচলিত আইনের বিরোধী হওয়া বিচিত্র নহে। একই দেশের মধ্যে এইরূপ জীবন-ধারাগত বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে যখন লোকেরা নগরে বসবাস করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এমন আচরণ করে যাহা নগর-জীবনের স্বীকৃত ধারার বিরোধী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন-বিরোধী। গ্রামাঞ্চলে অভ্যস্ত জীবন-প্রণালী অনুসরণ করার ফলেই

---

1 *Sociology : A Text with Adapted Readings.* **Edited by Leonard Broom and Philip Seznick. Article on Criminal Behaviour by Donald R. Cressey. Page 610.**

অনিচ্ছাজনিত অপরাধমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী অঞ্চলে যাহা স্বাভাবিক এবং উপযুক্ত আচরণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা নগর-সমাজে অস্বাভাবিক, অনুপযুক্ত, এমন কি আইন-বিরোধী, বলিয়া বিবেচিত হওয়া অপ্রত্যাশিত নহে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, আইন-বিরোধী কাজ করার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এই তথ্যের ভিত্তিতে অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অভাবের তাড়নায় মানুষ আইন-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। অভাবের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক সময় মানুষ বাধ্য হইয়া বিপথগামী হয়, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা অসঙ্গত বলিয়া অনেকে অভিমত পোষণ করেন। অভাব-অনটনের জন্য মানুষ অপরাধমূলক কার্য করে—এই মতবাদের বিরুদ্ধে দুই প্রকার যুক্তি উত্থাপন করা হয়। প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও লোকেরা অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়, এবং এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। যে-সব অপরাধ বাবু-কাজের সঙ্গে জড়িত, সাধারণতঃ এইসব অপরাধমূলক কার্যের পূর্ণ বিবরণ পুলিশের রিপোর্টে স্থান পায় না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিবেচনা করিয়া তাহাদের অপরাধমূলক কার্য যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে এইসব অপরাধমূলক কার্যের প্রমাণস্বরূপ উপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ না থাকায় মামলা দায়ের করা হয় না। বাবু-কাজের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া যাহারা অপরাধমূলক কার্য করে, সাধারণতঃ সরাসরি আদালতে অভিযুক্ত না করিয়া অন্য উপায়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হয়।1 এই অবস্থায় অপরাধীর তালিকায় উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত লোকদের বিশেষ উল্লেখ না-থাকা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ, অভাবগ্রস্ত হইলেই যে লোকে চুরি করে, এইরূপ উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। চরম দুঃখ-দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইয়াও অসদুপায় অবলম্বন না করার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আসল কথা হইল, অপরাধ করার প্রবণতা থাকিলে অভাব-অনটন ইহাকে উসকানি দেয় মাত্র। খুব অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই অভাব-অনটন প্রত্যক্ষভাবে অপরাধমূলক কার্য করিতে প্ররোচিত করে।

1 "White-collar crimes—crimes committed by persons of respectability and high social status in the course of their occupations—are widespread, but their frequency is not adequately reflected in police reports. Prosecution for this kind of crime frequently is avoided because of the political or financial importance of the individuals concerned, because of the apparent triviality of the crimes, or because of the difficulty of securing evidence sufficient for prosecution. Methods other than prosecution in the criminal courts are frequently used to protect society against white-collar crimes." তদেব পৃষ্ঠা ৬২৩—৬২৪

"Need bccomes a circumstance to which a certain type of individual responds by anti-social conduct."1

লোকেরা কি অবস্থায় বা কেন অপরাধমূলক কার্য করে—এই বিষয়টি সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ উপরে আলোচনা করা হইল। সব কয়টি মতবাদেই আংশিক সত্যতা রহিয়াছে। অবস্থা বা পরিবেশের তারতম্যে এক-একটি কারণ বিশেষ গুরুত্ব পায়। সেইজন্য অপরাধমূলক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সমাজে সাধারণতঃ তিন রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, অপরাধমূলক কাজকর্ম করার প্রবণতা যাহাতে হ্রাস পায় বা অবদমিত থাকে, সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষা-দীক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সামাজিকীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সুস্থ জীবন-যাপনের পক্ষে যাহাতে সহায়ক হয়, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। যেমন, বস্তি বা এই জাতীয় দরিদ্রপল্লীর নানা প্রকার উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্য হইল সুস্থ জীবন যাপন করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। অনুরূপভাব, বেকারি দূর করার চেষ্টা করিয়া, বেকার-ভাতার ব্যবস্থা করিয়া এবং বিবিধ উপায়ে নিম্নবিত্ত লোকদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়া সব সমাজেই দরিদ্র শ্রেণীর আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস লক্ষণীয়। তৃতীয়তঃ, অপরাধী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার ব্যবস্থাও সব সমাজে থাকে। অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজ দার্শনিক গ্রীন (T. H. Green) শাস্তি দিবার ব্যবস্থাকে এই বলিয়া সমর্থন করেন যে, অপরাধী ব্যক্তিদের শাস্তি না দিলে তাহারা সমাজে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে।2

তরুণ বয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা

যখন কিশোর-কিশোরীরা অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়, তখন এইসব অপরাধকে delinquency বা তরুণ বয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা বলা হয়। এই ব্যাপারে কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসীমা সমাজ-ভেদে পৃথক হয়। কোন কোন সমাজে আঠার বৎসর এবং কোন কোন সমাজে আরও বেশি। তবে কোন সমাজেই একুশ

1 Gillin and others : Social Problems. Page 419.

2 "This right on the part of associated men implies the right on their part to prevent such actions as interfere with the possibility of free action contributory to social good. This constitutes the right of punishment, the right so far to use force upon a person (to treat him as an animal or a thing) as may be necessary to save others from this interference." T. H. Green : Principles of Political Obligation. Longmans, Green & Co. 1941. Page 180

বৎসরের বেশি বয়স হইলে কিশোরের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয় না। যখন এই বয়ঃসীমার অন্তর্গত কোন কিশোর বা কিশোরী অপরাধমূলক কাজকর্ম করে, তখন তাহাকে আইনতঃ অপরাধী (criminal) হিসাবে গণ্য না করিয়া দুষ্ক্রিয় (delinquent) হিসাবে গণ্য করা হয়।

এইরূপ পার্থক্য করার যুক্তি এই যে, কিশোর-কিশোরীরা সাময়িকভাবে কুসংসর্গে অথবা অবাঞ্ছিত প্রভাবে পড়িয়া আইন-বিরোধী কাজকর্ম করিতে পারে। তরুণ বয়সে তাহাদের মধ্যে অপরাধমূলক কাজ করার প্রবণতা পাকাপাকি-ভাবে গড়িয়া উঠে না। সুতরাং কুসংসর্গ এবং অবাঞ্ছিত প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সংশোধন করার চেষ্টা করিলে তাহারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। একই অপরাধমূলক কাজ করার দায়ে অভিযুক্ত হইলেও বয়স্ক অপরাধীকে যে-শাস্তি দেওয়া হয়, তরুণ বয়স্ক অপরাধীকে সেই শাস্তি দেওয়া হয় না। শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তাহাকে সংশোধন করার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৈশোরে তাহাদের সংশোধন না করিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহারা সমাজের বোঝাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, এই আশঙ্কায় সমাজে নানা রকম সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। প্রায় সব সমাজেই সংশাধনাগার (Reformatory) স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দ্বারা প্রথম অপরাধীদের সংশোধনার্থ আধিকারিক (Probation officers) নিযুক্ত করা হয়। উপরন্তু, তরুণ বয়স্ক দুষ্ক্রিয়রা যাহাতে পরবর্তী জীবনে স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রশিক্ষণ দিবার জন্য নানা রকম শিল্প বিদ্যালয় (trade schools) স্থাপন করা হয়।

যে-সব কারণে বয়স্ক ব্যক্তিরা অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়, তরুণ বয়স্ক ছেলেমেয়েরাও অনুরূপ কারণে দুষ্ক্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু বয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করিলে দুইটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, তরুণ-তরুণীরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা অনেক সহজে ও স্বল্প সময়ে প্রভাবিত হয়। সুতরাং শিল্পায়নের ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন ঘটে, তাহা তরুণ-তরুণীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পরিবর্তনের গতি যত দ্রুত হয়, তাহাদের পক্ষে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা তত শক্ত হয়। তাহারা বিভিন্ন সূত্র হইতে নানা প্রকার শিক্ষা লাভ করে। অনেক সময় পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শ তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। এই পরিস্থিতিতে কোন স্থির আদর্শ বা মূল্যবোধকে তাহারা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে না। কৈশোরে বিচার-বুদ্ধিও পরিণতি লাভ করে না। সুতরাং কেহ কেহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিপথগামী হইয়া পড়ে। প্রাক্ শিল্পযুগীয় সমাজে তরুণ-তরুণীরা অসঙ্গতিপূর্ণ বা পরস্পরবিরোধী আদর্শ বা মূল্যবোধের সম্মুখীন হইত না। সুতরাং দুষ্ক্রিয়তার ব্যাপ্তি অত্যন্ত সীমিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় তরুণ বয়স্করা মনোগত কারণে দুষ্ক্রিয় হইয়া উঠে। যেমন, কোন

কোন মনোবিদ্ বলেন যে, অনেক ছেলেমেয়ে প্রতিরক্ষামূলক আচরণ হিসাবে (defensive behaviour) নানা রকম দুষ্কর্ম করিয়া থাকে। হীনম্মন্যতা (inferiority complex) হইতে বালকবালিকারা শৈশবে এবং কৈশোরে অনেক সময় মিথ্যা ভাষণের দ্বারা বা চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় লইয়া নিজেদের বাহাদুরি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। উপযুক্ত সময়ে নিয়ন্ত্রিত বা সংশোধিত না হইলে এইরূপ কু-অভ্যাস আরও সাংঘাতিক দুষ্কর্মের পথে তাহাদের ঠেলিয়া দেয়।1

বর্ণ-বিদ্বেষ

ইতিহাসে বর্ণ-বিদ্বেষজনিত (race prejudice) বিরোধ, শোষণ ও নিপীড়নের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিবেক-বর্জিত রাজনীতিবিদগণ বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বিশেষ জাতিকে মহিমান্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অপর জাতি বা জাতিসমূহকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদের উপর সব কিছু অন্যায় বা দুষ্কর্মের বোঝা চাপাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বর্তমান কালেও এই অপচেষ্টা অব্যাহত আছে।

জীববিজ্ঞানীগণ মস্তিষ্কের আকার, চুল, চোখ ও চামড়ার রঙ্, নাক ও গ্রীবার আদল, উচ্চতা, শারীরিক গঠন প্রভৃতি বাহ্যিক শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জাতি নির্ণয় করেন। এইসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিয়া তাঁহারা নিগ্রো (the Negroids), ককেশীয় (the Caucasians) এবং মঙ্গোলীয় (the Mongoloids) এই তিনটি প্রধান জাতিতে মানব-গোষ্ঠীকে ভাগ করেন।

বাস্তব ক্ষেত্রে এইরূপ বিভাজনের বিশেষ মূল্য নাই বলিলেই চলে। প্রথমতঃ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বলিত যে মিশ্র জাতি দেখা যায়, তাহাদের সুনির্দিষ্ট-ভাবে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। যেমন, রঙের ভিত্তিতে যদি ভেদরেখা টানা হয়, তাহা হইলে মধ্যবর্তী রঙ-বিশিষ্ট লোকদের কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হইবে? আবার চুলের আকৃতি যদি মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে মান হিসাবে গায়ের রঙ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। গায়ের রঙের দিক হইতে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ কঙ্গোর নিগ্রোদের সমগোত্রীয়, কিন্তু চুলের আকার বিচার করিলে তাহারা য়ুরোপীয় শ্বেতকায়দের পর্যায়ভুক্ত। অতএব প্রশ্ন দাঁড়ায়, কোন্ মাপকাঠিকে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে? দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘ কাল যাবৎ নানাভাবে এক জাতি অপর জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে। এক জাতির নর-নারীর সঙ্গে অপর জাতির নর-নারীর যৌন মিলন ঘটিয়াছে। ইহার ফলে আজ আর কেহ অবিমিশ্র জাতি বলিয়া দাবি করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, জীববিজ্ঞানীদের মতে, একই উৎস হইতে ভিন্ন

1 এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বিচ্যুতি সম্পর্কিত আলোচনা এবং আলোচ্য পরিচ্ছেদে অপরাধ ও তৎসম্পর্কিত সমস্যা শীর্ষক অংশটি দ্রষ্টব্য।

ভিন্ন জাতির উদ্ভব হইয়াছে। বর্ণ-সমস্যা আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে UNESCO-এর তরফ হইতে বিশেষজ্ঞদের লইয়া যে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটির সদস্যগণও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।1 তাঁহাদের মতে, দ্রুত যান-বাহন আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন জনসমষ্টি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দীর্ঘকাল কাটায়। স্বভাবতই বিবাহাদি সম্বন্ধ নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার ফলে পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রকাশ পায়।

জাতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত, সমাজতত্ত্বের নহে। কিন্তু জাতিগত পার্থক্য যদি পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, তাহা হইলে জাতি বা বর্ণ সমাজতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

অনেক সময় মানসিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে জাতিগত পার্থক্যের উল্লেখ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিগণের তুলনায় বেশি ধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া দাবি করেন। এইরূপ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার বিষয়টিও সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপ যুক্তি দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাজ্যে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিগণের পৃথকীকরণ-নীতি (policy of segregation) সমর্থিত হয়।

কিন্তু নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দুই বা ততোধিক জাতির মধ্যে এইরূপ উত্তম-অধম সম্পর্ক স্থাপন করার পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক হেতু নাই। সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্যক্তিত্ব আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি, বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়ের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে লোকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। দেখা গিয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল (যেখানে পৃথকীকরণ-নীতি অনুসরণ করা হয়) হইতে যে-সব নিগ্রো উত্তরাঞ্চলে (যেখানে পৃথকীকরণ নীতি অনুসৃত হয় না) আসিয়া বসতি স্থাপন করে, কিছুকাল থাকার পর তাহাদের ধী-শক্তি (I. Q.) বৃদ্ধি পায়। আসল কথা হইল, সব জাতির মধ্যেই সব রকমের লোক আছে। ধী-শক্তির প্রাচুর্য বা অভাব কোন জাতিরই একান্ত বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।2

---

1 UNESCO Courier. July-August, 1950. Page 8.

2 "Any racial group, however defined, includes all sorts of personalities. Both geniuses and idiots occur in all races. Always there are the clever and the stupid, the honest and the deceitful, the arrogant and the meek, the pious and the godless, the alert and the lethargic. No so-called race monopolies any of these qualities. The practical question about any individual is not, what is his physical type, but *what sort of person* is he ?" D. G. Haring : Contemporary Human Types. Quoted in Readings in Sociology. Edited by A. M. Lee. Page 194

বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং গবেষণা দ্বারা সমর্থিত না হইলেও বর্ণ-বিদ্বেষ সামাজিক সম্পর্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং প্রশ্ন হইল, বর্ণ-বিদ্বেষ কেন বা কি ভাবে উদ্ভূত হয়? এই বিষয় লইয়া সমাজ-মনোবিদ্যায় বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। তাহাদের গবেষণায় ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শিশুরা কোন জাতি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক মনোভাব বা প্রতিকূল ধারণা লইয়া জন্মায় না। ইহা মূলতঃ জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শৈশবাবস্থা হইতে সামাজিকীকরণের প্রভাবে শিশু কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রতিকূল ধারণা আত্মস্থ করে এবং ইহা পরবর্তীকালে তাহার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথা, উপকথা, নাটক ও সঙ্গীতে এইসব প্রতিকূল ধারণা নানাভাবে বিধৃত থাকে এবং সমাজস্থ লোক সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই ধারণাগুলি আত্মস্থ করিয়া লয়। এই প্রসঙ্গে ম্যাক আইভারের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। "The child's acquisition of prejudice is a subtle and gradual development. It is traceable.........to the same processes of socialisation that .....engender the sense of 'we', the sense of identification with family and play group. .... Thus his feeling of attachment and loyalty, usually first nourished in the family, is extended to include those particular groups that the circumstances of his environment call to his attention. He learns, for example, that he is a Protestant or a Catholic or a Jew,............that he is unhappily 'colored' or happily a 'superior white.' .... He is largely unaware of the process that makes of him, say, an anti-Semite or an advocate of white supremacy, and when he reaches adulthood he rarely can identify the influences that shaped his views in earlier years".1

পরবর্তী প্রশ্ন হইল, কোন জাতি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রতিকূল ধারণা কি করিয়া বা কি কারণে জীবন-ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া পড়ে? এই প্রশ্নের ব্যাখ্যাস্বরূপ অনেক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, স্বজাতি-প্রীতির (ethnocentrism) উল্লেখ করা হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে, অন্তঃসামাজিক সঙ্ঘ (in-group) এবং বহিঃ-সামাজিক সঙ্ঘের (out-group) মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বিরাজ করে। এক দিকে, মানুষ অন্তঃসামাজিক সঙ্ঘের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং অপর দিকে বহিঃসামাজিক সঙ্ঘ সম্পর্কে সে সাধারণতঃ উদাসীন থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে। অতি মাত্রায় স্বজাতিপ্রীতির জন্য বর্ণ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

---

1 Mac Iver and Page: Society. Page 408

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবার বাসনা ও সম্ভাবনা হইতে বর্ণ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা থাকায় সস্তা দরে মজুর সহজলভ্য। সেইজন্য নিগ্রোদের দাবাইয়া রাখার কৌশল হিসাবে বর্ণ-বিদ্বেষের আশ্রয় লওয়া হয়। তাহারা যদি শ্বেতকায় মার্কিন অধিবাসীদের ন্যায় লেখাপড়ার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরী দিয়া চাষবাসের কাজে তাহাদের নিয়োগ করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, ফ্রয়েডের অভিক্ষেপ-তত্ত্বের (theory of projection) সাহায্যে বর্ণ-বিদ্বেষ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হয়। নিজেদের ব্যর্থতা, ভয় বা অসম্পূর্ণতার জন্য অপরকে দায়ী করা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। যখন কেহ অপরের সঙ্গে ধন-সম্পদ বা বুদ্ধিতে প্রতিযোগিতা করিতে অপারগ হয়, তখন নিজেদের অসম্পূর্ণতা দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া সাধারণতঃ সে অপরকে দোষারোপ করে। য়ুরোপের দেশগুলিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিষ্টান অধিবাসীগণকে ইহুদীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করিতে দেখা যায়। ইহার অন্যতম কারণ হইল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহুদীদের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা এই যে, যাহাদের আমরা আমাদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করি, তাহাদিগকে আমরা হয় ঘৃণা করি নতুবা কৃপা করিতে ভালবাসি। কিন্তু যাহারা আমাদের সমকক্ষ অথবা আমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, সাধারণতঃ তাহাদের প্রতি আমরা বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করি।

চতুর্থতঃ, অজ্ঞানতা হইতে বর্ণ-বিদ্বেষ উদ্ভূত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। অপরের সম্পর্কে আমরা এমন অনেক ধারণা পোষণ করি, যাহার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোন মিল বা সঙ্গতি নাই। অনেক সময় অজ্ঞানতা আবেগ-বিজড়িত হইয়া বিদ্বেষমূলক মনোভাবকে সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করে। অজ্ঞানতা যত সহজে দূর করা যায়, আবেগ অথবা মানসিক অনুরাগ বা বিরাগ তত সহজে দূর করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য দেখা যায়, অপর জাতি সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বিদ্বেষমূলক মনোভাব অন্তর্হিত হয় না। বর্ণ-বিদ্বেষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথমাবস্থায় অজ্ঞানতা হইতে উদ্ভূত হইলেও কালক্রমে ইহার সঙ্গে অনেক রকম আবেগ জড়িত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অপর জাতি সম্পর্কে বাস্তবতা-বর্জিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

অতএব দেখা যাইতেছে, নানা কারণে বর্ণ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীতে ইহা সমস্যা হিসাবে বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছে। কারণ, যান-বাহন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে এক জাতি অপরাপর জাতির আদব-কায়দা রীতিনীতি, ভাষা, এমনকি পোষাক পরিচ্ছদও সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। বরং বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহজভাবে মিলামিশার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য বার্নস্ (Delisle Burns) বলিয়াছিলেন যে, মানব-গোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস একদিকে যেমন মানব-সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, অপর দিকে ইহা আবার নানা সমস্যারও

সৃষ্টি করিয়াছে। যদি অতীতের স্মৃতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে নিজেদের পছন্দানুযায়ী মানব-সমাজকে ঢালিয়া সাজান যাইত।1

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টি বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে জীবন-ধারার বিভিন্ন উপাদানের অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি (cultural lag) বলিয়া ভাবা যায়। যান-বাহন সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি উন্নত হওয়ায় এতাবৎ কাল যে-সব জাতি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাহাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পরস্পরের পার্থক্য স্বীকার করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে বাস করার মনোভাব সৃষ্টি না হওয়ার জন্য বর্ণবিদ্বেষ সম্পর্কিত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অগবার্ন ও নিমকফ্-এর উক্তি উল্লেখ করা হইল : "In almost all cases, the contacts which bring out the friction are due to the transportation inventions which have thrown the races into close contact. Technology changes first, and the adaptation of the races to these changes occurs much later" 2

উপরের বিশ্লেষণে বর্ণ-বিদ্বেষ সম্পর্কিত সমস্যার প্রতিকারের উপায় পাওয়া যায়। শৈশবাবস্থা হইতে শিক্ষার মাধ্যমে জাতিগত এবং বর্ণগত পার্থক্যের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে যদি শিশুদের পরিচিত করান হয়, তাহা হইলে ধীরে ধীরে বর্ণ-বিদ্বেষ দূর হইবার সম্ভাবনা আছে। আইন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। ইহা মূলতঃ নীতির প্রশ্ন, বিবেকের প্রশ্ন, ধ্যান-ধারণার প্রশ্ন। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে অগবার্ন ও নিমকফ্ বলেন : "Race prejudice is a matter of attitudes, which are often thought to be amenable to education; and the usual approach to the question concerns changing attitudes".3

বর্ণ-বিদ্বেষ সম্পর্কিত সমস্যার প্রতিকারের জন্য আরেকটি উপায়ও অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। যখন আর্থিক বা রাজনীতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মনোভাবের সৃষ্টি করা হয়, তখন এই জাতীয় উদ্দেশ্য যাহাতে সার্থক না হইতে পারে তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

---

1 "If man had no history then we could begin without difficulty to arrange the world upon the best plan conceivable ; for then all men would be made according to one excellent definition, all turned out according to one pattern and each easily to be understood by studying the other. But each of us individually and each group of us collectively is a result of the past. We are burdened or we are benefited by our descent." Delisle Burns : Political Ideals. Page 175-176

2 Ogburn and Nimkoff : A Handbook of Sociology. Page 545

3 তদেব পৃষ্ঠা ৫৪৫-৫৪৬

অধ্যাপক টয়েনবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন যে, নিগ্রোদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করিতে পারিলে শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায়দের মধ্যে বিদ্বেষজনিত সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তাঁহার অভিমতের সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছেন: "If the Negro has the same economic deal as the white, his way of life is going to be much like that of the corresponding white person, and this immediately decreases the racial tension. The more equal are the cultures, the less racial difference counts, and the easier becomes integration—including the only complete form of integration, intermarriage."1 অর্থাৎ অধ্যাপক টয়েনবীর মতে, নিগ্রোরা যদি অর্থনৈতিক বিষয়ে শ্বেতকায় মার্কিন অধিবাসীদের সমকক্ষ হইতে পারে এবং এই বিষয়ে যদি কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ না করা হয়, তাহা হইলে শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায়দের মধ্যে অভিন্ন জীবন-যাপনের রীতি গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। ইহা উভয় জাতির মধ্যে বিদ্বেষজনিত উত্তেজনা হ্রাস করিতে সাহায্য করিবে। ধীরে ধীরে আত্তীকরণের (assimilation) উপযুক্ত বাতাবরণ গড়িয়া উঠিবে এবং উভয় জাতির মধ্যে অন্তর্বিবাহের প্রচলন হইবে।

অধ্যাপক টয়েনবীর উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য ও অভিন্ন জীবন-যাপনের রীতি প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে আত্তীকরণের পথ প্রশস্ত হইবে, ইহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে য়ুরোপে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীগণ বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করিতেন না। কোন কোন অঞ্চলে ইহুদীগণ নিগৃহীত হন, ইহারও প্রমাণ আছে।

আসল কথা হইল, বর্ণ-বিদ্বেষ সম্পর্কিত সমস্যাটি অত্যন্ত ব্যাপক, জটিল ও সুদূরপ্রসারী। ইহার সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক প্রশ্ন জড়িত। তদুপরি, অজ্ঞানতা এবং অজ্ঞানতাপ্রসূত নানারকম কুসংস্কার সমস্যাটিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই সমস্যার সঙ্গে আবেগ ও হৃদয়-বৃত্তি সম্পৃক্ত থাকায় ইহার প্রতিকারের কোন হ্রস্ব পন্থা নাই। ধৈর্য সহকারে এবং দৃঢ় চিত্তে চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। এক পুরুষে (generation) প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। নিরলস প্রয়াসের ফলে হয়ত দুই বা তিন পুরুষের মধ্যে মানব-সমাজ বর্ণ-বিদ্বেষের গ্লানি হইতে মুক্ত হইবে।

জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ও পরিবার পরিকল্পনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে সারা পৃথিবীব্যাপী, বিশেষ করিয়া অনগ্রসর দেশসমূহে, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ (population explosion) সম্বন্ধে নানা

প্রকার আলোচনা, বিতর্ক এবং গবেষণা চলিতেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত সমস্যা সম্পর্কে কোন সংশয় বা ভিন্ন মত পোষণ করার অবকাশ নাই। এই বিষয়ে পরিসংখ্যান অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতি আট বৎসর অন্তর পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় এক শত কোটি (a billion people) করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। পৃথিবীতে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ শিশুই অনগ্রসর দেশগুলিতে এবং অবশিষ্ট এক ভাগ শিশু অগ্রসর দেশগুলিতে জন্মায়। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অনগ্রসর দেশসমূহে বাৎসরিক বিনিয়োগের দুই-তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র বর্তমানের জীবন-যাত্রার মান বজায় রাখিতে ব্যয়িত হয়। সুতরাং বাৎসরিক বিনিয়োগের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিতে ব্যয় করা হয়। অপর পক্ষে, অগ্রসর দেশগুলিতে বাৎসরিক বিনিয়োগের মাত্র এক-চতুর্থাংশ বর্তমানের জীবন-যাত্রার মান বজায় রাখিতে এবং বাকি তিন-চতুর্থাংশ জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিতে ব্যয় করা হয়। এই পরিসংখ্যানের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। অনগ্রসর দেশগুলির জীবন-যাত্রার মান অগ্রসর দেশগুলির জীবন-যাত্রার মানের সমপর্যায়ে আসার সম্ভাবনা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। ধনী দেশগুলি ক্রমশঃ অধিকতর ঐশ্বর্যশালী হইতেছে এবং দরিদ্র দেশগুলির দারিদ্র্যের বোঝা অধিকতর গুরুভার হইয়া পড়িতেছে।

ভারতবর্ষ অনগ্রসর দেশগুলির অন্যতম। সুতরাং উপরোক্ত পরিচ্ছেদে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার সমস্যা আলোচনা করা যায়। ১৮৭১ হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা প্রতি বৎসর গড়ে শতকরা ০.৬ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির হার মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। প্রকৃত পক্ষে, এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির গড় হার যাহা ছিল, সেই তুলনায় ভারতবর্ষে বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। বিশেষ করিয়া, এই সময়ের মধ্যে য়ুরোপীয় দেশগুলিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং জাপানে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির যে হার ছিল তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়।

একদিকে, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় এবং সেই তুলনায় ভারতবর্ষে জনসংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে এই সময় হইতে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার গড়ে শতকরা দুই ভাগেরও বেশি। ইহার অন্যতম কারণ, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নত ব্যবস্থা হওয়ায় মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে পঞ্চাশ শতক হইতে আশাতিরিক্তভাবে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির তুলনায় অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিতেছে।

এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে জনসংখ্যার সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে সেবামূলক কাজকর্মের (social services) পরিধি আরও সম্প্রসারিত হইলে মৃত্যুহার আরও হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য দুইটি পথ খোলা আছে। হয় জন্মহার হ্রাস করা নতুবা প্রবাসনের (emigration) ব্যবস্থা করা। কিন্তু ভারতবর্ষে জনসংখ্যার বোঝা লাঘব করার ক্ষেত্রে শেষোক্ত পন্থাটির কার্যকারিতা অত্যন্ত সীমিত। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে অন্যূন ৬০ লক্ষ লোক বিদেশে গিয়া বসবাস করিলে সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু এত বিরাট সংখ্যক লোকের বিদেশে জীবিকার সংস্থান হওয়া কি সম্ভব? সব দেশেই আগন্তুকদের চাকরি-বাকরির উপর নানা রকম নিষেধ-বিধি আরোপ করা হইতেছে। অভিবাসন (immigration) সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনও যথাসম্ভব জটিল করা হইতেছে। এই অবস্থায় প্রবাসনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে।

অতএব এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য জন্মহার হ্রাস করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এখন প্রশ্ন হইল, কি উপায়ে জন্মহার সীমিত করা সম্ভব? এই বিষয়ে জনসংখ্যায়কদের (demographer) দুইটি ভিন্ন মত পোষণ করিতে দেখা যায়। এক পক্ষ প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ (family planning approach) করার পক্ষপাতী। যাহারা এই পদ্ধতির সমর্থক তাহারা গর্ভ-নিরোধক দ্রব্যাদির ব্যবহার, গর্ভ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিবিধ নিদানিক (clinical) পদ্ধতির প্রয়োগ এবং গর্ভপাতের (abortion) উপর গুরুত্ব দেন। অপর পক্ষ পরোক্ষ উপায়ে (non-family planning approach) জন্মহার সীমিত করার পক্ষপাতী। শেষোক্ত পদ্ধতির সমর্থকগণ অর্থনৈতিক বিকাশ এবং জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহাদের মতে, জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইলে লোকদের বেশি বয়সে বিবাহ করার প্রবণতা এবং পরিবার সীমিত করার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইবে।

উভয় পদ্ধতির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে নানা রকম যুক্তি এবং উদাহরণ উত্থাপন করা হয়। প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করার উপর যাহারা জোর দেন, তাহারা বলেন যে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে সময় অপচয় করার অবকাশ নাই। বর্তমানে যে-হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সেই হার বজায় থাকিলে আগামী ২৮ বৎসরে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। অতএব প্রত্যক্ষ উপায়ে এবং প্রয়োজন হইলে জোর পূর্বক জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাহারা বলেন, যে-সব দেশে জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করা হইয়াছে সেইসব দেশে গর্ভপাত সংক্রান্ত আইনের কঠোরতা হ্রাস করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করিলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে আশানুরূপ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করিতে কম পক্ষে এক পুরুষ লাগিবে এবং জনসংখ্যার উপর

এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পরবর্তী ২৫।৩০ বৎসরের পূর্বে বুঝা যাইবে না।

পরোক্ষ পদ্ধতির সমর্থকগণ বলেন যে, প্রত্যক্ষ উপায়ে আশু ফল পাওয়া গেলেও তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। পরিবার সীমিত রাখার তাগিদ অনুভব না করিলে সাধারণ লোকের তরফ হইতে জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকর প্রয়াস না থাকারই কথা। ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশগুলিতে অধিক সংখ্যক লোক দারিদ্র্যের নিম্নতম পর্যায়ে অবস্থান করে। সন্তান কম বা বেশি হওয়ার ফলে তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না বলিলেই চলে। এই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জন্মহার সর্বাধিক। সুতরাং ইহাদের মনে সীমিত পরিবারের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিতে না পারিলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার হ্রাস করা যাইবে না। এই কারণে পরোক্ষ পদ্ধতির সমর্থকগণ বলেন যে, জাতীয় সম্পদের যে অংশ পরিবার পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় করা হয়, তাহার বেশির ভাগ অর্থ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয়িত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তাইওয়ানের (Taiwan) অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থার (Overseas Development Council, Washington) প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, তাইওয়ান (Taiwan) সরকারের তরফ হইতে ১৯৬৩ সালে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম গৃহীত হইবার পূর্বেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জন্মহার প্রতি হাজারে ছেচল্লিশ হইতে একত্রিশে দাঁড়ায়। এই পন্থার সমর্থকগণ চীন দেশেরও উল্লেখ করেন। তাহাদের মতে, নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলির জন্য সেখানে জন্মহার হ্রাস পাইতেছে: (১) দীর্ঘ সময় কমিউন-এর কাজকর্মে লোকদের নিযুক্ত থাকিতে হয়। (২) গৃহকর্মে সাহায্য করিবার জন্য ভৃত্যের অভাব। (৩) একান্নবর্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের লোকের অভাব। পূর্বে সাধারণ কাজকর্মে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। (৪) তরুণ বয়সে সপরিবারে বাস করিবার উপযুক্ত আয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়ায় পরিণত বয়সে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। (৫) নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার নীচে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ আইনের বলে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। (৬) বিদ্যায়তন ও কমিউনগুলিতে সীমিত পরিবারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এইভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়। পরোক্ষ পদ্ধতির সমর্থকগণ পাঞ্জাব ও গুজরাটের কোন কোন অংশে জন্মহার হ্রাস পাওয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এইসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার ফলেই জন্মহার হ্রাস পাইয়াছে।

পরিবার পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা প্রয়োজন। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি অবলম্বন করা কোনমতেই সমীচীন হইবে না। সমস্যাটি বিশাল আকারে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রতিদিনই ইহার জটিলতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় অপেক্ষা করার অবকাশ নাই বলিলেই চলে। যত দেরী হইবে সমস্যার

সমাধান তত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং আশু ফলপ্রাপ্তির জন্য প্রত্যক্ষ উপায়ের উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ উপায়ের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সীমিত পরিবারের আদর্শ যাহাতে আপামর জনসাধারণের নিকট কাম্য বা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সেইজন্য কয়েকজন জনসংখ্যায়কের মতে, পরিবার পরিকল্পনা বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ (population budget) থাকে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থ গর্ভ প্রতিরোধ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যয় করিয়া বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি-বিধানে এবং শিক্ষার সম্প্রসারণে ব্যয় করা উচিত। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পদ্ধতিকে একটি অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে না ভাবিয়া একটিকে অপরটির পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা সঙ্গত। কারণ, সমস্যাটি মূলতঃ সমাজতত্ত্বসম্বন্ধীয়, কেবলমাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রগত নহে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অনুন্নত সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যা

উন্নত ও অনুন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য 1

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার চার পাঁচ বৎসর পর হইতে সারা পৃথিবীকে উন্নত (developed) এবং অনুন্নত (underdeveloped) অঞ্চলে বিভক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ আলোচনা প্রধানতঃ অর্থনীতিবিদদের মধ্যেই আবদ্ধ এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের সাহায্যে এই প্রকার পার্থক্য করা হয়। এখনও এই ধারা অব্যাহত আছে। তবে সমাজতত্ত্ববিদগণও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি সমাজতত্ত্বের দিক হইতে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদ উভয়েরই বিবেচ্য বিষয়।

'অনুন্নত অঞ্চল' কথাটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বহু আলোচনায় underdeveloped এবং undeveloped শব্দ দুইটি সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ এই দুইটি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। এই মতের সমর্থনে তাঁহারা নিম্নোক্ত যুক্তির অবতারণা করেন। প্রাকৃতিক এবং মানবিক সম্বলের অভাব থাকায় যে-অঞ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা খুব সীমিত, সেই অঞ্চলকে undeveloped বলিয়া গণ্য করা সমীচীন পক্ষান্তরে, বর্তমানে undeveloped থাকিলেও ভবিষ্যতে যে-অঞ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই অঞ্চলের ক্ষেত্রেই কেবল underdeveloped শব্দটি প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এই বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল: "Unfortunately the term, 'underdeveloped areas,' has been carelessly used and ill-defined. 'Underdeveloped' has been used almost interchangeably with 'undeveloped,' although listings of each type would have both similarities and differences. An 'undeveloped' area may be 'underdeveloped' and then again it may offer little in the way of developmental possibilities, its 'undeveloped' condition being due to a lack of natural or human resources. An 'underdeveloped' area may be relatively developed but capable of further development." 2

1 এই পরিচ্ছেদে সমাজ বা অঞ্চল শব্দ দ্বারা সর্বব্যাপী (inclusive) বৃহত্তর সমাজ বা political entity নির্দেশ করা হইয়াছে।

2 Edited by L. W. Shannon : Underdeveloped Areas. Harper and Row. NewYork & Evanston. 1957. Chapter 1 (entitled Definition and Distribution of Underdeveloped Areas). Page 1

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুইটি কারণে গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমতঃ, কোন অঞ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা একেবারেই নাই ইহা সঠিকভাবে নিরূপণ করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরও উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটিলে তথাকথিত undeveloped অঞ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা যে উন্মোচিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? কোন মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ বর্তমানে অনাবিষ্কৃত থাকিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সম্পদ আবিষ্কৃত হইলে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে মানবিক সম্পদ অনুন্নত থাকিলেও কালক্রমে শিক্ষা-দীক্ষার সম্প্রসারণের ফলে সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণ যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে। সুতরাং তাহাদের বর্তমান অনুপযুক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে সেই অঞ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা চিরকালের জন্য সীমিত থাকিবে, এইরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে।

অতএব 'undeveloped' শব্দের পরিবর্তে 'underdeveloped' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এখন বিবেচ্য বিষয় হইল, অনুন্নত (underdeveloped) অঞ্চলের লক্ষণ নির্ণয় করা এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত (developed) অঞ্চলের সঙ্গে পার্থক্য যথাসম্ভব চিহ্নিত করা।

এই উদ্দেশ্যে অনুন্নত অঞ্চল সম্বন্ধে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধৃত করা হইল: "An economically underdeveloped country is one which on the average affords its inhabitants an end product of consumption and material well-being appreciably inferior to that provided by the economies of the developed countries. Poor is a relative term. To designate a country as underdeveloped also implies that its present economic performance—as evidenced by the average of consumption and material well-being could be improved by means which are known and understood."1 আরেকটি সংজ্ঞা হইল নিম্নরূপ: "A country characterised by mass poverty which is chronic and not the result of some temporary misfortune, and by obsolete methods of production and social organisation, which means that the poverty is not entirely due to poor natural resources and hence could presumably be lessened by methods already proved in other countries."2 অনুন্নত অঞ্চলের তৃতীয় সংজ্ঞা হইল:"………an underdeveloped country

---

1 N. S. Buchanan and H. S. Ellis: Approaches to Economic Development. New York. The Twentieth Century Fund. 1955. Pages 3-4

2 Eugene Staley: The Future of Underdeveloped Countries. New York. Harper and Brothers. 1954. Page 13

.........is a country which has good potential prospects for using more capital or more labor or more available natural resources, or all of these to support its present population on a higher level of living, or if its *per capita* income level is already fairly high, to support a larger population on a not lower level of living."[1]

উপরোক্ত তিনটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইবে। প্রথমতঃ, উন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষা অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের মান অনেক নীচু। অর্থাৎ উন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীগণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের দারিদ্র্য প্রাকৃতিক সম্বলের অভাব-প্রসূত নহে। তৃতীয়তঃ, উন্নত অঞ্চলসমূহে যে-কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃতিক সম্বলের সদ্ব্যবহার করা হয়, অনুন্নত অঞ্চলসমূহে তাহা করা হয় না। বরং অপ্রচলিত প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি প্রযোগ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না এবং এই কারণেই জীবনযাত্রার মান নীচু অবস্থায় থাকে। চতুর্থতঃ, উন্নত অঞ্চলসমূহে সামাজিক সংগঠনও উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে, অনুন্নত অঞ্চলসমূহে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকায় অনেক ক্ষেত্রে ইহা উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগ করার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

উপরোক্ত লক্ষণগুলির ভিত্তিতে পৃথিবীর অঞ্চলসমূহকে উন্নত এবং অনুন্নত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা খুবই অসুবিধাজনক। সুনির্দিষ্ট মানের সাহায্যে বিচার না করিলে এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ বাস্তবানুগ হয় না। বিস্তারিত অর্থনৈতিক তথ্যের (economic data) ভিত্তিতে এইরূপ মান নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল সম্পর্কে এইরূপ তুলনীয় তথ্যের অভাব রহিয়াছে। এই অবস্থায় কোন বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের মান বা সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং অপরাপর অঞ্চলের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব না হওয়ারই কথা। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আলোচনা করা যায়। যেমন, সম্ভাব্য জলশক্তির (potential water power) কি পরিমাণ উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইয়াছে, এই তথ্য মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি অঞ্চল সম্পর্কে পাওয়া যাইতে পারে। অথচ উন্নয়নের সম্ভাবনা নিরূপণ করিতে হইলে এইরূপ তথ্যের বিশেষ প্রয়োজন। পৃথিবীর বহু অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান করা হয় নাই। অতএব এইসব অঞ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা নির্ণয় করা কঠিন। অনেক সময় বিভিন্ন অঞ্চলের সংগৃহীত তথ্য এমনভাবে রাখা হয় যে, এক অঞ্চলের তথ্যের সঙ্গে অপর

1 Jacob Viner : International Trade and Economic Development. Glencoe. The Free Press: 1952. Page 125

অঞ্চলের তথ্যের তুলনা করা সম্ভব হয় না। জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে এই বিষয়ে (international social book-keeping) অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলির জন্য অনেকে জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে উন্নত এবং অনুন্নত অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষপাতী। যেমন, কেহ কেহ বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার উপযোগী দুই প্রকার পরিসাংখ্যিক তথ্য (statistical data) পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। একটি হইল, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার গুণগত মানোন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য। উদাহরণস্বরূপ, শিশুমৃত্যুর হারের উল্লেখ করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিলে খাওয়া-দাওয়া এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা উন্নত হওয়া স্বাভাবিক এবং ইহার ফলে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়া বিচিত্র নহে। অতএব বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুমৃত্যুর হার তুলনা করিলে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান তুলনা করা সম্ভব। আরেকটি হইল, একটি বা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যের পরিসাংখ্যিক তথ্য। যেমন, কৃষিক্ষেত্রে মাথা পিছু বা একর প্রতি কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন তুলনা করিলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব। এই দুই প্রকার পরিসাংখ্যিক তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ (correlation) স্থাপন করা যায়। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং সেই সঙ্গে শিশুমৃত্যুর হারও হ্রাস পাইবে। অতএব উভয় প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব।

বহু গবেষক উপরোক্ত ধারা অনুসরণ করিয়া তিন বা ততোধিক নির্দেশকের (index) সাহায্যে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন, কিছুসংখ্যক গবেষক মাথা পিছু আয়, নগরায়নের বিস্তৃতি এবং অকৃষিমূলক বৃত্তিতে নিযুক্ত কর্মীর অনুপাত বিবেচনা করিয়া উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের মধ্যে ভেদ-রেখা চিহ্নিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন গবেষক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান-নির্দেশক হিসাবে যে-সব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ (critical) বলিয়া গণ্য করেন, সেইসব বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি বিভিন্ন অঞ্চলকে উন্নত বা অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

বিভিন্ন গবেষকের গবেষণা-প্রসূত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক অনুন্নত অঞ্চলে এবং মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোক উন্নত অঞ্চলের অধিবাসী।[1] উন্নত অঞ্চলগুলির বণ্টন নিম্নরূপ : উত্তর আমেরিকা (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা), য়ুরোপের দেশসমূহ, দক্ষিণ আফ্রিকা (Union of South Africa), জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, এবং সাইবেরিয়ার যে-অংশ রাশিয়ার অন্তর্গত। পৃথিবীর বাকি অংশ অনুন্নত অঞ্চল

---

1 Dr. Douglas F. Dowd লিখিত 'Two-thirds of the World' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধটি Shannon কর্তৃক সম্পাদিত Underdeveloped Areas নামক গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা ১২-২১

বলিয়া গণ্য। বলা বাহুল্য, অনুন্নত অঞ্চলসমূহের মধ্যে পার্থক্য এত ব্যাপক যে সব অঞ্চলকে একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিলে বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মানে বিরাট ব্যবধান দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে। যেমন, আর্জেনটিনা, চিলি (Chile), উরুগুয়ে (Uruguay), চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে ইন্দোনেশিয়া বা আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের কোন তুলনা হয় না।

আবার উন্নত দেশগুলির মধ্যেও এই জাতীয় পার্থক্য নজরে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে অনেক দিক দিয়া সোভিয়েত রাশিয়াকে অনুন্নত বলা যায়। য়ুরোপের দেশসমূহ সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উন্নয়নের সব সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় নাই বলিয়া ইহাকেও অনুন্নত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই বিষয়ে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক গিল্-এর (Richard T. Gill) মন্তব্য উল্লেখ করা হইল: "From the point of view of the United States, the Soviet Union is still, in most respects, an underdeveloped nation. Much of the same can be said of Europe in general. For that matter, if we are thinking of growth *potentialities*, the United States with its continuing favorable prospects is itself an 'underdeveloped' country".1

তাহা ছাড়া, যে-সব দেশ উন্নত বলিয়া গণ্য হয়, সেইসব দেশেও কিছু কিছু অংশ এখনও অনুন্নত অবস্থায় আছে। অধ্যাপক রস্টোর (W. W. Rostow) মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ত্বরিত গতি (take-off stage) শুরু হইয়াছে মাত্র তিন দশক পূর্বে। অপরাপর উন্নত দেশগুলিতে —যেমন ফ্রান্স ও ইতালীর দক্ষিণাংশে—অনুন্নত এলাকা থাকায় এখনও উন্নয়ন সমস্যা রহিয়াছে।2

এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া অনেক অর্থনীতিবিদ বলেন যে, পৃথিবীর দেশসমূহকে উন্নয়নের মাত্রা অনুযায়ী পর পর অনবচ্ছেদ ধারায় সাজানো যায় ("To see the countries of the world, not as divided

between the developed and the underdeveloped, but as spaced along a line representing various stages of development.........".—Galbraith)। যে-সব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রথম অংশ গ্রহণ করে, তাহারা স্বভাবতই অধিকতর অগ্রগতি লাভ করে এবং যে-সব দেশ পরে এই বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা স্বাভাবিক কারণেই পিছাইয়া আছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের মধ্যে অন্যভাবে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। অধ্যাপক গিল্-এর মতে, কিছুসংখ্যক অনুন্নত দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে শুরু করিয়াছে এবং বাকি দেশগুলি এই অভিজ্ঞতা অর্জনের পর্যায়ে এখনও পৌঁছায় নাই। অপর পক্ষে, উন্নত দেশগুলি বহু পূর্বেই অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে অর্থনৈতিক ঋদ্ধিজনিত যাবতীয় সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে।[1] অতএব এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উন্নত দেশগুলির সমৃদ্ধির তুলনায় যে-সব দেশ দরিদ্র, সেই দেশগুলিকে অনুন্নত বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, দারিদ্র্যের সংজ্ঞা স্থান-কাল ভেদে পৃথক হয়। তবুও মাথা পিছু উৎপাদনের হার তুলনা করিলে দারিদ্র্যর সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। অধ্যাপক গিল্ তাঁহার Economic Development : Past and Present নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর অর্ধেক লোকের বাৎসরিক মাথা পিছু উৎপাদন হার ১০০ ডলারের কম, অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় এই হার ২,৫২১ ডলার।[2] এই তথ্য বিবেচনা করিলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক কেন দারিদ্র্যের জাঁতিকলে নিষ্পেষিত হইতেছে।

অনুন্নত সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যা

অনুন্নত সমাজের উন্নয়ন সমস্যা আলোচনা করিবার সময় আমাদের সর্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে অনগ্রসরতার কারণ ও প্রকৃতি ভিন্ন এবং এই কারণে অনগ্রসরতা দূরীকরণের উপায়ও ভিন্ন। এই সত্যটি অধ্যাপক রস্টো (Rostow) তাঁহার The Stages of Economic Growth নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে-পর্যায়ে (stage) যে-সমাজ রহিয়াছে, সেই পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সেই সমাজকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যথায় সমূহ

1 "What unites this group and makes the notion of 'underdeveloped countries' a meaningful one, however, is that all these countries have just begun to experience, or have yet to experience, the phenomenon of rapid economic growth which has become so characteristic in the economically advanced nations." R. T. Gill. Page 81.

2 তদেব পৃষ্ঠা ৮৪

বিপত্তির সম্ভাবনা। এক পর্যায়ের পক্ষে যাহা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত, সমরূপ ব্যবস্থা অপর পর্যায়ে প্রযুক্ত হইলে হিতের তুলনায় অ-হিত হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।1

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আলোচনা করা যায়। ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, মূলধনের অভাব অনুন্নত দেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু মূলধন সরবরাহ করিলেই যে সব অনুন্নত সমাজ সমানভাবে উপকৃত হইবে, ইহা বলা যায় না। কারণ, মূলধন সদ্ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। ইহা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, সমাজের ক্ষেত্রেও তদনুরূপ। অধ্যাপক গলব্রেথ এই বিষয়টির উপর জোর দিয়া বলেন ঃ "The ability to use capital in any considerable volume is itself the result of development. If it is available before the conditions for its use are available it will be ineffectively employed or possibly wasted"2 অনুরূপভাবে, অক্ষর-পরিচয় সম্পন্ন, অতীতের কু-সংস্কার হইতে মুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসমষ্টির নিকট বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ এবং উন্নত যানবাহনের ব্যবস্থা করিলে, এই সুযোগসুবিধাগুলি উন্নয়নমূলক কার্যে সার্থকভাবে নিয়োজিত হইবে। পক্ষান্তরে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অশিক্ষিত জনসমষ্টির নিকট এইরূপ সুযোগসুবিধা অর্থহীন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এইগুলির প্রয়োগ করা তাহাদের সাধ্যাতীত। অতএব প্রত্যেক সমাজকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী উন্নয়নের পথ নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে। এই বিষয়ে প্রতিটি সমাজ অনন্য। অনুন্নত সমাজের উন্নয়ন সমস্যা সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে এই সত্যটি সর্বাগ্রে উপলব্ধি করিতে হইবে।

সাধারণভাবে অনুন্নত সমাজের নিম্নোক্ত কয়েকটি উন্নয়ন সমস্যার উল্লেখ করা যায়। বলা বাহুল্য, এই সমস্যাগুলি সব অনুন্নত সমাজে সমানভাবে প্রযোজ্য নহে।

(১) পাশ্চাত্য দেশসমূহে উদ্ভাবিত এবং প্রচলিত উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে অনুন্নত সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার চেষ্টা করা হয়। বস্তুতঃ, অনুন্নত সমাজের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ পাশ্চাত্য সমাজের অনুসরণে প্রযুক্তিবিদ্যা ও তৎসম্পর্কিত কলাকৌশল ও ব্যবস্থাদি প্রবর্তনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

---

1 "......we must recognise that economic development is a process—one that extends in range from new nations of Africa but slightly removed from their tribal structure to the elaborate economic and social apparatus of Western nations. At each stage along this continuum there is an appropriate policy for further advance. What is appropriate at one stage is wrong at another." J. K. Galbraith : Economic Development in Perspective. The United States Information Service. Page 1.

2 তদেব পৃষ্ঠা ২১

কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের পক্ষে যাহা উপযুক্ত, অনুন্নত সমাজের পক্ষে তাহা সব ক্ষেত্রে উপযোগী নহে। পাশ্চাত্য সমাজে শ্রমের অভাব এবং তজ্জনিত শ্রম ব্যয়বহুল হওয়ায় সেখানে যথাসম্ভব শ্রমের ব্যবহার সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত হয়। এই জাতীয় কলাকৌশল অনুন্নত সমাজে প্রবর্তিত হইলে সমস্যা জটিল হইবে, হ্রাস পাইবে না।1 কারণ, অনুন্নত সমাজে শ্রম উদ্বৃত্ত এবং পারিশ্রমিকও অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং শ্রমের ব্যবহার সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে যেসব কলাকৌশল পাশ্চাত্য দেশসমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই কলাকৌশল অনুন্নত সমাজে নির্বিচারে প্রবর্তিত হইলে বেকারি বৃদ্ধি পাইবে। অতএব এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। এই বিষয়ে মন্তব্য করিতে গিয়া অধ্যাপক গিল্ যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য: "Ideally, the underdeveloped countries would employ a technology which is neither the Western technology of a century ago (which is defective) nor the most modern Western technology (which is adapted to a different kind of economic context) but a *third* technology which consists of an adaptation of modern methods to the special conditions of the underdeveloped world. Despite some efforts in this direction, however, this third technology does not really exist. Lacking it, the modern underdeveloped country typically tries to import the 'latest' Western methods, with the consequence that it faces acute shortages in certain areas (capital and trained personnel) while it has idle surpluses in others (large numbers of unemployed, unskilled workers)."2 অর্থাৎ অধ্যাপক গলব্রেথ ও অধ্যাপক গিল্-এর মূল বক্তব্য হইল, অনুন্নত সমাজের প্রয়োজন ও সাধ্য অনুযায়ী যদি কলাকৌশল প্রবর্তিত না হয়, তাহা হইলে আকৃতি এবং প্রকৃতিতে সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইবে। যে-সব

1 "The borrowing of technology is......a subtle matter. In principle, it is highly desirable... ..One must know, however, why the thing was worked out. Was it a step forward in process or product of universal application? Or was it an adaptation to the requirements of advanced economic development itself?......They (the first type) are as appropriate and important for the less as for the more developed country. But much of the technology of the more advanced countries represents an accommodation to labor shortages or reflects the other special requirements of the more advanced economy." Galbraith. তদেব পৃষ্ঠা ২২

কলাকৌশল অধি-শিল্পায়নের (super-industrialism) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাহা কোন অবস্থাতেই অনুন্নত সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে না। অনুন্নত সমাজকে নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া সৃজনমূলক প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিলে সমাধানের পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

(২) পর্যাপ্ত সংখ্যায় সৃজনমূলক কাজ করার উপযুক্ত যথার্থ উদ্যোক্তার (entrepreneur) অভাব অনুন্নত সমাজগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন নানা দিক দিয়া ব্যাহত করিতেছে। এইসব সমাজের ঐতিহ্য ও জীবন-ধারাগত নানা প্রলক্ষণ (cultural traits) এমন যে, যথার্থ উদ্যোক্তার উদ্ভব হওয়া অসুবিধাজনক।1 অথচ যথার্থ উদ্যোক্তা না থাকিলে শিল্প-ক্ষেত্রে সৃজনমূলক প্রয়াস অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব। পাশ্চাত্য সমাজের যান্ত্রিক কলাকৌশল অন্ধভাবে অনুকরণ করিলে কোন সুফল পাওয়া যাইবে না। কারণ, পাশ্চাত্য সমাজের সার্বিক পরিবেশে যাহা উপযুক্ত, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তাহা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইতে পারে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বেকার সমস্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, পাশ্চাত্য সমাজের গোটা অর্থনীতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের উপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, প্রত্যেকটি শিল্পের দক্ষতা ও কার্যকারিতা অপরাপর শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই অবস্থায় কোন একটি যন্ত্র বা কলাকৌশলকে অপরাপর কলাকৌশল হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া ভাবা অনুচিত। প্রত্যেকটি শিল্প অপরাপর শিল্পের পরিপূরক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে এই যে জটিল সম্বন্ধজাল রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া কেবল একটি বা কয়েকটি যন্ত্র বা শিল্প আমদানী করিলে সুফল প্রাপ্তির আশা কম। সেইজন্য উন্নত সমাজ হইতে আনীত শিল্প বা যন্ত্রকে অনুন্নত সমাজের স্বতন্ত্র প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করিতে না পারিলে, ভাল হওয়ার পরিবর্তে মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এইসব অভিযোজনের (adaptation) জন্য নূতন কিছু করার প্রবণতা এবং যোগ্যতা আছে এমন উদ্যোক্তার প্রয়োজন। অথচ অনুন্নত সমাজের ঐতিহ্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থা নূতন কিছু করার যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিত্ব (innovative personality) গড়িয়া তোলে না।1

---

1 এই বিষয়টি অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

1 "……a Western economy is a technical (and cultural) complex, not a set of isolated pieces of technology from which one piece can be detached and used efficiently elsewhere without skillful adaptation. Every Western industry depends for its efficiency on other industries. It assumes the ready availability of materials, machine parts and tools. It depends also on supplemental enterprises which can provide technical, financial and managerial services on demand; on a complex network of communication and transportation facilities; and on a complicated system of business practices. In a less developed society the supplemental industries are missing and the structure of business practices is different." E. E. Hagen: On the Theory of Social Change—how economic growth begins. Page 18.

(৩) প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক প্রয়োগ তখনই সম্ভব যখন উপযোগী সামাজিক ও জীবন-ধারাগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই কারণে বহু সমাজতত্ত্ববিদ technological development শব্দের পরিবর্তে socio-technological development শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে অনুন্নত সমাজগুলির সমস্যা এই যে, শিল্প-বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্ব এবং শিল্প-বিপ্লবের বাস্তব রূপায়ণ উভয় বিষয়েই যুগপৎ প্রচেষ্টা চালাইতে হইতেছে ("to accomplish simultaneously both the industrial revolution and the preparation for such a revolution"—R. T. Gill)। স্বভাবতই কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। আরেকটি কারণে সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। বহুল প্রচার মাধ্যমগুলির সম্প্রসারণ ও রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতার ফলে জনসাধারণের প্রত্যাশা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা চরিতার্থ করার সামর্থ্য অর্জিত হয় নাই। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও আন্দোলন। এই পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রয়াসের অন্তরায়স্বরূপ। আসল কথা হইল, শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য সমাজে যে-পরিবর্তন শতাধিক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে, অনুন্নত সমাজগুলিতে অনুরূপ পরিবর্তন মাত্র কয়েক দশকে আনিতে হইতেছে।

(৪) পাশ্চাত্য জগতের, এমন কি জাপানেরও, অথনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্বে শক্তিশালী শ্রমিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে নাই। এই কারণে এইসব দেশে শিল্পপতিদের পক্ষে অর্জিত মুনাফার একটি বড় অংশ ব্যবসায়ে পুনর্বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল। এতদ্ব্যতীত, শিল্প-বিরোধের সংখ্যা ও ব্যাপকতা সীমিত থাকায় শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে উন্নতিকামী দেশগুলিতে উন্নয়নের সূচনাতেই শক্তিশালী শ্রমিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। নানা দিক হইতে ইহা খুবই সমীচীন, সন্দেহ নাই। ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হইবে, এই বিষয়ে ন্যায়-নীতির দিক হইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। উপরন্তু, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী ও সুসংগঠিত শ্রমিক সঙ্ঘের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কিন্তু যেখানে দ্রুত উন্নয়ন কাম্য, সেখানে সুসংগঠিত শ্রমিক সঙ্ঘ শিল্পের দ্রুত বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা বলার অর্থ এই নহে যে, আইন করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘকে নিষ্ক্রিয় বা উচ্ছেদ করিতে হইবে। কিন্তু যদি শ্রমিক সঙ্ঘ উন্নয়নের লক্ষ্য উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র সঙ্ঘের সদস্যদের দাবিদাওয়া আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে শিল্পের এবং শ্রমিকদেরও দীর্ঘকালীন স্বার্থ উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ দায়িত্বশীল শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া না উঠিলে শিল্পের দ্রুত বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, অনুন্নত দেশসমূহে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দ্রুত উন্নয়নের পথে সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য উন্নতিকামী দেশগুলিতে মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের কর্তব্য হইল, দ্রুত

উন্নয়নের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া উভয় পক্ষের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সামঞ্জস্য আনয়ন করা এবং উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকা। এই কাজটি অত্যন্ত দুরূহ, অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উভয় পক্ষকেই অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া এই কাজটি সম্পাদন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত সমাজগুলি উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে এইরূপ কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই।

(৫) অনুন্নত সমাজগুলির উন্নয়ন প্রয়াসে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হইল জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। গত তিন চার দশকে জনস্বাস্থ্য (public health) সম্পর্কিত বিষয়ে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার ফলে মৃত্যুহার অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। অথচ জন্মহার বিশেষ হ্রাস পায় নাই। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি, জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি। উপরন্তু, ভূমি অনুপাতে জনসংখ্যার ঘনত্ব (density of population) সমস্যাকে আরও জটিল করিয়াছে। জাপান ব্যতীত অন্যান্য সব অধুনা শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পর্বে জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের দেশগুলিতে ইহা উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে নানা দিক দিয়া ব্যাহত করিতেছে।[1]

(৬) অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-সব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়াসী হয় তাহাদের দুইটি বিষয়ে সুবিধা ছিল। প্রথম সুবিধা বাজার সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় সুবিধা বৈদেশিক ঋণ সম্পর্কে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ব্যতিক্রম নহে) অনুন্নত দেশ হইতে সস্তা দরে কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া পরে আবার এইসব দেশেই চড়া দরে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়াছে। অর্থাৎ পরিপূরক অর্থনীতির (complementary economy) যাবতীয় সুযোগ পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভোগ করিয়াছে। ইহার ফলে খুব দ্রুত হারে এইসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে। অপর পক্ষে, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে-সব দেশ উন্নয়নমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহারা এই জাতীয় সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত। ফলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। এই বিষয়টির একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অনুন্নত দেশগুলিকে অনেক যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

1 "......population growth is not a stimulant to development,...but a depressant. Because of the lack of industrial capital the growing labor force can not find jobs in the city and therefore adds itself to the already congested rural areas. Rapid population growth in such 'labor surplus' economies may mean that despite the attempts to increase industrial employment, the absorption rate is insufficient, and that open and disguised unemployment increases as a percentage of the labor forcc—the reverse of successful development." R. T. Gill. Economic Development: Past aud Present. Second Edition. Page 88.

ইহার জন্য বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন। বিদেশে, বিশেষ করিয়া উন্নত দেশসমূহে, রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব নহে। অথচ বর্তমান যুগে উন্নত দেশে উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করা দস্তুরমত দুঃসাধ্য ব্যাপার।

উন্নত দেশগুলি উন্নয়ন-পর্বের প্রথম যুগে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ হিসাবে পাইয়াছিল, বর্তমান কালে অনুন্নত দেশগুলি তুলনায় অনেক কম বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ বা সাহায্য হিসাবে পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক গিল্-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ ".........the modern underdeveloped countries face a rather different and generally less favorable international environment than did the developing countries of the nineteenth century.........In the nineteenth century, British foreign investment flowed freely and massively to the then developing areas of the world. By contrast, in the twentieth century, the flow of private capital from rich to poor countries has been a mere trickle in relation to their needs. In the case of the United States, much of our private foreign investment goes to economically advanced countries (e. g., Canada and Western Europe), and a large fraction of the rest is devoted to extractive products, like oil, where the impact on the over-all development of the poor country may be relatively limited."[1] অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণ ব্রিটিশ মূলধন অবাধে তদানীন্তন উন্নতিকামী দেশগুলিতে নিয়োজিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে, বিংশ শতাব্দীতে উন্নতিকামী দেশগুলি তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য বে-সরকারী বৈদেশিক মূলধন পাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশে নিয়োজিত বে-সরকারী মূলধনের বেশির ভাগ উন্নত দেশগুলিতে (যেমন, ক্যানাডা ও পশ্চিম য়ুরোপ) বিনিয়োগ হইতেছে এবং বাকি মূলধনের অধিকাংশ তৈল জাতীয় সম্পদের নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হইতেছে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত বিনিয়োগের স্থলে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির অবস্থা দেখিলে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

অধ্যাপক গিল্-এর মতে, বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে অনুন্নত দেশগুলির অনুসৃত নীতি বে-সরকারী মূলধনের অবাধ আমদানীর পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অতীতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের শোষণ ও উৎপীড়নের তিক্ত অভিজ্ঞতা অনুন্নত দেশগুলিকে বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সন্দিহান করিয়া

---

1 তদেব পৃষ্ঠা ৮৮

তুলিয়াছে। এমন কি, বর্তমানে উন্নত দেশগুলির মনোভাব ও অনুসৃত নীতি এইরূপ সন্দেহকে আরও বদ্ধমূল করিতে সাহায্য করিয়াছে।

(৭) অনেক অর্থনীতিবিদ অনুন্নত সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা হিসাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। মির্ডাল (Gunnar Myrdal) অনুন্নত সমাজের সরকারকে soft government বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের তাৎপর্য এই যে, অনুন্নত সমাজে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। সেইজন্য অর্থনৈতিক নীতি বা কর্মপ্রস্থা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিকূল কার্যকলাপ ও ব্যবসায়ে অসাধু আচরণকে সংযত করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য, এইরূপ ব্যর্থতা ও দুর্বলতা উন্নয়নমূলক প্রয়াসের বিরোধী।

(৮) অনুন্নত সমাজে উন্নয়ন প্রচেষ্টার কার্যকারিতা মূলধন-বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার উপর নির্ভরশীল। অথচ এই বিষয়ে নানা অসুবিধা আছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার পথে প্রথম ধাপ হইল মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করা। দুইটি উপায়ে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করা যায়। একটি আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি করা। অপরটি, বিদেশ হইতে ঋণ বা দান হিসাবে মূলধন আমদানী করা। উভয় পন্থা অবলম্বন করাই সমস্যাসঙ্কুল। অনুন্নত সমাজে জাতীয় আয় সীমিত থাকায় ব্যয় সঙ্কুচিত করিয়া সঞ্চয় করিতে হয়। অথচ ব্যয়-সঙ্কোচনের সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। কর্মীরা যদি পর্যাপ্ত খাইতে না পায়, তাহাদের কর্ম-দক্ষতা হ্রাস পাইবে এবং তাহারা প্রয়োজনানুযায়ী পরিশ্রম করিতে উৎসাহ বোধ করিবে না। সুতরাং সীমিত আয়ের পটভূমিকায় ব্যয়-সঙ্কোচন করার ফলে কেবল যে কর্মীদের আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি পাইবে তাহাই নহে, উৎপাদনও ব্যাহত হইবে। এই পরিস্থিতিতে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে হইবে।[1] কাজেই আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি করার সুযোগ ও সম্ভাবনা খুবই সীমিত। এই অবস্থায় বিদেশ হইতে মূলধন আমদানী করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। গ্রহীতা দেশের পক্ষে অতিরিক্ত বিদেশী মূলধনের আমদানী মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে নানা প্রকার রাজনীতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ, যে-সব দেশ মূলধন সরবরাহ করে, সেইসব দেশ গ্রহীতা দেশের উপর রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। এইরূপ উদাহরণ বিরল নহে। তাহা ছাড়া, অভিজ্ঞতায় আরও দেখা যায়, খুব সতর্কতার সঙ্গে বিদেশী মূলধন ব্যবহৃত না হইলে গ্রহীতা দেশের ধন-বণ্টনে অসমতা দেখা দেয়। আরেকটা বিষয়ও বিবেচনা করা দরকার। আভ্যন্তরীণ মূলধন যথাসম্ভব সংগ্রহ করার পরই কেবল ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে মূলধন আমদানী করার প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহার পূর্বে নহে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিদেশী

1 "···if the lid is put on too tight—that is, if consumption is always kept to the bare minimum—then much of the steam may go out of the growth process in general, or, at least, it may have to be supplied by force and coercion." তদেব পৃষ্ঠা ৯২

মূলধনের যোগানবৃদ্ধি পাইলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়াভিযানে ভাটা পড়ে। পর-নির্ভরশীলতা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যেমন কাম্য নহে, সমাজের পক্ষেও নহে।

(৯) অনুন্নত সমাজের প্রয়োজন বিবিধ এবং অসংখ্য। সুতরাং বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শের দিক হইতে উপযুক্ত নীতি হইল, বর্তমানের দাবি যথাসম্ভব পূরণ করিয়া ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পাকাপোক্ত করা। এই নীতি কার্যকর করিতে গিয়া নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। যেমন, বর্তমানের কি কি দাবি পূরণ করা হইবে ইহা নির্ণয় করা কঠিন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারকে জনসাধারণের ভোটের উপর নির্ভর করিতে হয়। সেইজন্য সরকারের পক্ষে বিচিত্র দাবির মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া চলা ছাড়া উপায় থাকে না। ইহার ফলে ভোগ্য সামগ্রীর সঙ্গে নানা প্রকার বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন হইতে দেখা যায়। অনুন্নত সমাজগুলিতে পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে মর্যাদাসূচক সামগ্রীর উৎপাদনও অকিঞ্চিৎকর নহে। ইহা স্পষ্টতঃ অবাঞ্ছিত। অধ্যাপক গলব্রেথ এই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন: "………what kind of consumption should be planned? Should it take the consumption of the more highly developed countries as a model? Should it be guided by whatever market demand exists, which in most of the underdeveloped countries will reflect a considerable inequality of incomes with the result that production will be heavily influenced by the wants of the well-to-do minority? Or should production be tailored above all to serving as cheaply as possible the recognisable needs and desires of the average low-income consumer?[1] তাঁহার মতে, সুচিন্তিতভাবে এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করা প্রয়োজন। নচেৎ অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী অগ্রাধিকার পাইবে এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন স্বভাবতই কিছুটা উপেক্ষিত হইবে।[2] অনুরূপভাবে, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক

---

1 Economic Development in Perspective: Pages 33-34.

2 "If these questions are not faced deliberately they may be answered without thought. In particular there is danger that the consumption patterns of the more developed countries will be followed as a matter of course. Prestige—the wish to show off television, multi-lane highways —may play a part. The theory of consumption must be more democratic than this. Prime attention must be accorded to goods that are within the range of the modal income—that can be purchased by the typical family......Cheap bicycles in a low-income country are thus more important than cheap automobiles......Inexpensive radio sets are important; television belongs to another day". Galbraith. তদেব পৃষ্ঠা ৩৪

কাঠামোকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিনিয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ (of strategic importance) বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা নির্ণয় করার ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দেয়। অনুন্নত সমাজে সীমিত সম্বলের সাহায্যে দ্রুত উন্নয়ন আনয়ন করার আগ্রহাতিশয্যে একই সঙ্গে বিভিন্ন খাতে অর্থ বিনিয়োগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দপ্তর বা অঞ্চলের দাবির সঙ্গে আপস করার প্রচেষ্টাও এইরূপ প্রবণতাকে শক্তি জোগায়। ইহার ফলে, যে-সব বিনিয়োগ ভবিষ্যতের অগ্রগতিকে নিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত করিবে, সেই বিনিয়োগগুলি যথাযোগ্য গুরুত্ব না-ও পাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে মির্ডালের (Myrdal) বৃত্তাকার ক্রমপুঞ্জিত দ্রুতিশীল প্রবাহের (circular cumulative accelerating process) উল্লেখ করা যায়। যে-সব বিনিয়োগের বৃত্তাকার প্রবাহ দ্রুতগতিতে ক্রমপুঞ্জিত হইবার সম্ভাবনা বেশি, সেই বিনিয়োগগুলির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কারণ, তাহা হইলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ অধিকতর প্রশস্ত হইবে।[1]

উপরে অনুন্নত সমাজের কয়েকটি উন্নয়ন সমস্যার উল্লেখ করা হইল। এই সমস্যাগুলিই সব নহে। অনুরূপ সমস্যা আরও অনেক আছে। এই সমস্যাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, অনুন্নত সমাজকে সুচিন্তিত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। যুক্তি, অধ্যবসায়, সততা ও ধৈর্য এই দুরূহ পথের প্রধান পাথেয়।

---

1 মির্ডালের মতবাদের জন্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

1। Edited by L. W. Shannon : Underdevloped Areas. Harper and Row, New York. 1957. Chapters I, III, V, VI, VII & IX

1। Richard T. Gill : Economic Development : Past and Present Second Edition. Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.

3। J. K. Galbraith : Economic Development in Perspective. United States Information Service. New Delhi.

4। W. W. Rostow : Economic Development : Some Lessons of a Common Experience. United States Information Service, New Delhi

5। Indian Five Year Plans :

6। E. E. Hagen : On The Theory of Social Change : How Economic Growth Begins. Vakils, Feffer and Simons Pvt. Ltd. Bombay. 1962. Chapters I-IX.

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

অনগ্রসর সমাজ ও আধুনিকীকরণের সমস্যা

অনগ্রসর সমাজের বৈশিষ্ট্য

আজকাল সমাজতত্ত্বে অনগ্রসর ((backward) এবং অগ্রসর (advanced or modern) সমাজের মধ্যে পার্থক্য করিতে দেখা যায়। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। অগ্রসর বা অনগ্রসর সমাজ বলিতে অর্থনৈতিক দিক ছাড়া সমাজ-জীবনের অপরাপর দিকও বিবেচিত হয়। তবে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। কোন বিশেষ অংশ বা দিককে অপরাপর অংশ বা দিক হইতে বিচ্ছিন্ন কবা সম্ভব নহে। সুতরাং অনগ্রসরতা সমাজ-জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। তবুও অনগ্রসর সমাজের কয়েকটি লক্ষণ (পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার উল্লেখ করা হইয়াছে) পৃথকভাবে আলোচনা করিলে এইরূপ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হইবে।

(১) চিরাচরিত রীতিনীতি অনগ্রসর সমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত করে। অতীতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এইরূপ সমাজের বৈশিষ্ট্য। বর্তমান কালের সব রকম সমস্যার সমাধান চিরাচরিত পন্থায় সম্ভব, এই ধারণা সমাজের সর্ব স্তরে বিরাজ করে। অতএব স্বভাবতই নূতন কিছু করার (innovation) প্রবণতা হ্রাস পায় এবং নূতনভাবে উদ্ভাবিত পন্থাসমূহ উপেক্ষিত হয়। যেমন, রোগের চিকিৎসায় বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতির উপর নির্ভর না করিয়া তুকতাক এবং চিরাচরিত আচার-বিচারের উপর এইরূপ সমাজের অধিবাসীদের নির্ভর করিতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে, অতীতের প্রতি আকর্ষণ অধিকাংশ লোককে বর্তমান কালের প্রয়োজনের প্রতি নির্লিপ্ত করিয়া রাখে। ভারতীয় জীবন-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ মনোভাবের বহু নিদর্শন পাওয়া যাইবে। অপর পক্ষে, অগ্রসর সমাজে চিরাচরিত রীতিনীতির তুলনায় আনুষ্ঠানিক আইনকানুন সামাজিক নিয়ামক হিসাবে অধিকতর কার্যকর। উপরন্তু, আচারের অন্ধ অনুসরণ করার পরিবর্তে বিচারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(২) অনগ্রসর সমাজে নৈর্ব্যক্তিক পরোক্ষ পরিচয়ভিত্তিক সম্পর্কের (secondary relationships) তুলনায় প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সম্পর্কের (primary relationships) প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পরিবার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, স্বজাতি (caste group), ক্ষুদ্রায়তন পল্লী-সমাজ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক জন-সমষ্টির প্রতি এইরূপ সমাজের লোকদের অনুগত থাকিতে দেখা যায়। ইহার কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন, অনগ্রসর সমাজকে পরিবর্তনের প্রভাব হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়। আবার

অর্থনৈতিক দিক হইতে অনুন্নত থাকায় এইরূপ সমাজে যানবাহনের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে না। এইজন্য ভৌগোলিক সচলতা স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং বৈবাহিক সম্বন্ধ, সামাজিক মিলামিশা সব কিছুই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

(৩) অনগ্রসর সমাজ প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান। এইরূপ সমাজের অধিবাসীদের প্রয়োজন সীমিত ও বৈচিত্র্যহীন। অধিকাংশ প্রয়োজন নিজেদের সম্মিলিত প্রয়াসে চরিতার্থ করা সম্ভব। এই কারণে অনগ্রসর সমাজে সমিতি-ভিত্তিক (associational) জীবনের তুলনায় সম্প্রদায়-ভিত্তিক (communal) জীবনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অগ্রসর সমাজে প্রয়োজন এবং সম্বল উভয়ই বেশি থাকায় নানা প্রকার সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করা হয়। সম্বলের প্রাচুর্য এই বিষয়ে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে, অনগ্রসর সমাজে সম্বলের জোগান সীমাবদ্ধ থাকায় ইচ্ছা বা প্রয়োজন থাকিলেও বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং পরিপোষণ করা সম্ভব নহে।

(৪) অনগ্রসর সমাজে কেবল যে ভৌগোলিক সচলতা সীমিত থাকে তাহাই নহে, সামাজিক সচলতাও বিশেষভাবে সীমিত। পূর্ব হইতে যাহারা সমাজের শীর্ষ স্থানীয় (elite) বলিয়া পরিচিত, তাহারাই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করে এবং প্রতিপত্তি খাটাইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় উচ্চ বর্ণের লোকদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধিপত্য করিতে দেখা যায়। অন্যান্য অনগ্রসর সমাজে ভূ-স্বামীগণ অথবা সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ মর্যাদার স্থান অধিকার করেন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, এইরূপ সমাজে যাহারা নিম্নস্তরে অবস্থান করেন, তাহাদের পক্ষে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাহা ছাড়া, বৃত্তিতে বৈচিত্র্য না থাকায় মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর (status groups) উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, অগ্রসর সমাজে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ হওয়ায় সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ব্যক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায়। উপরন্তু, নূতন নূতন বৃত্তি গড়িয়া উঠে, এবং বিভিন্ন বৃত্তি নানা প্রকার মর্যাদার সূচক বলিয়া পরিগণিত হয়।

(৫) উপরোক্ত কারণে অনগ্রসর সমাজে সামাজিক পরিচিতি (social status) প্রধানতঃ জন্ম দ্বারা নির্ণীত হয়। অর্থাৎ যে যে-বংশে বা যে-জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহার মর্যাদা এবং সামাজিক পরিচিতি তদনুযায়ী নির্ধারিত হয়। পক্ষান্তরে, অগ্রসর সমাজে সামাজিক পরিচিতি অর্জন করিতে হয়। বিদ্যা অর্জন করিয়া অথবা বিভিন্ন রকম কলাকৌশল আয়ত্ত করিয়া জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পরিচিতির তুলনায় উচ্চতর সামাজিক পরিচিতি লাভ করা সম্ভব। আবার যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারিলে সামাজিক মর্যাদায় অধোগতি হওয়াও বিচিত্র নহে।

(৬) রাজনীতিক ক্ষেত্রেও অগ্রসর এবং অনগ্রসর সমাজের মধ্যে পার্থক্য

পরিলক্ষিত হয়। অনগ্রসর সমাজে আমজনতার রাজনীতিক ভূমিকা নগণ্য। সমাজের শীর্ষ স্থানীয় লোকদের (elite) মধ্যেই রাজনীতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় জনসাধারণের ভূমিকা স্বভাবতই নিষ্ক্রিয় এবং গৌণ। অপর পক্ষে, অনগ্রসরতা কাটাইয়া সমাজ যত বেশি অগ্রসর হইতে থাকে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের ভূমিকাও তদনুযায়ী ক্রমশঃ গুরুত্ব লাভ করে। চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘ ও রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং জনমত ও গণ-আন্দোলন যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাইয়া থাকে।

(৭) অনগ্রসর সমাজের অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলি স্বভাবতই শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। মোটামুটি নিশ্চল অর্থনীতি (stagnant economy), বৃত্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অভাব, অতীতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য—এই সব কয়টি বৈশিষ্ট্য শিক্ষা-ব্যবস্থার গঠন ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। সাধারণ শিক্ষা অধিকতর গুরুত্ব পায় এবং প্রয়োজন না থাকায় বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা (specialisation) অর্জন করার সুযোগ-সুবিধা স্বভাবতই কম থাকে। কৃষি-ভিত্তিক সমাজে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। এই কারণে উচ্চতর শিক্ষা ত দূরের কথা, প্রাথমিক শিক্ষাও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অতএব নিরক্ষরতার ব্যাপক হার অনগ্রসর সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে, অগ্রসর সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষায় নানা প্রকার বৈচিত্র্য প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অক্ষর-পরিচয় থাকিলে কলকারখানায় নিয়োগ-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কাজেই একদিকে সাধারণ লোকের মধ্যে সাক্ষর হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং অপর দিকে প্রয়োজনের স্বার্থে সাক্ষর হইবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। তাহা ছাড়া, অগ্রসর সমাজে মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর (status groups) উদ্ভব হওয়ায় শিক্ষার মান মর্যাদার সূচক বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং শিক্ষার সম্প্রসারণ ও বিশেষীকরণ অগ্রসর সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৮) অনগ্রসর সমাজে নগর ও নগরবাসীর সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে এবং তাহাদের জীবিকা মূলতঃ কৃষি-নির্ভর। তাহাদের জীবন-দর্শন, জীবন-প্রণালী সব কিছুই গ্রাম-সমাজের সার্বিক পরিবেশ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। অগ্রসর সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে গ্রাম-সমাজ প্রায় অবলুপ্তির পথে এবং নগরের সংখ্যা ও প্রভাব উভয়ই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অগ্রসর সমাজে যে-সব অঞ্চল গ্রাম বলিয়া পরিচিত, সেখানেও জীবন-প্রণালী ও ভাব-ধারা শহুরে প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। কোন কোন মহলে নগর-সমাজ ও অগ্রসর-সমাজ প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কারণ, অগ্রসর সমাজের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যগুলি নগর-সমাজে প্রতিফলিত হয়।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হ্যাগেন (E. E. Hagen) কর্তৃক প্রদত্ত সাবেকী সমাজের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হইল: "A society is traditional if

behaviour is governed by custom and if ways of behaviour continue with little change from generation to generation. In a traditional society the social classes form a pyramid, from the peasants and laborers at the bottom to the small group of powerful individuals at the top. The individual's position in the society is normally inherited rather than achieved, except that a group sometimes gains political control of the country by force. Economic productivity is low." (On The Theory of Social Change. Page 21).

আধুনিকীকরণের সংজ্ঞা

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনের মাধ্যমেই অনগ্রসর সমাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর সমাজে রূপান্তরিত হইতে পারে। এইরূপ রূপান্তরই আধুনিকীকরণ বলিয়া পরিচিত। বর্তমানে প্রায় সব অনগ্রসর সমাজেই আধুনিকীকরণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

ডেনিয়েল লার্নার (Daniel Lerner) আধুনিকীকরণের অঙ্গ (component) বা নির্দেশক (indices) হিসাবে নিম্নোক্ত চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করেন।1 যথা, নগরায়ন (urbanisation), নিরক্ষরতা দূরীকরণ (literacy), বহুল প্রচার মাধ্যমের প্রবর্তন (media participation) এবং রাজনীতিতে সর্বসাধারণের অংশ গ্রহণ (political participation)। আধুনিকতার লক্ষণসমূহ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন: "According to this typology, the modern person is an urbane literate who participates fully in the public forum, market place, political arena".2 অর্থাৎ যে শিক্ষিত নগরবাসী অর্থনৈতিক রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে, তাহাকে আধুনিক বলিয়া বিশেষিত করা যায়।

কিন্তু লার্নার আধুনিকীকরণের যে-সব নির্দেশকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, আধুনিকীকরণের উপরোক্ত অপরাপর বৈশিষ্ট্য শিল্পায়নের ফলেই উদ্ভূত হয়। যেমন, শিল্পায়ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নগরায়নের উৎপত্তি ও প্রকৃতি

---

1 An article by Daniel Lerner entitled The Transformation of Institutions, included in the book, The Transfer of Institutions, edited by William B. Hamilton. Published for the Duke University Commonwealth Studies Center, Duke University Press, Durham, N. C., Cambridge University Press. London. 1964. Pages 19-22

2 তদেব পৃষ্ঠা ১৯

ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে, শিক্ষার বিশেষীকরণ বা বহুল প্রচার মাধ্যমের সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা করিতে হইলেও শিল্পায়নের উল্লেখ করিতে হয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করিলেও আধুনিকীকরণে শিল্পায়নের ভূমিকা বুঝিতে পারা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম য়ুরোপে ও উত্তর আমেরিকায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের অগ্রগতির ফলেই আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি ধীবে ধীরে প্রকাশ পায়। এইসব অঞ্চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া যদি শিল্পায়নের সূচনা না হইত, তাহা হইলে আধুনিকীকরণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইত না, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান কালেও যে-সব অঞ্চলে আধুনিকীকরণের লক্ষণগুলি দেখা দেয়, সেই অঞ্চলসমূহে এইরূপ পবিবর্তনেব জন্য শিল্পায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রবর্তন প্রধানতঃ দায়ী।

অনগ্রসর সমাজে আধুনিকীকরণের সমস্যা

অনগ্রসর সমাজে আধুনিকীকরণ নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রধানতঃ দুইটি কারণে এইসব সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ, অগ্রসর সমাজগুলিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া আধুনিকীকরণের লক্ষণসমূহ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। যেমন, পশ্চিম য়ুরোপে বা উত্তব আমেরিকায় আধুনিকীকরণের সূচনা হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং ইহা পূর্ণতা লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। সুতরাং এইসব সমাজে পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যাপকভাবে বিশৃঙ্খলা বা সংহতিনাশক (disruptive) কিছু ঘটিবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু অনগ্রসর সমাজগুলিতে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে (কয়েক শতকের পরিবর্তে কযেক দশক মাত্র) আধুনিকীকরণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় অসঙ্গতিসঞ্জাত নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এত ব্যাপক আকারে দেখা দেয় যে, সামাজিক সংহতি বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হয়। দ্বিতীয়তঃ, জাপান ছাড়া অন্যান্য অগ্রসর সমাজে প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে আধুনিকীকরণের সূচনা এবং প্রসার ঘটে, এই ক্ষেত্রে বাহ্যিক ঘটনা অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা গ্রহণ করে।[1] সুতরাং এইসব সমাজে আধুনিকীকরণের অনুকূল বাতাবরণ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমাজস্থ লোকের দৃষ্টিভঙ্গি,

---

1 "It was in these European countries (Western Europe, England, The Netherlands, the Scandinavian countries, the United States, and in the English-speaking Dominions) that the first historical processes of modernisation developed, mostly through the transformation and working of various internal forces in these societies, and only to a small extent through the impact of external events." S. N. Eisenstadt : Modernisation—Protest and Change.

মানসিকতা এবং অভ্যাস দীর্ঘ সময় ধরিয়া আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হইবার অবকাশ পায়। কিন্তু অগ্রসর পাশ্চাত্য সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে অনগ্রসর সমাজসমূহে আধুনিকীকরণের সূচনা হয়। অর্থাৎ বাহ্যিক প্রভাব মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হইবার পূর্বেই অগ্রসর সমাজের অনুসরণে আধুনিক আচার-ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তিত হয় অথবা প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে অনগ্রসর সমাজগুলিতে স্বভাবতই নানা প্রকার অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং এইরূপ অসঙ্গতি হইতে অনেক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে উপরে উল্লিখিত সমস্যাগুলির প্রকৃতি ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

সর্বাগ্রে অনগ্রসর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিরক্ষরতা-দূরীকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নীতিগতভাবে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ প্রত্যেক সমাজের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে এইরূপ প্রচেষ্টা সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে। অনেক অনগ্রসর সমাজেই (ভারতবর্ষও ইহার ব্যতিক্রম নহে) শিক্ষা মর্যাদার সূচক। এইসব সমাজে কায়িক পরিশ্রম করা হীন কাজ বলিয়া গণ্য হয় এবং স্বভাবতই বাবু-কাজের (white-collar jobs) প্রতি অধিকাংশ লোকের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতিতে অক্ষর-পরিচয় কায়িক পরিশ্রম করার প্রতি অনীহা জন্মাইতে পারে। ইহা নানা দিক দিয়া অবাঞ্ছনীয়। যেমন, কোন কৃষকের ছেলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর যদি তাহার পিতৃপুরুষের বৃত্তি অনুসরণ করিতে নারাজ হয়, তাহা হইলে সে কেবল যে তাহার পিতৃপুরুষের বৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহা নহে, তাহার আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উপরন্তু, সে এমন কোন বিদ্যা অর্জন করে না যাহার সাহায্যে সে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে বাবু-কাজ পাইতে পারে। এই অবস্থায় সে চরম ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় এবং এই ব্যর্থতা তাহার মনে অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং সমাজ-বিরোধী প্রবণতা গড়িয়া তুলিতে পারে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষা এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থীগণ অক্ষর-পরিচয় ছাড়াও তাহাদের পারিবারিক বৃত্তি বিষয়ে উন্নততর পদ্ধতি বা প্রণালী অনুসরণ করিবার শিক্ষা ও উৎসাহ পাইতে পারে। কোন কোন মহলে এই ধরনের শিক্ষাকে functional literacy বলা হয়। যে-শিক্ষায় শিক্ষিত করিলে শিক্ষার্থীর এবং সমাজের সমস্যা সৃষ্টি করা হয়, সেই শিক্ষা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য—এই সহজ, সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বার্ণার্ড শ'-এর (Bernard Shaw) সাবধান-বাণী প্রণিধানযোগ্য: "How can you dare to teach a man how to read before you have taught him everything else ?"

এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সমাজের অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পশ্চিম য়ুরোপে যদিও সপ্তদশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা-সম্প্রসারণের দাবি উঠে মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই দাবি আইনতঃ স্বীকৃত হয়। এইসব সমাজে শিল্প-

সংস্থায় শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন যখন এবং যেমন অনুভূত হয়, তদনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হয়। প্রথম পর্বে যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়া চাকুরিতে উন্নতি করিতে আগ্রহী ছিল, তাহারাই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিত। পরবর্তীকালে, এবং কেবলমাত্র উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষা সংস্কৃতিবান্ (cultured) ব্যক্তির সূচক হিসাবে স্বীকৃতি পায়।1

একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, আমাদের দেশে চাকুরি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত না হইয়া বহু ক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি করার সূচক হিসাবে উচ্চতর শিক্ষার অনুশীলন করা হয়। এইপ্রকার শিক্ষার ফলে কায়িক পরিশ্রম করার প্রতি আগ্রহ হ্রাস পায় এবং বাবু-কাজের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। অথচ কোন সমাজই কায়িক পরিশ্রম বাদ দিয়া কেবল বাবু-কাজের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারে না। কাজেই বাবু-কাজের সুযোগ সীমিত। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও তেমনই ব্যর্থতা, অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং শেষ পর্যন্ত সমাজ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। অতএব প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার বিষয়বস্তু, পঠন-পাঠন পদ্ধতি ইত্যাদি সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীলঙ্কার শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া স্যার আইভর জেনিংস্ (Sir Ivor Jennings) ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাশে শিক্ষক ও ছাত্রের প্রশ্নোত্তরের একটি নমুনা উল্লেখ করেন :2

"Teacher : 'O daffodil we weep to see you fade away so soon.'

Pupil : What is a daffodil?

Teacher : Just an English flower, but the examiners will not ask questions on that. Take this note : The imagery in this poem........."

---

1 "Whereas urbanisation was well under way by the seventeenth century, the drive toward free and compulsory public education did not get properly started until the eighteenth nor complete its victory until the nineteenth century. Here, again, the growth of free public education was functionally related to industrial society, with its ever-growing need for literates to perform the skilled and semi-skilled functions of industrial production, distribution, and even consumption. In the modern West, literacy developed initially as a skill with a ready pay-off to the ambitious individual who acquired it. Only later, and at a much higher level, did it become a personal and cultural adornment". Daniel Lerner : The Transformation of Institutions. Pages 16-17

2 An article on Universities in the Colonics by Sir W. Ivor Jennings. Published in The Political Quarterly, Vol. 17, No. 3, 1946. Pages 228-244

এই কথোপকথনটি কি আমাদের দেশেও সমভাবে প্রযোজ্য নহে? আধুনিকতার নামে আমরা পাশ্চাত্য জগত হইতে তাহাদের যাহা প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী, তাহাই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্য শিক্ষার্থীর সহিত শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ হয় না এবং দেশের ও দশের মঙ্গলার্থে এই শিক্ষা নিয়োজিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "নিজের চারিদিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।" তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, "আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।"1 আসল কথা হইল, যে-শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল করেনা, সেই শিক্ষা আধুনিকতার মুখোশ পরিলেও প্রকৃত পক্ষে অসার এবং চিন্তাশক্তির জড়ত্ব ঘটায়।

আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল আমজনতার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বভাবতই জনসাধারণের সমর্থন লাভ করার প্রত্যাশায় তাহাদের নানা অভাব-অভিযোগ দাবি হিসাবে সরকারের নিকট উপস্থিত করে এবং দাবির অনুকূলে প্রচার-কার্য ও আন্দোলনের সাহায্যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এইরূপ কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত এবং যুক্তিযুক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় তখনই, যখন বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করা হয়। অনেক সময় চাপে পড়িয়া সরকারকে এমন অনেক দাবি মানিতে হয় যাহা সমাজের দীর্ঘকালীন স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার পাইতে পারে না। যেখানে অভাবের সীমা-সংখ্যা নাই, বিশেষ করিয়া যেখানে অতি প্রয়োজনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব রহিয়াছে, এবং যেখানে সম্বল খুবই সীমিত, সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে (according to priority) অগ্রসর না হইলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হইবার আশঙ্কা থাকে। ভারতবর্ষে অনিয়ন্ত্রিত এবং অপরিকল্পিত (unplanned) শিক্ষা-সম্প্রসারণের মূল কারণ শিক্ষা-সম্প্রসারণের দাবি। এইরূপ দাবির স্বীকৃতি বহু ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অনুরূপভাবে, অনেক অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া এবং ইহাদের স্বীকৃতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করার উপায় নাই। অধ্যাপক গলব্রেথ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত ভোগ তত্ত্বের (Democratic Theory of Consumption) উল্লেখ করেন।2

1 রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি ও সমূহ শীর্ষক রচনা।

2 ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই স্বার্থবাহী সঙ্ঘসমূহের (pressure groups) চাপে এই তত্ত্ব অনুযায়ী উৎপাদন পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। ইহা অনস্বীকার্য যে, অগ্রসর সমাজের ন্যায় অনগ্রসর সমাজেও আমজনতার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ নানা দিক দিয়া কাম্য ও সুফলপ্রদ। কিন্তু অনগ্রসর সমাজে রাজনৈতিক দলসমূহ যদি অবিবেচক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়, তাহা হইলে আধুনিকতার এই উপকরণটি সংহতিনাশক (disruptive) এবং ক্ষতিকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।1

অনুরূপভাবে, বহুলপ্রচার মাধ্যমের নেতিবাচক (dysfunctional) দিক সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। দৈনিক সংবাদপত্র, সিনেমা-সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও একদিকে যেমন নানা প্রকার তথ্য সরবরাহ এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করে, অপর দিকে সাধারণ লোকের প্রত্যাশাকে বহু গুণ বৃদ্ধি করে। ইহা সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে। শহুরে আদব-কায়দা, রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বহুলপ্রচার মাধ্যমগুলির দৌলতে গ্রামবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। স্বভাবতই তাহাদের মনে, বিশেষ করিয়া তরুণ-তরুণীদের মধ্যে, নগরবাসীর অনুকরণে জীবন-যাপন করার সাধ জন্মায়। অথচ সাধ পূরণ করার সাধ্য না থাকায় অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। নগর-সমাজে আবার পাশ্চাত্য অগ্রসর সমাজগুলির জীবন-প্রণালীর অনুকরণে পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণ অনুসরণ করিতে দেখা যায়। এখানেও সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইতে পারে।

অনগ্রসর সমাজে নগবায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমস্যা দেখা দেয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভারতবর্ষে নগরায়নের প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, শিল্পায়নের ফলশ্রুতি হিসাবে পাশ্চাত্য সমাজে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে যে নগরায়নের সূচনা হয়, তাহার সঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের নগরায়নের কোন তুলনা হয় না। এই প্রকার নগরায়নকে আধুনিকীকরণের সূচক হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা, এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই সম্পর্কে ডেনিয়েল লার্নারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "This is not urbanisation in......the sense the term acquired

1 "Another important aspect of the process of modernization of the broader social groups in most new states is the relative sequence of modernization in different institutional spheres—the relatively quick development of the politial aspirations of the wider social groups and their overall political modernization before a concomitant extent of economic, professional, and often even educational development. The high level of modernization of political demands, in its turn, usually gave rise to a quicker development of educational facilities and aspirations—especially of the more generalized and humanistic ones—which often outstripped the economic facilities." S. N. Eisenstadt: Modernisation—Protest and Change. Pages 117-118

in the modern West. This bears more resemblance to the mass migrations of human hordes driven by famine and pestilence in the centuries preceding the modern epoch. These massive internal migrations bear no visible relation to the transfer of urban-industrial institutions. On the contrary, they operate dysfunctionally upon the industrial development of transitional societies today."1

উপসংহার

উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে অনগ্রসর সমাজে আধুনিকীকরণের কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করা হইল। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কি উপায়ে এই জাতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আবহমান কাল হইতে প্রচলিত একটি উক্তির মধ্যে পাওয়া যাইবে। উক্তিটি হইল, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তাহা না হইলে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। অনগ্রসর সমাজগুলি যে যে-অবস্থায় আছে, তদনুযায়ী তাহাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সমাজে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা করিতে হইবে এবং যথাসম্ভব দ্রুত এই কার্য সম্পাদন করিতে হইবে, ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিলে চলিবে না। আধুনিকীকরণ করিতে গিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা কোন অবস্থাতেই কাম্য হইতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে যেমন কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা, খাদ্য ইত্যাদি গ্রহণ করার একটা সীমা আছে, অনুরূপভাবে সমাজেরও কোন কিছু গ্রহণ করার একটা সীমা আছে। মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণ করিলে ব্যক্তির যেমন অনিষ্ট হয়, ঠিক তেমনি সমাজেরও। আবার মননশক্তি বা শারীরিক শক্তিতে সবল ব্যক্তি যে-পরিমাণ শিক্ষা বা আহার্য গ্রহণ ও আত্মস্থ করিতে পারে, দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সমাজের ক্ষেত্রেও এই উপমাটি প্রযোজ্য। রস্টো (Rostow) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের (stages) উল্লেখ করেন। আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রেও সমাজ কোন্ পর্যায়ে রহিয়াছে তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক পর্যায়ের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, অপর কোন পর্যায়ের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক না-ও হইতে পারে। অনগ্রসর সমাজগুলি এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া যদি অগ্রসর সমাজের অন্ধ অনুকরণে সম্বল এবং শ্রম নিয়োজিত না করে এবং নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহা হইলে আধুনিকীকরণ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অনগ্রসর সমাজগুলিকে আরেকটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। আধুনিকীকরণের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এই ভারসাম্য

1 Daniel Lerner: Article entitled Transformation of Institutions. Page 17.

বিনষ্ট হইলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইতে পারে। যেমন, শিল্পায়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া যদি শিক্ষার সম্প্রসারণ না ঘটে, তাহা হইলে হয় উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের অভাবে শিল্পায়ন বাধাপ্রাপ্ত হইবে, নতুবা উদ্বৃত্ত শিক্ষিত লোকের বেকারি এবং তজ্জনিত সামাজিক অসন্তোষ ও অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে। অনুরূপভাবে, প্রত্যাশা চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা রোধ করিবার জন্য যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। বর্তমান কালে অনগ্রসর সমাজগুলিতে যে অশান্তি ও বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূল কারণ এইসব সমাজে সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে অসঙ্গতি। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ বলেন যে, অনগ্রসর সমাজগুলিতে লোকের প্রত্যাশায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন (a revolution in expectations of people) ঘটিয়াছে। ইহার সত্যতা অনস্বীকার্য। বহুল প্রচার মাধ্যমগুলির দৌলতে, রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মতৎপরতার ফলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে সরকারের অপ্রয়োজনীয় অথচ মর্যাদা-ব্যঞ্জক ব্যয়-বাহুল্যের জন্য লোকের প্রত্যাশা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই প্রত্যাশা চরিতার্থ করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় ব্যর্থতা সমাজের সর্ব স্তরে অশান্তির আগুণ প্রজ্জ্বলিত করে। অতএব আধুনিকীকরণের বিভিন্ন উপকরণের যথাসম্ভব সুসমঞ্জস উন্নয়ন এবং প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। নচেৎ আধুনিকীকরণ Pandora's box-এর সমস্যা সৃষ্টি করিবে। দেবরাজ জিউস (Zeus) প্র্যামিথিউসকে (Prometheus) দিব্যাগ্নি চুরি করিবার অপরাধে শাস্তি দিবার জন্য প্যাণ্ডোরার হাতে যে-বাক্স পাঠাইয়াছিলেন, তাহা উন্মুক্ত করার পর কেবলমাত্র রোগ, শোক, দুঃখই বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু যে আশা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাক্স উন্মুক্ত করা হইয়াছিল, সেই আশা চিরতরে বাক্সে বন্দী হইয়া রহিল। অনুরূপভাবে, খুব সতর্কতার সঙ্গে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করা না হইলে আশা পূরণের পরিবর্তে আশাহত হইবার সম্ভাবনাই বেশি।

সামাজিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

উপরের আলোচনা হইতে ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, আধুনিকী-করণে সামাজিক পরিকল্পনার (social planning) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। আধুনিকতার বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব, তাহা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। কোন পরিবর্তন প্রবর্তন করিলে সমাজের অপরাপর ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে ইহা উক্ত পরিবর্তন করার পূর্বে ভাবিয়া না দেখিলে সমূহ বিপত্তির সম্ভাবনা। আধুনিকীকরণের সমস্যা আলোচনা করিবার সময় এই ধরনের কয়েকটি বিপত্তির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

আরেকটি কারণেও সামাজিক পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। আমরা জানি যে, সামাজিক আচার-ব্যবস্থাগুলির দুই প্রকার ক্রিয়া-কলাপ আছে। এক প্রকার

ক্রিয়া-কলাপ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান (manifest functions) এবং আরেক প্রকার আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতীয়মান (latent functions)। যাহা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতীয়মান তাহা আবার অনভিপ্রেত (unintended) হইতে পারে। সুতরাং কোন সামাজিক পরিবর্তন প্রবর্তন করিবার সময় যদি প্রবর্তিত ব্যবস্থার আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতীয়মান দিকটি বিচার-বিশ্লেষণ করা না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। সমুদ্রের তুষারস্তূপের (ice-berg) উপরে ভাসমান সীমিত অংশটি দেখিয়া যদি কোন নাবিক তাহার গতিপথ নির্ধারণ করে তাহা হইলে অদৃশ্য বৃহত্তর অংশের আঘাতে তাহার জাহাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতে পারে। অনুরূপভাবে, কোন পরিবর্তন প্রবর্তন করিবার সময় আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতীয়মান ক্রিয়া-কলাপ বিবেচনা না করিয়া অগ্রসর হইলে অভিপ্রেত যে ফললাভের প্রত্যাশায় পরিবর্তন প্রবর্তন করা হইয়াছিল তাহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে পারে। সুতরাং সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন আনয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে প্রায় সব সমাজেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, অন্নচিন্তা চমৎকারা। অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার কাজ সব সমাজে অগ্রাধিকার পাইয়া থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক ঋদ্ধি অর্জন করার সময় সমাজের অপরাপর অংশে কি প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। নচেৎ সামাজিক জীবন বিশৃঙ্খল হইতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যায়। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া বেকারি দূর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু যেখানে ভোগ্য সামগ্রীর অভাব রহিয়াছে, সেখানে যদি বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে কেবল আশু অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অথচ বিলাস সামগ্রীর বর্ধিত সরবরাহ নানা প্রকার সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে। স্বভাবতই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামাজিক পরিকল্পনা না থাকিলে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং সামাজিক পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিপূরক বলা যায়।

আজকাল ইহা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা আলোচনা করার সময় সামাজিক বিষয়ও বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। ম্যাক্স হ্বেবার হইতে শুরু করিয়া বহু সমাজতত্ত্ববিদ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণও অর্থনৈতিক বিকাশ আলোচনা করিবার সময় সমাজতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচনা করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।

অতএব সমাজতত্ত্ববিদের ভূমিকা কেবলমাত্র সমালোচকের নহে। সামাজিক ঘটনার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া উপযোগী ব্যবস্থাদি সম্পর্কে গঠনমূলক প্রস্তাব উপস্থাপন করাও তাহার কার্যের অন্তর্গত।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। Edited by William B. Hamilton : The Transfer of Institutions. Published for the Duke University Commonwealth Studies Center. Duke University Press, Durham, N.C. Cambridge University Press. London. Two articles in this book are very valuable : (a) The Transformation of Institutions by Daniel Lerner. (b) Advanced and Underdeveloped Countries: A Study in Development Contrasts by Bert F. Hoselitz.

২। S N. Eisenstadt : Modernization—Protest and Change. Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.

৩। T. B. Bottomore Sociology. Unwin University Books. London.

৪। Edited by L. W. Shannon — Underdeveloped Areas. Harper and Row, New York and Evanston. 1957. The following articles in this book are useful : (a) Professional Problems of Education in Dependent Countries by Margaret Mead. (b) Literacy and Social Change in Underdeveloped Countries by Hilda Hertz Golden. (c) Universities in the Colonies by Sir W. Ivor Jennings.

৫। Daniel Lerner — The Passing of Traditional Society. The Free Press, New York. 1958. Important sections in this book are the following : (a) Introduction by David Riesman. (b) Chapter II entitled 'Modernising Styles of Life : A Theory'. (c) Appendix C : 'The Latent Structure Analysis'.

৬। S. C. Dube : Contemporary India and its modernisation. Vikas.

৭। Chandler Morse and others : Modernization by Design : Social Change in the Twentieth Century. Scientific Book Agency. 22, Raja Woodmunt Street, Calcutta 1.

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দাবলী

Accommodation	–	উপযোজন
Action Crowd		উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যোগী জনতা
Adaptation		অভিযোজন
Alienation		বিচ্ছিন্নতা-বোধ
Animism	-	সর্বপ্রাণবাদ
Anomie		নিঃসঙ্গতা-বোধ
Arranged marriage	-	সংযোজিত বিবাহ
Assimilation	–	আত্তীকরণ স্বাঙ্গীকরণ
Association		সমিতি
Attitude	–	মনোভাব , দৃষ্টিভঙ্গি
Audience		শ্রোতৃমণ্ডলী
Backward Society		অনগ্রসর সমাজ
Bureaucracy		আমলাতন্ত্র
Caste System	-	জাতিভেদ প্রথা
Casual Crowd	=	আকস্মিক জনতা
Clan	–	গোষ্ঠী
Closed Class System		নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থা
Collective Property		যৌথ সম্পত্তি
Common Interest	=	অভিন্ন লক্ষ্যবস্তু , অভিন্ন স্বার্থ
Common Interest Crowd	=	সমরূপ বিষয়ে আগ্রহী জনতা
Common Property	-	এজমালী সম্পত্তি
Community	=	সম্প্রদায়
Conformity	=	অনুসরণ
Conjugal family	=	দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার
Crowd	=	জনতা
Culture	=	জীবন-ধারা
Cultural Lag	=	জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের পশ্চাদ্বর্তিতা
Cultural Trait	=	জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণ
Custom	=	প্রথা
Delinquency	=	দুষ্ক্রিয়তা
Demography	=	জনসংখ্যান

Demographer	=	জনসংখ্যাযক
Deviance	=	বিচ্যুতি
Dysfunction	=	নেতিবাচক ক্রিযাকলাপ
Emigration	=	প্রবাসন
Endogamy	=	গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ
Etiquette	=	শিষ্টাচাব
Eugenics	=	সৌজাত্য
Exogamy	=	গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহ
Expressive Crowd	=	ভাবপ্রকাশে উদ্গ্রীব জনতা
Family of Orientation	=	পালযিতৃ পরিবাব
Family of procreation	=	জন্মদাতৃ পবিবাব
Fashion	=	ফ্যাশান
Folk Society	=	লোকাচাব শাসিত সমাজ
Folkways	=	লোকাচাব
Functional Theory	=	কর্মনির্বাহী তত্ত্ব
Genus	=	পবাজাতি
Glandular System	=	গ্রন্থিতন্ত্র
Goal attainment	=	অভীষ্টলাভ
Group	=	সঙ্ঘ
Habituation	=	অভ্যস্তকবণ
Heredity	=	বংশগতি
Heterogamy	=	অসম বিবাহ
Homogamy	=	সম বিবাহ
Horizontal mobility	=	অনুভূমিক সচলতা
Hypergamy	=	অনুলোম বিবাহ
Hypogamy	=	প্রতিলোম বিবাহ
Immigration	=	অভিবাসন
Incest	=	অজাচাব
Individual property	=	ব্যক্তিগত সম্পত্তি
Indoctrination	=	দীক্ষিতকবণ
Industrialisation	=	শিল্পাযন
In-group	=	অন্তঃসামাজিক সঙ্ঘ
Instinct	=	সহজ প্রবৃত্তি
Institution	=	প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা
Integration	=	সঙ্গতিসাধন
Interest	=	লক্ষ্যবস্তু

Joint (or extended) family	=	যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার
Latent function	=	স্পষ্টতঃ অপ্রতীয়মান ক্রিয়াকলাপ
Like interest	=	অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু , অনুরূপ স্বার্থ
Like-interest crowd	=	অনুরূপ বিষয়ে আগ্রহী জনতা
Love (romantic) marriage	=	স্ব-নির্বাচিত বিবাহ
Magic	=	তুকতাক
Manifest function	=	স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান ক্রিয়াকলাপ
Mass Society	=	গণ সমাজ
Matriarchy	=	মাতৃশাসিত পরিবার
Matrilineal family	=	মাতৃপরিচায়ী পরিবার
Matrilocal residcnce	=	পত্নী-আবাসিক
Mechanical integration	=	যান্ত্রিক সংহতি
Membership reference group	=	নামে মাত্র সদস্য নির্দেশক সঙ্ঘ
Migration	=	পরিযাণ
Mob	=	উচ্ছৃঙ্খল জনতা
Modern (or advanced) society	=	আধুনিক বা অগ্রসর সমাজ
Modernisation	=	আধুনিকীকরণ
Monogamy	=	একগামিতা
Mores	=	অবশ্য পালনীয় আচার
Motive	=	উদ্দেশ্য
Motivation	=	প্রেষণা
Naturism	=	প্রকৃতিবাদ
Neolocal residence	=	স্বয়ম্ আবাসিক
Nervous system	=	নার্ভতন্ত্র
Non-membership reference group	=	অ-সদস্য নির্দেশক সঙ্ঘ
Objective	=	বিষয়গত
Open class system	=	সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা
Organic evolution	=	জীব-অভিব্যক্তি
Organic integration	=	সাংগঠনিক সংহতি
Out-group	=	বহিঃসামাজিক সঙ্ঘ
Pantheism	=	সর্বেশ্বরবাদ
Patriarchy	=	পিতৃশাসিত পরিবার
Patrilineal Family	=	পিতৃপরিচায়ী পরিবার

Patrilocal residence	=	পতি-আবাসিক
Pattern maintenance	=	কাঠামো সংরক্ষণ
Personality Integration	=	ব্যক্তিত্বের সম্পূরণ
Polyandry	=	বহুভর্তৃকত্ব
Polygamy	=	বহুগামিতা
Polygyny	=	বহুপত্নীকত্ব
Pressure Group	=	চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘ
Primary Group	=	প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ
Progress	=	প্রগতি
Projection	=	অভিক্ষেপ
Psychologist	=	মনোবিদ্
Public	=	জনমণ্ডল
Quasi (or potential) group	=	সম্ভাব্য সামাজিক সঙ্ঘ
Race	=	জাতি
Race prejudice	=	বর্ণ বিদ্বেষ
Rationalisation	=	যুক্ত্যাভ্যাস
Reflex	=	স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র
Repression	=	অবদমন
Reproduction	=	সংজনন
Retrogression	=	প্রত্যাগতি
Scheduled Caste	=	তফসিলী সম্প্রদায়
Secondary group	=	পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ
Self-assertion	=	আত্মসাম্মুখ্য
Social development	=	সামাজিক ক্রমবিকাশ
Social dynamics	=	সামাজিক জঙ্গমত্ব
Social evolution	=	সামাজিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি
Social group	=	সামাজিক সঙ্ঘ
Socialisation	=	সামাজিকীকরণ
Social interaction	=	সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া
Social Mobility	=	সামাজিক সচলতা
Social role	=	সামাজিক ভূমিকা
Social status	=	সামাজিক পরিচিতি
Social structure	=	সামাজিক কাঠামো
Social stratification	=	সামাজিক স্তর-বিন্যাস
Social system	=	সামাজিক গঠনতন্ত্র
Species	=	প্রজাতি

Spectator Crowd	–	কৌতূহলজনিত আকস্মিক জনতা
Status group	=	মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণী
Sub-culture	=	উপজীবন-ধারা
Subjective	–	বিষয়ীগত
Sublimation	–	উদ্‌গতি
Temperament		মানসিক ধাত
Tension	–	মানসিক উত্তেজনা
Tension Management	-	মানসিক ভাবসাম্য রক্ষা
Theory of evolution		বিবর্তনবাদ , অভিব্যক্তিবাদ
Traditional	–	সাবেকী , চিরাচরিত
Tribe		উপজাতি
Type	–	জাতিরূপ
Urbanisation	=	নগরায়ন
Underdeveloped society	-	অনুন্নত সমাজ
Variation	–	বিভিন্নতা
Vertical mobility		উল্লম্বী সচলতা
White-collar job	–	বাবু-কাজ

নামসূচী